অরুণকুমার সেন
সুশীলকুমার সেন
শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

ভারতের শাসন-ব্যবস্থা

Syllabuses for the Degree Courses in Political Science

Pass Course

THE UNIVERSITY OF CALCUTTA

Paper—III

Indian Government and Politics

1. Historical background : Colonialism and nationalism in India ; Anti-imperialist struggle ; its forms.
2. Indian Constitution : its socio-economic basis and philosophy : important features
3. Fundamental Rights and Directive Principles of State Policy : their nature and significance.
4. Distribution of powers between the Centre and the States—(Legislative, administrative and financial) trends in Centre States relations.
5. Parliamentary Government President : Prime Minister and Cabinet ; Parliament.
6. Governor : Chief Minister and Cabinet , State Legislature.
7. Judicial Review—role of the Supreme Court and the High Courts.
8. Amendments to the Indian Constitution.
9. Bureaucracy, its functions.
10. Public Service Commissions.
11. Official Language.
12. Election Commissions.
13. Provisions relating to the Schedule Castes, the Scheduled Tribes and the Anglo-Indian Community.
14. Political Parties : ideology and programmes (with special reference to West Bengal).
15. Local SelfGovernment : Urban and Rural (with special reference to West Bengal).

THE UNIVERSITY OF BURDWAN

Paper—III

Indian Government and Politics

I. Preamble to the Constitution ; its significance.

II. Fundamental Rights and Duties of citizens—Constitutional limitations on the Fundamental Rights.

III. Directive Principles of State Policy : Constitutional provisions—Significance / importance of the Directive Principles

IV. The Nature of Indian Federal Syetem ; Legislative, Administrative and Financial Relations between the Union and the Planning Commission.

V. Election Commission : functions.

VI. Party-system in India. Salient features.

VII. Amendment of the Constitution : Procedure.

VIII. The Union Legislature : Parliament—composition powers and functions—Relations between the Lok Sabha and Rajya Sabha.

IX. The Union Executive : (a) President and Vice-President election and removal, (b) President, powers and his relation with the Council of Ministers, (c) The Prime Minister and the Council of Ministers : their relations.

X. The Indian Judiciary, Organisation, power and functions of the Supreme Court and the High Courts.

XI. The Governor : appointment, removal, powers and position.

XII. Composition, power and functions of the Legislative Assembly and Legislative Council in a State.

XIII. Municipal Government and Panchayet Raj in West Bengal—a brief outline.

VIDYASAGAR UNIVERSITY

PAPER—III. INDIAN GOVERNMENT

1. Preamble to the Constitution—
2. Fundamental Rights and Duties.
3. Directive principles of State Policy.
4. Distribution of Powers between the Centre and the States—Legislative, Administrative & Financial.
   Recent trends in Centre—State relations
5. Union Government : The President and the Vice-President—Cabinet and Prime Minister. Relations between the President & the Cabinet.
   The Parliament : Composition & functions. Interrelations between the two Houses.
   The Speaker – the Parliamentary committees.
   State Government The Governor, The Chief Minister and the Council Ministers—The Governor, and the Council of Minister —The Governor and the Council of Minister.
   State Legislature : Composition & functions.
   —The role of the Speaker.
7. The Judicial System. Organisation & function of the Supreme Court and the High Courts.
8. The Civil Service. The recruitment procedure.
   —The role of the Civil Service
9. Official language
10. Election Commission.
11. Provisions relating to Scheduled Castes & Scheduled Tribes.
12. The Party System : Evolution and recent trends.
13. Structure of Divisional and District Administration.
14. Local self-Government—Panchayati Raj and Municipal Administration in West Bengal.
15. Procedure for amending the Constitution
   The Central Military Commission.
   The Local People's Congresses and the Local People's Governments at different levels.
   The Organs of self-Government of National Autonomous Areas.
   The People's Courts and the People's Procurators.

THE UNIVERSITY OF NORTH BENGAL

Paper—III

Constitution of India

Group A : *Constitutional Development in India, 1919-1950*

1. Government of India Act, 1919 (Dyarchy).
2. Government of India Act, 1935 (Federalism, Provincial Autonomy).
3. Constitutional and Political Developments **1937-47** (Cabinet Mission Plan, Indian Independence Act).
4. Framing of the Constitution ; Constituent Assembly of India, 1946-49.

Group B : *Constitution of India, 1950*

1. Preamble.
2. Union State Relations in India and Indian Federal System.
3. Fundamental Rights.
4. Directive Principles of State Policy.
5. Union State Executive.
6. Union and Legislature.
7. Union State Judiciary.
8. Provisions for Minorities.
9. Constitutional Amendment.
10. Emergency Provisions.
11. Nature of the Indian Constitution : An Assessment.

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

১. ঐতিহাসিক পশ্চাৎপট—ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদনীতি (Historical Survey—British Imperialism in India) : সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ, ফিনান্স-মূলধন—উপনিবেশের উপর সাম্রাজ্যবাদের ফল—ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ : তিনটি পর্যায়—কোম্পানীর শাসনতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের রূপান্তর, ফিনান্স-মূলধনের প্রসার, সাম্রাজ্যবাদের কৌশল পরিবর্তন, শাসন-সংস্কারের স্বরূপ, সম্পত্তির অধিকারের তাৎপর্য—সাম্রাজ্যবাদী বিভেদ-নীতি—দেশীয় রাজ্যগুলির পরিপোষণ, সাম্প্রদায়িকতার প্রসারসাধন ৩-১৯

২. ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ফলাফল (Outcome of the British Rule in India) : শুভাশুভ—অশুভ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত শুভ, অর্থ-ব্যবস্থার উপর ব্রিটিশ শাসনের প্রভাব—ব্রিটিশ স্বার্থসাধক ভূমিস্বত্ব-ব্যবস্থা ও শিল্পায়ন নীতি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ব্রিটিশ শাসনের প্রভাব, ব্রিটিশ শাসনের ফলে উদ্ভূত শ্রেণী ও গোষ্ঠী—মিশ্র প্রকৃতির জাতীয়তাবাদ ২০-২৮

৩. ভারতীয় জাতীয়তাবাদ (The Indian Nationalism) : জাতীয়তাবাদের ধারণা, ভারতে জাতীয়তাবাদ বিকাশের মৌল কারণ, ভারতে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ও সম্প্রসারণ, ভারতে নবজাগরণ—পাশ্চাত্য প্রেরণা ও ইংরাজী শিক্ষা, অর্থনৈতিক অসন্তোষ, বর্ণবৈষম্য ও ইংরাজদের ঔদ্ধত্য, ইংরাজদের দমন-নীতি, বৈদেশিক ঘটনার অনুপ্রেরণা—ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রসারের বিভিন্ন পর্যায় : প্রথম পর্যায় (১৮৮৫-১৯০৫), দ্বিতীয় পর্যায় (১৯০৫-২০), স্বদেশী ও বয়কট, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, তৃতীয় পর্যায় (১৯২০-৪৭ —গান্ধী-নেতৃত্বের তিনটি যুগ ২৯-৪৪

৪. সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম (Anti-Imperialist Struggle) : স্বদেশী ও বয়কট, হোমরুল আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, স্বরাজ্য দলের রাজনীতি, আইন অমান্য আন্দোলন (১৯৩০-৩১, ১৯৩২-৩৪), ভারত ছাড়ো আন্দোলন (১৯৪২), গান্ধীনীতির প্রহেলিকা ৪৫-৫১

৫. ভারতের সংক্ষিপ্ত শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস (A Short Constitutional History of India) : ঐতিহাসিক পরিক্রমা—১৭৭৩ ও তৎপরবর্তী সময়, ব্রিটিশ রাজশক্তির নিকট ভারত-শাসনের হস্তান্তর, ভারতীয় আইনসভা-সমূহের সম্প্রসারণ—১৮৬১-১৯০৯, ১৯০৯ সালের আইন, ১৯১৭ সালের আগস্ট মাসের ঘোষণা, ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন বা মণ্টফোর্ড শাসনসংস্কার—দ্বৈত শাসন-ব্যবস্থা—ত্রুটি—১৯৩৫ সালের আইন প্রবর্তনের পূর্বতন ঘটনাবলী,

জালিয়ানওয়ালাবাগ [illegible]দি ; সাইমন কমিশন, নেহরু কমিটি ; সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ; ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন—প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি, প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য ; গভর্ণরের স্ববিবেকানুযায়ী কার্য ও ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি অনুসারে কার্য : কার্যক্ষেত্রে প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য ; শাসনতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতি—১৯৪০-৪৭ ; ক্রীপস প্রস্তাব, ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা, ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের এ্যাটলীর ঘোষণা, মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা, ১৯৪৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা আইন ; ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের মৌল ব্যবস্থা ; কংগ্রেস ভারত বিভাগকে স্বীকার করিয়া লওয়ার কারণ ; ডোমিনিয়ন ভারতের শাসন-ব্যবস্থা ; গণপরিষদ ও ভারতীয়-সংবিধান ; গণপরিষদের প্রকৃতি—কয়েকটি দেশের গণপরিষদের সহিত তুলনা ; বুর্জোয়া সংবিধান ৫২-১০১

সংবিধানের দার্শনিক এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভিত্তি (The Philosophical and Socio-Economic Bases of the Constitution) : সোবিয়েত ইউনিয়নের সহিত ভারতের তুলনা ; সংবিধান রচয়িতৃগণ কর্তৃক শাসন-ব্যবস্থার পুরাতন কাঠামোর রূপদান ; ভারতীয় সংবিধানের তিনটি মৌল বৈশিষ্ট্য ; পুরাতন কাঠামোর বিবরণ ; ভারতে পার্লামেন্টীয় শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন (১৯১৯) ; ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার সূচনা এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের প্রতিষ্ঠা (১৯৩৫) ; ভারতীয় সংবিধানের উৎস, পুরাতন ও নূতনের সমন্বয় ; স্বাধীন ভারতের সংবিধানের উপর ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের প্রভাব ; বিভিন্ন আধুনিক সংবিধান হইতে গৃহীত ব্যবস্থা ; প্রস্তাবনা ও সংবিধানের দার্শনিক ভিত্তি ; সংবিধানের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভিত্তি ; ভারত-রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্র : শিল্পক্ষেত্রে, কৃষিক্ষেত্রে, বর্ণভেদ প্রথা ১০২-১২৩

দ্বিতীয় খণ্ড

১. **ভারতীয় সংবিধানের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য (Salient Features of the Constitution of India) :** শাসন-ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনার ভিত্তিতে ভারতীয় সংবিধানের বৈশিষ্ট্যসমূহ ; ভারতীয় সংবিধান কতদূর যুক্তরাষ্ট্রীয় ১-১১

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা (Preamble to the Constitution of India) : সংবিধানের প্রস্তাবনার অর্থ, উদ্দেশ্য এবং তাৎপর্য ; ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা ও উহার বিশ্লেষণ : সংবিধানের রাজনৈতিক, আইনগত ও নৈতিক ভিত্তি—প্রস্তাবনার অন্যান্য অংশের বিশ্লেষণ ১২-২৪

ভারতীয় রাজ্যসংঘের গঠন (Structure of the Indian Union) : ভারতীয় রাজ্যসংঘের বর্তমান গঠন—রাজ্য পুনর্গঠন ব্যাপারে সংবিধানগত ব্যবস্থা ২৫-৩০

৪. **ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রকৃতি (Nature of the Indian Federalism) :** যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি, যুক্তরাষ্ট্রের আর দুইটি বৈশিষ্ট্য—সংবিধানের প্রাধান্য এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত, কোন্ কোন্ অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কাম্য ? ; ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা গ্রহণের কারণ—ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের গঠন-পদ্ধতি, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বিবর্তন ; ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি—কেন্দ্রপ্রবণতা, কেন্দ্রপ্রবণতার বিভিন্ন দিক, আর্থিক ক্ষেত্রে কেন্দ্রপ্রবণতা, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রপ্রবণতার কারণ, কেন্দ্রিকতার সম্প্রসারণ ও ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ৩১-৫৪

৫. **ভারতীয় সংবিধানে ইউনিয়ন ও রাজ্যগুলির মধ্যে সম্পর্ক (Relations between the Union and the States under the Indian Constitution) :** যুক্তরাষ্ট্রের আইনবিষয়ক ক্ষমতার বণ্টন এবং কেন্দ্র ও অংগরাজ্যগুলির মধ্যে সম্বন্ধ, ক্ষমতা বণ্টনের প্রকৃতি কোন্ কোন্ বিষয় দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়, ভারতীয় সংবিধানে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা বণ্টন, আইন প্রণয়ন বিষয়ে কেন্দ্রীয় প্রাধান্য, আদালতের ব্যাখ্যা, যুগ্ম ক্ষমতার ক্ষেত্রে সংঘর্ষ, বিশেষ অবস্থায় রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয় সম্পর্কে পার্লামেন্টের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা, কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের স্বপক্ষে যুক্তি, শাসন বিভাগীয় ক্ষমতার বণ্টন এবং ইউনিয়ন ও অংগরাজ্যসমূহের মধ্যে শাসনকার্য পরিচালনাসংক্রান্ত সম্বন্ধ, অধস্তন সহযোগিতা, অধস্তন সহযোগিতার অন্যান্য প্রকাশ, আন্তঃরাজ্য পরিষদ ৫৫-৬৯

৬. **ইউনিয়ন ও রাজ্যগুলির মধ্যে রাজস্বসংক্রান্ত ক্ষমতার বণ্টন (Distribution of Financial Powers between the Union and the States) :** যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজস্ব-ব্যবস্থার কয়েকটি সাধারণ নীতি. ভারতীয় সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজস্ব-ব্যবস্থা, অর্থ কমিশন, রাজস্ববণ্টনের প্রকৃতি ৭০-৮০

৭. **ভারতীয় নাগরিকতা (Indian Citizenship) :** সংবিধান অনুসারে নাগরিক ভিত্তি বা বিধান ; ১৯৫৫ সালের নাগরিকতা আইন—নাগরিকতা অর্জন, নাগরিকতার অবসান ; ভারতীয় নাগরিকতা প্রদান-ব্যবস্থার উৎকর্ষ ৮১-৮৮

৮. **মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights) :** অধিকারের প্রকৃতি, রাষ্ট্র ও নাগরিক-অধিকার, অধিকার-সংরক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতি ; সংবিধানে অধিকার অন্তর্ভুক্ত ও ঘোষণা করার প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা—বিপক্ষে ও সপক্ষে যুক্তি ; ভারতীয় সংবিধানে অংগীভূত অধিকারসমূহের বৈশিষ্ট্য ; ভারতীয় সংবিধানে সংরক্ষিত মৌলিক অধিকারসমূহ—(১) সাম্যের অধিকার ; (২) ছয় প্রকারের স্বাধীনতার অধিকার, অধিকারগুলির গুরুত্ব ও তাৎপর্য, স্বাধীনতার অধিকারসমূহের সীমাবদ্ধতা, ভারতের স্বাধীনতার অধিকারের উপর বিভিন্ন বাধানিষেধ, স্বাধীনতার অধিকারের আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য, স্বাধীনতার অধিকারের অন্যান্য ব্যবস্থা. জীবনের নিরাপত্তা ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার সংরক্ষণ.

গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কিত অধিকার, নিবর্তনমূলক আটক ও স্বাধীনতার অধিকার; (৩) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার; (৪) ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার; (৫) সংস্কৃতি ও শিক্ষাবিষয়ক অধিকার; সম্পত্তির অধিকার]; (৬) শাসনতান্ত্রিক প্রতিকারের অধিকার ৮৯-১২৩

৯. **রাষ্ট্রের নির্দেশমূলক নীতি (The Directive Principles of State Policy)**: জনকল্যাণকর রাষ্ট্র ও নির্দেশমূলক নীতিসমূহ; ভারতীয় সংবিধানভুক্ত নির্দেশমূলক নীতিসমূহের প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য, সংবিধানের ২৫তম ও ৪২তম সংশোধন, উপযোগিতা ও মর্যাদা, নির্দেশমূলক নীতিসমূহের বর্ণনা; নির্দেশমূলক নীতিসমূহের মূল্যায়ন বা তাৎপর্য, নির্দেশমূলক নীতিগুলির রূপায়ণ ১২৪-১৩৭

১০. **ভারতীয় নাগরিকদের মৌল কর্তব্য (Fundamental Duties of the Indian Citizen)**: সংবিধানের ৪২তম সংশোধন অনুসারে ১০টি মৌল কর্তব্য; উহাদের সমর্থন ও বিরোধিতা ১৩৮-১৪০

১১. **ইউনিয়নের শাসন বিভাগ (The Executive of the Union)**: শাসন বিভাগের গঠন; রাষ্ট্রপতি—নির্বাচন, নির্বাচন-পদ্ধতির বিশদ বর্ণনা, ভোটদান-পদ্ধতি—একহস্তান্তরযোগ্য সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব, রাষ্ট্রপতির নির্বাচন-পদ্ধতির সপক্ষে যুক্তি, রাষ্ট্রপতির কার্যকাল ইত্যাদি, রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করিবার পদ্ধতি, রাষ্ট্রপতিদের যোগ্যতা; ভারতের উপরাষ্ট্রপতি—নির্বাচন, কার্যকাল, পদচ্যুতি, যোগ্যতা, কার্যাবলী, মার্কিন উপরাষ্ট্রপতির সহিত তুলনা, পদমর্যাদা: রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইলে কার্যপরিচালনা সংক্রান্ত আইন, রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচন সম্পর্কে বিবাদ-মীমাংসার ব্যবস্থা; রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার বর্ণনা শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা. আইনসংক্রান্ত ক্ষমতা—'ভিটো', অর্ডিন্যান্স বা জরুরী আইন, অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা, জরুরী অবস্থাদি সংক্রান্ত ক্ষমতা; মন্ত্রি-পরিষদ—গঠন ও সংবিধানে উল্লিখিত কার্যাবলী; রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা ও তাঁহার ক্ষমতার তাৎপর্য এবং মন্ত্রি-পরিষদের সহিত তাঁহার সম্পর্ক—মার্কিন রাষ্ট্রপতি ও ইংলণ্ডের রাণীর সহিত তুলনা; রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার তাৎপর্য এবং মন্ত্রি-পরিষদের সহিত তাহার সম্পর্ক; সংবিধানগত ব্যবস্থা, সুপ্রীম কোর্টের অভিমত; রাষ্ট্রপতি কি সম্পূর্ণ নামসর্বস্ব শাসক ছিলেন; রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা সম্পর্কে সংশয়, তাঁহার স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা; বাস্তবে কার্যাকার্যের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা ও ক্ষমতা; ১৯৭৯ সালের ঘটনাবলী; মন্ত্রি-পরিষদের সহিত সংসদের সম্পর্ক: যৌথ দায়িত্ব, আইন প্রণয়ন, সরকারী আয়ব্যয়; ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মন্ত্রি-পরিষদের কার্যাবলী ও ইহার প্রকৃত ভূমিকা, শাসন বিভাগের প্রাধান্য, ক্যাবিনেট নায়কতন্ত্র; প্রধান মন্ত্রী—পদমর্যাদা ও ক্ষমতা: সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে প্রধান মন্ত্রী, সংসদের অভ্যন্তরে প্রধান মন্ত্রী, অন্যান্য মন্ত্রীর

সহিত প্রধান মন্ত্রীর সম্পর্ক, প্রচারযন্ত্রের উপর প্রধান মন্ত্রীর প্রভাব, রাষ্ট্রপতির সহিত প্রধান মন্ত্রীর সম্পর্ক ; বিভিন্ন রাষ্ট্রপতি ও সমকালীন প্রধান মন্ত্রিগণ,* সাধারণ নির্বাচন ও প্রধান মন্ত্রী, উপ-প্রধান মন্ত্রী ১৪১-১৯০

১২. **সংবিধানের জরুরী অবস্থাদি সংক্রান্ত ব্যবস্থা (Emergency Provisions of the Constitutions)** : জরুরী বা আপৎকালীন অবস্থার ঘোষণা, রাজ্যে শাসন-ব্যবস্থার অচলাবস্থাসংক্রান্ত ঘোষণা, আর্থিক সংকটাবস্থার ঘোষণা ; জরুরী অবস্থাদি সংক্রান্ত ব্যবস্থা—সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি ১৯১-১৯৯

১৩. **ভারতের এটর্নি-জেনারেল (The Attorney-General of India)** : এটর্নি-জেনারেলের পদ ও পদাধিকারীর যোগ্যতা, বেতন, কার্যাবলী, ইংল্যাণ্ডের এটর্নি-জেনারেলের সহিত তুলনা ২০০-২০১

১৪. **ইউনিয়নের ব্যবস্থা বিভাগ (The Legislature of the Union)** : সংসদ বা সংসদের তিনটি অংগ, রাজ্যসভা ও লোকসভার গঠন, সংসদে আসন বণ্টন, সংসদের সদস্যপদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা সম্পর্কে নিয়ম-কানুন, রাজ্যসভা ও লোকসভার আয়ুষ্কাল, সংসদের অধিবেশন, রাজ্যসভার সভাপতি ও সহ-সভাপতি, লোকসভার স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার ; কেন্দ্রে দ্বিপরিষদ-ব্যবস্থা, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় দ্বিতীয় পরিষদের তাৎপর্য, স্পীকারের পদমর্যাদা, দায়িত্ব ও ক্ষমতা, স্পীকারপদের জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলী, কাম্য রীতিনীতির প্রয়োজনীয়তা, কয়েকজন স্পীকার* ; স্পীকারপদের বর্তমান অবনতি*, স্পীকারের ভূমিকার মূল্যায়ন* ; সংসদ এবং সংসদের সদস্যদের অধিকার ও অব্যাহতি, আইনসভার অবমাননা ও উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা সংক্রান্ত মামলা, আইনসভাসমূহের ব্যাপক অধিকারের যৌক্তিকতা ; সংসদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী : আইন প্রণয়নের ক্ষমতা, সরকারী আয়ব্যয় নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা, শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ; সংসদীয় শাসন-ব্যবস্থায় বিরোধী দলের ভূমিকা ; সরকার ও বিরোধী দলে পারস্পরিক, বিরোধী দল ও গণতন্ত্র* ; ভারতীয় সংসদে বিরোধী দলের ভূমিকা* ; রাজ্যসভার ক্ষমতা ও কার্য এবং লোকসভার সহিত সম্বন্ধ ; অর্থ বিল, অর্থ বিল ভিন্ন অন্যান্য বিল, শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ, রাজ্যসভার ক্ষমতার যৌক্তিকতা ২০২-২৩৪

১৫. **সংসদে আইন প্রণয়ন ও অর্থবিষয়ক কার্যপদ্ধতি (Legislative and Financial Procedures in Parliament)** : সংসদে আইন প্রণয়ন পদ্ধতি ; সংসদে বিল পাসের বিভিন্ন পর্যায় ; বিল উত্থাপন ও বিলের প্রথম পাঠ, বিলের দ্বিতীয় পাঠ ও বিলের নীতির আলোচনা, কমিটি পর্যায়, রিপোর্ট পর্যায়, বিচারবিবেচনা পর্যায় এবং বিলের ধারার আলোচনা, বিলের তৃতীয় পাঠ, অন্য পরিষদ দ্বারা বিচারবিবেচনা, বেসরকারী বিল, বিলে

* চিহ্নিত বিষয়গুলি বর্তমান সংস্করণে নূতন

সম্মতিজ্ঞাপন ; অর্থ বিল সম্পর্কে বিশেষ পদ্ধতি অর্থ বিলের সংজ্ঞা, অর্থ বিল পাসের পদ্ধতি, অর্থ বিল উত্থাপনের পরবর্তী পর্যায়সমূহ, অর্থ বিল ও অন্যান্য অর্থ-সম্বন্ধীয় বিলের মধ্যে পার্থক্য, অর্থ বিলে সম্মতিজ্ঞাপন ; সংসদের অর্থবিষয়ক কার্যপদ্ধতি ; সংসদে বাজেট পাসের পদ্ধতি ; সংসদে বাৎসরিক অর্থবিবরণী বা বাজেট পেশ, বাজেটের সাধারণ আলোচনা, লোকসভার ব্যয়মঞ্জুরীর দাবি সম্পর্কে ভোটগ্রহণ, বিনিয়োগ আইন, গণনানুদান, অনুপূরক, অতিরিক্ত বা অধিক অনুদান, প্রত্যয়ানুদান ও ব্যতিক্রমানুদান ; রাজস্ব আইন : আয়ব্যয়ের উপর সংসদের নিয়ন্ত্রণ, ভারতের নিয়ন্ত্রণ ও মহাগণনা-পরীক্ষক, সরকারী গণিতক কমিটি, আনুমানিক ব্যয় হিসাব কমিটি ; ভারতীয় সংসদের স্থায়ী ও অস্থায়ী কমিটি-ব্যবস্থা : লোকসভার কমিটিসমূহ : কার্য পরিচালনাসংক্রান্ত পরামর্শদান কমিটি, আবেদনসংক্রান্ত কমিটি, নিয়মাবলীসংক্রান্ত কমিটি, অধিকারসংক্রান্ত কমিটি, সরকারী প্রতিশ্রুতিসংক্রান্ত কমিটি, অধস্তন আইনসংক্রান্ত কমিটি, লোকসভার বৈঠকে সদস্যদের অনুপস্থিতি সম্পর্কিত কমিটি, সরকারী গণিতক কমিটি, আনুমানিক ব্যয়-হিসাব কমিটি, বিল সম্পর্কিত সিলেক্ট কমিটি, বেসরকারী বিল ও প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি, সরকারী উদ্যোগাধীন প্রতিষ্ঠানসংক্রান্ত কমিটি ; রাজ্যসভার কমিটিসমূহ, দুই কক্ষের যুক্ত কমিটি ২৩৫-২৬৩

১৬. ভারতীয় সংসদের সাংবিধানিক মর্যাদা (The Constitutinal Status of the Indian Parliamant) : ২৬৪-২৬৭

প্রথম খণ্ড

১. ঐতিহাসিক পরিক্রমা—ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদনীতি
২. ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ফলাফল
৩. ভারতীয় জাতীয়তাবাদ
৪. সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম
৫. ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস
৬. ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের প্রকৃতি-বিশ্লেষণ
৭. গণপরিষদ
৮. সংবিধানের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভিত্তি

"Constitutions may be traced historically, described legally, compared critically."—Lord Balfour

"A constitution is a system of fundamental practical institutions moulded partly by history and partly by human ingenuity".

—Herman **Finer**

১

ঐতিহাসিক পশ্চাৎপট—ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদনীতি

(HISTORICAL BACKDROP—BRITISH IMPERIALISM IN INDIA)

"On a world scale the subjection of India has been the largest and most important basis of empire domination in the modern world." R. Palme Dutt

কোন দেশের সংবিধানের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্যকভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে ঐ দেশের ইতিহাস এবং সক্রিয় ঐতিহাসিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক শক্তিসমূহ সম্পর্কে ধারণা লইয়া চলা অপরিহার্য। সুতরাং ভারতের বর্তমান সংবিধানের প্রকৃতি অনুধাবন করিতে হইলে উহার বিবর্তনধারা বা ক্রমবিকাশকে অনুসরণ করিতে হয়। এবং এই ক্রমবিকাশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাসের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আবার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও শাসনের প্রকৃতি পর্যালোচনার পূর্বে সাধারণভাবে ঔপনিবেশিক বা সাম্রাজ্যবাদী নীতির প্রকৃতি সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন।

১. সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ : ঔপনিবেশিক শক্তির নীতি হইল অনুন্নত ঔপনিবেশিক দেশসমূহ হইতে সুলভে কাঁচামাল আমদানি এবং ঐ সকল দেশে শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানি করা। এইভাবে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী দেশ উপনিবেশসমূহকে শোষণ করিতে থাকে।

১.১. ফিন্যান্স-মূলধন : ক্রমে আবির্ভাব হয় একচেটিয়া কারবারের এবং **শিল্প-মূলধন** (*industrial capital*) ও **ব্যাংক-মূলধন** (*banking capital*) পরস্পরের সহিত মিশিয়া গিয়া **ফিন্যান্স-মূলধনে** (*finance capital*) পরিণত হয়। স্বদেশে নিয়োগের সুযোগসম্ভাবনা সংকুচিত হওয়ার দরুন এই ফিন্যান্স-মূলধনের একচেটিয়া কারবারীরা উপনিবেশগুলিতে মূলধন রপ্তানি করিতে থাকে। কারণ, উপনিবেশগুলির অর্থ-ব্যবস্থা অনুন্নত বলিয়া সেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে জমি এবং সুলভ শ্রম ও কাঁচামাল মুনাফার সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে। এবং এই বিনিয়োগের ফলে উপনিবেশগুলির শিল্পপ্রসার মোটেই সুষম (balanced) হয় না। অপরপক্ষে উপনিবেশগুলির পূর্বতন অর্থ-ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়ে। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ধ্বংস হয় এবং ফলে কৃষির উপর জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অথচ কৃষি অনুন্নতই থাকিয়া যায়। বিদেশীরা জমিদারশ্রেণীর সহিত সমঝোতা করিয়া চলার ফলে কৃষির উন্নয়নের দিকে কোন দৃষ্টিই দেওয়া হয় না।

১.২. উপনিবেশের উপর সাম্রাজ্যবাদের ফল : কৃষির উপর জনসংখ্যার অধিক চাপের দরুন ভূমিহীন কৃষিশ্রমিক বা খেতমজুরদের সংখ্যা দ্রুত বাড়িতে থাকে। বৎসরের কয়েক মাস বেকার থাকিতে বাধ্য হইয়া ইহারা প্রচ্ছন্ন বা ছদ্ম বেকারত্বের

(*disguised unemployment*) সৃষ্টি[১] করে। অপরদিকে যাহারা কোন কাজই পায় না তাহারা হয় সাধারণ বেকারের পর্যায়ভুক্ত। মোটকথা, সাম্রাজ্যবাদী শোষণের ফলে উপনিবেশে শিল্প ধ্বংস হয়, কৃষি অবনতির দিকে চলে এবং বিভিন্ন ধরনের বেকারত্বের সৃষ্টি হইতে থাকে।

১.৩. শ্রেণীবিন্যাস: ইহার সংগে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়। সাম্রাজ্যবাদ প্রসারের ফলে দেশীয় এক **বণিকশ্রেণীর উদ্ভব** হয়; ইহারা বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শিল্পপতি এবং দেশীয় বাজারের মধ্যে মধ্যস্থতার কার্য করিয়া বিত্তশালী হইয়া উঠে। অর্থাৎ, ইহারা বিদেশী দ্রব্য দেশীয় বাজারে বিক্রয় করিয়া মুনাফা করিতে থাকে। ইহা ছাড়া **শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর** সৃষ্টি হয়; ইহারা বিদেশী শক্তির রাজকর্মে সহায়তা করিতে থাকে। পরিশেষে সৃষ্টি হয় **শ্রমিকশ্রেণীর**।

১.৪. সাম্রাজ্যিক শক্তির সহিত সংঘর্ষ ও জাতীয়তাবাদের উদ্ভব: ক্রমশ বণিক, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক—এই তিন শ্রেণীরই মধ্যে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও অভিযোগ গড়িয়া উঠিতে থাকে। বিত্তশালী দেশীয় বণিকশ্রেণী নিজেদের শিল্পবাণিজ্য গড়িয়া তুলিতে চায়; ইহা বিদেশী শক্তি সুনজরে দেখে না। অপরদিকে দেশীয়দের (natives) সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ফলে একদিকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এবং অপরদিকে দেশীয়দের মধ্যে সংঘাতের ফলে উপনিবেশে অংকুরিত হয় জাতীয়তাবাদ। তখন দেশীয় বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে সকল শ্রেণীর লোক মিলিত হইয়া সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে থাকে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ইহার মোকাবিলার প্রচেষ্টা করে চিরাচরিত নীতি অনুসারে—দেশীয় জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে মদত দিয়া, একদিকে প্রয়োজনীয় অত্যাচার চালাইয়া এবং অপরদিকে কিছু কিছু দয়াদাক্ষিণ্য দেখাইয়া। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম তীব্র হইয়া দাঁড়াইলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি উপনিবেশের উচ্চতর শ্রেণীর সংগে আপোষ-মীমাংসার মাধ্যমে অবস্থানুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া স্বার্থরক্ষার সম্ভাব্য প্রচেষ্টা করিতে থাকে।

২. ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ: ভারতে ব্রিটিশ শাসন ও শোষণ উপরি-উক্ত পদ্ধতিতেই পরিচালিত হইয়াছিল। ইংরাজরা ভারতে আসে বণিক হিসাবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত শক্তিশালী ঔপনিবেশিক শক্তিতে পরিণত হয়। 'বণিকের মানদণ্ড পোহালে শর্বরী, দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে'—রবীন্দ্রনাথ।

তিনটি পর্যায়: ভারতে ব্রিটিশ শাসন ও শোষণ মোটামুটিভাবে প্রধান তিনটি পর্যায়ের মধ্য দিয়া চলিয়াছিল। প্রথমটি হইল বণিক-মূলধনের (*Merchant*

---

১. Disguised Unemployment বা 'প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব' বর্ণনাটি Mrs. Joan Robinson-এর। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ হইতে প্রচ্ছন্ন বেকার হইল তাহারাই যাহাদের সামাজিক সুযোগ-ব্যয় (social opportunity cost) শূন্য। ফলে প্রান্তিক উৎপাদনও (marginal product) শূন্য। অর্থাৎ, ৪ জনের স্থলে ৫ জন শ্রমিক নিযুক্ত করিলে উৎপাদন যেমন বাড়ে না, তেমনি ৫ জনের স্থলে ৪ জন শ্রমিক নিযুক্ত করিলে উৎপাদন কমেও না।

Capital) যুগ। ইহার ব্যাপ্তি হইল ১৬০০ সাল হইতে উনিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত। দ্বিতীয় যুগ হইল শিল্প-মূলধনের (*Industrial Capital*) যুগ—ইহা ১৮১৩ হইতে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। পরিশেষে আছে ফিন্যান্স মূলধনের (*Finance Capital*) পর্যায়। ইহার যুগ হইল ১৮৫৮ হইতে ১৯৪৭ বা ক্ষমতা-হস্তান্তর পর্যন্ত।

৩. প্রথম পর্যায়—১৬০০-১৮১২ : ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সূত্রপাত হয় তখনই যখন ১৬০০ সালে (ব্রিটিশ) ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে প্রাচ্য দেশে একচেটিয়া ব্যবসায়ের সনদ দেওয়া হয়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বণিক-মূলধনের প্রতিনিধি হিসাবে ভারতে আসে। তখন ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল এই দেশের জিনিসপত্র (যেমন, মসলাপাতি সুতী ও রেশম বস্ত্র) ইংল্যাণ্ড ও ইয়োরোপীয় বাজারে বিক্রয় করিয়া মুনাফা করা।

আদিতে ভারতে ব্রিটিশ দ্রব্যাদির বিক্রয়-বাজার প্রসারের কোন পরিকল্পনা কোম্পানীর ছিল না।

৩.১. রাজনৈতিক ক্ষমতা বিস্তারের প্রচেষ্টা : ক্রমশ ইংরাজরা রাজনৈতিক ক্ষমতা ও রাজ্য বিস্তারের প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়। ব্যবসাবাণিজ্য তখন হইয়া দাঁড়ায় লুঠতরাজের নামান্তর মাত্র। আঠার শতকের মধ্যভাগের কিছু পরে ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করিয়া রাজস্ব পরিচালনার ভার পায়। তখন তাহাদের শোষণ-প্রকৃতি সুপরিস্ফুট হইয়া পড়ে।

ইংরাজরা দুইভাবে ভারতকে শোষণ করিতে সুরু করে। প্রথমত, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে বলপূর্বক দেশীয় জিনিসপত্র নামমাত্র দামে কিনিয়া লইয়া ইংল্যাণ্ড ও অন্যান্য দেশে চালান দিতে থাকে। ইহার ফলে দেশীয় শিল্পসমূহ ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। দ্বিতীয়ত, সরাসরি রাজস্ব আদায় করিয়া তাহার সিংহভাগ ইংল্যাণ্ডে প্রেরণ করিতে থাকে। এইভাবে লুণ্ঠিত অর্থ ইংল্যাণ্ডে চালান হইয়া ঐ দেশের শিল্পবিপ্লবকে (Industrial Revolution—1760-1820) সাহায্য করে।[১] শিল্প-বিপ্লবের ফলে ইংল্যাণ্ডে নূতন এক শিল্পপতিশ্রেণীর উদ্ভব হয়। ইহারা এবং ইংল্যাণ্ডের অন্যান্য বণিক মিলিয়া ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া কারবারের বিরুদ্ধে আন্দোলন সুরু করে।

৩.২. কোম্পানীর শাসনতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ : ইতিমধ্যে বিভিন্ন সময়ে পার্লামেণ্ট আইন পাস করিয়া ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ক্ষমতা হ্রাস করিতে থাকে। ১৭৭৩ সালে পাস হয় **লর্ড নর্থের রেগুলেটিং আইন** (Lord North's Regulating Act, 1773)। ইহা দ্বারা বাংলার জন্য স-পরিষদ গভর্ণর-জেনারেল (Governor-General-in-Council) নিযুক্ত করার ব্যবস্থা হয়। মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এর জন্য গভর্ণর বা প্রেসিডেণ্ট ও পরিষদ নিযুক্ত হয়, এবং একটি সুপ্রীম কোর্টও স্থাপিত হয়।

---

১. "Daring explorers and merchants increased the territory of the British Empire......and contributed to Industrial Revolution." Daniel R. Fusfeld : *The Age of the Economist*

ইহার পর ১৭৮৪ সালে পাস হয় **পিটের ভারত (শাসন) আইন** (The Pitt's India Act, 1784)। ইহার দ্বারা ইংল্যাণ্ডে **বোর্ড অফ্ কণ্ট্রোল** (Board of Control) প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার ফলে **দ্বৈত শাসন-ব্যবস্থা** (*dual administration*) প্রবর্তিত হয়—একদিকে থাকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এবং অপরদিকে বোর্ড অফ্ কণ্ট্রোল্।

৪. দ্বিতীয় পর্যায় ১৮১৩-থেকে উল্লেখ করা হইয়াছে যে (৫ পৃষ্ঠা) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শোষণের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় মোটামুটি ১৮১৩ সাল হইতে। এই পর্যায়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উদ্দেশ্য হয় ভারতে ইংল্যাণ্ডের শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার প্রসারিত করা এবং ভারত হইতে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ইংল্যাণ্ডে আমদানি করা। কোম্পানীর একচেটিয়া ব্যবসা ও উহার প্রত্যক্ষ শোষণ-পদ্ধতি এই উদ্দেশ্যসাধনের অনুকূল ছিল না। সুতরাং যাহা প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল তাহা হইল কোম্পানীর একচেটিয়া কারবার-পদ্ধতিকে বন্ধ করিয়া দক্ষ শাসনের ব্যবস্থা করা, শান্তি স্থাপন করা, ইংল্যাণ্ডের স্বার্থে অর্থনৈতিক সম্পদের সম্প্রসারণ করা এবং বিদেশী শাসকের শাসনকার্যে সহায়তা করার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষার বিস্তার করা। মোটকথা, প্রয়োজন ছিল **ভারতকে পরিপূর্ণ উপনিবেশে পরিণত করা**।

৪.১. ভারতকে পূর্ণ ব্রিটিশ উপনিবেশে পরিণতকরণের প্রচেষ্টা : ১৮১৩ সালের আইনের দ্বারা ভারতে কোম্পানীর একচেটিয়া কারবারের অবসান ঘটানো হয়। ১৮৩৩ সালের চার্টার আইন দ্বারা চীনদেশে একচেটিয়া কারবারের সুবিধাও বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। বাংলার গভর্ণর-জেনারেলকে করা হয় ভারতের গভর্ণর-জেনারেল।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একাধিক সংস্কারসাধন করা হয়। ভারতের বাজার এখন ইংল্যাণ্ডের পুঁজিপতি ও ব্যবসায়ীদের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। কৃষিক্ষেত্রে রায়তওয়ারি (ryotwari)ও জমিদারি ব্যবস্থার প্রসার করা হয়। রাস্তাঘাট রেলপথ পোস্টাপিস ও টেলিগ্রাফ প্রভৃতির সম্প্রসারণ করা হয়। ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তন করা হয়। এই সকল সংস্কারের উদ্দেশ্য ছিল ইংরাজদের ব্যবসায়ের জন্য বাজারের সৃষ্টি করা এবং কাঁচামাল সংগ্রহের সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি করা।

৪.২. শিল্প-মূলধন মালিকদের শোষণের প্রকৃতি : এখন শিল্প-মূলধন মালিকদের শোষণ কিভাবে চলে ও উহার ফলাফল কি দাঁড়ায় তাহার কিছুটা ইংগিত দেওয়া যাইতে পারে। বাজার প্রসারের জন্য ইংরাজরা যে-প্রথা অবলম্বন করে তাহা ছিল যে, ভারতের বাজারে ইংল্যাণ্ডের শিল্পজাত দ্রব্যাদি অবাধে আসিতে পারিবে কিন্তু ইংল্যাণ্ডের বাজারে ভারতীয় শিল্পজাত দ্রব্যাদিকে উচ্চহারে আমদানি শুল্ক দিতে হইবে। ইহার ফলে ভারতে ইংরাজদের বাজার সম্প্রসারিত হইতে থাকে এবং ভারতীয় শিল্পসমূহ ধ্বংসমুখে পতিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ভারতের তাঁত শিল্প, রেশম শিল্প, লৌহ ও কাঁচ শিল্প—সকলই বিনষ্ট হয়। ঢাকা মুর্শিদাবাদ সুরাট প্রভৃতি সমৃদ্ধশালী সহর অবনতির পথে চলিতে থাকে এবং সহরবাসী লোকেরা গ্রাম ও কৃষিতে গিয়া ভিড় জমায়। কারণ, ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রামীণ শিল্পেও তাহাদের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

ব্রিটিশের কৃষি-উপনিবেশ : ফলে ভারত হইয়া দাঁড়ায় ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের কৃষি-উপনিবেশ।

৪.৩. **ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের রূপান্তর :** শীঘ্রই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের রূপ পরিবর্তিত হইতে থাকে। ১৮৫৭ সালে জাতীয় স্বাধীনতার জন্য প্রথম বিদ্রোহ ঘটে। ইহাকে সাধারণত **সিপাহী বিদ্রোহ** (*the Sepoy Mutiny*) বলিয়া অভিহিত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে এই বিদ্রোহ ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে বিভিন্ন শ্রেণীর ভারতীয়ের প্রথম সংগ্রাম।[১] ইংরাজরা এই বিদ্রোহকে দমন করে। তবে তাহারা বুঝিতে পারে যে কোম্পানীর শাসনের অবসান ঘটাইয়া ব্রিটিশ রাজের প্রত্যক্ষ শাসন স্থাপন করিতে হইবে।

৫. **তৃতীয় পর্যায় ১৮৫৮-১৯৪৭ :** ১৮৫৮ সালে ভারত শাসন আইনের (Government of India Act, 1858) দ্বারা কোম্পানীর শাসনের অবসান ঘটানো হয়। এই প্রসংগে ব্রিটিশ **রাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণায়** (*Queen's Proclamation*) বলা হয় : আমাদের সংকল্প হইল জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে যোগ্যতা অনুসারে ভারতীয়দের সরকারী কাযে নিয়োগ করা। এই ঘোষণার উদ্দেশ্য অবশ্য স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা নয়, উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়দের এক শ্রেণীকে ব্রিটিশ শাসনের সহিত সংযুক্ত করিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করা।[২]

৫.১. **শিল্প-মূলধনের রূপান্তর :** ১৮৫৮ সালের ভারত শাসন আইনের (Government of India Act, 1858) ফলে কোম্পানীর স্থলে পুঁজিপতিদের প্রাধান্য স্থাপিত হয় এবং শিল্প-মূলধনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন সূচিত হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ শিল্প-মূলধনের স্থলে ফিন্যান্স-মূলধনের দিকে ঝুঁকিতে থাকে।[৩] তখন ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের দৃষ্টিতে ভারত আর মাত্র ব্রিটিশ দ্রব্যের বিক্রয়-বাজার এবং কাঁচামালের সংগ্রহস্থল না থাকিয়া হইয়া দাঁড়ায় মূলধন বিনিয়োগের ক্ষেত্র। ফলে শোষণের পদ্ধতিও হয় ভিন্নতর।

রেলপথ নির্মাণের সংগে সংগে চা কফি রবার প্রভৃতি শিল্পের প্রসার ঘটিতে দেখা যায় ; ইহার পর অন্যান্য ক্ষেত্রেও ব্রিটিশ মূলধন দ্রুত নিয়োজিত হইতে থাকে। ইহা ছাড়া ব্রিটিশ ব্যাংকিং ব্যবসায়ের অগ্রগতিও বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

তবে এই ব্রিটিশ মূলধন ভারতে শিল্পপ্রসারের বিশেষ সহায়ক হয় নাই।

৫.২. **ফিন্যান্স-মূলধনের প্রসার :** ফিন্যান্স-মূলধনের গোড়াপত্তন উনিশ

১. কেহ কেহ অবশ্য ইহাকে মধ্যশ্রেণীর অভ্যুত্থান বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। জওহরলাল নেহরু তাঁহার *The Discovery of India*তে লিখিয়াছেন : "The Revolt of 1857-58 was essentially a feudal rising, though there were *some nationalistic elements in it*".

২. বস্তুত, এই প্রথম ভারতীয়দের চাকরিতে নিয়োগে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই ; ইহা করা হইয়াছিল ১৮৩৩ সালে...See N. S. Bose : *The Indian National Movement* (1979), pp 3-4

৩ শিল্প মূলধন (industrial capital) এবং ফিনান্স-মূলধনের (finance capital) পার্থক্যের জন্য ৩ পৃষ্ঠা দেখ।

শতকের শেষার্ধে সুরু হইলেও ইহার প্রসারলাভ করিতে থাকে **পরবর্তী সময়ে**—বিশেষ করিয়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৮) হইতে। যুদ্ধের প্রারম্ভে ফিন্যান্স-মূলধনের পরিমাণ ছিল ৫৯ কোটি পাউণ্ডের অধিক। ঐ সময় **হোম চার্জ** (*Home Charges*)[১], সুদ ও মুনাফা ইত্যাদি লইয়া ইংরাজরা ভারত হইতে ৫ কোটি পাউণ্ড করিয়া আদায় করিত। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বিশ শতকে ব্রিটিশ মূলধনের শোষণ কায়েমীভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও পরবর্তী সময়ে এই শোষণ বৃদ্ধিই পাইতে থাকে। ১৯১১ সাল ও ১৯৩৩ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী মোট ব্রিটিশ ফিন্যান্স-মূলধনের মধ্যে ভারতে বিনিয়োজিত অংশের পরিমাণ ১১ শতাংশ হইতে বাড়িয়া দাঁড়াইয়াছিল ২৫ শতাংশে। ইহা হইতে সহজেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ নির্ধারণ করা যায়। এককথায় বলা যায়, লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ অর্থনৈতিক স্বার্থকে অক্ষুণ্ণ রাখা।

৫.৩. কিছুটা অসম শিল্পপ্রসার : পূর্বেই (৭ পৃষ্ঠা) উল্লেখ করা হইয়াছে যে ব্রিটিশ মূলধনের শোষণ চলিতে থাকিলেও ভারতের শিল্পপ্রসারের কোন প্রচেষ্টাই করা হয় নাই। অবশ্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় (১৯১৪-১৮) কিছুটা শিল্পপ্রসার ঘটিয়াছিল, তবে ইহা বিশেষভাবে উল্লেখ্য বা সুষম শিল্পায়নের (balanced industrial development) দ্যোতক ছিল না। ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় শিল্পকে চাপিয়া রাখিবার জন্যই শুল্কনীতিকে প্রয়োগ করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত বস্ত্র ও পাট শিল্প কিছুটা প্রসারলাভ করে। কিন্তু বস্ত্র শিল্পে ভারতীয় মূলধনের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকায় সরকার ইংল্যাণ্ডের মিল-মালিকদের স্বার্থে শুল্কনীতিকে পরিচালিত করিতে থাকে।

৫.৪. প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগ : ইহার পর যুদ্ধ ও আন্দোলনের চাপে পড়িয়া ব্রিটিশ সরকার ভারতের শিল্পপ্রসার ও দায়িত্বশীল সরকার প্রবর্তনের কথা ঘোষণা করে। ১৯১৮ সালের **মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্টে** (the Montagu-Chelmsford Report, 1981) উভয় প্রকার সংস্কারের কথা উল্লিখিত হয়। এই ঘোষণা সত্ত্বেও বিশেষ কোন কিছু করা হয় নাই।

৫.৫. প্রভেদাত্মক সংরক্ষণ ও সাম্রাজ্যিক পক্ষপাতিত্ব : শিল্পক্ষেত্রে সংরক্ষণমূলক শুল্কনীতি (protective tariff policy) গ্রহণ করা হয়। ১৯২২ সাল হইতে সরকার **প্রভেদাত্মক সংরক্ষণ নীতি** (*discriminating protection*) প্রয়োগ করিতে থাকে। পরবর্তী সময়ে যাহাতে ব্রিটিশ অর্থনৈতিক স্বার্থ ক্ষুণ্ণ না হয় সেই উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যিক পক্ষপাতিত্ব (Imperial Preference) অনুসরণের নীতি গৃহীত হয়। ইহার ফলে ব্রিটিশ স্বার্থ দুইভাবে সাধিত হয় : (ক) স্বল্প শুল্কে ব্রিটিশ পণ্য ভারতীয় বাজারে আসিতে থাকে ; এবং (খ) ভারতে নিয়োজিত ব্রিটিশ পরিচালিত শিল্পাদি প্রতিযোগিতার হাত হইতে সংরক্ষিত হয়।

যুদ্ধোত্তর যুগে অধিকতর পরিমাণে ব্রিটিশ মূলধনের অনুপ্রবেশ সত্ত্বেও ভারতের

১. Home বা তাহাদের স্বদেশে প্রেরণের জন্য ইংরাজরা ব্রিটেনে গৃহীত ঋণ, অবসৃত ব্রিটিশ অফিসারদের পেন্‌সন, ভারত সচিবের দপ্তর পরিচালনা ইত্যাদির জন্য ভারতের রাজস্বের উপর ধার্য বা দেয় অর্থই যৌথভাবে Home Charges বলিয়া অভিহিত হইত। বাংলায় ইহাকে **বিলাতী দক্ষিণা** বলা হইত।

শিল্পায়নের অসম রূপের কোন পরিবর্তন ঘটে না। বস্ত্র শিল্প, পাট শিল্প এবং লৌহ ও ইস্পাত শিল্প কিছুটা পরিমাণে প্রসারলাভ করিলেও ভারী শিল্প ও যন্ত্রপাতি উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভারত অনগ্রসরই থাকিয়া যায়। যাহা কিছু একটু শিল্পপ্রসার ঘটে তাহাতেও ব্রিটিশ মূলধনের প্রাধান্যই পরিলক্ষিত হয়। ব্যাংক-ব্যবসায়, বাণিজ্য, বীমা, রেলপথ, চা-কফি, রবার-পাট প্রভৃতি শিল্পক্ষেত্রে ব্রিটিশ মূলধন একচেটিয়া কারবার করিতে থাকে। একমাত্র বস্ত্র শিল্পে ভারতীয় মূলধন কিছুটা স্থান করিয়া লয়। কিন্তু সেখানেও ম্যানেজিং এজেন্সি ব্যবস্থা (*Managing Agency System*) থাকায় ব্রিটিশদের মুনাফা লুণ্ঠনের পথে বিশেষ কোন অন্তরায় ঘটে না। ইহা ছাড়া ব্যাংক-ব্যবসায় ব্রিটিশদের নিয়ন্ত্রণে থাকায় ব্রিটিশ শিল্প-ব্যবসায় সর্বপ্রকার সুযোগসুবিধা পাইতে থাকে। এবং অপরদিকে ভারতীয় ব্যবসায়ের প্রতি বিভেদমূলক আচরণ করা হইতে থাকে।

৫.৬. **দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ:** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-৪৫) সময় সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের দৃষ্টিভংগির বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই—পূর্বতন শাসন ও শোষণ মোটামুটিভাবে বজায় রাখা হইয়াছিল—প্রয়োজন সত্ত্বেও কোন প্রকার শিল্পপ্রসারের প্রচেষ্টা করা হয় নাই। কলকারখানা ও রেলপথকে বেশী খাটাইয়াই কিছুটা উৎপাদনবৃদ্ধি সম্ভব করা হয়। বাহির হইতে কোন মূলধন-দ্রব্য আমদানি করিতে দেওয়া হয় নাই—এমনকি অবস্থিত যন্ত্রপাতির অবক্ষয় (depreciation) পূরণের জন্যও বিদেশ হইতে কোন মূলধন-দ্রব্য আনিতে দেওয়া হয় নাই। যুদ্ধজনিত সংকটের সম্মুখীন হইয়াও সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার ভারতের সম্পদের সদ্ব্যবহার করিতে স্বীকৃত হয় নাই পাছে যুদ্ধোত্তর যুগে ভারত শিল্পসমৃদ্ধ হইয়া উঠে এবং ব্রিটিশ মূলধনের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়।

৫.৭. **মুদ্রাস্ফীতি ও স্টার্লিং উদ্বৃত্ত:** একদিকে রিজার্ভ ব্যাংকের মাধ্যমে নোট ছাপাইয়া যুদ্ধের ব্যয় বহন করিবার ফলে দেশে মুদ্রাস্ফীতি ও দুরবস্থা প্রকট হইয়া দাঁড়ায়। ভারতের খাতে যে স্টার্লিং ব্যাংক অফ্ ইংল্যাণ্ডে (Bank of England) জমা হইতে থাকে তাহা কোনরূপে ব্যবহার করিতে দেওয়া হয় নাই। অবশ্য মুদ্রাস্ফীতির দরুন যুদ্ধের সময় পাট, বস্ত্র প্রভৃতি শিল্প বেশ মোটা অংকের মুনাফা লাভ করে। ইহার ফলে ভারতীয় শিল্পপতিরাও পূর্বের তুলনায় শক্তিশালী হইয়া উঠিতে থাকে; কিন্তু তাহাদের স্বাধীনভাবে শিল্পপ্রসারের কোন সুযোগই দেওয়া হয় না।

৫.৮. **সাম্রাজ্যবাদের কৌশল পরিবর্তন:** ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নীতির মূল কোন পরিবর্তন না হইলেও যুদ্ধের সময় কিছুটা এবং যুদ্ধোত্তর যুগে বিশেষ করিয়া সাম্রাজ্যবাদের কৌশল পরিবর্তিত হইতে থাকে। মূলধন-মালিকদের সহিত মিলিত হইয়া যৌথ প্রতিষ্ঠান বা যৌথ উদ্যোগ (joint ventures or joint enterprises) গড়িয়া ব্রিটিশ মূলধনের স্বার্থসাধনে প্রবৃত্ত হয়। ১৯৪৫ সালে লর্ড ওয়াভেল (Lord Wavell) উক্তি করেন যে ব্রিটিশ ও ভারতীয় শিল্পগুলি সহযোগিতার সহিত কাজ করিলে ভারতের শিল্পপ্রসার ত্বরান্বিত হইবে। অনুরূপ উক্তি অন্যান্য ব্রিটিশ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা করিতে থাকেন। ভারতের শিল্পপতিদের মধ্যেও অনেকে সহযোগিতার কথা বলিতে থাকেন।

৫.৯. **শাসন-সংস্কারের স্বরূপ :** এই প্রসংগে উল্লেখ্য যে শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে যতকিছু সংস্কার করা হয় তাহাতে ইংরাজরা ভারতীয়দের শাসনকার্যে সহযোগিতার প্রসার-সাধন করিয়া সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করে কিন্তু ব্রিটেনের অর্থনৈতিক স্বার্থ যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে তাহার দিকে প্রখর দৃষ্টি রাখিয়া। **১৮৬১ সালের সংস্কার হইতে সুরু করিয়া ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন পর্যন্ত সকল শাসনতান্ত্রিক আইনেই ব্রিটিশ স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।** যেমন, ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে (Government of India Act, 1919) **দ্বৈত শাসন-ব্যবস্থা** (*Diarchy*) প্রবর্তন করা হয়, কিন্তু কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ যাহাতে শিথিল না হয় সেদিকে পূর্ণ দৃষ্টি রাখা হয়। প্রদেশগুলির ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়কে দুই ভাগে ভাগ করা হয় : **সংরক্ষিত বিষয়** (*reserved subjects*) এবং **হস্তান্তরিত বিষয়** (*transferred subjects*)। সংরক্ষিত বিষয়সমূহ গভর্ণর ও তাহার শাসন-পরিষদ (Executive Council) পরিচালনা করিতেন, আর হস্তান্তরিত বিষয়গুলি পরিচালিত হইত দায়িত্বশীল মন্ত্রি-পরিষদের সাহায্যে। কিন্তু আর্থিক বিষয়গুলি (financial matters) সংরক্ষিত বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত থাকায় গভর্ণরের নিয়ন্ত্রণ সর্বক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত ছিল এবং মন্ত্রীরা জনপ্রতিনিধি হইলেও জনস্বার্থসাধনের জন্য ছিলেন গভর্ণর ও তাহার পরিষদের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল।

ব্রিটিশ স্বার্থ সংরক্ষণের এক অভিনব প্রচেষ্টা : ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের (Government of India Act, 1935) তৃতীয় অধ্যায়ে ইংরাজদের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থ যাহাতে সংরক্ষিত হয় তাহার বিশদ ব্যবস্থা করা হয়। যাহাতে ব্রিটিশ স্বার্থের বিরুদ্ধে ভারতীয় মন্ত্রীরা কোন ব্যবস্থা অবলম্বন না করিতে পারেন তাহা নিশ্চিত করিবার জন্য গভর্ণরদের হাতে বিশেষ দায়িত্ব (*special responsibilities*) অর্পণ করা হয়।[১]

৫.১০. **পরবর্তীকালীন প্রচেষ্টা :** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর যুগে যত শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনার প্রস্তাব করা হয় এবং ব্রিটিশ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা যত বিবৃতি প্রদান করেন তাহাদের প্রত্যেকটিতেই দেখা যায় **ব্রিটিশ স্বার্থ সংরক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ।** ১৯৪২ সালে চার্চিল (Churchill) যখন ভারতকে ডোমিনিয়ন মর্যাদা দেওয়ার কথা বলেন তখন তিনি স্পষ্টই ঘোষণা করেন যে ব্রিটিশ স্বার্থ সম্পর্কে ব্যবস্থা করিতে হইবে। ক্রীপসের প্রস্তাবেও (Cripps' Proposals) অনুরূপ উক্তি দেখা যায়। ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনায় (The Cabinet Mission Scheme) ঐ একই কথার উল্লেখ করা হয়। ১৯৪৭ সালে অ্যাটলি (Attlee) ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা যখন ঘোষণা করেন তখন তিনি সুস্পষ্টভাবে উক্তি করেন, নূতন পরিস্থিতিতে আশা করা হইতেছে যে ক্ষমতা-হস্তান্তরের চুক্তির সময় ব্রিটিশ বাণিজ্যিক ও শিল্প স্বার্থের প্রতি ন্যায়বিচার করা হইবে।

১. Sec 52 (1) (d) of the Government of India Act, 1935

৫.১১. বর্তমান সংবিধানের ব্যবস্থা : ভারতের নূতন (বা বর্তমান) সংবিধান যখন রচিত হয় তখন দেখা যায় যে প্রত্যক্ষভাবেই হউক বা পরোক্ষভাবেই হউক ব্রিটিশ স্বার্থ সংরক্ষিত হইয়াছে।[১] যেমন, ভারত-সচিব বা স-পরিষদ ভারত-সচিব (The Secretary of State or the Secretary of State for India in-Council) কর্তৃক যে-সকল ব্যক্তি ভারতীয় জনপালন কৃত্যক বা সিভিল সার্ভিসের (Indian Civil Service) অধীনে নিযুক্ত ছিলেন তাঁহাদের সুযোগসুবিধা বা অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয়। অবশ্য ২৮তম সংশোধনের মাধ্যমে ইহাদের সুযোগসুবিধা অবসানের বা পরিবর্তনের ব্যবস্থা হয়।[২]

৫.১২. সম্পত্তির অধিকার : নূতন সংবিধানে আবার সম্পত্তির অধিকার (Right to Property) নাগরিক ও অ-নাগরিক—উভয় শ্রেণীকেই দেওয়া হয় এবং মূল সংবিধানে বলা হয় যে রাষ্ট্র কোন সম্পত্তি অধিগ্রহণ করিলে তাহার জন্য **ক্ষতিপূরণ** (*compensation*) দিতে হইবে। সুতরাং ব্রিটিশ অর্থনৈতিক স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে সংরক্ষিত করা হয়। অবশ্য পরে ১৯৭১ সালে ২৫তম সংবিধান সংশোধনের দ্বারা ক্ষতিপূরণ কথাটি উঠাইয়া দেওয়া হয় এবং কোন সম্পত্তি রাষ্ট্র দখল করিলে একটা পরিমাণ **অর্থ প্রদানের** (*an amount*) ব্যবস্থা করা হয়।[৩] ইহার পর আর এক দফা সংশোধন (১৯৭৮ সালের ৪৪তম সংশোধন) দ্বারা সম্পত্তির অধিকার **মৌলিক অধিকারের অধ্যায় হইতে স্থানান্তরিত** করিয়া সংবিধানের ৩০০(ক) অনুচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তবে সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য কি পরিমাণ অর্থ দেওয়া হইবে না-হইবে, তাহা সাধারণ বিধিবদ্ধ আইনের দ্বারাই নির্ধারিত হইবে। তবে মনে করা হয় যে বিদেশীয় সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা হইলে উপযুক্ত অর্থ প্রদান করা হইবে। এই অর্থ যে ভারতীয় জনসাধারণের নিকট হইতেই আসিবে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

৬. সাম্রাজ্যবাদী বিভেদনীতির আরও দুইটি দিক : উল্লেখ করা হইয়াছে যে (৪ পৃষ্ঠা) সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম নীতি হইল উপনিবেশের অধিবাসীদের (বা দেশীয় লোকদের) মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে মদত দিয়া শাসন ও শোষণ চালানো এবং প্রগতিশীল জাতীয় আন্দোলন প্রতিরোধের প্রচেষ্টা করা।[৪]

ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিভেদনীতির দুইটি প্রধান দিক ছিল (ক) **দেশীয় রাজ্যগুলির** (The Native States) **পরিপোষণ** করা এবং (খ) **সাম্প্রদায়িকতাকে**

১. "It is ... clear from the provisions of the Constitution that the British Government insisted upon, and the ruling party in *India acquiesced in, guarantees as to the proper and effective protection of British interests.*"

D. N. Sen : *The Paradox of Freedom*

২. Art 312A of the Constitution of India

৩. Art. 31(2) of the Constitution of India

৪. "As in the case of every reactionary rule, and especially of alien rule, the division of the people is the necessary law of the rulers' statecraft."

R. Palme Dutt : *India Today*

উসকানি দেওয়া—বিশেষ করিয়া হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি করা। এখন এই দুইটি দিকের সামান্য আলোচনা করা হইতেছে।

ক। **দেশীয় রাজ্যগুলির পরিপোষণ:** ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতে ব্রিটিশ ভারত (British India) এবং দেশীয় রাজ্য (Natives States)—এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া শাসন চালাইতে থাকে। প্রথম দিকে দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতি তত দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই। কিন্তু **১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পর ইংরেজরা দেশীয় রাজ্যগুলির রক্ষণাবেক্ষণের সক্রিয় নীতি গ্রহণ করে।** ১৮৫৮ সালে রাণীর ঘোষণায় (The Queen's Proclamation of 1858)[1] দ্ব্যর্থহীন উক্তি করা হয় যে, "আমরা দেশীয় নৃপতিদের অধিকার, মর্যাদা ও সম্মান সংরক্ষিত করিয়া চলিব।" এই ঘোষণার উদ্দেশ্য কি তাহা সহজেই অনুমান করা যায় লর্ড ক্যানিং-এর (Lord Canning) উক্তি হইতে। ১৮৬০ সালে তিনি বলেন: যদি দেশীয় রাজ্যগুলিকে সংরক্ষিত করা যায় তাহা হইলে এদেশে যতদিন ইচ্ছা শাসন চালাইয়া যাইতে পারিব।[2] অনুরূপ উক্তি করেন ১৯৩০ সালে অধ্যাপক রাসব্রুক-উইলিয়ামস (Rushbrook-Williams)। তিনি বলেন যে দেশীয় নৃপতিবৃন্দ ব্রিটিশদের প্রতি অনুগত এবং ইহাদের জন্যই সাধারণ বিদ্রোহ ভারতকে গ্রাস করিতে পারিতেছে না।

ক.১. **দেশীয় রাজ্যসমূহের শাসনপ্রণালী:** ছোটবড় বিভিন্ন আয়তনের ৫ শতের অধিক দেশীয় রাজ্যের সম্মিলিত জনসংখ্যা ছিল ভারতের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের মত। ইহাদের উপর **সর্বময় কর্তৃক** (*Paramount Power* বা *Paramountcy*) ছিল ব্রিটিশ রাজশক্তির। এই কর্তৃত্ব মানিয়া লইয়া নৃপতিগণ যথেচ্ছাচার করিতেন। জনগণের অর্থ লইয়া নৃপতিরা বিলাসিতায় ডুবিয়া থাকিতেন। সংবাদপত্রের কোনরকম স্বাধীনতা ছিল না। এমনকি দাসত্বপ্রথাও চালু ছিল। মোটকথা, একদিকে ছিল নৃপতিদের চরম বিলাসিতা আর অপরদিকে অত্যাচার শোষণ ও চরম দারিদ্র্য। অন্যভাবে বলা যায়, **শাসন অপেক্ষা শোষণই ছিল দেশীয় রাজ্য-শাসনপ্রণালীর বৈশিষ্ট্য।**

দেশীয় রাজ্যগুলিকে স্বার্থসাধনে নিয়োগ: ইতিহাস হইতে দেখা যায়, **এই প্রকারের দেশীয় রাজ্যগুলিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ নিজের স্বার্থে সর্বপ্রকারে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছে এবং ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলন জোরদার হওয়ার সংগে সংগে প্রয়োজনমত ইহাদের ব্যবহারও করিয়াছে।**

১৯২১ সালে **চেম্বার অফ প্রিন্সেস** (*the Chamber of Princes*) গঠন করিয়া দেশীয় রাজ্যগুলিকে সংগঠিত করিবার প্রচেষ্টা হয়। ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইনে **বৃহত্তর ভারতের** (ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্য লইয়া গঠিত Greater

---

১. ৭ পৃষ্ঠা দেখ।

২. **"... if we could keep up a number of Native States without political power but as royal instruments, we should exist in India as long as our naval supremacy was maintained." Lord Canning (1860)**

India) **জন্য যে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার পরিকল্পনা** করা হয় তাহাতে দেশীয় রাজ্যগুলিকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়। কেন্দ্রীয় আইনসভার **উর্ধ্বতন কক্ষে নৃপতিদের দুই-তৃতীয়াংশের** অধিক ও নিম্নতম কক্ষে এক-তৃতীয়াংশের **মত প্রতিনিধিত্ব** দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। বলা হয়, দেশীয় রাজ্যগুলি এইরূপ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় যোগদান করিবে কি না, তাহা দেশীয় রাজ্যগুলিই স্থির করিবে। **দেশীয় রাজ্যসমূহ এই যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় যোগদান করিতে রাজী হয় নাই; ফলে পরিকল্পিত যুক্তরাষ্ট্রও প্রবর্তিত হয় নাই।** এখন প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় দেশীয় রাজ্যগুলিকে গুরুত্ব দেওয়ার কারণ কি তাহা লর্ড রিডিং-এর (Lord Reading) উক্তি হইতে বুঝা যায়। তাঁহার বক্তব্য ছিল এইরূপ : ভারতীয়দের এক শ্রেণীর মধ্যে স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন চলিতেছে। এ-অবস্থায় নৃপতিদের কেন্দ্রীয় আইনসভায় পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হইলে স্থিতিশীলতা বজায় রাখা সম্ভব হইবে।[১]

ক.২. দেশীয় রাজ্যে গণ-আন্দোলন : ইতিমধ্যে দেশীয় রাজ্যগুলিতে **দেশীয় রাজ্যসমূহের জনগণের কনফারেন্সের** (States' People's Conference) নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক আন্দোলন ক্রমশ শক্তিশালী হইতে থাকিলে নৃপতিগণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সহায়তায় আন্দোলনকে দমন করিতে থাকে।

ক.৩. প্রস্তাবিত ক্ষমতা হস্তান্তরে দেশীয় রাজ্যগুলির স্বার্থ সংরক্ষণের প্রচেষ্টা : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর সময়ে আন্তর্জাতিক শক্তি ও ভারতের সংগ্রামের চাপে ব্রিটিশ শক্তি বিভিন্ন সময় শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের প্রস্তাব করে তাহাদের প্রত্যেকটিতেই ছিল দেশীয় নৃপতিদের স্বার্থ, সুযোগসুবিধা ও বিশেষাধিকার (Special Privileges) সংরক্ষণের প্রচেষ্টা। ১৯৪২ সালে **ক্রীপস্ মিশন** (the Cripps' Mission) ভারতে প্রেরণের সময় চার্চিল সুস্পষ্টভাবেই ঘোষণা করেন যে যুদ্ধের পর ভারতকে ডোমিনিয়ন মর্যাদা (Dominion Status) প্রদান করা হইলেও দেশীয় রাজাদের সহিত যে-সকল চুক্তি রহিয়াছে তাহা মান্য করিয়া চলা হইবে। ক্রীপস্ মিশন প্রস্তাব করে, যুদ্ধাবসানের পর ভারতের সংবিধান রচনার জন্য সংবিধান-রচনাকারী সংস্থা (a constitution-making body) গঠিত করা হইবে এবং এই সংস্থায় নৃপতিবর্গের প্রতিনিধি থাকিবে। ১৯৪৬ সালে **ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা** (Cabinet Mission Plan) প্রস্তাব অনুসারে ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্য লইয়া ভারতীয় ইউনিয়ন গঠিত হইবার কথা ছিল। দেশীয় রাজ্যগুলির পক্ষে এই ইউনিয়নে যোগদানের পূর্বসর্ত ছিল যে দেশীয় রাজ্যরা যে-সকল বিষয় চুক্তির মাধ্যমে ভারত সরকারকে ছাড়িয়া

১. "If the Princes come into a Federation of India, there will always be a steadying influence. There are those who agitate for independence for India, for the right to secede from the Empire altogether. It becomes important, therefore, that we should get what steadying influence we can against this view." Lord Reading

দিবে তাহা ব্যতীত অন্যান্য বিষয় তাহাদের হাতে সংরক্ষিত থাকিবে। এবং সমগ্র ভারতের জন্য সংবিধান-রচনাকারী **গণপরিষদে** (Constituent Assembly) **দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা থাকে**। বস্তুত, সংবিধান রচনার জন্য যে গণপরিষদ গঠিত হয় তাহাতে ৩৯৫টি আসনের মধ্যে ৯৩টি আসন নৃপতিদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়।

ক.৪. **ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের ব্যবস্থা :** ইহার পর ১৯৪৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের (The Indian Independence Act, 1947) দ্বারা ভারতকে বিভক্ত করিয়া দুইটি স্বাধীন ডোমিনিয়ন—ভারতীয় ডোমিনিয়ন ও পাকিস্তানী ডোমিনিয়ন সৃষ্ট করা হয়। ভারতীয় ডোমিনিয়ন সৃষ্ট হওয়ার পর ভারতীয় গণপরিষদের মোট সদস্যসংখ্যা দাঁড়ায় ২৯৯। ইহার মধ্যে প্রদেশগুলির **প্রতিনিধিসংখ্যা হয়** ২২৯ এবং ভারতীয় ডোমিনিয়নে যোগদানকারী **দেশীয় রাজ্যগুলির সদস্যসংখ্যা** ৭০।[১] ভারতীয় স্বাধীনতা আইনে বলা হয় যে দেশীয় রাজ্যগুলি সম্পর্কে রাজশক্তির সর্বময় ক্ষমতার (Paramountcy of the Crown) অবসান হইল—অর্থাৎ দেশীয় রাজ্যগুলি স্বাধীন হইল। ইহারা চুক্তির মাধ্যমে ভারত কিংবা পাকিস্তানে যোগদান করিতে পারিবে। অধিকাংশ দেশীয় রাজ্য ভারতের সহিত যোগদান করিল। যোগদানের পর চুক্তির মাধ্যমে কতকগুলি রাজ্য পার্শ্ববর্তী প্রদেশগুলির সহিত মিশিয়া গেল, কতকগুলি একত্রিত হইয়া একটি রাজ্য (States' Union) স্থাপন করিল আর দুই-একটি দেশীয় রাজ্য ভারতের স্বতন্ত্র রাজ্য হিসাবে থাকিল। ভারতীয় গণপরিষদ ১৯৪৯ সালে ভারতের সংবিধান গ্রহণ করে এবং ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী হইতে এই সংবিধানকে চালু করা হয়।

স্বাধীন ভারতের সংবিধানের ব্যবস্থা : এই সংবিধানে নৃপতিদের ব্যক্তিগত অধিকার, সুবিধাসুযোগ ও মর্যাদা গ্যারান্টি করা হয় এবং রাজন্য-ভাতা (Privy Purse) দেওয়ার ব্যবস্থা হয়।

পরবর্তীকালে অবশ্য—**১৯৭১ সালের সংবিধানের ২৬তম সংশোধন দ্বারা**—নৃপতিদের সুযোগসুবিধা ও ভাতার অবসান ঘটানো হয়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ দেশীয় রাজাদের আনুগত্যের প্রতিদান হিসাবে উহাদের স্বার্থ-সংরক্ষণের সকল প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত চালাইয়া গিয়াছে।

খ। সাম্প্রদায়িকতার প্রসারসাধন : ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিভেদনীতির আর একটি দিক হইল ভারতে সাম্প্রদায়িকতার প্রসারসাধন—বিশেষ করিয়া হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ ও সংঘাত সৃষ্ট করা। **এই নীতির পরিণতি দেখিতে পাওয়া যায় ১৯৪৭ সালের দেশ-দ্বিখণ্ডনে।**

প্রথমদিকে ইংরাজরা খোলাখুলিভাবেই তাহাদের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিত ; পরে অবশ্য রাখিয়াঢাকিয়া সতর্ক হইয়া উক্তি করিতে ও বিবৃতি দিতে থাকে।

১. D. D. Basu : *Introduction to the Constitution of India*

মোটামুটিভাবে বলা যায়, ব্রিটিশ শাসকরা যে সাম্প্রদায়িকতার প্রসারসাধন করিয়া সাম্রাজ্যবাদকে জিয়াইয়া রাখিতে চাহিয়াছিল সে-সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশই নাই।

খ.১. মুসলমানদের পৃথক প্রতিনিধিত্ব ও সংঘাতের গোড়াপত্তন: ঊনিশ শতকের মধ্যভাগেই সামরিক কর্মচারী কোক (Lieutenant-Colonel Coke) উক্তি করেন যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া শাসন করাই ভারত সরকারের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।[১] ১৮১৮ সালে স্যার জন স্ট্রাচী (Sir John Strachey) অনুরূপ উক্তি করিয়া বলেন যে ভারতে দুই বিরুদ্ধ ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায় থাকায় ইংরাজশাসনের সুবিধা হইয়া গিয়াছে।[২] ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় যে ১৯০৬ সালে আগা খানের (The Aga Khan) নেতৃত্বে একটি মুসলমান প্রতিনিধি দল লর্ড মিণ্টোর (Lord Minto) সংগে দেখা করিয়া মুসলমানদের নির্বাচন ব্যাপারে পৃথক প্রতিনিধিত্ব ও সুবিধাদানের দাবি জানায়। মনে রাখিতে হইবে যে এই প্রতিনিধি দল ইংরাজ শাসকদের প্ররোচনায় সংগঠিত হয়। ভাইসরয় লর্ড মিণ্টো বিনা দ্বিধায় এই প্রস্তাবকে অভিনন্দন জানাইয়া বলেন যে মুসলমানদের দাবি ন্যায়সংগত। এই দাবির ভিত্তিতেই মর্লি-মিণ্টো শাসন-সংস্কার বা **১৯০৯ সালের ভারত শাসন আইনে মুসলমানদের জন্য পৃথক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা দ্বারা হিন্দু-মুসলিম সংঘাতের গোড়াপত্তন করা হয়।**

মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা: ইহার পূর্বেই অবশ্য—১৯০৬ সালে সাম্প্রদায়িক দল হিসাবে মুসলিম লীগের (The Muslim League) প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল। সন্দেহ করা হয় যে এই লীগের প্রতিষ্ঠাও ইংরাজ শাসকদের প্ররোচনায় হয়।

পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন শাসনতান্ত্রিক সংস্কারেও মুসলমানদের জন্য **পৃথক নির্বাচন-কেন্দ্রের ব্যবস্থা সম্প্রসারিত** করা হয়। যেমন, ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনেও পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা সুদৃঢ় করা হইয়াছিল।

খ.২. সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা: মুসলমান ও অ-মুসলমানদের মধ্যে বিভেদসৃষ্টির ব্যাপারে আর একটি পদক্ষেপ হইল ১৯৩২ সালের ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী **র্যামজে ম্যাকডোনাল্ড (Ramsey MacDonald) কর্তৃক ঘোষিত সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা বা 'কমিউন্যাল অ্যাওয়ার্ড'** (The Communal Award)। এই ঘোষণার ভিত্তিতেই ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে মাত্র মুসলমানদের জন্যই পৃথক প্রতিনিধিত্ব দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় না—শিখ, ইয়োরোপীয়, ইংগ-ভারতীয় (Anglo-Indians), ভারতীয় খ্রীষ্টানদের জন্যও পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। ইহা সহজেই অনুমেয় যে এইভাবে ভারতবাসীদের সংহতির পথে অন্তরায়ের পর অন্তরায়ের সৃষ্টি করা হয়।

১. "*Divide et impera* should be the principle of Indian Government."

২. "The truth plainly is that existence side by side of these hostile creeds is one of the strong points in our political position."

খ.৩. **অস্থায়ী সহযোগ**: সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা সত্ত্বেও প্রথম দিকে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে বুঝাপড়ার ভিত্তিতে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন কতকটা অগ্রসর হয়, এবং হিন্দু-মুসলমান সংঘাতও কতকটা সংযত থাকে। ১৯১৩ সালে মুসলিম লীগ স্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্য ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সহযোগিতার কথা উল্লেখ করে। ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌ চুক্তিতে (The Lucknow Pact of Congress-League Unity) ডোমিনিয়ন মর্যাদার জন্য সংগ্রাম করিতে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সংঘবদ্ধ হয়। ১৯১৯ সালের **রাওলাট আইন** (The Rowlatt Act) ও জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করিয়া হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায় ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করিতে থাকে। ইহার সংগে **খিলাফৎ আন্দোলন** (The Khilafat Movement) সুরু হয়। হিন্দু-মুসলমান ঐক্যবদ্ধভাবে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইতে থাকে।

খ.৪. **সহযোগের অবসান**: অবশ্য হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে এই ঐক্য বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করিয়া লওয়ায় মুসলমানরা ক্ষুণ্ণ হয় এবং ইহার পর হইতে হিন্দু-মুসলমানদের সংঘাত বাড়িয়া যাইতে থাকে। ইংরাজরাও এই বিরোধের সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে। ১৯৩৫ সালের সংবিধান অনুসারে ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ পরস্পরের বিরোধিতা করে। পরবর্তী সময়ে বিরোধিতা আরও তীব্র আকার ধারণ করে এবং মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে মুসলিম লীগের প্রভাব দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

খ.৫. **পাকিস্তান সৃষ্টির প্রস্তাব**: **১৯৪০ সালে লাহোর অধিবেশনে মুসলিম লীগ পাকিস্তান সৃষ্টির সপক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করে। ১৯৪৫ সালে জিন্না পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করেন যে কংগ্রেস পাকিস্তানের গঠনের নীতি স্বীকার করিয়া লইলে সকল সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে।**

খ.৬. **ব্রিটিশ প্ররোচনা**: এদিকে ব্রিটিশ সরকার সাম্প্রদায়িক বিবাদকে উসকানি দিয়া চলিতে থাকে। **১৯৪০ সালে ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করে যে তাহারা ভারতে এমন কোন সরকারের হস্তে দায়িত্ব সমর্পণ করিতে পারে না যাহার কর্তৃত্ব ভারতীয়দের শক্তিশালী একাংশ স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত নয়।**

খ.৭. **ক্রীপস্ প্রস্তাব**: ১৯৪২ সালে পূর্বোল্লিখিত ক্রীপস্ মিশন (১০ ও ১৩ পৃষ্ঠা)[১] প্রেরণের সময় প্রধান মন্ত্রী চার্চিল ঐ একই সুরে কথা বলেন এবং প্রস্তাব করেন যে যুদ্ধের পর ভারতীয়দের মধ্যে ঐক্যের ভিত্তিতে এক সংবিধান রচনা করা হইবে যাহাতে ভারত ডোমিনিয়ন মর্যাদা পায়, তবে সংখ্যালঘুদের স্বার্থ নিশ্চিত করিতে হইবে। ক্রীপস্ মিশন প্রস্তাব করে যে যুদ্ধের পর সংবিধান রচনার জন্য সংবিধানপ্রণয়নকারী সংস্থা গঠন করা হইবে। ইহাতে আরও বলা হয় যে, কোন প্রদেশ নূতন ব্যবস্থার সামিল নাও

১. 'ক্রীপ প্রস্তাব' ক্রিপস্ মিশন নামেও অভিহিত।

হইতে পারে এবং পরে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে। যে-সকল প্রদেশ প্রস্তাবিত ডোমিনিয়নে যোগদান করিবে না তাহাদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

ক্রীপসের প্রস্তাব কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ উভয় দলই প্রত্যাখ্যান করে। মুসলিম লীগ জানাইয়া দেয় যে পাকিস্তানের দাবি মানিয়া না লইলে তাহাদের নিকট কোন পরিকল্পনাই গ্রহণযোগ্য হইবে না।

৭. পরবর্তী অধ্যায়: ক্রীপস্ মিশন ব্যর্থ হওয়ার পর **ভারত ছাড়ো আন্দোলন** ('Quit India Movement') সুরু হয় এবং কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ কারারুদ্ধ হন। মুসলিম লীগ এই আন্দোলন হইতে দূরে থাকে এবং পাকিস্তানের দাবি জানাইতে থাকে। ১৯৪৪ সালে গান্ধীজী আটকমুক্ত হইলে রাজাগোপালাচারীর পরামর্শানুসারে জিন্নার সহিত আলাপ-আলোচনায় লিপ্ত হন। কিন্তু এই আলোচনায় কোন সুফল হয় না, কারণ জিন্না ভারত বিভাগ ছাড়া কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করিতে রাজী হন নাই।

১৯৪৫ সালে গভর্ণর-জেনারেল ও রাজপ্রতিনিধি (Viceroy) লর্ড ওয়াভেল (Lord Wavell) এক পরিকল্পনা পেশ করেন। তাহাও ফলপ্রসূ হয় না। ইহার পর ১৯৪৬ সালে মার্চ মাসে ভারতে আসে **ক্যাবিনেট মিশন** (Cabinet Mission)। এই মিশন যে পরিকল্পনা পেশ করে তাহাতে পাকিস্তানের কথা প্রত্যক্ষভাবে অস্বীকার করা হইলেও প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ সরকারের বিভেদনীতি এবং মুসলিম লীগের দাবি ইহাতে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে।

৭.১. ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা: প্রস্তাব করা হয় যে ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্য লইয়া 'একটি ভারতীয় ইউনিয়ন' (an Indian Union) গঠিত হইবে। কোন সাম্প্রদায়িক সমস্যা কেন্দ্রীয় আইনসভায় হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোট ছাড়া মীমাংসা করা যাইবে না। প্রদেশগুলিকে হিন্দু-প্রধান ও মুসলমান-প্রধান—এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করার প্রস্তাব করা হয়, বিভিন্ন অঞ্চলের নিজেদের সংবিধান রচনা করিবার অধিকার থাকিবে। প্রদেশগুলির প্রতিনিধি লইয়া সমগ্র ভারতের জন্য একটি গণপরিষদ গঠিত হইবে এবং সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে প্রদেশগুলির আইনসভার সদস্যরা গণপরিষদে প্রতিনিধি পাঠাইবেন। নূতন সংবিধান চালু হওয়ার পর যে-কোন প্রদেশ যে-কোন অঞ্চল হইতে বাহির হইয়া আসিতে পারিবে। অন্তর্বর্তী কালের জন্য প্রধান দলগুলির প্রতিনিধি লইয়া এক সরকার গঠিত হইবে।

ইতিমধ্যে **গণপরিষদের নির্বাচন সমাপ্ত হয়**, কিন্তু অনতিবিলম্বে মুসলিম লীগ ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে এবং গণপরিষদ হইতে বাহিরে থাকে। ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে জিন্না মুসলিম লীগের এক অধিবেশনে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের (direct action) কথা ঘোষণা করেন। আগস্ট মাসে মুসলিম লীগের নেতৃত্বে বাংলায় প্রত্যক্ষ সংগ্রাম সুরু হয় এবং সাম্প্রদায়িক দাংগাহাংগামা ব্যাপক আকার ধারণ করে। এই দাংগা ভারতের বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়াও পড়িতে থাকে।

একটি উল্লেখ্য ব্রিটিশ ঘোষণা: এই প্রসংগে উল্লেখ্য যে, ১৯৪৬ সালের ৬ই

ডিসেম্বর ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করে, যে-ক্ষেত্রে গণপরিষদ ভারতীয়দের এক বিরাট অংশের সহযোগিতা ব্যতীত সংবিধান গ্রহণ করিবে তাহা ব্রিটিশ সরকার অসহযোগী অংশের উপর চাপাইয়া দিতে বাধ্য থাকিবে না। এই ঘোষণা হইতে ইহা সহজেই অনুভূত হয় যে ভারতে দুইটি রাষ্ট্র ও দুইটি গণপরিষদ সৃষ্টির জন্য মুসলিম লীগের দাবি ব্রিটিশ সরকার স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

ইহার পর ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করে যে ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হইবে এবং ভারতীয়দের হস্তে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা হইবে। আরও বলা হয়, সম্পূর্ণভাবে প্রতিনিধিমূলক গণপরিষদ সংবিধান রচনা না করিতে পারিলে কাহার হস্তে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা হইবে তাহা ব্রিটিশ সরকারই স্থির করিবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম লীগ স্বভাবতই অস্তিমান (existing) গণপরিষদে যোগদান করা প্রয়োজন মনে করে না এবং 'মুসলিম ভারতে'র জন্য পৃথক গণপরিষদ গঠন করার দাবি জানায়।

৭.২। **মাউণ্টব্যাটেন পরিকল্পনা, ভারতের স্বাধীনতা আইন ও ভারত খণ্ডীকরণ** : ইতিমধ্যে ব্রিটিশ সরকার লর্ড মাউণ্টব্যাটেনকে (Lord Mountbatten) ভারতের গভর্ণর-জেনারেল ও রাজপ্রতিনিধি করিয়া পাঠান। মাউণ্টব্যাটেন মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের সহিত আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে ভারত বিভাগের পরিকল্পনা করেন। কংগ্রেসও এই ভারত-বিভাগ এবং বাংলা ও পাঞ্জাবকে দ্বিখণ্ডিত করার প্রস্তাবকে মানিয়া লয়। ১৯৪৭ সালের ২৬শে জুলাই গভর্ণর-জেনারেল ও রাজপ্রতিনিধি মাউণ্ট-ব্যাটেন পাকিস্তানের জন্য পৃথক গণপরিষদের কথা ঘোষণা করেন। ইহার পর আসে ১৯৪৭ সালের **ভারতের স্বাধীনতা আইন** (The Indian Independence Act, 1947)। এই আইনের দ্বারা ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারত ও পাকিস্তান দুইটি ডোমিনিয়ন সৃষ্টি করা হয় এবং ভারত ও পাকিস্তানের গণপরিষদকে যে-কোন প্রকার সংবিধান গ্রহণ করিবার ক্ষমতা প্রদান করা হয়।

স্মর্তব্য

১. ইংরাজ আমলে ভারতের শাসন-ব্যবস্থার পশ্চাৎপট হইল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ।

২. এই সাম্রাজ্যবাদ বর্তমান দিনের অর্থনৈতিক প্রকৃতির—অর্থাৎ ঐতিহাসিক সাম্রাজ্যবাদের সহিত তুলনীয় নহে।

৩. ভারতে এই সাম্রাজ্যবাদী পদ্ধতি প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত হইয়াছে কিন্তু ইংরাজরা তাহাদের মূল লক্ষ্য হইতে কখনও বিচ্যুত হয় নাই—সাম্রাজ্যবাদী শোষণের জন্য সর্বপ্রকার বিভেদনীতি এবং প্রয়োজনমত বলপ্রয়োগ—সবকিছুই অবলম্বন করিয়াছে।

৪. সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে অনুসৃত বিভেদনীতির দরুনই শেষ পর্যন্ত ভারত দ্বিখণ্ডিত হয়।

অনুশীলনী

1. Analyse the nature of modern imperialism with special reference to British Imperialism in India.

[বিশেষ করিয়া ভারতের প্রসংগে আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।] (৩-১১ পৃষ্ঠা)

2. Explain the policy of 'Divide and Rule' followed by the British in this country.

ভারতে সাম্রাজ্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ বিভেদনীতি ব্যাখ্যা কর।

(৩-৪, ৬-৭, ১১-১৩, ১৪-১৭ পৃষ্ঠা)

3. Write short notes on :

(a) Finance-Capital in India.

(b) The Communal Award, **(C. U. 1984)**

(c) Cripps' Proposals.

সংক্ষিপ্ত টীকা রচনা কর :

(ক) ভারতে ফিন্যান্স-মূলধন,

(খ) সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা,

(গ) ক্রীপস্ প্রস্তাব।] (৩-৪ ও ৭-৯, ১৪-১৫ এবং ১৬-১৭ পৃষ্ঠা)

২

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ফলাফল
(OUTCOME OF BRITISH RULE IN INDIA)

"...*remarkable contradiction meets us at every turn in considering the record of British rule in India.*" Jawaharlal Nehru

১. শুভাশুভ : পূর্ববর্তী অধ্যায়ের আলোচনা ও বিশ্লেষণ হইতে এ-ধারণা সহজেই করা যাইবে যে ভারতে দুইশত বৎসরের মত ব্রিটিশ শাসনের ফলাফল বিচারে **শুভ অপেক্ষা অশুভ পাল্লায় অনেক বেশী ভারী।** শুভ যে কিছু প্রসূত হয় নাই, তাহা নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, অখণ্ড শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন, পরিবহণ ও সংসরণ ব্যবস্থার প্রসার, অন্তত পরোক্ষভাবে জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্র প্রস্তুত, ইত্যাদির উল্লেখ করা যাইতে পারে। অপরদিকে অশুভের সাক্ষাৎ মিলে অর্থ-ব্যবস্থার সকল দিকের রূপান্তরজনিত অবনতিতে, জনগণের দারিদ্র্যের মাত্রাবৃদ্ধিতে, পুরাতন চিন্তাবিশ্বাস এবং মূল্যবোধ ও সচেতনতার অপসারণজনিত শূন্যতায় এবং নূতন শ্রেণীবিন্যাসের উদ্ভবে।

১.১. অশুভ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত শুভ : অনেক ক্ষেত্রে অবশ্য উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ক্রিয়ার পরোক্ষ শুভ প্রতিক্রিয়াই ঘটিয়াছিল। যেমন, প্রয়োজনীয় আমলা-কর্মচারী সংগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রবর্তিত ইংরাজী শিক্ষা সৃষ্টি করিয়াছিল এক নূতন বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর (intelligentsia), জাতীয় আন্দোলনের সূত্রপাত ও প্রসারে যে-শ্রেণী সকল সময়েই ছিল পুরোভাগে। আবার ব্রিটিশ কর্তৃক রেলপথ নির্মাণ ও সংসরণ-ব্যবস্থার বিস্তৃতির প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল—বাণিজ্যিক বা সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থসাধন—যাহাতে দেশের অভ্যন্তর হইতে সহজে কাঁচামাল সংগ্রহ করিয়া বন্দরসমূহে লইয়া আসা যায় এবং বন্দরসমূহ হইতে নির্মিত (ব্রিটিশ) পণ্য দেশের অভ্যন্তরে পৌছাইয়া দেওয়া যায় তাহার ব্যবস্থা করা।[১] কিন্তু ইহা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল জাতীয়তাবাদের প্রসারের বিশেষ সহায়ক। কারণ, ইহার ফলেই জনসাধারণ অনুভব করিতে শিখিয়াছিল যে তাহারা একই জনগোষ্ঠী। এই অনুভূতিই হইল **জাতীয় জনসমাজ** (nationality) বা **জাতি** (nation) গঠনের প্রথম স্তর। বিশ্লেষণী ঐতিহাসিকগণের মতে, আওরঙজেবের পর এরূপ ঘটনা আর ঘটে নাই।[২] আওরঙজেব অবশ্য অখণ্ড শাসন-ব্যবস্থা সৃষ্টি করিলেও উহার সংহত রূপ দান করিতে সমর্থ হন নাই, হইয়াছিল ব্রিটিশরা। তাহারা এই কার্য সম্পন্ন করিয়াছিল পরীক্ষানিরীক্ষার পদ্ধতিতে—সময়ের সহিত তাল রাখিয়া ধীরে ধীরে, কিন্তু সার্থকতার সহিত।

এখন কিছুটা বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাক, ভারতের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ শাসনের ফলাফল—

১. *The Impact of British Rule*—article by Bipan Chandra in *Freedom Struggle* by Chandra, Tripathi and De

২. K. M. Panikkar *The Foundations of New India*

শুভাশুভ কিভাবে প্রতিফলিত হইয়াছিল। আলোচনা অর্থ-ব্যবস্থা হইতে শুরু করা যাইতে পারে।

২. অর্থ-ব্যবস্থার উপর ব্রিটিশ শাসনের প্রভাব

(Impact of British Rule upon Economy) : অর্থ-ব্যবস্থার উপর ব্রিটিশ শাসনের প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। প্রথমেই কৃষিপ্রধান ভারতের কৃষির উপর প্রভাবের বিশ্লেষণ করা হইতেছে।

২.১. কৃষির উপর প্রভাব : ব্রিটিশ শাসন-ব্যবস্থা 'সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে' ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার আমূল রূপান্তর সাধন করিয়াছিল। উদ্দেশ্য ছিল : (ক) যুদ্ধ ও শাসন-কার্যের ব্যয়নির্বাহার্থে কৃষিক্ষেত্র হইতে যথাসম্ভব রাজস্ব সংগ্রহ করা, এবং (খ) ঔপনিবেশিক অর্থব্যবস্থার আংগিক উপাদান হিসাবে কৃষিকে গড়িয়া তোলা—উহাকে কাঁচামাল সরবরাহ এবং নির্মিত পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার করা।

এইরূপ দৃষ্টিভংগি অনুসরণের ফলে ভারতের কৃষি-ব্যবস্থায় পুরাতন প্রতিষ্ঠান ও সম্পর্কের (institutions and relationships) অবলুপ্তি ঘটিয়াছিল কিন্তু কৃষির আধুনিকীকরণের উপযোগী বা কাম্য প্রতিষ্ঠান বা সম্পর্ক গড়িয়া উঠে নাই।

২.২. ব্রিটিশ স্বার্থসাধক ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা : ব্রিটিশ শাসন মোটামুটিভাবে দুই প্রকার রাজস্ব ও ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন করে : (ক) জমিদারি ব্যবস্থা ও (খ) রায়তওয়ারি ব্যবস্থা। (অপর দুই ব্যবস্থা—মহলওয়ারি ও মালগুজারি ব্যবস্থা—ছিল এই দুই মৌল ব্যবস্থারই নামান্তর। জমিদারী ব্যবস্থাধীনে পূর্বতন রাজস্ব-সংগ্রাহক (revenue collectors)—সরাসরি করদাতা-কৃষক, ইত্যাদি—ভূস্বামী বা জমিদারে পরিণত হয়। তাহারা সংগৃহীত ভূমি-রাজস্বের অধিকাংশটাই সরকারকে হস্তান্তরিত করিতে বাধ্য থাকিলেও মর্যাদাবৃদ্ধির দরুন তাহাদের ক্ষতি পোষাইয়া যায়—গ্রামীণ সমাজের নেতৃত্ব গিয়া পড়ে তাহাদেরই হস্তে। অপরপক্ষে সাধারণ কৃষিজীবী হইয়া দাঁড়ায় ভূস্বামীর মর্জির উপর নির্ভরশীল কৃষি-প্রজা (tenants-at-will)।

রায়তওয়ারি ব্যবস্থাধীনে রায়ত (কৃষিজীবী) ও সরকারের মধ্যে সম্পর্ক ছিল প্রত্যক্ষ—সরকার রায়তদের জমির মালিক বলিয়া মানিয়া লইয়া তাহাদের নিকট হইতেই সরাসরি ভূমি-রাজস্ব সংগ্রহ করিত। কিন্তু এই বন্দোবস্ত ছিল সম্পূর্ণ অস্থায়ী প্রকৃতির এবং রায়তের রাজস্ব প্রদানক্ষমতার উপর নির্ভরশীল। অনেক ক্ষেত্রেই সরকারের ভূমি-রাজস্বের দাবি ছিল মাত্রাতিরিক্ত যাহা মিটাইতে পারিত না বলিয়া রায়তকে জমি ছাড়িয়া চলিয়া আসিতে হইত। ফলে কার্যক্ষেত্রে রায়তওয়ারি ব্যবস্থাধীনেও কৃষকরা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল মর্জির উপর নির্ভরশীল কৃষি-প্রজা (tenants-at-will)। তবে এক্ষেত্রে জমি ভূস্বামীর নয়, সরকারের—এইটুকুই যা পার্থক্য।

মর্জির উপর নির্ভরশীলতার সহজ অর্থ হইল পরনির্ভরশীলতা। ইহারই সুযোগ লইয়া কৃষি-প্রজাদের নিকট হইতে নানাপ্রকার ন্যায্য-অন্যায্য দেয় আদায় করা হইত—অনেক সময় তাহাদের বেগারও খাটান হইত।

উপরন্তু, উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত ভূমি-রাজস্বের হার ক্রমাগত এরূপ বৃদ্ধি করা হইয়াছিল যে, কৃষিজীবীদের আর ভার বহিবার ক্ষমতা ছিল না। ফলে ১৯০১ সালের পর যখন ভূমি-রাজস্ব হ্রাসের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তখন কৃষি-প্রজারা উহার মধ্যে কোন ব্যবহারিক তাৎপর্য খুঁজিয়া পায় নাই। ইতিমধ্যে আবার ভূস্বামী, মহাজন ও বণিক-ব্যবসায়িগণ গ্রামীণ অর্থ-ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল। ফলে বাঁচিবার পথ খুঁজিয়া না পাইয়া সাধারণ ভারতীয় কৃষিজীবী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল সম্পূর্ণ অদৃষ্টবাদী।

এই প্রসংগে মহাজনদের ভূমিকার কিছুটা বিশদ আলোচনা করা যাইতে পারে।

২.৩. মহাজনগোষ্ঠীর উদ্ভব : গ্রামীণ অর্থ-ব্যবস্থায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তি হিসাবে মহাজনদের উদ্ভব ব্রিটিশ-অনুসৃত নীতিরই ফল। অনেক ক্ষেত্রেই কৃষিজীবীকে জমিদার বা সরকারের রাজস্বের দাবি মিটাইবার জন্য ঋণের আশ্রয় লইতে হইত। অনাবৃষ্টি বা বন্যার বৎসরে এই প্রয়োজনীয়তা স্বাভাবিকভাবেই ছিল অধিক। প্রয়োজনীয়তার দরুন উদ্ভব ঘটিয়াছিল মহাজনশ্রেণীর। তাহারা শুধু অযৌক্তিক সুদই দাবি করত না, অন্যান্যভাবেও কৃষিজীবীকে শোষণ করিত। যেমন, তাহারা বাজার অপেক্ষা অনেক কম দামে উৎপন্ন ফসল ক্রয় করিয়া লইত, দাদন বা শস্য-ঋণের দরুন পাওনার অনেক অতিরিক্ত পরিমাণ আদায় করিয়া লইত। এ-ব্যাপারে প্রশাসন ও বিচার-ব্যবস্থা হয় প্রত্যক্ষভাবে মহাজনদিগকে সাহায্য করিত, না হয় পরোক্ষভাবে তাহাদিগকে মদত দিত। কারণ, ব্রিটিশ শাসনের উদ্দেশ্য ছিল নিয়মিত ভূমি-রাজস্ব সংগ্রহ এবং কৃষিজ কাঁচামাল বন্দরে প্রেরণ করা, যাহা মহাজনগোষ্ঠীর অস্তিত্বের দরুন অপেক্ষাকৃত সহজেই সম্ভব হইত।

এ-হেন অবস্থায় কৃষিজমি যে ধীরে ধীরে কৃষিজীবীদের নিকট হইতে মহাজন, বণিক, ধনী-কৃষক, জমিদারের পক্ষে রাজস্ব-সংগ্রাহক প্রভৃতির নিকট হস্তান্তরিত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি? এইভাবে রায়তরা জমির মালিকানা-স্বত্ব হইতে চ্যুত হইলে উত্তরোত্তর বর্ধমান সংখ্যায় মধ্যস্বত্বভোগীর উদ্ভব হইতে থাকে, এবং উহাদের উপরই ভূমি-রাজস্ব সংগ্রহের ভার অর্পিত হয়। ফলে কৃষিক্ষেত্রে উদ্ভূত হয় **কৃষি-উন্নয়নের পরিপন্থী এক নূতন গোষ্ঠীবিন্যাস**। উপরের স্তরসমূহ অধিকার করে জমিদার, মহাজন ও বণিক এবং বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যস্বত্বভোগিগণ এবং সাধারণ কৃষি-প্রজা, ভাগচাষী ও কৃষি-শ্রমিকরা নিম্নস্তরসমূহে অবস্থান করিয়া কোনমতে অদৃষ্টের সহিত মোকাবিলা করিতে থাকে।

২.৪. কৃষি-ব্যবস্থার প্রকৃতি : ইহা ধনতন্ত্র বা সামন্ততন্ত্র—কোন ব্যবস্থার সহিতই তুলনীয় নহে। এই নূতন সংগঠন মোটামুটিভাবে উপনিবেশবাদ (colonialism) অনুসরণের ফল। বলা যায়, ইহা ছিল **আধা-সামন্ততান্ত্রিক** এবং **আধা-ঔপনিবেশিক প্রকৃতির**।[১]

এই চরিত্রের ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থায় কৃষির উন্নয়ন কোনমতেই সম্ভব নয়। বস্তুত, বিপরীত

১. "The new pattern was neither capitalism nor feudalism. It was a new structure that colonialism evolved. It was *semi-feudal* and *semi-colonial* in character." Bipan Chandra : *Freedom Struggle*

ফলই ফলিয়াছিল। খাদ্যশস্য-সহ কৃষিজ উৎপাদন ধীরে ধীরে হ্রাস পাইয়াছিল। ব্রিটিশরাজের তাহাতে কিছু আসে যায় নাই—তাহাদের ঔৎসুক্য ছিল ভূমি-রাজস্ব সংগ্রহে ; অন্য ব্যাপারে তাহারা ছিল সম্পূর্ণ—অন্তত মোটামুটি নিরুৎসুক।

৩. শিল্পবাণিজ্যের উপর প্রভাব: ভারতে ব্রিটিশ কর্তৃক শিল্প-বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণেও ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভংগি অনুরূপভাবে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। ব্রিটিশ শাসনাধীনেই ভারত বিশ্বব্যাপী **বাণিজ্যিক বিপ্লবের** (commercial revolution) সহিত সংশ্লিষ্ট হয় যাহার দরুন বিশ্বের বাজারে দামের হ্রাসবৃদ্ধি ভারতীয় পণ্যের উপরও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে থাকে। কিন্তু ভারতের রপ্তানি এত হ্রাস পায় যে হ্রাসবৃদ্ধির কোন সুবিধা ভারত লাভ করিতে পারিত না।

প্রথমত, ভারতের পৌর ও গ্রামীণ হস্তশিল্পের ক্রমাবনতি ঘটিয়া ধ্বংস পাইলে ঐ সকল পণ্যের বিদেশী বাজার সম্পূর্ণ নষ্ট হয়। অপরদিকে কিন্তু যন্ত্রনির্মিত বিদেশী পণ্যে দেশের বাজার ছাইয়া যায়। দ্বিতীয়ত, ভারতের রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেও উহার বৃহদংশ যাইত **হোম চার্জেস** (*Home Charges*) বা বিলাতি-দক্ষিণা মিটাইতে।[১] এই কারণেই ভারতকে অনুকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত (বা আমদানি অপেক্ষা রপ্তানির আধিক্য) বজায় রাখিতে হইত। অতএব, দেশের জনগণের ভোগের পরিমাণ হ্রাস পাইলেও অন্য দিক দিয়া দেশের কোন সুবিধা হইত না।

তৃতীয়ত, ব্রিটিশ কর্তৃক অনুসৃত নীতির ফলে দেশের মধ্যে আয়-বণ্টনেও (income distribution) বিশেষ রূপান্তর ঘটে—জাতীয় আয়ের উত্তরোত্তর বৃহদংশ সাধারণ কৃষিজীবী ও হস্তশিল্পীদের নিকট হইতে মহাজন, বণিক, জমিদার ও বিদেশী পুঁজিপতিদের নিকট হস্তান্তরিত হইতে থাকে যাহার দরুন দারিদ্র্য-সীমার (poverty line) নিম্নে জনসংখ্যার পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়।

৩.১. কৃষির অবনতি: দেশীয় শিল্পের ধ্বংস ঐ উপজীবিকা অবলম্বনকারী ব্যক্তিগণকে বর্ধমান হারে কৃষিতে যাইয়া ভিড় জমাইতে বাধ্য করে। ... জনসংখ্যার চাপ হইয়া দাঁড়ায় কৃষির আর একটি সমস্যা, যে-সমস্যা পশ্চাৎপদ অর্থ-ব্যবস্থার (backward economy) সহিত অংগাংগিভাবে জড়িত।

৩.২. আধুনিক শিল্প-বিকাশ: এক দিক দিয়া ভারতের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ আর্থিক নীতি আধুনিক **মূলধনমূলক শিল্প-ব্যবস্থার** (capitalist industrial system) উপযোগী পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়াছিল। প্রথমত, সমগ্র ভারতীয় বাজার একীভূত হয় এবং ভারতীয় বাজার সংযুক্ত হয় সমগ্র বিশ্বের বাজারের সহিত। দ্বিতীয়ত, হস্তচালিত শিল্প ও কৃষি হইতে উৎখাত হইয়া এক বিরাট 'বিমুক্ত' (freed) শ্রমিকগোষ্ঠীর সৃষ্টি হইয়াছিল যাহারা স্বচ্ছন্দেই শিল্পোৎপাদনে নিযুক্ত হইতে পারি[ত]। ইহাদের ক্ষেত্রে **সুযোগ-ব্যয়ের**

১. 'হোম চার্জেস' বা 'বিলাতী-দক্ষিণা' ছিল বিভিন্ন খাতে এদেশ হইতে ইংল্যাণ্ড বা বিলাতে প্রেরিত অর্থ।

(*opportunity cost*)[১] প্রশ্ন ছিল না বলিয়া এই শ্রমিকদের নিয়োগ অপেক্ষাকৃত সুলভও ছিল। অতএব, মূলধনমূলক শিল্পায়নের জন্য দুইটি অপরিহার্য সর্ত পূরিত হইয়াছিল : (ক) জাতীয় বাজার এবং (খ) সুলভ শ্রম।

৩.৩ অ-পর্যাপ্ত ও অসম শিল্পায়ন : ইহার ফলেই উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ হইতে কিছু কিছু আধুনিক যন্ত্রচালিত শিল্প গড়িয়া উঠিতে থাকে। তবুও কিন্তু বিশ শতকের প্রথম দশক অবধি ভারতের শিল্পায়ন পর্যাপ্ত, সামঞ্জস্যপূর্ণ বা কাম্য—কোনটিই হয় নাই।

প্রথমত, যে-সকল ক্ষেত্রে স্বাভাবিক সুযোগসুবিধা অধিক সেগুলি গঠনের দিকেই দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছিল। দ্বিতীয়ত, জনগণের ক্রয়ক্ষমতার স্বল্পতাহেতু স্বাভাবিক সুবিধা বর্তমান থাকা সত্ত্বেও বহুবিধ শিল্পের দিকে দৃক্‌পাত করা হয় নাই। তৃতীয়ত, ভারী ও মূলধন শিল্পকে সম্পূর্ণ উপেক্ষাই করা হইয়াছিল। কারণ, এইরূপ শিল্প আশু ফলপ্রসূ বা মুনাফা-অর্জনকারী নহে। চতুর্থত, যেটুকু শিল্পক্ষেত্র সংগঠিত হইয়াছিল সেখানেও ছিল বিদেশী—বিশেষ করিয়া ব্রিটিশ—মূলধনের প্রাধান্য। পঞ্চমত, খনিজ শিল্পের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংরক্ষণের (conservation) দিকে মোটেই লক্ষ্য রাখা হয় নাই। ফলে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদের পরিমাণ আশংকাজনকভাবে হ্রাস পাইয়াছিল। উদাহরণস্বরূপ, কোক্ বা ধাতু-নিষ্কাশক কয়লার (coking or metallurgical coal) উল্লেখ করা যাইতে পারে।

৩.৪. শিল্পায়ন নীতিকে ব্রিটিশ স্বার্থে ব্যবহার : মোটকথা, ভারতের শিল্পায়ন-নীতিকেও সবদা সচেতনভাবে ব্রিটিশ স্বার্থের অনুপন্থী করা হইয়াছিল। যেমন, যখন দাণ্ডীতে পাটজাত দ্রব্য উৎপাদন অপেক্ষা এদেশেই উহা করা যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হইয়াছিল তখনই গড়িয়া তোলা হইয়াছিল পাটকল শিল্প। আবার যেখানে ব্রিটিশ স্বার্থের সহিত এদেশের স্বার্থের সংঘাত বাধিত তখন বাণিজ্য-শুল্ক নীতিকে (tariff) ব্যবহার করা হইত ব্রিটিশ স্বার্থে। যেমন, উনিশ শতকে ব্রিটিশরা মূলত **অবাধ বাণিজ্য-নীতি** (*Free Trade Policy*) অনুসরণ করিয়া ভারতের বাজারে যথেচ্ছ পণ্য প্রেরণ করিলেও প্রয়োজনমত ব্রিটেনে ভারতীয় পণ্যের অনুপ্রবেশের উপর আমদানি শুল্ক আরোপ করিত। এইভাবে ঐ শতকের তৃতীয় দশকে ভারতীয় বস্ত্রের আমদানির উপর ৩০-৭০ শতাংশ শুল্ক ধার্য করা হইয়াছিল, এবং চিনির উপর আমদানি-শুল্ক ছিল উহার উৎপাদন-ব্যয়ের তিনগুণ। কোন কোন ক্ষেত্রে ৩০০-৪০০ শতাংশের মতও আমদানি-শুল্ক ধার্য করা হইয়াছিল। ব্রিটেনে এই সকল পণ্য রপ্তানি বন্ধ হওয়ার পরই উহাদের উপর আমদানি-শুল্ক রহিত হইয়াছিল।[২]

১. 'সুযোগ ব্যয়' হইল স্থানান্তর ব্যয় (Transfer Cost)—অর্থাৎ অন্য এক স্থান হইতে স্থানান্তরিত করিয়া আনিবার ব্যয়। যেহেতু জনসংখ্যার এই অংশ নিয়োগহীন হইয়া' পড়িয়াছিল সেইহেতু তাহাদিগকে স্থানান্তরিত করিয়া আনিবার কোন প্রশ্নও ছিল না—সামান্য মজুরিতেই তাহাদিগকে নিয়োগ করা যাইত।

২. Bipan Chandra, op. cit.

উপরন্তু, অনেক ক্ষেত্রে **আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য-শুল্কের** (internal customs duties) বেড়াজাল নির্মাণ করিয়া দেশীয় উৎপাদকগণকে সর্ব-ভারতীয় বাজারের সুবিধা হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছিল। ফলে অবস্থাটি দাঁড়াইয়াছিল এইরূপ : দেশের বাজারে দেশীয় পণ্যের চলাচল প্রতিবন্ধকতামুক্ত না হইলেও বিদেশী (প্রধানত ব্রিটিশ) পণ্যের ছিল অনুপ্রবেশের অবাধ অধিকার।

এই প্রকার পরিস্থিতিতে বিদেশী পণ্য ভারতীয় বাজার সম্পূর্ণ অধিকার করার পর উনিশ শতকের মধ্যভাগে আভ্যন্তরীণ শুল্ক-ব্যবস্থার বিলোপসাধন করা হয়।

ব্রিটিশ আমলে ভারতের শিল্পবিকাশের সকল দিক বিচার করিয়া অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে যে, ঐ সময় **অর্থ-ব্যবস্থার বাণিজ্যিক রূপান্তর ঘটিলেও শিল্প-বিপ্লবের লক্ষণ ঠিক দেখা যায় নাই**। গতি ছিল স্বল্পোন্নত ঔপনিবেশিক অর্থ-ব্যবস্থার দিকে—স্বয়ম্ভর, মূলধনমূলক ও শিল্পভিত্তিক অর্থ-ব্যবস্থার দিকে নয়।

৩.৫. ফল : দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ : ফলে দেশে দারিদ্র্যের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ার পরিবর্তে দিন দিন বৃদ্ধিই পাইতেছিল এবং দুর্ভিক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল দেশের জনগণের একরূপ নিত্য সহচর।

৪. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ব্রিটিশ শাসনের প্রভাব (The Impact of British Rule in the Social and Cultural Fields) :

ব্রিটিশদের আগমনের ফলে এবং সংগে সংগে পাশ্চাত্য জগতের সহিত ভারতের ব্যাপক অর্থে সাংস্কৃতিক সম্পর্কও স্থাপিত হয়। ব্রিটিশরা ভারতে না আসিলে ভারত বাহির্জগৎ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিত এরূপ ধারণা করা অবশ্য ভুল। কারণ, ভারত কখনও কূপমণ্ডুকতার নীতি অনুসরণ করে নাই।[১]

৪.১. পাশ্চাত্য ভাবধারার অনুপ্রবেশ : তবুও বলা যায়, ব্রিটিশ শাসনের ফলে ভারতে পাশ্চাত্যের ভাবধারার **অনুপ্রবেশ ত্বরান্বিত হইয়াছিল**। অনেক সময় কোনকিছুর হঠাৎ আবির্ভাব বা আগমনের ফলে আলোড়ন দেখা দিতে পারে। ভারতে পাশ্চাত্য ভাবধারণার হঠাৎ অনুপ্রবেশের ফলে ইহাই ঘটিয়াছিল—গণতন্ত্র ও জনগণের সার্বভৌমিকতা, মানুষের অধিকার, যুক্তিবাদ ও মানবপ্রাধান্যবাদ (rationalism and humanism) ইত্যাদির ধারণা ও ভাবাদর্শ[২] বিশেষ করিয়া ভারতের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ইহার দরুনই সমালোচকের দৃষ্টিকোণ হইতে **সমাজ-ব্যবস্থা, অর্থ-ব্যবস্থা** এবং **প্রশাসনের বিশ্লেষণ** সুরু হয়।

৪.২. ব্রিটিশ প্রতিক্রিয়াশীল নীতি : ইংরাজরা কোন কোন সময় এই প্রবণতাকে সমর্থন করিয়াছিল, আবার কোন কোন সময় ইহার বিরোধিতাও করিয়াছিল। শিক্ষাপ্রসারের ক্ষেত্রেও ব্রিটিশদের অনুরূপ দৃষ্টিভংগি লক্ষ্য করা যায়। ইহার দরুন এবং প্রশাসনের প্রয়োজনে ইংরাজীকে শিক্ষার বাহন করায় **আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থা**

১. প্রাচীন কাল হইতে ভারতে আগত বিভিন্ন বিদেশী পর্যটক ইহার সাক্ষ্য রাখিয়া গিয়াছেন।

২. সুসম্বদ্ধ চিন্তাবিশ্বাসকেই ভাবাদর্শ (ideology) বলা হয়, যাহার মধ্যে একটা জেহাদের ভাব থাকে।

উচ্চশ্রেণী ও **মধ্যবিত্তদের একচেটিয়া অধিকার** হইয়া দাঁড়ায়। এই দুই শ্রেণীর অধিকাংশই আবার ছিল নগরবাসী। এইভাবে **পল্লীবাসী** ও **নগরবাসীদের মধ্যে ব্যবধান** সৃষ্ট হয়।

৫. সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তন : অবশ্য ক্রমশ গ্রামাঞ্চলেও ভাবধারণার অনুপ্রবেশ ঘটিতে থাকে। নূতন শিল্প-ব্যবস্থা, আধুনিক পরিবহণ, উত্তরোত্তর নগরীকরণ (urbanisation) এবং জীবনসংগ্রামের কঠোরতাবৃদ্ধির দরুন স্ত্রীপুরুষ—উভয়েরই ক্ষেত্রে নূতনভাবে জীবিকার্জনের প্রচেষ্টা পুরাতন সমাজবন্ধন ও বর্ণভেদ প্রথার ভিত্তিমূল ধরিয়া নাড়া দেয়। ফলে **ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী দৃষ্টিভংগি** (*individualistic attitude*) **ক্রমশ** প্রসারলাভ করিতে থাকে। সমাজ-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তাও ব্যাপকতরভাবে **অনুভূত** না হইয়া পারে না।

এ-ব্যাপারেও ইংরাজরা কখনও নিষ্ক্রিয়তার নীতি অনুসরণ করে নাই। যখনই তাহারা দেখিয়াছে যে সাম্রাজ্যের পক্ষে বিপজ্জনক সমাজ-সংহতি দানা বাঁধিতে চলিতেছে তখনই তাহারা প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীকে মদত জোগাইয়াছে। ইহা 'বিভেদ সৃষ্ট করিয়া শাসন কর' (divide and rule) নীতিরই একটি দিক। পরে এই নীতি বিশেষভাবে প্রযুক্ত হয় **সাম্প্রদায়িকতার প্রসারে**।

অন্য এক ক্ষেত্রেও ইংরাজরা ইহা পরোক্ষভাবে কিন্তু সার্থকতার সহিত প্রয়োগ করিয়াছিল। ইহা হইল অনুকরণশীল (imitative) মধ্যবিত্ত ও উচ্চশ্রেণীর সৃষ্টি। এই দুই শ্রেণী অন্ধভাবে ইংরাজদের অনুকরণ করিত এবং তাহাদের ধ্যানধারণা, জীবনযাত্রা-পদ্ধতি, মূল্যবোধ—সবকিছুকেই শ্রেয় মনে করিত।

এইভাবে ভারতে সৃষ্ট হইয়াছিল এক নূতন সামাজিক গোষ্ঠীর।

৬. ব্রিটিশ শাসনের ফলে উদ্ভূত গোষ্ঠী ও শ্রেণী (Emergence of Groups and Classes as a result of British Rule) :

ব্রিটিশ শাসনের ফলে উদ্ভূত গোষ্ঠী ও শ্রেণীসমূহকে এইভাবে ভাগ করা যায়

(১) **শিল্প-শ্রমিকশ্রেণী :** ব্রিটিশ আমলে আধুনিক শিল্পের কিছুটা বিকাশ ঘটে। ইহার ফলে উদ্ভূত হয় শিল্প-শ্রমিকশ্রেণী বা 'ভারতের শ্রমজীবী শ্রেণী' (the Indian working class)।

(২) **মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত গোষ্ঠী :** মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তরাও এক গোষ্ঠীতে পরিণত হয়। চাকুরিজীবী বা চাকুরিপ্রার্থী হইয়া তাহারা ভারতীয় জনগণের অন্যান্য অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু চাকরিতে নিযুক্ত ইংরাজদের সমপর্যায়ে উন্নীত হইতে পারে নাই। ফলে তাহারা অবস্থান করিত একদিকে মুষ্টিমেয় ইংরাজ এবং সংখ্যাধিক ভারতীয়—উভয় গোষ্ঠীর মধ্যবর্তী স্থলে।

(৩) **পুঁজিপতিশ্রেণী :** ১৮৫৮ সালের মহাবিদ্রোহের পর ভারতীয় পুঁজির উদ্যোগে বস্ত্রশিল্পের ন্যায় নূতন নূতন যন্ত্রচালিত শিল্প গড়িয়া উঠিলে উদ্ভব ঘটে ভারতীয় পুঁজিপতিশ্রেণীর।

(৪) **বুদ্ধিজীবীশ্রেণী :** অপরদিকে কিন্তু ব্রিটিশ শাসনের সূত্রপাত হইতেই দানা বাঁধিতেছিল ভারতের বুদ্ধিজীবীশ্রেণী (the intelligentsia)। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সহিত সংঘর্ষের ফলে উদ্ভূত এই শ্রেণী ক্রমাগত সম্প্রসারণশীলই ছিল। তাহারাই ঔপনিবেশিক শাসকের প্রকৃতি সকল সময়েই বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছিল এবং বুঝিতে সমর্থও হইয়াছিল।

(৫) **কৃষিজীবী ও কারিগর গোষ্ঠী :** কৃষিজীবী এবং গ্রামীণ ও পেশার কারিগরও গোষ্ঠীতে পরিণত হইয়াছিল। মূলে ছিল ব্রিটিশ শাসনের ফলে দুঃখভোগের সমতা।

এই সকল গোষ্ঠী ও শ্রেণীই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে অংশগ্রহণ করিয়াছিল এবং অনেক সময়েই পরস্পরের সহিত হাত মিলাইয়াছিল।

৭. **ব্রিটিশ সমর্থক গোষ্ঠীসমূহ :** অপরদিকে সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক-গোষ্ঠী ছিল সংখ্যায় তিন : (ক) জমিদার ও ভূস্বামীগণ, (খ) দেশীয় রাজন্যবর্গ এবং (গ) আমলাতন্ত্রের উপরের স্তরে অধিষ্ঠিত ভারতীয়গণ (Indians in the higher bureaucracy)।

৭.১. **বিরোধী গোষ্ঠীসমূহ :** সুরুতে না হইলেও ক্রমশ ভারতের শ্রমজীবী গোষ্ঠী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী হইয়া উঠে। কারণ, উত্তরোত্তর তাহাদের জীবনযাত্রায় অবনতি এবং দমনপীড়নমূলক শ্রম-আইন। এই অবস্থা হইতে তাহারা মুক্তিপথের সন্ধান করিয়াছিল উগ্র সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী দৃষ্টিভংগির (militant anti-imperialist approach) মধ্যে।

মধ্য ও নিম্নবিত্তদের বিরোধিতার কারণ ছিল তাহাদের মর্যাদাবোধের অস্বীকৃতি—চাকুরি, মর্যাদা ইত্যাদিতে তাহারা যে ইংরাজদের অপেক্ষা অহেতুকভাবে মর্যাদাহীন সে-সম্বন্ধে সচেতনতা এবং ফলে ইংরাজ-বিদ্বেষ।

অনুরূপভাবে ভারতীয় পুঁজিপতিদের বিদ্বেষ দানা বাঁধিয়াছিল বিদেশী বিশেষ করিয়া ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের প্রতি কর্তৃপক্ষের পক্ষপাত এবং ভারতীয় শিল্পের প্রতি নিস্পৃহতার জন্য।

বুদ্ধিজীবীগোষ্ঠী সুরু হইতেই সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র-বিশ্লেষণে নিয়োজিত ছিল। উহা বৃদ্ধি পাইলে তাহারা সাম্রাজ্যবাদ ও ব্রিটিশ-বিরোধী হইয়া উঠে।

কৃষক ও কারিগরগণও অনুভব করিতে থাকে যে বিদেশী শাসকের অবসান ব্যতীত তাহাদের মুক্তির আর পথ নাই।

---

৮. ভারতের জাতীয়তাবাদের মিশ্র প্রকৃতি : বিপরীত পক্ষে জমিদার ও ভূস্বামিগণ, দেশীয় রাজন্যবর্গ ও আমলাতন্ত্রের একাংশ সাম্রাজ্যবাদকে বজায় রাখিবার সকল প্রচেষ্টাই করিয়াছিল। ফলে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ (The Indian Nationalism) মিশ্র প্রকৃতির (of mixed character) হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল, এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম হইয়াছিল দ্বিমুখী : (১) সাম্রাজ্যিক শক্তি বনাম ভারতীয় জাতীয়তাবাদ

এবং (২) ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বনাম ভারতীয় বিরোধিতা—জমিদার, রাজন্যবর্গ ও আমলাতন্ত্রের বিরোধিতা।

পরবর্তী দুই অধ্যায়ে এই জাতীয়তাবাদ ও সংগ্রামের বিশদ আলোচনা করা হইতেছে।

স্মর্তব্য

১. ভারতে দুইশত বৎসরের মত ব্রিটিশ শাসন শুভ ও অশুভ—উভয় প্রকার ফলই প্রসব করিয়াছিল। তবে শুভ অপেক্ষা অশুভের পরিমাণ অধিক।

২. ভারতের অর্থ-ব্যবস্থায় ব্রিটিশ শাসনের প্রভাব বিচার করিতে হয় কৃষি ও শিল্প-বাণিজ্যের দিক দিয়া। কৃষি ক্রমাগত অবনতির পথে চলিয়াছিল এবং শিল্প-বাণিজ্যকে ব্রিটিশ স্বার্থসাধনে নিযুক্ত করা হইয়াছিল।

৩. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও ব্রিটিশ শাসনের প্রভাব বিশেষ উল্লেখ্য। ব্রিটিশ শাসনের ফলে ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থায় বিশেষ পরিবর্তন ঘটিয়াছিল।

৪. বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠী ও শ্রেণী উদ্ভূত হইয়াছিল।

৫. ফলে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল মিশ্র প্রকৃতির।

অনুশীলনী

1. **Briefly describe the impact of British rule in India.**

[সংক্ষেপে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রভাবের পর্যালোচনা কর।] (২০-২৬ পৃষ্ঠা)

2. **The British rule in India produced beneficial and evil effect. Elucidate.**

[ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ফলে শুভ ও অশুভ উভয়েরই সৃষ্টি হইয়াছিল। ব্যাখ্যা করিয়া দেখাও।] (২০-২৬ পৃষ্ঠা)

3. **Delineate the effects of British rule upon Indian Economey.**

[ভারতের অর্থ-ব্যবস্থার উপর ব্রিটিশ শাসনের প্রভাবের বিবরণ প্রদান কর।] (২১-২৫ পৃষ্ঠা)

4. **Enumerate the social groups and classes that emerged in India as a result of British rule.**

[ব্রিটিশ শাসনের ফলে ভারতে যে-সকল গোষ্ঠী ও শ্রেণীর উদ্ভব ঘটিয়াছিল তাহাদের উল্লেখ কর।] (২৬-২৮ পৃষ্ঠা)

৩

ভারতীয় জাতীয়তাবাদ
(THE INDIAN NATIONALISM)

"The politically minded portion of the people of India . are intellectually our children." Montagu-Chelmsford Report, 1918

" . common interest and common grievance had its customary effect in stimulating a similar consciousness among the subjects." E. H. Carr

১. জাতীয়তাবাদের ধারণা : ভারতীয় জাতীয়তাবাদের আলোচনা প্রসংগে প্রথমেই 'জাতীয়তাবাদ' বলিতে কি বুঝায় সে-সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করা প্রয়োজন। এ-বিষয়ে বিভিন্ন ধারণা প্রচলিত থাকিলেও অনেক লেখকেরই মতে, কোন জনগোষ্ঠীর নিজেদের মধ্যে ঐক্যবোধ কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য মনুষ্য-সম্প্রদায় হইতে পার্থক্যবোধ, আত্মশাসনের আকাংক্ষা ইত্যাদির ফলে যে মনোভাব বা মানসিক চেতনা গড়িয়া উঠে তাহাই জাতীয়তাবাদ। জাতীয়তাবাদকে **জাতীয় ঐক্যবোধ** বলিয়াও অভিহিত করা যাইতে পারে। কারণ, ইহা **স্বজাতীয়গণের** (nationals) মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হইবার প্রবণতাই নির্দেশ করে। এই জাতীয় ঐক্যবোধ নানা কারণে উদ্ভূত বা জাগ্রত হইতে পারে : ভৌগোলিক সান্নিধ্য, উদ্ভবগত ঐক্য, ভাষা-ধর্ম-সাহিত্য-ইতিহাস, ঐতিহ্যগত সমতা, অর্থনৈতিক অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে সমচেতনা এবং অভিন্ন রাজনৈতিক আকাংক্ষা ইত্যাদি। কারণগুলির মধ্যে কোনটিকেই অবশ্য অপরিহার্য বলিয়া গণ্য করা হয় না, তবে কয়েকটির অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অপরিহার্য। বলা হয়, প্রধানত ঐতিহ্য ও একত্রে বসবাসের আকাংক্ষাই জাতীয় ঐক্যবোধ বা জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটাইয়া থাকে।[১]

১.১. ভারতের জাতীয়তাবাদের বিকাশের মৌল কারণ : অন্যান্য ঔপনিবেশিক দেশে জাতীয়তাবাদের মৌল উৎস সাম্রাজ্যবাদের শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও আত্মনিয়ন্ত্রণের আকাংক্ষা এবং দাবি। ভারতে জাতীয়তাবাদ বিকশিত হয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অর্জনের সংগ্রামের মধ্য দিয়া।[২] এখানে স্মরণ

---

১. **Nationalism "is still one of the most powerful urges that move a people, and round it cluster sentiments and traditions and a sense of common living and common purpose." Jawaharlal Nehru : *The Discovery of India***

২. মার্ক্সবাদীরা স্তালিনকে (Stalin) অনুসরণ করিয়া জাতির সংজ্ঞা এইভাবে নির্দেশ করিয়াছেন : জাতি হইল ভাষাগত ঐক্য, ভৌগোলিক সান্নিধ্য, সম-অর্থনৈতিক জীবনের বন্ধন এবং সাংস্কৃতিক ঐক্যের ভিত্তিতে সংগঠিত ইতিহাস-বিবর্তিত স্থায়ী সমাজ বা সম্প্রদায় (**"A nation is a historically evolved, stable community of language, territory, economic life and psychological make up manifested in a community of culture."**)। এই অর্থে **ভারত বহুজাতিসম্পন্ন দেশ**। **কিন্তু তৎসত্ত্বেও স্বীকার করিতে হয়, ভারতের বিভিন্ন জাতীয় সম্প্রদায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে ভারতের আত্মনিয়ন্ত্রণ ও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছে। এবং এই ঐক্যের মনোভাবই হইল ভারতীয় জাতীয়তাবাদ (Indian Nationalism)।**

করাইয়া দেওয়া যাইতে পারে যে জাতীয়তাবাদ হইল বিভিন্ন শ্রেণী ও গোষ্ঠীর ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন, এবং এই আন্দোলনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও কৃষ্টির পথে যে-সকল বাধাবিপত্তি থাকে তাহা অপসারিত করার প্রচেষ্টা চলে। তবে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে **যে-শ্রেণী আন্দোলনের পুরোভাগে থাকে তাহাদের দাবি ও আশা-আকাংক্ষাই আন্দোলনে মূলত প্রতিফলিত** হয়। অর্থাৎ, তাহাদের স্বার্থ-পূরণের প্রচেষ্টা চলে যদিও আন্দোলনের উদ্দেশ্য—সর্বস্বার্থ সাধন করা বলিয়া প্রচার করা হয়।[১]

২. ভারতে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ও সম্প্রসারণ (Rise and Growth of Nationalism in India):

ভারতীয় জাতীয়তাবাদ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী (anti-colonial) প্রকৃতির বলিয়া ইহা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিবর্তনের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

অন্যভাবে বলা যায়, একদিকে ভারতে যেমন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিবর্তিত হইয়াছে, অন্যদিকে তেমনি উহার দরুন জাতীয়তাবাদও দানা বাঁধিয়াছে।

২.১. **সূত্রপাত**: ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সূত্রপাত হয় ভারতে নবজাগরণ (Renaissance) হইতে। নবজাগরণকে বৈদেশিক শাসনের প্রথম পরোক্ষ ফল (indirect consequence) বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। তাহার পর শাসনের নামে ঔপনিবেশিক শোষণ জাতীয় চেতনাকে সুপরিস্ফুটিত করিয়া তুলে। এবং সুরু হয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বা স্বাধীনতা-সংগ্রাম।[২]

অতএব, ভারতে জাতীয়তাবাদের ক্রমবিকাশের পর্যালোচনা ভারতে নবজাগরণ হইতেই শুরু করিতে হয়। বলা যায়, ইহাই ভারতে **জাতীয়তাবোধ উন্মেষের মৌলতম কারণ**।

ক। ভারতে নবজাগরণ (Renaissance in India):

কেহ কেহ বলেন, ভারতে নবজাগরণ বা ঐরূপ কোন ঐতিহাসিক ঘটনা কখনও ঘটে নাই। কারণ, ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি কখনও সুষুপ্তি-কবলিত হয় নাই। সুতরাং ইয়োরোপের অনুসরণে নবজাগরণ বা জাগৃতি[৩] (Renaissance)—ঐরূপ কোন কিছু ঘটিয়াছিল তাহা মনে করা ভুল। অপরদিকে আবার অনেকের মতে, বৈদেশিক শাসনের মাধ্যমে ইয়োরোপীয় সভ্যতার সহিত পরিচয়ের ফলে ভারতবাসীর দৃষ্টিভংগিতে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। ইহাকেই নবজাগরণ বা জাগৃতি আখ্যা দেওয়া হয়।

১. "Nationalism is a movement of various classes and groups comprising a nation, attempting to remove all economic, political, social and cultural obstacles which impede the realisation of their aspirations...... in this multi-class nationalist movement, the class which is at the helm of the movement will put its own class impress on the movement." A. R. Desai: *Recent Trends in Indian Nationalism*

২. **Raghuvanshi**: *Indian Nationalist Movement and Thought*

৩. 'জাগৃতি' শব্দটি মানবেন্দ্রনাথ রায়ের (M. N Roy)।

ক.১. **প্রথম প্রাণস্পন্দন** : কলিকাতা সহর ইংরাজদের শাসন-কেন্দ্র ছিল বলিয়া নবজীবনের প্রাণস্পন্দন এখানেই প্রথম অনুভূত হয়, এবং এখান হইতেই নবজাগরণের বার্তা ভারতের অন্যান্য অংশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। আচার্য যদুনাথ সরকার প্রভৃতি ঐতিহাসিকের ইহাই সুস্পষ্ট অভিমত।[১]

ক.২. নবজাগরণের প্রকৃতি : ইংরাজ-বাহিত ইয়োরোপীয় সভ্যতার সহিত সংস্পর্শের ফলে ভারতবাসীর মনে প্রথম জাগিয়াছিল আভ্যন্তরীণ প্রতিবন্ধক (built-in restraints) হইতে মুক্তির আকাংক্ষা—সতীদাহ বালবৈধব্য বর্ণবৈষম্য প্রভৃতির বিলোপসাধনের বাসনা। প্রথম সংস্পর্শের পর কিন্তু বাঁধিয়াছিল ইয়োরোপীয় সভ্যতার সহিত সংঘর্ষ। প্রথম প্রথম পাশ্চাত্য সভ্যতার উজ্জ্বলতায় কিছুটা দিশাহারা হইলেও ভারতবাসী শীঘ্রই তাহা সামলাইয়া লইয়া ঐ সভ্যতার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে মুখোমুখি দাঁড়াইয়াছিল। মুক্তি-আন্দোলন তখনই সার্থক হইয়া উঠে যখন উহা মুক্তিদাতার শৃংখল হইতে মুমুক্ষায় পরিণত হয়। এই মুমুক্ষার ফলেই জাতীয় চেতনার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়, এবং উহা পরিণতি লাভ করে প্রকৃত মুক্তি আন্দোলন বা স্বাধীনতা-সংগ্রামে।[২]

ক.৩. **সমাজ-সংস্কৃতিগত জাগৃতি হোতৃগণ** : ভারতের এই নবজাগরণকে **সমাজ-সংস্কৃতিগত জাগৃতি** (Socio-cultural Renaissance) বলিয়া অভিহিত করা হয়। অনেকেরই ইহাতে অপরিমেয় বা উল্লেখ্য অবদান আছে। তবুও যাঁহাদের নাম না করিলে চলে না তাঁহারা হইলেন রাজা রামমোহন রায়, ভিভিয়ান লুই ডিরোজিও, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, কেশবচন্দ্র সেন, অ্যানি বেসান্ত এবং স্বামী বিবেকানন্দ। ইহাদের অনেকেই আন্দোলন বা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছেন, অনেকে আবার এককভাবেই কার্য করিয়াছিলেন। রাজা রামমোহন প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম সমাজ, দয়ানন্দের আর্য সমাজ, স্বামী বিবেকানন্দের রামকৃষ্ণ মিশন, রবীন্দ্রনাথ সহ ঠাকুরবাড়ীর অবদান—সকলই জাতীয় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ফিরাইয়া আনায় এবং দেশের অতীত সম্বন্ধে গর্ব সঞ্চারে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল।[৩] বস্তুত, ইহাদের প্রতিষ্ঠাতৃগণ সত্যাদিষ্ট প্রচারকের ন্যায়ই কার্য করিয়াছিলেন।

ক.৪. **ধর্ম-আন্দোলন ও জাতীয়তাবোধ** : দয়ানন্দ 'স্বরাজ' শব্দটির উপর গুরুত্ব আরোপের ফলে **আর্য সমাজের আন্দোলন জাতীয় আন্দোলনের রূপ ধারণ করে।** অ্যানি বেসান্ত ঘোষণা করেন যে ভারতে মাত্র ধর্মের মাধ্যমেই দেশাত্মবোধকে জাগ্রত করা সম্ভব। স্বামী বিবেকানন্দ উপদেশ দিয়াছিলেন যে ৫০ বৎসর অন্য সমস্ত দেবদেবীকে ভুলিয়া মাত্র দেশমাতৃকার বন্দনা এবং দেশের সেবাই হইবে ভারতীয়দের একমাত্র কর্তব্য।

১. *History of Bengal*, **Vol. II (Dacca University)**
২. *Studies in Bengal Renaissance* **(Jadavpore University)**
৩. **Collins and Lapierre :** *Freedom at Midnight* ; **also Santi L. Mukherji :** *The Philosophy of Man-making*

সংগে সংগে সমাজ-ব্যবস্থার আমূল সংস্কারও ('root and branch reform') সাধন করিতে হইবে।

ক.৫. বঙ্কিমচন্দ্র ও স্বাদেশিকতার প্রসার: বিবেকানন্দ প্রভৃতির মত ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রও কখনও রাজনীতি করেন নাই। কিন্তু স্বাদেশিকতার (patriotism) প্রসারে তাঁহার ভূমিকা কাহারও অপেক্ষা কম নহে। তাঁহার 'বন্দে মাতরম্' হইয়া দাঁড়ায় স্বাদেশিকতার মন্ত্র ('song of patriotism'), এবং তাঁহার আনন্দমঠ, কমলাকান্ত, দেবী চৌধুরাণী প্রভৃতি উপন্যাস এবং বিভিন্ন প্রবন্ধ (যথা—'মুচিরাম গুড়', 'ভারত কলঙ্ক', 'ভারত পরাধীন কেন' ইত্যাদি) বহু বুদ্ধিজীবীকেই জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করে।

খ। পাশ্চাত্য প্রেরণা ও ইংরেজী শিক্ষা (Western Inspiration and English Education): এই প্রসংগে স্মরণ রাখিতে হইবে যে উপরি-উক্ত মনীষীগণের মাধ্যম ছাড়াও ভারতের বুদ্ধিজীবীরা ইংরাজী শিক্ষার ফলে পাশ্চাত্য ধ্যানধারণা ও ভাবাদর্শের সহিত পরিচিত হন। লক্-ম্যাটসিনি-গ্যারিবল্ডি-পেইনের (Thomas Paine) রচনা, ফরাসী বিপ্লব ও মার্কিন উপনিবেশগুলির বিদ্রোহ অনেক ভারতীয়ের মনেই প্রেরণা সঞ্চার করে। আবার ইংরাজী শিক্ষার ফলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকের মধ্যে যোগাযোগ ও ভাবের আদানপ্রদান চলিতে থাকে।

খ.১. ঐক্যভাবের উদ্ভব: ইহার ফলে যে মনোভাবটি বিশেষ করিয়া গড়িয়া উঠে তাহা হইল: সমগ্র ভারতবাসীকে এক হইতে হইবে—বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকার যুগ শেষ হইয়াছে।

গ। অর্থনৈতিক অসন্তোষ (Economic Discontent): ইহাতে—অর্থাৎ আঞ্চলিক সংকীর্ণতা পরিহারে—বিশেষ করিয়া প্রেরণা যোগায় অর্থনৈতিক অসন্তোষ। স্মরণ রাখিতে হইবে যে একই প্রকার দুর্ভোগের ফলে জনগণ ঐক্যবদ্ধ হইয়া জনসমাজে পরিণত হয় (Equal suffering makes a people)।

গ.১. অর্থনৈতিক শোষণের প্রতিবাদ: ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের লক্ষ্যই ছিল অর্থনৈতিক শোষণ। ইহার ফলে যে 'স্বর্ণভূমি' বিদেশীদের আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছিল সব দিক দিয়া ঘটায় তাহার দুরবস্থা। কৃষিকৃষক, কুটির ও গ্রামীণ শিল্প, পৌর শিল্প,—সকলই দিন দিন অবনতির পথে চলিতে থাকে। ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদও সুরু হয়। বাংলাদেশে এই প্রতিবাদ **নীল বিদ্রোহের** (Indigo Agitation) রূপ গ্রহণ করে, এবং ১৮৬০ সালে প্রকাশিত দীনবন্ধু মিত্রের **নীল দর্পণ** হইল অর্থনৈতিক শোষণ ও অত্যাচারের এক স্বচ্ছ দর্পণ। ইহার পর দাদাভাই নৌরজী[১], গোপালকৃষ্ণ গোখেল, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অ্যানি বেসান্ত, স্বামী অভেদানন্দ[২], রমেশচন্দ্র দত্ত[৩] প্রভৃতি গ্রন্থ প্রবন্ধ ও বক্তৃতার মাধ্যমে দেশবাসীকে বুঝাইতে থাকেন যে কিভাবে ভারতীয় অর্থে

১. গ্রন্থের নাম *Poverty and Un-British Rule in India*

২. গ্রন্থের নাম *India and Her People*—'ভারতীয় সংস্কৃতি' নামে বাংলা ভাষায় অনুদিত

৩. গ্রন্থের নাম *Economic History of India* (in two volumes)

ইংল্যাণ্ডে প্রথমে শিল্প-বিপ্লব (১৭৬০-১৮৪০) ঘটিয়াছিল এবং কিভাবে ফিন্যান্স মূলধনের অনুপ্রবেশ ভারতীয় শিল্পবাণিজ্যকে ধ্বংসের পথে ঠেলিয়া দেয়।

গ.২. ইংরাজদের বাণিজ্য, শুল্ক ও নিয়োগ নীতি : ইহা ব্যতীত ইংরাজ শাসকদের প্রথম অবাধ বাণিজ্যের (Free Trade) নীতি ও পরে বিশেষ শুল্কনীতি ভারতীয় শিল্পপ্রসারের অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও স্বল্পবিত্তদের মধ্যে নিয়োগহীনতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তাহাদের মধ্যে অসন্তোষের পরিমাণ আরও বাড়িয়া যায় যখন তাহারা দেখে যে উচ্চস্তরের সরকারী চাকরিগুলি মাত্র ইংরাজ ও তাহাদের অনুপুষ্ট ইংগ-ভারতীয় প্রভৃতির জন্যই সংরক্ষিত। তুচ্ছ অজুহাতে সুরেন্দ্রনাথের আই. সি. এস. হইতে পদচ্যুতি এ-বিষয়ে ইন্ধন যোগায়।

গ.৩. শ্রমিকদের মধ্যে বিদ্বেষ : শিল্পের যে যৎসামান্য প্রসার হয় তাহার ফলে শ্রমিকশ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। কিন্তু তাহাদের অবস্থা ছিল (ম্যাক্সিম) গর্কী-বর্ণিত তৎকালীন রাশিয়ার শ্রমিকদের মত, বা তাহা অপেক্ষাও মন্দ। সুতরাং তাহাদের মধ্যেও বিদ্বেষ জমিতে থাকে।

গ.৪. কৃষকদের মধ্যে বিদ্বেষ : নীলচাষ বন্ধ হইবার পর কৃষকদের মধ্যে বিদ্বেষের প্রধান কারণ ছিল ভূমি-রাজস্বের ভার ও উহার সংগ্রহ পদ্ধতি। ইহাকে কেন্দ্র করিয়াই দাক্ষিণাত্যের কৃষকেরা বিদ্রোহ করে (১৮৭৫) এবং বাংলার ভূমি-রাজস্ব বিরোধী ইউনিয়ন স্থাপিত হয় (১৮৭২-৭৬)।

দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর সময় কৃষকদের উপর ইংরাজদের অত্যাচার এত স্বচ্ছ হইয়া উঠিত যে সন্দেহ বা মতবিরোধের কোন অবকাশই থাকিত না।[১] ১৮৯৬ সালে দাক্ষিণাত্যের ভীষণ দুর্ভিক্ষ ও প্লেগজনিত মহামারীকে কেন্দ্র করিয়াই লোকমান্য তিলকের (১৮৫৬-১৯২০) **উগ্র জাতীয়তাবাদ** প্রথম আত্মপ্রকাশ করে।

মোটকথা, ভারতীয় কৃষক, শিল্প-শ্রমিক, শিক্ষিত বেকার, শিল্পপতি—সকলেরই অর্থনৈতিক অসন্তোষ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিকাশে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হইয়া দাড়ায়।

ঘ। বর্ণবৈষম্য ও ইংরেজদের ঔদ্ধত্য (Racial Discrimination and British Arrogance) :

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতীয়দের হেয় চক্ষে দেখিত। অধিকাংশ সময়ই তাহারা ঘোষণা করিতে দ্বিধা করিত না যে ভারতীয়রা অনুন্নত ও বর্বর জাতির লোক। ১৮৭০ সালে লর্ড মেয়ো (Viceroy Mayo) উক্তি করেন : নিম্নস্তরের ভারতীয় সরকারী কর্মচারীদের উন্নত জাতি ইংরাজ-শাসনের উৎকর্ষ উপলব্ধি করিতে শিখাইতে হইবে। এইরূপ ধারণার জন্যই সরকারী চাকরিতে উচ্চ পদগুলি ভারতীয়দের জন্য খোলা ছিল না।

ঘ.১. ইলবার্ট বিল : ইংরাজদের বর্ণগত ঔদ্ধত্যের আরও পরিচয় পাওয়া যায় ইলবার্ট বিল (The Ilbert Bill) লইয়া বিতর্কের মধ্যে। ইংরাজ-শাসনের সুরু হইতেই

১. **Tara Chand :** *History of the Freedom Movement in India* **Vol. II**

ভারতীয় বিচার-ব্যবস্থায় ভারতীয় ও ইয়োরোপীয়দের মধ্যে এক অসমর্থনীয় বৈষম্য ছিল —কোন ভারতীয় বিচারকের ইয়োরোপীয়দের বিচার করিবার অধিকার ছিল না। লর্ড রিপন ভাইসরয় হইয়া আসিয়া (১৮৮০-৮৪) ইলবার্ট বিলের মাধ্যমে এই বৈষম্য দূরীকরণের প্রচেষ্টা করেন। কিন্তু শ্বেতকায় ইংরাজদের চাপে এই বিল প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হন। তবুও কিন্তু ইলবার্ট বিলের ফল সুদূরপ্রসারী হয়—ইংরাজদের বর্ণ বৈষম্যবোধ ও ঔদ্ধত্য ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বিশেষ প্রেরণা যোগায়।

৫. ইংরাজদের দমননীতি (Repressive Policy of the British): ক্ষেত্র অবশ্য পূর্ব হইতেই অনেকাংশে প্রস্তুত ছিল ইংরাজদের দমননীতির দরুন।

৫.১. লর্ড লীটনের সাম্রাজ্যবাদ: দমননীতিতে বোধ হয় সকলকে ছাড়াইয়া গিয়াছিলেন লর্ড লীটন (১৮৭৬-৮০)। তিনি যখন ভাইসরয় হইয়া আসেন তখন ভারতবাসী **সুরেন্দ্রনাথের সিভিল সার্ভিস আন্দোলনকে কেন্দ্র করিয়া** ধীরে ধীরে জাতীয়তাবাদের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন মাতৃভাষায় সংবাদপত্রগুলি (the Vernacular Press)। গোঁড়া সাম্রাজ্যবাদী লীটন প্রথমেই মাতৃভাষায় সংবাদপত্র আইন পাস করিয়া (১৮৭৮) ভারতীয় সংবাদপত্রগুলির কণ্ঠরোধ করিতে বদ্ধপরিকর হন। তারপর ঐ বৎসরই ভারতীয়দের নিরস্ত্র করিবার উদ্দেশ্যে অস্ত্র আইন পাস করেন। ইহা ছাড়া ইংল্যাণ্ডের বস্ত্রশিল্পের প্রসারের জন্য ভারতে তুলাবস্ত্রের আমদানির উপর শুল্কের বিলোপসাধন করেন। পরিশেষে, দেশ যখন ব্যাপক দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত তখন লীটন দিল্লীতে জাঁকজমকের সংগে এক দরবার ডাকিয়া ইংলণ্ডেশ্বরীকে ভারতের সাম্রাজ্ঞী বলিয়া ঘোষণা করেন।

লীটনের নীতির বিরুদ্ধে ভারতীয়রা আন্দোলন শুরু করিয়া দেয় এবং বিভিন্ন আন্দোলনকারী সংগঠনও গড়িয়া উঠিতে থাকে। স্যার উইলিয়াম ওয়েডারবার্ণ (Sir William Wedderburn) শংকিত চিত্তে উক্তি করেন যে, **লর্ড লীটনের নীতি ভারতকে প্রায় বিপ্লবের মুখে ঠেলিয়া দিয়াছে।**

৬. বৈদেশিক ঘটনার অনুপ্রেরণা (Inspiration of Foreign Events): বৈদেশিক ঘটনাও ভারতের জাতীয়তাবাদের পরিস্ফুটনে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। রাজা রামমোহন রায় ফরাসী বিপ্লবে উৎফুল্ল হইয়াছিলেন।[১] পরবর্তী যুগে **আবিসিনিয়ার হস্তে ইতালীর** (১৮৯৬) **এবং জাপানের হস্তে রাশিয়ার** (১৯০৪) **পরাজয়** ভারতকে উল্লসিত ও উত্তেজিত করিয়া তুলে। আরও পরবর্তী যুগে এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে মুক্তি-আন্দোলন

---

১. কথিত আছে যে তিনি ভারত হইতে ইংল্যাণ্ডের পথে একটি জাহাজে ফরাসী রিপাবলিকের পতাকা দেখিয়া এত উত্তেজিত হইয়াছিলেন যে ঐ পতাকাকে সম্মান জানাইবার জন্য ছুটিয়া গিয়া অসাবধানে পড়িয়া পা ভাঙিয়াছিলেন···নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়: মহাত্মা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত

এবং **রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লব** (The October Revolution) আরও প্রেরণা যোগায়।

উপসংহার : যদিও বা বিভিন্ন বিষয় ভারতের জাতীয়তাবাদের পরিস্ফুটনে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের সকলই কিন্তু ভারতে ইংরাজ-অনুসৃত সাম্রাজ্যবাদী নীতির ফল। সুতরাং ভারতের জাতীয়তাবাদের উৎসের সন্ধান করিতে হইবে প্রতিক্রিয়াশীল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে। শাসনের পরিবর্তে শোষণ, বৈষম্য ও ঔদ্ধত্য, দমননীতি ইত্যাদি হইল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিভিন্ন দিক। প্রত্যেক প্রতিক্রিয়ারই প্রতিক্রিয়া (reaction against reaction) **থাকে বলিয়া এই সাম্রাজ্যবাদের প্রতিক্রিয়া হিসাবেই ধীরে ধীরে দানা বাঁধিয়া উঠে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ।**

---

৭. ভারতীয় জাতীয়তাবাদ প্রসারের বিভিন্ন পর্যায় (Stages of Development of Indian Nationalism) :

ভারতে জাতীয়তাবাদ ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সুসংগঠিত রূপ ধারণ করে **১৮৫৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত** হইলে।[১] ইহার পূর্বে নীল বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল, ইলবার্ট বিলকে কেন্দ্র করিয়া ভারতের বিভিন্ন স্থানে আন্দোলন চলিয়াছিল, সুরেন্দ্রনাথের একান্ত উৎসাহ ও কর্মপ্রচেষ্টায় ভারতসভা (Indian Association, 1876) স্থাপিত হইয়াছিল, ইত্যাদি। কিন্তু জাতীয়তাবাদ বা জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ঠিক সর্ব-ভারতীয় বা সংহত—কোনটিই ছিল না।

৭.১. গণ-আন্দোলনের পরিণতি : প্রথমে কংগ্রেস ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী ও ব্যবসায়ীদের লইয়া গঠিত এবং ইহার লক্ষ্য ও কর্মক্ষেত্রের পরিধি—উভয়ই ছিল সীমিত। ক্রমশ এই সংগঠনই কিন্তু সম্প্রসারিত হইয়া ব্যাপক গণ-আন্দোলনে পরিণত হয়।

৮. কংগ্রেস আন্দোলনের তিন পর্যায় (Three Phases of Congress Movement) :

কংগ্রেসের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে তিন পর্যায়ে ভাগ করিয়া আলোচনা করা যাইতে পারে।

৮.১. প্রথম পর্যায় (১৮৮৫-১৯০৫) : জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা সমগ্র ভারতে এক প্রবল উদ্দীপনার সৃষ্টি করে এবং ক্রমেই সভাসংখ্যা বৃদ্ধি ও ইহার আদর্শের প্রতি অনুগত লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। গোখেল, সুরেন্দ্রনাথ, দাদাভাই নৌরজী, বদরুদ্দীন তৈয়বজী ছিলেন কংগ্রেসের প্রথম যুগের প্রথম সারির নেতা। ইহাদের অধিকাংশই ছিলেন অল্পবিস্তর **ব্রিটিশ-ভক্ত** এবং ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রতি মোটামুটি **আনুগত্যপরায়ণ।** আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসকবর্গের নিকট ভারতের শাসনতান্ত্রিক সমস্যা ও অন্যান্য অভিযোগ তুলিয়া ধরাই ছিল ইহাদের প্রধান লক্ষ্য।

---

১. কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা হিউমের কিন্তু উদ্দেশ্য ছিল ভারতের জাতীয়তাবাদকে 'বিপথে' চালিত হইতে না দিয়া ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে অক্ষুণ্ণ রাখা।

ইংরাজদের উদারনৈতিক দৃষ্টিভংগির উপর ইহাদের এরূপ আস্থা ছিল যে নিয়মতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক পথ ছাড়া ইহারা অন্য কোন কিছুর চিন্তাও করিতে পারিতেন না।

আবেদন নিবেদনের সংস্থা : ইহার দরুনই ১৯০৫ সাল পর্যন্ত কংগ্রেস ছিল আবেদন নিবেদনের সংস্থা।

৮.২. **কংগ্রেসের ক্রিয়াকলাপের দুইটি নীতি** : কংগ্রেসের এই ক্রিয়াকলাপ দুইটি নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল : (১) **সরকারের কার্যাকার্যের সমালোচনা করা,** (২) **বিভিন্ন শাসনতান্ত্রিক সংস্কার দাবি করা।** কখনও ভারতের জনগণের দারিদ্র্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ,[১] কখনও বা অস্ত্র-আইন, বাণিজ্য-শুল্ক, লবণ-কর বা ঐ রকম কিছুর সমালোচনা করাই ছিল কংগ্রেসের কাজ। কংগ্রেস তাহার মতামতগুলি প্রস্তাবাকারে রচনা করিত এবং সরকারের সুবিবেচনার জন্য প্রেরণ করিত। তবে রচনা ও সমালোচনা কালে যথাসম্ভব নম্র ও সংযত ভাষাই প্রয়োগ করিত। কারণ, উহা ছিল নরমপন্থীদেরই (moderates) যুগ।

কিন্তু কংগ্রেসের অধিকাংশ প্রস্তাব সম্পর্কে ব্রিটিশের উদাসীনতা এবং কংগ্রেসকে একরূপ উপেক্ষা ভারতীয় জনগণের মধ্যে হতাশা ও ক্ষোভের সৃষ্টি করে। অপরদিকে শাসকবর্গের কংগ্রেস-বিরোধী মনোভাব দিন দিন কঠিন হইতে কঠিনতর হইতে থাকে—কংগ্রেস হইতে যাহা কিছু প্রস্তাব আবেদন-নিবেদন আসে ইংরাজরাও তাহাই প্রত্যাখ্যান করিতে থাকে। তখন কংগ্রেস ইংল্যাণ্ডেও আন্দোলন সুরু করে।

৮.৩. **ইংল্যাণ্ডে কংগ্রেসের আন্দোলন ও উহার ফল** : ইংল্যাণ্ডে কংগ্রেসের আন্দোলন কিছুটা সুফল প্রসব করে। বলা যায়, ইহার দরুনই **১৮৯২ সালের কাউন্সিল আইন** (The Indian Councils Act of 1892) পাস হয়। এই আইনের দ্বারা (১) **আইন পরিষদগুলির সম্প্রসারণ** এবং (২) সংগে সংগে **পরোক্ষ নির্বাচন-পদ্ধতি অনুসরণ**—উভয় ব্যবস্থাই করা হয়। ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসের এ এক বিশেষ উল্লেখ্য পদসঞ্চার।

৮.৪. **মন্তব্য : উদারনৈতিক রাষ্ট্রদর্শনের প্রতিফলন** : তবুও কিন্তু এই যুগ 'সদাশয় সরকার বাহাদুরে'র নিকট আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে শাসনতান্ত্রিক সংস্কার কামনা দ্বারাই চিহ্নিত। শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের সহিত অবশ্য ব্যক্তি-স্বাধীনতাও (personal liberty) দাবি করা হইয়াছিল। কারণ, উদারনৈতিক রাষ্ট্রদর্শনের (liberal political philosophy) প্রতিপাদ্য বিষয়ই হইল ব্যক্তি-স্বাধীনতা বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য।

৯. **দ্বিতীয় পর্যায় (১৯০৫-২০)—১৯০৫ সালের গুরুত্ব :** ১৯০৫ সালকে কংগ্রেসের **বয়ঃসন্ধির বৎসর** বলিয়া সূচিত করা যায়। কারণ, ঐ বৎসরই জাতীয়তাবাদ পুরাপুরি উপনিবেশ-বিরোধী আন্দোলনের (anti-colonial

---

১. পূর্বোক্ত (৩২ পৃষ্ঠা) দাদাভাই নৌরজীর *'Poverty and Un-British Rule in India'* প্রভৃতি গ্রন্থ এই প্রসংগে উল্লেখ্য।

movement) রূপ গ্রহণ করে এবং শাসনসংস্কার ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার স্থলে ঘোষিত হয় **'স্বরাজে'র** (*Swaraj*) **দাবি।**

৯.১. লাল-বাল-পাল—জাতীয়তাবাদের রূপান্তর : সুরু হইতেই কংগ্রেসের মধ্যে 'আবেদন-নিবেদন নীতি' বিরোধী গোষ্ঠী বর্তমান ছিল। কিন্তু এই গোষ্ঠীর যথাযথ নেতৃত্ব প্রদান করিবার লোক ঠিক ছিল না। উনিশ শতকের শেষ দিকে মহারাষ্ট্রে বাল গংগাধর তিলকের (১৮৫৬-১৯২০) আবির্ভাব এই অভাব পূরণ করিল। কিছুটা পরবর্তী সময়ে তিলকের সহিত এই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট হন মোটামুটি সমসাময়িক আরও দুইজন নেতা—বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩২) এবং লালা লাজপৎ রায় (১৮৬৫-১৯২৮)। ভারতের জাতীয়তাবাদের রূপান্তর ও স্বাধীনতা-সংগ্রামের নূতন অধ্যায়ের সূচনাকার্যে এই নেতৃত্রয় **লাল-বাল-পাল** নামে আখ্যাত। ইহারাই ভারতে **উগ্র জাতীয়তাবাদের পথিকৃৎ।**

৯.২. তিলকের উগ্র জাতীয়তাবাদ : মহারাষ্ট্র ছিল জাতীয় প্রাণচেতনার এক বিশেষ ক্ষেত্র। দিল্লীর—বিশেষ করিয়া আওরংজেবের—বিরুদ্ধে শিবাজীর সার্থক সংগ্রাম, পেশোয়াদের অধীনে মারাঠা সাম্রাজ্যের বিস্তার প্রভৃতি মারাঠারা কখনও ভুলিতে পারে নাই। সুতরাং তাহারা আবার বিদেশীকে বিতাড়ন করিয়া 'একান্তভাবে ভারতীয়' (essentially Indian) (বা হিন্দু) সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিত। এই স্বপ্নাবিষ্ট দূতরূপেই আবির্ভূত হন বাল গংগাধর তিলক।

১৮৯৬ সালে বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে দুর্ভিক্ষ ও প্লেগে বহু লোক (১.৭০ লক্ষের উপর) মারা যায়। এই দুর্ভিক্ষ ও প্লেগকে কেন্দ্র করিয়াই তিলকের উগ্র জাতীয়তাবাদ প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। তিনি তাঁহার **কেশরী** পত্রিকার[১] মাধ্যমে বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অধিবাসীদের সরকারের নিকট খাদ্যের দাবি করিবার এবং খাজনা বন্ধ করিবার নির্দেশ দেন।[২]

তিলকের উগ্র জাতীয়তাবাদ মোটামুটি **চারিটি নীতির** উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল : (১) গৌরবময় অতীতের ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ ভারতের গঠন, (২) আবেদন-নিবেদনের নীতি (the policy of prayers and petitions) পরিহার করিয়া আত্মনির্ভরশীলতা ও স্বার্থত্যাগের শিক্ষা, (৩) খুঁটিনাটি সংস্কারের মোহ ত্যাগ করিয়া **পূর্ণ স্বরাজের** (Purna Swaraj) প্রচেষ্টা এবং (৪) তীব্র জাতীয় চেতনা ও গণ-আন্দোলনের সৃষ্টি। "স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার আমি তাহা অর্জন করিবই" (Swaraj is my birth-right and I will have it)—সগর্বে তিলক ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার এই মহৎ আদর্শ ঘোষণা করেন।

---

১. তিলক সম্পাদিত অপর পত্রিকাটির নাম ছিল **মারাঠা** (**Mahratta**)। কেশরী মারাঠীতে এবং মারাঠা ইংরাজীতে প্রকাশিত হইত।

২. কেশরী পত্রিকায় প্রকাশিত তিলকের নির্দেশের একটি নমুনা : **"When the Queen desires none should die, when the Governor declares that all should live, will you kill yourself by timidity and starvation ?··· Can you not be bold even when in the grip of death ?"** (অনুবাদ)

তিলক শুধু বাক্যবীরও ছিলেন না, কর্মবীরও (man of action) ছিলেন। জনগণের মধ্যে স্বাদেশিকতা ও রাজনীতিবোধ জাগ্রত করিবার জন্য তিনি **গণপতি ও শিবাজী উৎসব** দুইটিকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া জাতীয় উৎসবে পরিণত করেন।

৯.৩. উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রসার : প্রথম শিবাজী উৎসবের অব্যবহিত পরেই তিলক দুইজন ইংরাজ কর্মচারীর হত্যার সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া ধৃত ও ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ইহা **ভারতের জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা**।[১] কারণ, ইহাকে কেন্দ্র করিয়া এবং ইহার পরই উগ্র জাতীয়তাবাদ ভারতের বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া পড়ে।

৯.৪. বাংলার উগ্র জাতীয়তাবাদ ও বিপিন পাল : বাংলায় উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রধান নেতা ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল এবং পাঞ্জাবে লাল লাজপৎ রায়। স্বরাজ বলিতে বিপিনচন্দ্র বুঝিতেন **'অটোনমি'** (*autonomy*) বা আত্ম-কর্তৃত্ব। তাঁহার বিখ্যাত উক্তি : "স্বরাজ কেহ কাহাকে দান করিতে পারে না, নিজেকেই অর্জন করিতে হয়"—নূতন জাতীয়তাবাদের আদর্শের দ্যোতক হইয়া দাঁড়ায়। এক দিক দিয়া ইহাকে স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দের জাতীয়তাবাদের আদর্শের জনপ্রিয় রূপ বলিয়া গণ্য করা চলে। বিপিনচন্দ্রের সহজ ব্যাখ্যার ফলেই উহা ভারতীয় জনমানসে প্রতিফলিত হয়।

৯.৫. লালা লাজপৎ রায় ও স্বদেশী আন্দোলন : রংগমঞ্চে লালা লাজপৎ রায় অবতীর্ণ হন স্বদেশী আন্দোলনের সময়। সুতরাং এ-সম্পর্কেই প্রথমে আলোচনা করা যাইতে পারে।

৯.৬. স্বদেশী ও বয়কট : স্বদেশী ও বয়কট ছিল একই আন্দোলনের দুইটি অবিচ্ছেদ্য অংগ, এবং **১৯০৫ সালের বংগভংগের প্রতিক্রিয়া**। বংগভংগের প্রস্তাব অবশ্য ১৮৯১ সাল হইতেই চালু ছিল। কিন্তু ইহাকে কার্যকর করেন লর্ড কার্জন ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর তারিখে। আপাত কারণ যাহাই ব্যাখ্যা করা হউক না কেন, কার্জনের আসল উদ্দেশ্য ছিল বাংলার উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রসার রোধ করা। হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হইলেই ইহা সম্ভব হইবে। এবং বাংলাদেশ দ্বিখণ্ডিত হইলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ দানা বাঁধিয়া উঠিবে।

বংগভংগের প্রস্তাব প্রকাশিত হইবার সংগে সংগেই (১৯০৩) সারা দেশ বারুদের স্তূপে পরিণত হয়। উহা কার্যকর হইলে ঐ বারুদের স্তূপে ঘটে বিস্ফোরণ। ক্রমে আন্দোলন সমগ্র ভারতেই ছড়াইয়া পড়ে। বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে উত্তাল দেশ আর কখনও পূর্বে হয় নাই।[২] কারামুক্ত তিলক তাঁহার 'কেশরী' পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখেন সংকট আসন্ন। স্বরাজ বা স্বাধীনতার ইহাই প্রকৃষ্ট সময়।

---

১. "The trial and conviction of Tilak may be regarded as a landmark in the history of Indian nationalism." R. C. Mazumdar : *History of Freedom Movement*

২. **Romain Rolland** : *Prophets of the New India* (*Biography* of Ramakrishna and Vivekananda)

প্রতিবাদ প্রথমে বয়কট বা বিলাতী পণ্য বর্জনের আন্দোলন এবং পরে বিদেশী স্কুল-কলেজ, বিচারালয় বর্জন এবং বিদেশী শাসকদের সহিত সামগ্রিক অসহযোগের রূপ গ্রহণ করে। সংগে সংগে স্বদেশী পণ্য ও জাতীয় শিক্ষা প্রসারের আন্দোলনও চলিতে থাকে। এই সময় লাজপৎ রায় বাংলাদেশে আসিয়া আন্দোলনকে জোরদার করিয়া তোলেন এবং পাঞ্জাবে জাতীয় শিক্ষার আদর্শের বহুল প্রচারে সচেষ্ট হন। এইভাবে সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বুনিয়াদ শিথিল করিয়া জাতীয়তাবাদীরা স্বরাজ উপলব্ধিতে সচেষ্ট হন।

৯.৭. **সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন**: সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন (terrorist movement) জাতীয়তাবাদের দ্বিতীয় পর্যায়ের এক অধ্যায়। অবশ্য বহুদিন পূর্বেই ইহা অংকুরিত হইয়াছিল তবে ব্যাপক আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করে ১৯০৫ সাল হইতে। বংগদেশ ছাড়াও ইহা মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবে বিস্তারলাভ করে।

ইংরাজ সরকারও আন্দোলনকে দমন করিবার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করে। ইহার মধ্যে কোন কোনটি ছিল **আপোষমূলক**, এবং কোন কোনটি ছিল **নিপীড়নের প্রতীক**।

৯.৮. **রাওলাট আইন ও জালিয়ানওয়ালবাগ**: আপোষমূলক ব্যবস্থার মধ্যে ১৯০৯ সালের আইন বা মর্লে-মিণ্টো সংস্কার, ১৯১১ সালে বংগভংগরোধ প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে এবং নিপীড়নের প্রতীক হিসাবে ১৯১৯ সালের কুখ্যাত 'রাওলাট আইনের (Rowlatt Act) স্থান সর্বাগ্রে। বিনা বিচারে আটক, যথেচ্ছ দণ্ডদান, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের সামাহীন ক্ষমতা প্রভৃতি ছিল আইনের ব্যবস্থা। এই **রাওলাট আইনই ভারতের রাজনীতিতে মহাত্মা গান্ধীর আগমন এবং জাতীয় আন্দোলনে এক নূতন যুগ সূচনা করে**। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, রাওলাট আইন বা 'কালা কানুন'কে কেন্দ্র করিয়াই ১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল তারিখে **জালিয়ানওয়ালবাগের হত্যাকাণ্ড** অনুষ্ঠিত হয়।[১]

৯.৯. **মহাত্মা গান্ধী ও গণ-আন্দোলনের সূচনা**: এইভাবে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের রূপ গ্রহণের দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত হয়। এখনও কিন্তু ইহার সহিত দেশের জনগণের পূর্ণ যোগসূত্র স্থাপিত হয় নাই। বলা যায়, এই অধ্যায়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ **মধ্যবিত্তশ্রেণীর আন্দোলনে পরিণত** হয়। ইহাকে **গণ-আন্দোলনের পথে** লইয়া যান মহাত্মা গান্ধী।

১০. **তৃতীয় পর্যায় (১৯২০-৪৭)**: জওহরলাল নেহরু গান্ধীজীর আবির্ভাবের পটভূমিকে এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন. প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতীয় রাজনীতিতে ছিল ভাটার টান। কারণ দ্বিবিধ: কংগ্রেস চরমপন্থী ও নরমপন্থী—এই দুই অংশে বিভক্ত হইয়াছিল এবং যুদ্ধকালীন অবস্থায় নিয়ন্ত্রণ ও সীমাবদ্ধকরণের পরিমাণ বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

---

১. Jawaharlal Nehru: *Autobiography*

যুদ্ধের পর যাহা আশা করা গিয়াছিল তাহা ঘটে নাই। নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্তি ও অগ্রগতির পরিবর্তে আসিয়াছিল দমনমূলক ব্যবস্থা এবং পাঞ্জাবে প্রবর্তিত হইয়াছিল সামরিক আইন (martial law)। চূড়ান্ত অপমানের অনুভূতি ও অবরুদ্ধ ক্রোধ দেশের লোককে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। সাংবিধানিক সংস্কার ও কৃত্যকসমূহের (services) ভারতীয়করণের কথা যে চলিতেছিল তাহা যেন আর শেষ হয় না। যখন আমাদের মানবত্বকে নানাভাবে দমন করা হইতেছিল এবং নিরবচ্ছিন্ন শোষণের ফলে আমাদের দারিদ্র্য দিন দিন প্রকটাকার ধারণ করিতেছিল তখন সংস্কার ইত্যাদির কথা পরিহাস বলিয়াই মনে হইতেছিল। জাতি হিসাবে ভারত যেন নিজেকে পরিত্যাগ করিয়াছিল।

কারণ, কিই বা আমরা করিতে পারিতাম? মাঝে মাঝে কোন কোন দুঃসাহসিক ব্যবস্থার চিন্তাও যে করি নাই তাহা নহে, কিন্তু তাহা যে হাতুড়ে বৈদ্যগিরির ন্যায়ই হইবে তাহাও বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

এমন সময় ঘটিল গান্ধীজীর আগমন। ঘূর্ণিবায়ুর মত আসিয়া তিনি অনেক কিছুই পালটাইয়া দিলেন—অনেকেরই ভাবনা নূতন হাওয়ায় ভাসিয়া চলিল।

১০.১. গান্ধী-নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য : গান্ধীজী উপর হইতে অবতরণ করেন নাই ; ভারতীয় জনগণ হইতেই তিনি উদ্ভূত হইয়াছিলেন। এবং তিনি তাহাদের ভাষাতেই কথা বলিতেন এবং তাহাদের দুঃখদুর্দশার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেন।[১]

---

১১. গান্ধী-নেতৃত্বের তিনটি যুগ : দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁহার 'সত্যাগ্রহ' বা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ[২]-অস্ত্রকে সার্থকভাবে প্রয়োগ ও শাণিত করিয়া গান্ধীজী স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন ১৯১৫ সালে। তারপর এক বৎসর গোখেলের পরামর্শে দেশের অবস্থার সমীক্ষণ করিয়া সক্রিয় রাজনীতিতে অবতীর্ণ হন। গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে তিনটি পৃথক কালবিভাগ (period) দ্বারা চিহ্নিত করা যায় : **১৯২০-২৮, ১৯২৮-৪২** এবং **১৯৪২-১৯৪৭**।

১১.১. অহিংস অসহযোগের যুগ : প্রথম যুগে (১৯২০-২৮) গান্ধীজীর রণকৌশল ছিল উপরি-উক্ত সত্যাগ্রহ বা অহিংস অসহযোগ। প্রথমে বিহারের চম্পারণ জিলা, গুজরাটের খেদা জিলা প্রভৃতিতে এই অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া পরে ইহাকে নিয়োগ করেন কুখ্যাত রাওলাট আইনের (Rowlatt Act, 1919) বিরুদ্ধে।[৩]

---

১. *The Discovery of India*

২. সত্যের প্রতি অবিচল আস্থা এবং অন্যায়ের সংগে পূর্ণ অসহযোগ (complete non-cooperation with the forces of evil) এই নীতির মূল কথা। ইহাতে হিংসার পথ সম্পূর্ণ পরিহার করিয়া চরম আত্মত্যাগের মধ্য দিয়াই শত্রুকে জয় করিবার আশা করা হয়। ইহাতে হত্যা নয়, অন্যায়ের প্রতিবাদে নীরবে মৃত্যুবরণের অসীম সাহস অর্জনের প্রয়াসকেই জীবনের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা হয়। ইহা হইল সত্যের অগ্নিপরীক্ষারই দ্যোতক।

৩. বিনা বিচারে আটক, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ ও বিভিন্ন প্রকার প্রতিরোধমূলক শাস্তিদান ছিল এই আইনের উদ্দেশ্য (৩৯ পৃষ্ঠা দেখ)।

রাওলাট আইনের প্রতিবাদে আহূত পূর্বোল্লিখিত (৩৯ পৃষ্ঠা) অমৃতসরের জালিয়ান-ওয়ালবাগের সভাতেই ১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল তারিখে ঘটে নৃশংস হত্যাকাণ্ড, যাহা ভারতে এক অভূতপূর্ব জনজাগরণের সৃষ্টি করে। সংগে সংগে সুরু হয় **খিলাফৎ আন্দোলন**।[১] গান্ধীজী ছিলেন ইহার প্রধান ও প্রথম সমর্থক। ইহার মধ্যে তিনি হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত সংগ্রামের রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

অসহযোগ আন্দোলন ছিল বিশেষ ব্যাপক। ইহাতে সবকিছু বিলাতী বর্জন ও স্বদেশী গ্রহণের নীতি গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু অহিংস অসহযোগ কোন কোন স্থানে, বিশেষ করিয়া চৌরিচৌরায়, হিংসাত্মক ঘটনায় পরিণত হইলে গান্ধীজী আন্দোলনকে প্রত্যাহার করিয়া লন। অন্যান্য নেতা ইহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন। তখন সাময়িকভাবে গান্ধীজীকে নেতৃত্ব হইতে একরূপ সরিয়া দাঁড়াইতে হয়। এবং **নেতৃত্ব গিয়া পড়ে স্বরাজ্য গোষ্ঠীর**[২] হস্তে, যাহাদের উদ্দেশ্য ছিল আইনসভাগুলিতে প্রবেশ করিয়া সংস্কারসাধনের মাধ্যমে ইংরাজদের শাসন ও শোষণ বলবৎ রাখিবার প্রচেষ্টা ব্যর্থ করা।

১১.২. পূর্ণ স্বাধীনতার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত: ১৯২৮ সালে আবার কিন্তু গান্ধীজী অবিসংবাদী নেতৃপদ পুনরধিকার করেন, এবং কিছুকাল পরেই ১৯৩০ সালের ২রা জানুয়ারী মাসে লাহোর অধিবেশনে কংগ্রেস **পূর্ণ স্বাধীনতার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত** গ্রহণ করে। এবং **২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা** (বা পূর্ণ স্বরাজ) **দিবস** হিসাবে পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১২. আইন অমান্য আন্দোলন: ইতিমধ্যেই গান্ধীজী আইন অমান্য আন্দোলন (Civil Disobedience Movement) সুরু করিয়াছিলেন। আন্দোলনের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হইল লবণ-আইন ভংগ বা ডাণ্ডি অভিযান।

১২.১. সাইমন কমিশনের রিপোর্ট ও পরবর্তী অধ্যায়: আইন অমান্য আন্দোলন চালু থাকাকালীনই সাইমন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয় (জুন, ১৯৩০)। এই রিপোর্টে ভারতকে স্বায়ত্তশাসনের আশ্বাস দান করা হইলে উহাতে কোন রাজনৈতিক দলই সন্তুষ্ট হয় নাই। অবশ্য আলোচনা করিবার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে লণ্ডনে **গোল টেবিল বৈঠকে** (Round Table Conference) ডাকা হয়। বিখ্যাত গান্ধী-আরউইন চুক্তির পর গান্ধীজীও উহাতে যোগদান করেন। কিন্তু তাঁহাকে, শূন্য হাতে হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হয়। কারণ, সংখ্যালঘু ও সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান ইহাতে হয় নাই, কংগ্রেসকেও জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে মানিয়া লইতে ব্রিটিশ সরকার স্বীকৃত হয় নাই।

দেশে ফিরিয়া **আর এক দফা আইন অমান্য আন্দোলনের** ব্যবস্থা করিতে থাকেন। ইহা চলে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত। তারপর পাস হয় ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন (Government of India Act, 1935) যাহার প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য

১. প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তুরস্ক সাম্রাজ্যের খণ্ডবিখণ্ডের বিরুদ্ধে ভারতীয় মুসলমানদের প্রতিবাদ।

২. নেতা ছিলেন পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, দেশবন্ধু ও পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়।

অংশটুকুকে কার্যকর করা হয় ১৯৩৭ সালের ১লা এপ্রিল হইতে।[১] কংগ্রেস এই শাসন আইন অনুসারে নির্বাচনে অবতীর্ণ হয় এবং বিভিন্ন প্রদেশে এককভাবে বা কোয়ালিশনের মাধ্যমে মন্ত্রিসভা গঠন করে। ইহার **অর্থ** সাংবিধানিক **পথে** স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিচালনা এবং **তাৎপর্য** হইল গান্ধীজীর প্রভাব হ্রাস। ইহা এক প্রকার স্বরাজ্য দলের কার্যপদ্ধতিরই অনুসরণ।

১২.২. ভারত ছাড়ো আন্দোলন : গান্ধীজী আবার রাজনৈতিক মঞ্চের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ান ক্রীপস্ মিশনের ব্যর্থতার পর ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলনের (Quit India Movement) সময়। বস্তুত, এই আন্দোলন তাঁহারই আন্দোলন। আন্দোলনের ফলে সকল কংগ্রেস নেতাই কারারুদ্ধ হন, গান্ধীজী অবশ্য কিছু পরেই মুক্তি পান।

১৩. শেষ অধ্যায় : কংগ্রেস নেতৃবর্গের বন্দীত্বের সুযোগ লইয়া মুসলিম লীগ প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠে, এবং শেষ পর্যন্ত উহাই দেশবিভাগের কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

এই ঘটনাই হইল **গান্ধীজীর সমগ্র রাজনৈতিক জীবনের চরম ট্রাজেডি।** ইহার পূর্বে অবশ্য স্বরাজ্য দল গান্ধীজীর নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহই করিয়াছিল (১৯২২) বলা চলে, সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেস সভাপতিপদের জন্য গান্ধীজী মনোনীত প্রার্থী পট্টভি সীতারামিয়াকে পরাজিত করিয়া দ্বিতীয়বার নির্বাচিত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।[২]

১৩.১. ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পরিপুষ্টি : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় একদিকে যেমন মুসলিম লীগ শক্তিসঞ্চয় করিতেছিল, অপরদিকে তেমনি ভারতীয় জনগণের অপরাংশের উপর ভিত্তি করিয়া ভারতীয় জাতীয়তাবাদও অপরিদৃশ্যভাবে পুষ্ট হইতেছিল। পুষ্টির অন্যতম উৎস ছিল নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ভূমিকা। গোপনে দেশ হইতে পলায়ন করিয়া তিনি ব্রিটিশের শত্রুপক্ষের সহায়তায় আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠন করেন। এই আজাদ হিন্দ বাহিনীকে ১৮৫৭ সালের **প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের একরূপ পুনরাবৃত্তি** বলিয়া অভিহিত করা যায়। ভারতে সাম্রাজ্যবাদের দিন যে শেষ হইয়াছে ইহা তাহারই অন্যতম নিরুক্ত ঘোষণা।

১৩.২. নৌবাহিনীর সৈনিকদের বিদ্রোহ : ইহার পর যুদ্ধাবসানে বোম্বাই-এ রাজকীয় নৌবাহিনীর সৈনিকদের বিদ্রোহ (RIN Ratings Mutiny) এই ঘোষণার নিম্নে আর এক দফা রেখাংকন করে।

অতএব, (১) '৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলন, (২) নেতাজীর ভূমিকা ও আজাদ হিন্দ কীর্তিকলাপ এবং (৩) রাজকীয় নৌবাহিনীর বিদ্রোহ হইল ভারতীয় জাতীয়তাবাদের শেষ অধ্যায়ের তিনটি ধাপ।

---

১. পরে বিস্তৃতভাবে আলোচ্য।

২. শেষ পর্যন্ত অবশ্য সুভাষচন্দ্র পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এখানেই ব্যাপারটির সমাপ্তি ঘটিতে দেন নাই। কংগ্রেসের বাহিরে আসিয়া তিনি 'ফরওয়ার্ড ব্লকে'র প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রসংগত উল্লেখ্য যে, এই তিনটি ধাপই সাম্প্রদায়িক রাজনীতি-বিরোধী ছিল। বিশেষ করিয়া নেতাজী তাঁহার আজাদ হিন্দ বাহিনীর মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সংহতি আনয়ন করিতে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন।

১৪. জাতীয়তাবাদের ইতিহাসের মূল্যায়ন: এই হইল আধুনিক ভারতের জাতীয়তাবাদের ইতিহাস। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে এই ইতিহাসের মূল্যায়ন করা হইয়াছে। কাহারও কাহারও মতে, ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে ভারতীয় পুঁজিবাদের স্বার্থসংরক্ষণকারী আন্দোলন বলিয়াই বর্ণনা করা চলে। কারণ, দেখা যায় যে, আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ কখনও সাম্রাজ্যিক শক্তির সহিত সহযোগিতা করিতে এবং কখনও বা গণ-আন্দোলনের পথে পা বাড়াইতে উন্মুখ। এই **দ্বৈত চরিত্র** কংগ্রেসের সামগ্রিক ইতিহাসে বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।[১]

ভিন্ন মতাবলম্বীদের ধারণা হইল যে অন্তত স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামেই পরিণত হয়, এবং গান্ধীজীর আবির্ভাবের পর হইতে ইহা **গণ-আন্দোলনের** রূপই গ্রহণ করে। যেহেতু ইহা গণ-আন্দোলন ছিল সেইহেতু ইহা ভূস্বামী ও শিল্পপতিদের বিরুদ্ধেও সম্প্রসারিত হইয়াছিল।

পরস্পরবিরোধী মূল্যায়নের সামঞ্জস্যবিধান: এই দুই বিরোধী মতাবলম্বীদের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করিয়া বলা যায় যে, ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দানা বাঁধিতে বাঁধিতে শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যিক শক্তি উৎখাতের আন্দোলনেই পরিণত হয়। ইহাই ছিল আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী জনগণের লক্ষ্য। এবং নেতারা মনে করিয়াছিলেন যে এই উৎখাত ব্যতীত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক দিক দিয়া হৃতসর্বস্ব ভারতের পুনরুজ্জীবন সম্ভব নয়। অনেক লেখক মনে করেন যে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ধনিকশ্রেণীর প্রাধান্য ছিল। এই শ্রেণীর দ্বারা প্রভাবিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (the Indian National Congress) এবং জাতীয় আন্দোলন পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হইতে থাকে।[২]

স্মর্তব্য

১. ভারতে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের উৎস হইল ভারতীয় জাতীয়তাবাদ।

২. এই জাতীয়তাবাদের সূত্রপাত হয় (ক) ভারতে নবজাগরণ হইতে।

৩. নবজাগরণের প্রথম প্রাণস্পন্দন অনুভূত হয় কলিকাতা শহরে।

৪ নবজাগরণ ছাড়াও যে-সকল শক্তি জাতীয়তাবাদের প্রসারে কার্য করিয়াছেন তাহারা হইল (খ) পাশ্চাত্য প্রেরণা ও ইংরেজী শিক্ষা, (গ) অর্থনৈতিক

১. **Rajani Palme Dutt:** ***India Today***

২. **"... it was the capitalist class which led and dominated the nationalist movement in India. It accomplished this through its classical party, viz. the Indian National Congress ...." A. R. Desai:** ***Recent Trends in Indian Nationalism***

অসন্তোষ, (ঘ) বর্ণবৈষম্য ও ইংরেজদের ঔদ্ধত্য, (ঙ) ইংরেজদের দমননীতি এবং চ) বৈদেশিক ঘটনার অনুপ্রেরণা।

৫ ভারতে জাতীয়তাবাদ ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন কংগ্রেসের মাধ্যমেই সুসংগঠিত রূপ ধারণ করে।

৬. এই জাতীয়তাবাদী বা কংগ্রেসের আন্দোলনকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়ঃ প্রথম পর্যায়—১৮৮৫-১৯০৫, দ্বিতীয় পর্যায়—১৯০৫-২০ এবং তৃতীয় পর্যায়—১৯২০-৪৭।

৭ প্রথম পর্যায়ে আন্দোলন ছিল নরমপন্থীদের হাতে। এই যুগ আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের কামনা দ্বারাই চিহ্নিত।

৮. দ্বিতীয় পর্যায়ের সূচনা—১৯০৫ সালকে কংগ্রেসের বয়ঃসন্ধির বৎসর বলিয়া সূচিত করা যায়। এই পর্যায়ে আন্দোলন বহুলাংশে উগ্র রূপ ধারণ করে। তবে ইহা ছিল মধ্যবিত্তদের আন্দোলন।

৯. তৃতীয় পর্যায়ে গান্ধীজীর নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন প্রকৃত গণ-আন্দোলনে পরিণত হয়।

১০. কংগ্রেসের অধীনে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে কংগ্রেসের দ্বৈত চরিত্র সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়।

অনুশীলনী

1. **Describe the nature of Indian Nationalism and account for its rise and growth.**

[ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রকৃতি বর্ণনা করিয়া উহার উন্মেষ ও সম্প্রসারণ কিভাবে ঘটিয়াছিল তাহা ব্যাখ্যা কর।] (৩০-৩৫, ৪১ পৃষ্ঠা)

2. **Analyse in brief the factors that calculated the growth of Indian Nationalism.** (C. U. 1983)

[ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সম্প্রসারণে যে-সকল বিষয় ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদের উল্লেখ কর।] (৩০-৩৫ পৃষ্ঠা)

3. **Discuss in brief the different stages in the development of Indian Nationalism during the British rule** (C. U. 1981)

[ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রসারের বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।] (৩৫-৪৩ পৃষ্ঠা)

4. **Assess the role of the Congress in the development of Indian Nationalism.**

[ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পরিস্ফুটনে কংগ্রেসের ভূমিকার মূল্যায়ন কর।] (৩৫-৩৮, ৩৯-৪২ পৃষ্ঠা)

5. **Review the role of Mahatma Gandhi in growth of Indian Nationalism.**

[ভারতের জাতীয়তাবাদের সম্প্রসারণে গান্ধীজীর ভূমিকার মূল্যায়ন কর। (৩৯-৪১ পৃষ্ঠা)

6. **Review the implications of the following in the growth of Indian Nationalism: (a) Swadeshi and Boycott, (b Partition of Bengal, 1905, (c) Rowlatt Act, 1919, (d) Swarajya Party, (e) Quit India Movement, (f) Netaji Subhas Chandra and the INA.**

[ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সম্প্রসারণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর: (ক) স্বদেশী ও বয়কট, (খ) ১৯০৫ সালের বংগভংগ, (গ) ১৯১৯ সালের রাওলাট আইন, (ঘ) স্বরাজ্য দল, ঙ) ভারত ছাড়ো আন্দোলন এবং (চ) নেতাজী সুভাষচন্দ্র এবং আজাদ হিন্দ ফৌজ।

(৩৮-৩৯ ও ৪৬-৪৭ ; ৩৮ ; ৩৯ ; ৪১ ; ৪২, ; ৪২-৪৩ পৃষ্ঠা)

৪ | সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম
(ANTI-IMPERIALIST STRUGGLE)

> *"A Nation resents being governed by foreigners and demands a sovereign state of its own."* F. M. Watkins

বর্তমান অধ্যায়কে পূর্ববর্তী অধ্যায়ের পরিশিষ্ট হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে। কারণ, ভারতীয় জাতীয়তাবাদই ইহার বিশেষ পর্যায়ে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের রূপ গ্রহণ করিয়াছিল, এবং ইহার দরুনই শেষ পর্যন্ত ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিলুপ্তি ঘটিয়াছিল।

১. জাতীয়তাবাদের উৎস : জাতীয়তাবাদের উৎস হইল মানুষের গূঢ়তম প্রবৃত্তি। এই কারণে জাতীয়তাবাদকে **অন্যতম ধর্ম** বলিয়া গণ্য করা হয়।[১] ব্যাখ্যা করিয়া বলা যায়, নিজ গোষ্ঠির শ্রেষ্ঠত্ব ও সংহতির যে আকাংক্ষা ও চেতনা প্রায় প্রত্যেক লোকের মধ্যেই থাকে, তাহা হইতেই মূলত জাতীয় ভাব বা জাতীয়তাবাদ উৎসারিত হয়। অতীতে আদিম জনগোষ্ঠির (clan or tribe) এইরূপ শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ ও সংহতির আকাংক্ষা করিত, বর্তমানে জাতীয় ভাবাপন্ন গোষ্ঠির সভ্যগণ তাহাই করে। পরাধীন জাতি বা উপনিবেশের ক্ষেত্রে এই আকাংক্ষা **আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার** (*the right of self-determination*) বা নিজ রাজনৈতিক ভাগ্য-নির্ধারণ করিবার দাবির রূপ গ্রহণ করে।

১.১. আত্মনিয়ন্ত্রণ ও উহার প্রকারভেদ : আত্মনিয়ন্ত্রণ বা রাজনৈতিক ভাগ্য-নির্ধারণ বলিতে **পূর্ণ স্বাধীনতা নাও বুঝাইতে পারে**—পরাধীন জাতি বেশ কিছুটা স্বাতন্ত্র্য বা আত্মনিয়ন্ত্রণের আংশিক অধিকার লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারে। তবে পরবর্তী পর্যায়ে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিই জানাইয়া থাকে। অবশ্য স্বজাতীয়দের দ্বারা স্থাপিত উপনিবেশসমূহের (settled colonies) বেলায় সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক (symbol of imperialism) শেষ পর্যন্ত বজায় থাকিতে পারে।[২]

১.২. প্রথম যুগে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের লক্ষ্য : ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ইতিহাসের পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে ঐ আন্দোলন ছিল সভ্যতা-সংস্কৃতির দিক দিয়া সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রথমে সমকক্ষ এবং পরে উহা হইতে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের প্রচেষ্টা। এই যুগের সূত্রপাত করেন রাজা রামমোহন রায় এবং উহার পরিসমাপ্তি ঘটে স্বামী বিবেকানন্দের অবদানের ফলে।[৩]

১. "Nationalism may be called a religion because it is rooted is the deepest instincts of man." Lloyd : *Democracy and Its Rivals*

২. অস্ট্রেলিয়া কানাডা প্রভৃতি পূর্ববং ব্রিটিশ উপনিবেশ ইংল্যাণ্ডের রাজশক্তিকে (Crown) রাষ্ট্র-প্রধান হিসাবে মানিয়া লইয়াছিল।

৩. Sri Aurobindo : *Renaissance in India* ; also Santi L. Mukherji : *The Philosophy of Man-making*

২. সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত: ইতিমধ্যে কংগ্রেস স্থাপিত হইয়াছিল (১৮৮৫) এবং উহা শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের দাবি জানাইতে সুরু করিয়াছিল। অবশ্য আবেদন-নিবেদনের পালার প্রবর্তক ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। যাহা হউক, শাসন-সংস্কারের এই দাবিকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের একরূপ সূত্রপাত বলিয়া গণ্য করা যায়।

২.১. ১৮৫৮ সালের বিদ্রোহের প্রকৃতি-বিশ্লেষণ: ইহার পূর্বে—অর্থাৎ প্রাক কংগ্রেস যুগে—১৮৫৮ সালের মহাবিদ্রোহ বা স্বাধীনতা-যুদ্ধকে ঠিক জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম বা আন্দোলন আখ্যা দেওয়া যায় না। কারণ, উহা দিল্লীতে মুঘল রাজবংশের, মধ্যপ্রদেশে পেশোয়াদের এবং অযোধ্যায় নবাবের পরিবারকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিতই করিতে চাহিয়াছিল—ভারতের কোন অংশে জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য উহার ছিল না।[১] অন্যভাবে বলা যায়, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রকৃত লক্ষ্য হইল সমগ্র জাতির জন্য স্ব-শাসন (self-rule) বা স্বরাজের ব্যবস্থা করা—বিদেশী শাসকদের পরিবর্তে স্বদেশী শাসন স্থাপন বা পুনঃসংস্থাপন করা হয়। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন স্বদেশী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেও পরিচালিত হয়। সুতরাং ইহাতে **গণতান্ত্রিকতার উপাদান** বর্তমান থাকে।

২.২. সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের প্রথম যুগসূচক: প্রথম এই ধরনের আন্দোলন হইল ১৯০৫ সালে ও তৎপরবর্তী যুগের স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন।

৩. পরবর্তী যুগসূচকসমূহ: ১৯১৬-১৭ সালে হোমরুল আন্দোলনকে দ্বিতীয় যুগসূচক (milestone) বলিয়া বর্ণনা করা যায়। তারপর আছে গান্ধীজীর নেতৃত্বে ১৯২০-২২ সালের (অহিংস) অসহযোগ আন্দোলন, ১৯৩০-৩৪ সালের মধ্যে দুই পর্যায়ে আইন অমান্য আন্দোলন। এবং সর্বশেষ অধ্যায় হইল ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়ো আন্দোলন'। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে ইহাদের প্রত্যেকটিরই প্রসংগত উল্লেখ ও বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের মাপকাঠিতে উহাদের বিচার করা হইতেছে।

৩. ক. স্বদেশী ও বয়কট: স্বদেশী ও বয়কটকে ভারতীয় **জাতীয়তাবাদের প্রথম সুদীপ্ত ঘোষণা** (firm assertion) বলিয়া বর্ণনা করা যায়। বলা হইয়াছে, নিজ গোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা এবং সংহতির আকাংক্ষা ও চেতনা জাতীয় ভাব বা জাতীয়তাবাদের (পূর্ববর্তী পৃষ্ঠা) প্রাণ। স্বদেশী আন্দোলন এই ঘোষণা এবং আকাংক্ষা ও চেতনার দ্যোতক। আমরা যে স্বদেশী পণ্যের উপর নির্ভর করিতে পারি, স্বদেশী শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষিত হইতে পারি, এক 'স্বদেশী সমাজ'[২] গড়িয়া তুলিতে পারি—ইহাই

১. "There were attempts in 1857 to restore the Mughal dynasty in Delhi, the Peshwa's supremacy in the Central Provinces, and the rule of the Nawab family of Oudh. But there was no question of establishing a national State in any of these regions." R. C. Mazumdar and P. N. Chopra: *Main Currents of Indian History*

২. 'স্বদেশী সমাজ' বাক্যাংশটি রবীন্দ্রনাথের—১৯০৫ সালে প্রকাশিত তাঁহারই বিখ্যাত প্রবন্ধের নাম। উহা ইংরাজীতে অনূদিত হইবে *Society and State* নামে।

ছিল স্বদেশী আন্দোলনের প্রতিপাদ্য বিষয়। সুতরাং ইহার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হইল ইংরাজ-প্রবর্তিত পাশ্চাত্যের মোহ হইতে মুক্তি।

অর্থনৈতিক তাৎপর্য: অর্থনৈতিক দিক হইতে ইহার **অর্থ: শাসনের নামে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের পরিসমাপ্তি।** স্বদেশী পণ্যপ্রসারের **তাৎপর্য**: বিলাতী (ও অন্যান্য বিদেশী) পণ্যের চাহিদা হ্রাস—অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অর্থনৈতিক ভিত্তি ধরিয়া নাড়া দেওয়া। ফলে তাহারা একদিন পাততাড়ি গুটাইতে বাধ্য হইবে।[১] অতএব অনুজ্ঞা হইল বিলাতী পণ্য বর্জন কর।

রাজনৈতিক দিক হইতে ইংরাজদের কোর্টকাছারি স্কুলকলেজ বয়কট করিয়া শাসন-যন্ত্রকে বিকল করিবার আশা করা হয়। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, স্বদেশী ও বয়কট ছিল একই আন্দোলনের দুইটি অবিচ্ছেদ্য অংশ (৩৮-৩৯ পৃষ্ঠা)।

অস্পষ্টভাবে বর্ণিত স্বরাজের লক্ষ্য. এইভাবে ভারতের মাটি হইতে সাম্রাজ্যবাদকে উৎখাত করিবার ব্যবস্থা করা হইলেও পূর্ণ স্বাধীনতা বা স্বরাজের লক্ষ্য তখনও ঠিক নির্দিষ্ট হয় নাই। কংগ্রেসের ২১তম অধিবেশনে (১৯০৬) স্বদেশী, বয়কট, জাতীয় শিক্ষার সংগে সংগে 'স্বরাজে'র উপরও একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিন্তু এই প্রস্তাবে স্বরাজের ধারণা মোটেই সুপরিস্ফুট হয় নাই। তাই বলা হয়, ভারতে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ের লক্ষ্য ছিল এক অস্পষ্টভাবে বর্ণিত স্বরাজ (an unclearly defined swaraj)।

৩. খ. হোমরুল আন্দোলন: হোমরুল আন্দোলনের সূত্রপাত করেন অ্যানি বেসান্ত (১৯১৬)।

অর্থ: হোমরুলের সহজার্থ **মোটামুটি স্বায়ত্তশাসন** (a sort of self-rule)। ইহা এক প্রকার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যাহার জন্মভূমি হইল উত্তর আয়ারল্যাণ্ড। অ্যানি বেসান্ত আয়ারল্যাণ্ডের হোমরুল আন্দোলনের অনুকরণে ভারতে অনুরূপ আন্দোলনের প্রবর্তন করিয়াছিলেন।

দ্বিবিধ উদ্দেশ্য: বলা হয়, হোমরুল আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল দ্বিবিধ: (ক) আয়ারল্যাণ্ডের মত ভারতের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে স্বায়ত্তশাসন অর্জন করা, (খ) ভারতে উগ্র জাতীয়তাবাদী ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনকে অন্যপথে পরিচালিত করা। কেহ কেহ এই দ্বিতীয় উদ্দেশ্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করিলেও তিলকের সমর্থনে হোমরুল আন্দোলন বিশেষ জনপ্রিয় ও শক্তিশালী হইয়া উঠে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে হোমরুল লীগের শাখা স্থাপিত হয়, বেসান্ত তাহার 'নিউ ইণ্ডিয়া' এবং তিলক তাঁহার পূর্বোল্লিখিত (৩৭ পৃষ্ঠা) 'কেশরী' ও 'মারাঠা' পত্রিকার মাধ্যমে হোমরুল বা স্বায়ত্তশাসনের দাবি প্রচার করিতে থাকেন। হোমরুলের মাধ্যমে জাতীয় আন্দোলনের গতি দিন দিন তীব্রতর হইতে থাকে।

---

১. **Lajpat Rai**: ***Young India***: ***Freedom Movement***

আন্দোলনের অবদান: এইভাবে হোমরুল আন্দোলন জনগণের মধ্যে উত্তরোত্তর **রাজনৈতিক সচেতনতার** সৃষ্টি করিয়া চলে।[১]

অন্তর্নিহিত ত্রুটি: তবুও কিন্তু হোমরুল আন্দোলনকে ঠিক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন হিসাবে গণ্য করা যায় না। কারণ, অ্যানি বেসান্ত নিজেই ঘোষণা করিয়াছিলেন: **"ভারত ও গ্রেট ব্রিটেন পরস্পরের কাছাকাছি আসুক** ইহাই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা এবং আমাদের শাসন-সংস্কারের উদ্দেশ্য হইল গ্রামীণ পরিষদ হইতে সুরু করিয়া জাতীয় সংসদ (National Parliament) পর্যন্ত সর্বস্তরে **পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা** করা।"

তবে স্বীকার করিতে হইবে যে প্রাথমিকভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি 'আনুগত্য' দেখাইলেও শেষ পর্যন্ত অ্যানি বেসান্ত ও আরও অনেকে অসহযোগ আন্দোলনের সংগে সক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট হন।[২]

প্রকৃত গণ-আন্দোলনের প্রস্তুতিপর্ব: **এই দিক দিয়া বিচার করিলে হোমরুল আন্দোলনকে অসহযোগ বা প্রকৃত গণ-আন্দোলনের প্রস্তুতিপর্ব হিসাবে গণ্য করা চলে।**

৩. গ. অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০-২২): গান্ধীজীর নেতৃত্বে ১৯২০ সালে যে অসহযোগ আন্দোলন (Non Cooperation Movement) সুরু হয় তাহা প্রথম প্রকৃত গণ-আন্দোলন ছাড়াও আর একটি বৈশিষ্ট্য দ্বারা সূচিত ছিল: আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের দৃষ্টিভঙ্গি, **সংস্কার হইতে বিপ্লবে** স্থানান্তরিত হইয়াছিল। বস্তুত, আপামর-সাধারণের অসহযোগের মাধ্যমে অবস্থা-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন—অর্থাৎ বিপ্লব সংগঠন করাই ছিল এই 'আন্দোলনে'র লক্ষ্য। এই আমূল পরিবর্তনের লক্ষ্য ছিল সকল শান্তিপূর্ণ ও ন্যায্য উপায়ে 'স্বরাজ' অর্জন—প্রয়োজন হইলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরে স্বরাজ অর্জন। সুতরাং **ইহা স্পষ্টতই** ছিল **সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন**।

মুক্তি-সংগ্রামের এক নূতন অধ্যায়: আন্দোলন অবশ্য দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। চৌরিচৌরার হিংসাত্মক ঘটনার পর গান্ধীজী উহাকে প্রত্যাহার করিয়া লন।[৩] অনেকেই গান্ধীজীর এই কার্যের তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন। অনেকে আবার ইহাকে বুর্জোয়াশ্রেণীর চাপে 'বৈপ্লবিক শক্তিসমূহের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা' বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছিলেন।[৪] এই বিষয়ে আলোচনায় না গিয়াও বলা যায় যে, ১৯২০-২২ সালের অসহযোগ আন্দোলন ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ হইতে **মুক্তি-সংগ্রামের এক নূতন অধ্যায়**।

---

১. R. C. Majumdar and P. N. Chopra: *Main Currents of Indian History*
২. Rajani Palme Dutt: *India To-day*
৩. ৪১ পৃষ্ঠা দেখ।
৪. এম. এন. রায়, রজনী পামী দত্ত, প্রভৃতি।

স্বরাজ্য দলের রাজনীতির মূল্যায়ন : অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হইলে অভ্যুত্থান ঘটে স্বরাজ্য গোষ্ঠীর যাহার নেতৃবর্গের লক্ষ্য ছিল আইন পরিষদে প্রবেশ করিয়া অভ্যন্তর হইতে তথাকথিত সংস্কারের বিনাশসাধন করা। ইহাকেও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের একটি অধ্যায় বলিয়া গণ্য করা চলে, কিন্তু ইহাকে বিপ্লব বলিয়া অভিহিত করা কঠিন।

৩.ঘ. আইন অমান্য আন্দোলন—১৯৩০-৩১, ১৯৩২-৩৪ (Civil Disobedience Movement—1930-31, 1932-34) : আইন অমান্য আন্দোলন অবশ্যই ছিল **বৈপ্লবিক প্রকৃতির**। অহিংস পথে পরিচালিত হইলেও ১৯৩০ সালের মার্চ মাসে গান্ধীজীর **ডাণ্ডি অভিযান** মার্কিন ঔপনিবেশিকদের বোষ্টন টী পার্টির (Boston Tea Party) কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। কোন 'কালা আইন' মানিব না, কোন 'অন্যায্য কর' প্রদান করিব না—ইহাই ছিল আইন অমান্য আন্দোলনের মূল কথা। 'কালা আইন' ও 'অন্যায্য কর' বলিতে সাম্রাজ্যিক শক্তি দ্বারা ধার্য সকল আইন ও করকেই বুঝাইত। বস্তুত, কংগ্রেস সকল প্রকার কর প্রদানের বিরুদ্ধেই জেহাদ ঘোষণা করিয়াছিল এবং স্বাস্থ্যবিধি বা জনসাধারণের সুবিধার সংগে সম্পর্কিত নয় এমন সকল আইনকেই অমান্য করিতে নির্দেশ দিয়াছিল। কার্যক্রমের মধ্যে ছিল বিলাতী বস্ত্র বর্জন, মদের দোকানে বয়কট, ইত্যাদি ব্যবস্থা।

আইন অমান্য আন্দোলনের ফলে ইংরাজদের ব্যবসায়ের ক্ষতি হয়, সরকারের রাজস্ব আদায় হ্রাস পায় এবং ইংল্যাণ্ড হইতে কয়েকবার ঋণ করিয়া বাজেট ঘাটতি মিটাইতে হয়।

মূলত অহিংস হইলেও শীঘ্রই ভারতের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক বিশৃংখলা ও দাংগা-হাংগামা সুরু হয়। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হয়।

আইন অমান্য আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে (১৯৩২-৩৪)[১] একই কার্যক্রম আরও ব্যাপক রূপ ধারণ করে এবং সাম্রাজ্যবাদী সরকারের দমননীতি সকল পূর্ব দৃষ্টান্ত ছাড়াইয়া যায়। শেষ পর্যন্ত আইন অমান্য আন্দোলনের অবসান ঘটে। অসহযোগ আন্দোলনের মত দ্বিতীয় পর্যায়ে গান্ধীজী ইহাকে **আবার প্রত্যাহার** করেন। কারণ কি ছিল সে-বিষয়ে বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে।

চূড়ান্ত ফল : যাই হোক, আইন অমান্য আন্দোলনের ফলে **একটি বিষয় সুস্পষ্ট হইয়া উঠে** : ভারতীয় জনগণ স্বাধীনতা অর্জন করিতে দৃঢ়সংকল্প। ইহার স্বাভাবিক অনুসিদ্ধান্ত হইল যে দমননীতি বেশীদিন কার্যকর হয় না—দমননীতির দরুনই শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতার সংকল্প দানা বাঁধিয়া থাকে।

অসহযোগ আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনে যে বিশেষ শক্তিসঞ্চার করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

৩.ঙ. ভারত ছাড়ো আন্দোলন—১৯৪২ (Quit India Movement—1942) : ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়ো আন্দোলন'কে ভারতের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী

১. ৪১-৪২ পৃষ্ঠা দেখ।

আন্দোলন বা মুক্তি-সংগ্রামের **শেষ পর্বের শেষ আভ্যন্তরীণ আন্দোলন** বলিয়া গণ্য করা যায়। আভ্যন্তরীণ আন্দোলন বলা হইতেছে এই কারণে যে, নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাঁহার আজাদ হিন্দ্ ফৌজের মাধ্যমে ভারতের বাহিরে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন পরিচালনা করেন ১৯৪৫ সালের আগষ্ট মাস অবধি, এবং ১৯৪৬ সালে রাজকীয় নৌবাহিনীর সৈনিকদের বিদ্রোহ ঠিক আন্দোলন-পর্যায়ভুক্ত না হইলেও উহা সাম্রাজ্যিক শক্তিকে আতংকিত করিয়া তুলিয়াছিল।

আন্দোলনের পটভূমি: ভারত ছাড়ো আন্দোলনের পটভূমিকা ক্রীপস্ মিশনের ব্যর্থতার উল্লেখ পূর্বে এক অধ্যায়ে করা হইয়াছে (১৬-১৭ পৃষ্ঠা)। অন্যান্য অনেকের মতই গান্ধীজীর মনেও ধারণা বদ্ধমূল হয় যে ইংরাজরা প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রক্ষার জন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় নাই—অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাদের সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য। তখন তিনি হরিজন পত্রিকায় 'ভারত ছাড়ো' (Quit India) একটি প্রবন্ধ লিখিয়া ইংরাজদের উদ্দেশ্য করিয়া বলেন: তোমরা ভারত ছাড়িয়া গেলেই সকল সমস্যার সমাধান হইবে—তোমাদেরও মংগল হইবে।

৪. গান্ধীনীতির প্রহেলিকা: একজন আধুনিক ভারতীয় লেখকের মতে, (ইংরাজের) **ভারত ছাড়ো**—এই দাবি গান্ধীনীতির প্রহেলিকার অন্যতম নিদর্শন। ইহা দ্বারা ইংরাজকে সাম্রাজ্যের লোভ ত্যাগ করিয়া যুদ্ধে জয়ী হইবার আহ্বান জানানো হইয়াছিল। আরও বলা হইয়াছিল, ভারত ছাড়ো কিন্তু সংগে লইয়া যাও ভারতের মিত্রতা।[১]

৪.১. ইহার ফল: ইংরাজ যে এই দাবি মানিয়া লইবে না তাহা গান্ধীজী এবং আর সকলেই অনুমান করিয়াছিলেন। তাই গান্ধীজী আর এক অহিংস আন্দোলনেরই পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু গান্ধীজী ও অন্যান্য নেতার গ্রেপ্তারে আন্দোলন সুরু হইল বটে, কিন্তু মোটেই অহিংস রহিল না। অপরদিকে লোকে বুঝিতে পারিল যে ব্রিটিশ দমননীতি কত নির্মম হইতে পারে। ইহার দরুনই জনসাধারণ দেশ হইতে সাম্রাজ্যবাদ উৎখাত করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল, যদিও বা মুসলিম লীগের সমর্থকগণ চাহিয়াছিল সাম্রাজ্যিক শক্তি বিদায়ের সংগে সংগে দেশের দ্বিখণ্ডন ও তাহাদের (মুসলমানদের মধ্যে লীগ-সমর্থকদের) আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার।

স্মর্তব্য

১. সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন ভারতীয় জাতীয়তাবাদেরই অন্যতম পর্যায় বা অধ্যায়।

২. ১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত হিসাবে গণ্য করা যায়।

৩ অবশ্য প্রথম যুগসূচক হিসাবে চিহ্নিত করিতে হয় (ক) ১৯০৫ সাল ও তৎপরবর্তী যুগের স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনকে।

---

১. V. P. Raghuvanshi: *Indian Nationalist Movement and Thought*

৪. পরবর্তী যুগসূচকসমূহ হইল (খ) হোমরুল আন্দোলন, (গ) অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০-২২), (ঘ) আইন অমান্য আন্দোলন (১৯৩০-৩১, ১৯৩২-৩৪) এবং (ঙ) ভারত ছাড়ো আন্দোলন (১৯৪২)।

৫. অসহযোগ আন্দোলন ছিল প্রথম প্রকৃত গণ-আন্দোলন, এবং আইন অমান্য আন্দোলন ছিল বৈপ্লবিক প্রকৃতির।

৬. অসহযোগ আন্দোলন ও আইন অমান্য আন্দোলন ছিল মূলত গান্ধীজীর আন্দোলন।

৭. ভারত ছাড়ো আন্দোলন যাহা ছিল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের শেষ অধ্যায় তাহা অনেকাংশে গান্ধীজীরই অবদান।

৮. ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ফলেই ভারতীয়গণ সাম্রাজ্যবাদ উৎখাত করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়।

অনুশীলনী

1. **Trace the objectives of Indian Nationalism since its genesis.**

শুরু হইতে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের লক্ষ্যের বিবরণ দাও। (৪৫-৫০ পৃষ্ঠা)

2. **Discuss the main types anti-imperialist struggle witnessed in India during the British rule.** (C. U. 1982 ; '84)

বিটিশ শাসনাধীনে ভারতে যে সব সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম হইয়াছিল তাহা আলোচনা কর। (৪৬-৫০ পৃষ্ঠা)

3. **What is meant by anti-colonial movement? Describe a few such Indian movements during the British period.**

সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন বলিতে কি বুঝায়? ব্রিটিশ আমলে এরূপ কয়েকটি ভারতীয় আন্দোলনের উল্লেখ কর। (৪৫-৫০ পৃষ্ঠা)

4. **Attempt an analysis of any *two* of the principal anti-imperialist movements in India.** (C. U. 1980)

ভারতে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্রধান প্রধান আন্দোলনগুলির মধ্যে যে কোন দুইটি বিশ্লেষণ কর। (৪৬-৫০ পৃষ্ঠা)

5. **What were the *objectives* of the non-co-operation movement?** (C. U. 1985)

অসহযোগ আন্দোলনের উদ্দেশ্য কি ছিল? (৪৮ পৃষ্ঠা)

6. **What is meant by the Home Rule Movement? What were its aims.** (C. U. 1983)

হোমরুল আন্দোলন কাহাকে বলে? ইহার উদ্দেশ্য কি কি ছিল? (৪৭-৪৮ পৃষ্ঠা)

৫

ভারতের সংক্ষিপ্ত শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস
(CONSTITUTIONAL HISTORY OF INDIA IN BRIEF)

"The various 'Constitutions' or constitutional projects of imperialism for India are not solutions, or even attempted solutions, of Indian problem. They are simply forms of the battle, successive stages and arenas of the battle between imperialism and nationalism. They are not even the main stage of the battle. ***The reality is the battle ; the ghost is the constitution***"

R. Palme Dutt

১. ঐতিহাসিক পরিক্রমার গুরুত্ব : যে-কোন দেশের শাসন-ব্যবস্থার অনুধাবনেই ঐতিহাসিক পরিক্রমার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হয়। ইহার উপর শাসন-ব্যবস্থা যদি বিবর্তনশীল প্রকৃতির হয়—অথাৎ বর্তমান শাসন-ব্যবস্থা যদি পূর্ববর্তী শাসন-ব্যবস্থার অল্পবিস্তর ক্রমবিকশিত রূপ বলিয়াই গণ্য হয় তবে ঐতিহাসিক পরিক্রমা হইয়া উঠে আরও গুরুত্বপূর্ণ। **স্বাধীন ভারতের সাধারণতান্ত্রিক** (বা প্রজাতান্ত্রিক) **শাসন-ব্যবস্থাকে মোটামুটি ব্রিটিশ আমলের শাসন-ব্যবস্থার নবপর্যায় বলিয়া অভিহিত করা চলে।** ফলে ইহার পর্যালোচনায় কিছুটা ঐতিহাসিক পটভূমিকার অবতারণা করা একরূপ অপরিহার্য বলিলেই চলে। নিম্নে এই ঐতিহাসিক পরিক্রমা প্রদান করা হইতেছে।

এখানে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের অন্তঃস্থলে একটি **মূলসূত্রের ধারাবাহিকতা** পরিলক্ষিত হয়। ইহা হইল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চাপসৃষ্টি করা এবং দফায় দফায় সুবিধাসুযোগ আদায় করিয়া লওয়া। এক দফা সুবিধা আদায়ের একটি আবার চাপ সৃষ্টি করিয়া সুবিধা আদায় করা। সুতরাং **চাপসৃষ্টি—সুবিধা আদায়—আবার চাপসৃষ্টি** (pressure—concessions—pressure) ছিল জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম পন্থা। কৌশলটি নরমপন্থী (Moderates), উগ্রপন্থী (Extremists) এবং গান্ধীপন্থী (Gandhians)—সকলেই প্রয়োগ করিয়া আসিয়াছেন। দেখা যায়, ইহাই বিভিন্ন শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে।[১]

২. ঐতিহাসিক পরিক্রমা (Historical Retrospect) : আধুনিক ভারতের দুই শতাব্দীর শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সহিত প্রায় সমপরিব্যাপ্ত। ইংরাজরা ভারতে আসিয়াছিল বাণিজ্য করিতে, কিন্তু ঘটনাচক্রে হইয়া পড়িল রাজদণ্ডের অধিকারী। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন ঘটে এবং ১৮৫৮ সালের মধ্যে একরূপ সমগ্র ভারতই আসে ব্রিটিশ অধিকারে

১. **Bipan Chandra :** ***Nationalism and Colonialism in Modern India***

ঐ সাল পর্যন্ত বণিক কোম্পানীই[১] ভারতে ব্যবসাবাণিজ্যের সহিত শাসনকার্য পরিচালনা করিত। অবশ্য শাসন অপেক্ষা শোষণই ছিল তাহাদের লক্ষ্য।

১৭৭৩ সাল অবধি ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট কোম্পানীর ভারত শাসন ব্যাপারে কোন হস্তক্ষেপ করে নাই। রাজকীয় সনদ (Royal Charters) দ্বারা প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে কোম্পানী যথেচ্ছভাবে শাসন পরিচালনা করিত। ভারতে কোম্পানীর কার্যের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান করিবার জন্য বিলাতে কোম্পানীরই **দুইটি সংস্থা** ছিল : (ক) মালিকদের কোর্ট (Court of Proprietors) এবং (খ) পরিচালকমণ্ডলীর সংস্থা (Court of Directors)। ইহাদের উপর কোন পার্লামেণ্টীয় নিয়ন্ত্রণ (Parliamentary control) ছিল না।

২.১. ১৭৭৩ ও তৎপরবর্তী সময় (১৭৭৩-১৮৫৮) : ১৭৭৩ সাল হইতে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট কোম্পানীর ভারত শাসন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে সুরু করে এবং এই পর্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে ১৮৫৮ সালে ভারত-শাসনভার কোম্পানী হইতে পার্লামেণ্টের নিকট হস্তান্তরিত হইলে।

২.২. রেগুলেটিং আইন : ১৭৭৩ সালে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট পাস করে রেগুলেটিং অ্যাক্ট (Regulating Act, 1773) বা নিয়ন্ত্রণকারী আইন। ইহা দ্বারা অন্যান্যের মধ্যে বাংলার শাসনভার একজন **স-পরিষদ** গভর্ণর-জেনারেল বা বড়লাটের (Governor-General-in-Council) হস্তে ন্যস্ত করা হয়। পরিষদের সদস্যসংখ্যা ছিল ৪। গভর্ণর-জেনারেলকে পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমতকে মান্য করিয়া চলিতে হইত। বাংলার গভর্ণর-জেনারেলকে বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর শাসনক্ষেত্রে কতিপয় ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের ভার দেওয়া হয়। ওয়ারেণ হেষ্টিংসই হইলেন প্রথম গভর্ণর-জেনারেল।

২.৩. ১৭৮৪ সালের আইন : এই আইন দ্বারাই কলিকাতায় একটি **সুপ্রীম কোর্ট** স্থাপিত হয়।

২.৪. বোর্ড অফ কণ্ট্রোল-এর প্রতিষ্ঠা : ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট অবলম্বিত পরবর্তী ব্যবস্থা হইল ১৭৮৪ সালের পিটের ভারত শাসন আইন (Pitt's India Act, 1784)।[২] পিটের ভারত শাসন আইনে কোম্পানীর শাসনকার্যের তত্ত্বাবধান করিবার জন্য একটি পার্লামেণ্টীয় সংস্থা স্থাপন করা হয়। ইহা সাধারণত **বোর্ড অফ কন্ট্রোল** (Board of Control) নামেই পরিচিত। ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের একজন সদস্য ছিলেন এই বোর্ডের সভাপতি একরূপ সর্বময় কর্তা। কোম্পানীর মালিক ও পরিচালকদের এই বোর্ডের আদেশনির্দেশ-নিয়ন্ত্রণ মানিয়া চলিতে হইত।

ভিটো ক্ষমতা ইহার পর এক বিশেষ আইনের দ্বারা গভর্ণর-জেনারেলকে তাঁহার

১. (ব্রিটিশ) ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী।

২. ঐ সময় পিট (Pitt the Younger) প্রধান মন্ত্রী ছিলেন বলিয়া আইনটি এইভাবে অভিহিত হয়।

পরিষদের (Executive Council) সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমতকে উপেক্ষা করিবার ক্ষমতা বা 'ভিটো ক্ষমতা' (Veto Power) দেওয়া হয়।[১]

৩. বিভিন্ন চার্টার আইন (The Charter Acts): ১৭৯৩-১৮৫৩—এই ৬০ বৎসরে কোম্পানী যে রাজকীয় সনদ বলে ভারতে ব্যবসাবাণিজ্য চালাইত ও ভারত শাসন করিত তাহার বহুবিধ পরিবর্তনসাধন করা হয়। চার্টার বা সনদ আইন সাধারণত ২০ বৎসরে নূতন করিয়া গঠন করা হইত। ১৭৯৩ সালের আইনে বিশেষ কিছু করা না হইলেও পরবর্তী ১৮১৩ সালের আইনে কোম্পানীর ব্যবসায়গত সুযোগসুবিধা বহু পরিমাণে হ্রাস করা হয় এবং ঘোষণা করা হয় যে কোম্পানীর ক্ষমতা ব্রিটিশ রাজশক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন।

৩.১. ১৮৩৩ সালের চার্টার আইনের গুরুত্ব: ১৮৩৩ সালের আইনে কোম্পানীর ব্যবসায়গত সুযোগসুবিধার বাকী অংশেরও বিলোপসাধন করা হয়। এবং **কোম্পানী হইয়া দাঁড়ায় সম্পূর্ণভাবে এক প্রশাসন-সংস্থা** (an administrative organisation)। বাংলার গভর্ণর-জেনারেলকে ভারতের গভর্ণর-জেনারেল (Governor-General of India) আখ্যা দেওয়া হয় এবং তাঁহার পরিষদে (Council) একজন আইন-সদস্য (a Law Member) নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়।[২] বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর সরকারদ্বয়ের এ-পর্যন্ত যে আইনবিষয়ক ক্ষমতা ছিল তাহা বাংলা সরকারের হস্তে অর্পণ করা হয়। ফলে **ভারতে প্রবর্তিত হয় এক এককেন্দ্রিক সরকার** (a unitary or centralised government)। ১৮৩৩ সালের চার্টার আইনের ইহাই হইল **ঐতিহাসিক তাৎপর্য**। আওরঙ্গজেবের পর ভারতে এরূপ ঘটনা এ-পর্যন্ত আর ঘটে নাই।[৩]

ভারতের জন্য আইন পরিষদ: ১৮৫৩ সালের বা পরবর্তী চার্টার আইনের বৈশিষ্ট্য হইল ভারতের জন্য এক আইন পরিষদের (a Legislative Council) ব্যবস্থা করা। যদিও ইহাতে কোন বেসরকারী সদস্যের স্থান ছিল না—যদিও কার্যত ইহা সম্প্রসারিত গভর্ণর-জেনারেলের পরিষদই ছিল তবুও কিন্তু ভারতের আধুনিক সাংবিধানিক ইতিহাসে এই ব্যবস্থাকে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলিয়া বর্ণনা করা যায়। কারণ, ইহা একক শাসন হইতে **বহুজন-শাসনের পথে পদসঞ্চারেরই লক্ষণ**।

৪. ব্রিটিশ রাজশক্তির নিকট ভারত-শাসনের হস্তান্তর (Transfer of Indian Administration to the British Crown): ভারতের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হইল যাহাকে ইংরাজরা সিপাহী বিদ্রোহ (Sepoy Mutiny, 1857) নামে

১, ঐ দাবি মানিয়া না লওয়া পর্যন্ত লর্ড কর্ণওয়ালিশ গভর্ণর-জেনারেল হইতে স্বীকৃত হন নাই— **Vincent Smith:** *The Oxford History of India*

২. প্রথম আইনসদস্য ছিলেন মেকলে (**Thomas Babington Macaulay**)।

৩. **Panikkar:** *The Foundations of New India*

অভিহিত করিয়াছেন, কিন্তু অনেকেই যাহাকে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রাম (First War of Independence against the British) আখ্যা দিবার পক্ষপাতী।[১] এই বিদ্রোহ হইল ভারতের (অপরিণত) **জাতীয়তাবাদেরই প্রকাশ**। যাই হোক, ইহার দরুন ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন-অধ্যায়ে সম্পূর্ণ ছেদ পড়ে। ইংরাজরা বুঝিতে পারে যে ভারতের শাসনভার আর কোম্পানীর হাতে রাখা যুক্তিযুক্ত হইবে না। তখন পাস করা হয় ১৮৫৮ সালের আইন। বলা হইয়াছিল, এই আইন হইল **অধিকতর উৎকর্ষমূলক ভারত শাসনের জন্য** (Act for the Better Government of India)।

৪.১. **ভারত-সচিব পদের সৃষ্টি** : এই আইন ব্রিটিশ রাজশক্তির নিকট ভারত-শাসনভার সরাসরি হস্তান্তরিত করা ছাড়াও স-পরিষদ ভারত-সচিব (a Secretary of State for India-in-Council) নামক একটি পদের সৃষ্টি করে। রাজশক্তির ক্ষমতা এই ভারত-সচিবের মাধ্যমেই প্রয়োগের ব্যবস্থা করা হয় এবং **স-পরিষদ গভর্ণর-জেনারেল ভারত-সচিবের অধীনে আনীত হন**।

৫. ভারতীয় আইনসভাসমূহের সম্প্রসারণ—১৮৬১-১৯০৯ (Growth of the Indian Legislatures—1861-1909) :

সিপাহী বিদ্রোহ বা ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের পর ইংরাজরা সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারে যে পুরাতন ঔপনিবেশিক পদ্ধতিতে ভারতকে আর শাসন করা যাইবে না—যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ দিন দিন দানা বাঁধিতেছে তাহার সার্থক মোকাবিলা করিতে হইলে পদ্ধতির পরিবর্তনসাধন করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যেই **আইন-প্রণয়ন পদ্ধতির কিছুটা গণতন্ত্রীকরণের** (democratisation) ব্যবস্থা করা হয়।

৫.১. **বেসরকারী সদস্য গ্রহণ ও প্রাদেশিক আইনসভা** : ১৮৬১ সালের ভারতীয় পরিষদ আইন (Indian Councils Act, 1861) দ্বারা আইন পরিষদে বেসরকারী সদস্য লওয়ার ব্যবস্থা করা হয়, এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক আইনসভাও[২] (Provincial Legislative Councils) সৃষ্ট করা হয়।

৫.২. **পরোক্ষ নির্বাচন-পদ্ধতি** : ১৮৯২ সালের আইন (Indian Councils Act, 1892) দ্বারা ক্ষমতা ও আয়তন—উভয় দিক দিয়াই কেন্দ্র ও প্রদেশগুলির আইনসভাসমূহের সম্প্রসারণ করা হয়। উপরন্তু, তত্ত্বগতভাবে আইন পরিষদের সদস্যগণ মনোনীত হইয়া আসিলেও কোন কোন শ্রেণীর বেসরকারী সদস্যের ক্ষেত্রে কার্যত পরোক্ষ নির্বাচন-পদ্ধতি অবলম্বিত হইতে থাকে।

৬. ১৯০৯ সালের ভারতীয় কাউন্সিল বা মর্লি-মিণ্টো সংস্কার আইন (The Indian Councils Act or Morley-Minto Reforms Act, 1909) :

১৮৯২ সালের আইন কাহাকেও সন্তুষ্ট

১. R. C. Majumdar and P. N. Chopra : *Main Currents of Indian History.*

২. তখন রাজ্যগুলিকে প্রদেশ (Provinces) বলা হইত।

করিতে পারে নাই। বিভিন্ন দিক হইতে ইহার বিরুদ্ধে সমালোচনা ছিল অতি সুস্পষ্ট ও তীব্র।

৬.১. **সমালোচনা** : প্রথমত, কংগ্রেস ইহার পুরাপুরি বিরোধিতা করে। দ্বিতীয়ত, ব্রিটিশ সরকারের প্রতি বিদ্বেষ ধূমায়িত হইতে থাকে এই কারণে যে দুর্ভিক্ষ ও প্লেগ (plague) ইত্যাদির ফলে ভারতীয়দের দুঃখদুর্দশা চরমে উঠিলেও ব্রিটিশ সরকার ইহার বিশেষ কোন প্রতিবিধানের প্রচেষ্টাই করে না। তৃতীয়ত, বংগদেশকে দ্বিখণ্ডিত করার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন চলিতে থাকে। ইহার ফলে উগ্রপন্থীরা সক্রিয় হইয়া উঠে। লোকমান্য বালগংগাধর তিলক (Lokmanya Bal Gangadhar Tilak) তীব্র আবেগের সহিত বলেন : "চোর যদি আমাদের ঘরে ঢুকিয়া পড়ে তাহা হইলে আমাদের কর্তব্য হইল তাহাদের আবদ্ধ করিয়া পুড়াইয়া মারা।"[১] ইহা ছাড়া বিপিন পাল ও লালা লাজপৎ রায় তীব্র ভাষায় বিদেশী সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনা করিয়া বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা করিতে থাকেন। বিভিন্ন পত্রপত্রিকাতেও ব্রিটিশরাজের সমালোচনা ভারতীয় আন্দোলনকে উৎসাহিত করে। চতুর্থত, লর্ড মিণ্টোর নেতৃত্বে ব্রিটিশ সরকার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে **সাম্প্রদায়িকতাকে উসকানি** দিতে থাকে। ইহার ফলেই মুসলমানদের পৃথক নির্বাচনের আন্দোলন গড়িয়া উঠে এবং **১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়**।

ইহা ব্যতীত ১৯০৫ সালের **স্বদেশী ও বয়কট** (boycott) আন্দোলন এবং ১৯০৫ সালের **রাশিয়ার বিপ্লব** ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে তীব্রতর করিতে থাকে।[২]

৬.২. **বিভেদসৃষ্টিতে ব্রিটিশ প্রচেষ্টা** : এই পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সরকার নরম-পন্থীদের (moderates) সমর্থন পাইবার প্রচেষ্টা চালাইতে থাকে এবং **স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে বানচাল** করিতে অগ্রসর হয়। লর্ড মর্লি এই নীতিকে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বলেন যে ভারতে তিন শ্রেণীর লোক রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে উগ্রপন্থীরা আমাদের এদেশ হইতে বিতাড়িত করিতে চাহে; দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা উপনিবেশগুলির অনুকরণে স্বাতন্ত্র্য ও স্বায়ত্তশাসন পাইতে চায়, এবং তৃতীয় শ্রেণীর লোকেরা মাত্র প্রশাসনের সহিত সংশ্লিষ্ট হইতে আগ্রহী। আমাদের লক্ষ্য হইবে বিভিন্ন সংস্কারের সাহায্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর নেতৃবৃন্দকে একজোট করা।

এইভাবে ব্রিটিশ সরকার শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তিত করিয়া স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে ঠেকাইয়া রাখিবার প্রচেষ্টা করে।[৩]

১. **"If thieves enter our house and we have not sufficient strength to drive them out, should we no without hesitation shut them up and burn them alive... ." Bal Gangadhar Tilak**

২. যথাক্রমে ৪৬-৪৭ ও ৩৫ পৃষ্ঠা।

৩. **"Thus 'cooperation in our administration', along the path of constitutional reforms, was the chosen method of imperialism by which it hoped to defeat the national claim of self-government." R. Palme Dutt : *India To-day***

এই পটভূমিকাতেই ব্রিটিশ সরকার ১৯০৯ সালের আইন প্রবর্তন করে। ভারত-সচিব লর্ড মর্লি (Lord Morley) এই প্রসংগে সুস্পষ্ট উক্তি করেন, **সংস্কারের দ্বারা কোনক্রমেই বুঝায় না যে ভারতে (সংসদীয়) শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা হইবে।**[১]

৬.৩. **১৯০৯ সালের আইনের অংগব্যবচ্ছেদ (Anatomy of 1909 Act):** এখন দেখা যাক, মর্লি-মিণ্টো শাসনসংস্কার বা ১৯০৯ সালের আইনের স্বরূপ কি ছিল।

ক। **আইন পরিষদ—গঠন-প্রকৃতি (Legislative Councils—Structural Nature):** এই সংস্কারমূলক আইনের দ্বারা ভারতীয়দের আইন পরিষদ ও প্রশাসনের সহিত সম্পর্কিত করার সীমাবদ্ধ প্রচেষ্টা করা হয়। কিছুটা নির্বাচনের ব্যবস্থাও ইহা দ্বারা করা হয়, যদিও এই নির্বাচন বিভিন্ন সম্প্রদায়, স্বার্থ ও শ্রেণী ভিত্তিক করা হয়।

প্রথমত, ১৯০৯ সালের আইনের দ্বারা আইন পরিষদগুলির (Legislative Councils) আয়তন বৃদ্ধি করা হয়। যেমন, কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে সদস্যসংখ্যাকে ১৬ হইতে বাড়াইয়া করা হয় অনধিক ৬০। বোম্বাই মাদ্রাজ বাংলা সংযুক্তপ্রদেশ (বর্তমানে উত্তর-প্রদেশ) বিহার ও উড়িষ্যার আইন পরিষদের সদস্যসংখ্যা বাড়াইয়া অনধিক ৫০ করা হয়। পাঞ্জাব ব্রহ্মপ্রদেশ[২] ও আসামের ক্ষেত্রে প্রাদেশিক পরিষদে সদস্যসংখ্যা হইবে অনধিক ৩০ জন। উপরি-উক্ত সদস্যগণ ব্যতীত **পদাধিকার বলে** (*ex-officio*) আরও সদস্য করার ব্যবস্থা হয়। এই সদস্যরা হইলেন শাসকপ্রধান ও তাঁহার পারিষদবর্গ, এমনকি কতিপয় ক্ষেত্রে—যেমন, মাদ্রাজ বোম্বাই ইত্যাদি প্রদেশগুলির আইন পরিষদে—এ্যাডভোকেট-জেনারেল পদাধিকার বলে সদস্য হইতেন।

দ্বিতীয়ত, পদাধিকারবলে সদস্যগণ ব্যতীত **তিন শ্রেণীর সদস্য** লইয়া প্রত্যেক আইন পরিষদ গঠন করার প্রস্তাব করা হয়। অর্থাৎ, আইন পরিষদ (ক) মনোনীত সরকারী কর্মচারী, (খ) বেসরকারী মনোনীত সদস্য এবং (গ) নির্বাচিত সদস্য লইয়া গঠিত হইবে।

খ। **কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ:** কেন্দ্রীয় বা সর্বোচ্চ আইন পরিষদে (Imperial Legislative Council) **সরকারী সদস্যদের প্রাধান্য** বা সংখ্যাগরিষ্ঠতা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। ফলে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ ৩৭ জন সরকারী সদস্য এবং ৩২ জন বেসরকারী সদস্য লইয়া গঠিত হয়। ৩৭ জন সরকারী সদস্যদের মধ্যে ২৮ জন গভর্ণর-জেনারেল কর্তৃক মনোনীত হইবেন এবং বাকী (৯ জন) সদস্যগণ হইবেন পদাধিকার বলে সদস্য। বেসরকারী ৩২ জন সদস্যদের মধ্যে ৫ জনকে গভর্ণর-জেনারেল মনোনীত

---

১. "If I were attempting to set up a parliamentary system in India or if it could be said that this chapter of reforms led directly or indirectly to the establishment of a parliamentary system in India, I for one would have nothing to do with it." Lord Morley : *Indian Speeches*

২. তখন ব্রহ্মদেশ ছিল ভারতের অংশ এবং অভিহিত ছিল ব্রহ্মপ্রদেশ নামে।

করিবেন এবং বাকী সদস্যগণ নির্বাচিত হইবেন। নির্বাচিত সদস্যরা আবার **বিভিন্ন সম্প্রদায়, শ্রেণী ও স্বার্থ** কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন। যেমন, কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে ৬ জন জমিদার, ৫ জন মুসলমান সম্প্রদায় এবং ১ জন মুসলমান জমিদার এবং ১ জন করিয়া বাংলা ও মাদ্রাজের বণিকসভা (the Bengal and Madras Chambers of Commerce) কর্তৃক নির্বাচিত হইতেন। নির্বাচিত সদস্যদের বাকী ১৩ জন নয়টি প্রাদেশিক আইন পরিষদের বেসরকারী সদস্যগণ কর্তৃক নিবাচিত হইয়া আসিতেন।

গ। **প্রাদেশিক আইন পরিষদ**: প্রাদেশিক আইন পরিষদগুলিতে অবশ্য **বেসরকারী সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ব্যবস্থা** করা হয়। যেমন, মাদ্রাজ আইন পরিষদে সদস্যদের মধ্যে ২৬ জন ছিলেন বেসরকারী সদস্য এবং ২১ জন সরকারী। ২১ জন সরকারী সদস্যগণের মধ্যে ছিলেন গভর্ণর, শাসন পরিষদের ৩ জন সদস্য এবং এ্যাডভোকেট-জেনারেল। ইহারা পদাধিকার বলে সদস্য হইতেন। বেসরকারী ২৬ জন সদস্যদের মধ্যে ৫ জন মনোনীত এবং ২১ জন নির্বাচিত হইতেন। আবার ২১ জন নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে ২ জন মুসলমান সম্প্রদায় কর্তৃক, ২ জন জমিদারগণ কর্তৃক, ৩ জন জমিদার ব্যতীত অন্যান্য ভূস্বামী কর্তৃক, ১ জন করিয়া সদস্য মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাজের বণিকসভা, মাদ্রাজের বিক্রেতা সম্প্রদায় ও রোপণ শিল্প সম্প্রদায় কর্তৃক এবং বাকী ৯ জন মিউনিসিপ্যাল পরিষদ, জিলা ও তালুক বোর্ড প্রভৃতি কর্তৃক নির্বাচিত হইতেন। বাংলার ক্ষেত্রে প্রায় অনুরূপ ব্যবস্থা ছিল—নির্বাচিত সদস্যদেরই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠতা।

তবে মনে রাখিতে হইবে, প্রাদেশিক আইন পরিষদগুলিতে বেসরকারী সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকিলেও সরকারী নিয়ন্ত্রণের বিশেষ অসুবিধা ছিল না। ইহার কারণ, সদস্যগণ বিভিন্ন সম্প্রদায় বা শ্রেণী কর্তৃক নির্বাচিত হওয়ার ফলে সংঘবদ্ধভাবে কার্য করিতে পারিতেন না। ইহা ছাড়া সরকার প্রাদেশিক আইন পরিষদগুলির যে-কোন সিদ্ধান্তকে বাতিল করিয়া দিতে পারিত। আবার মনোনীত বেসরকারী সদস্যগণ সরকারী সদস্যগণের সহিত একযোগে কার্য করিতেন; ফলে সরকারের পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাইতে বিশেষ অসুবিধা হইত না।

৬.৪. **আইন পরিষদগুলির কার্যাবলীর সম্প্রসারণ (Enlargement of the Functions of Legislative Councils)**: ১৯০৯ সালের আইনে আইন পরিষদগুলির কার্যাদি ও ক্ষমতা কিছুটা সম্প্রসারিত করা হয়। প্রথমত, সদস্যদের প্রশ্ন ও অনুপূরক প্রশ্নাদি (supplementary questions) করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। দ্বিতীয়ত, জনস্বার্থ বিষয়াদি সম্পর্কে সদস্যদের প্রস্তাব উত্থাপনের ক্ষমতা দেওয়া হয় এবং এই প্রস্তাবগুলির উপর ভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়। তৃতীয়ত, বেসরকারী সদস্যগণকে আয়ব্যয়ের উপর অধিক ক্ষমতা দেওয়া হয়। ইহারা সরকারী আয়ব্যয় সম্পর্কে প্রস্তাব উপস্থিত করিতে পারিতেন এবং উহার উপর ভোটগ্রহণের ব্যবস্থাও করা হয়। অবশ্য কতকগুলি ব্যয় ভোটযোগ্য (votable) বলিয়া বিবেচিত হইত না। অবশ্য

ভোটগ্রহণ করার ব্যবস্থা থাকিলেও ভারত সরকার যে-কোন ভোটকে অগ্রাহ্য করিতে পারিত। ইহা ব্যতীত কেন্দ্রের ক্ষেত্রে কতকগুলি বিষয়, যেমন সামরিক, বৈদেশিক ও প্রাদেশিক বিষয় সম্পর্কে কোন আলোচনার ক্ষমতা আইন পরিষদের ছিল না।

৬.৫. **শাসন পরিষদ (Executive Councils)** : শাসন পরিষদগুলি সম্পর্কেও কতকগুলি নূতন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। যেমন, **স-পরিষদ** ভারত-সচিব (Secretary of State-in-Council) মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এর শাসন পরিষদের সংখ্যা ২ হইতে বাড়াইয়া ৪ জন করিবার ক্ষমতা পান। বাংলার ক্ষেত্রে স-পরিষদ গভর্ণর-জেনারেল অনধিক ৪ জন সদস্যবিশিষ্ট শাসন পরিষদ গঠন করিতে সমর্থ ছিলেন। অবশ্য এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করিতে হইলে ভারত-সচিবের অনুমোদন প্রয়োজন হইত।

১৯০৭ সালেই ভারত সচিবের পরিষদে দুইজন ভারতীয়কে নিযুক্ত করার ব্যবস্থা করা হয়। ১৯০৯ সালে আবার গভর্ণর-জেনারেলের পরিষদে একজন ভারতীয়কে সদস্যরূপে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ১৯০৯ সালের আইনে গভর্ণরের পরিষদে ভারতীয়দের সংশ্লিষ্ট করার নীতি গৃহীত হয়।

৬.৬. **১৯০৯ সালের আইনের ত্রুটি** : ১৯০৯ সালের আইন নানাভাবে ত্রুটিপূর্ণ ছিল যদিও বা ইহা দ্বারা সীমাবদ্ধভাবে ভারতীয়দের সরকারী কার্যের সংগে সংশ্লিষ্ট করার প্রচেষ্টা হয়। প্রথমত, নির্বাচনের ব্যবস্থা ছিল পরোক্ষ—প্রত্যক্ষ নির্বাচনের দাবি প্রত্যাখ্যান করা হয়। দ্বিতীয়ত, সম্প্রদায় এবং স্বার্থ ও শ্রেণীর ভিত্তিতে নির্বাচন করার ব্যবস্থা হয়। তৃতীয়ত, ১৯০৯ সালের আইনের দ্বারা সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কানি দেওয়া হয়। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সংঘর্ষের বীজ বপন করা হয় এবং ইহার ভবিষ্যৎ পরিণতি দাঁড়ায় দেশদ্বিখণ্ডন।[১] চতুর্থত, আইন পরিষদগুলি এমনভাবে গঠিত করা হয় যাহার ফলে নির্বাচিত সদস্যদের মতামতের কোন মূল্যই থাকে না। পরিশেষে, ব্রিটিশ সরকারের ভারতের ভবিষ্যৎ কি হইবে না-হইবে তাহার কোন ইংগিতই এই আইনে দেওয়া হয় নাই।

৭. মণ্টফোর্ড শাসনসংস্কার এবং ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন (Montford Reforms and the Government of India Act, 1919) :

১৯০৯ সালের আইনের পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ শাসনতান্ত্রিক সংস্কার হইল মণ্টফোর্ড শাসনসংস্কার ও ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন। ১৯০৯ সালের আইন ভারতীয়দের কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। কারণ, ইহার দ্বারা স্বায়ত্তশাসনের অধিকার স্বীকৃত হয় নাই এবং শাসন-সংস্কারের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ইংগিতও

১. "... the **positive vice of the system of election** introduced by the Act of 1909 was that it provided, for the first time, for separate representation of the Muslim community and thus sowed the seeds of separation that eventually led to the lamentable partition of the country." D. D. Basu : *Introduction to the Constitution of India*

ঐ আইনে দেওয়া হয় নাই। কি কি প্রভাবের ফলে ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন পাস করা হয় তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই প্রসংগে দেওয়া যাইতে পারে।

৭.১. **১৯১৯ সালের শাসনসংস্কারের পটভূমি :** (১) ১৯০৯ সালের আইনে স্বায়ত্বশাসন কিংবা দায়িত্বশীল সরকার প্রবর্তিত করা হয় নাই। ইহার ফলে ভারতীয়দের মধ্যে অসন্তোষ বাড়িয়া যাইতে থাকে। (২) ১৯১৬ সালে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে চুক্তি হওয়ায় উভয় দলই যৌথভাবে স্বায়ত্তশাসনের জন্য সংগ্রাম করিবার দিকে ঝুঁকে। অবশ্য প্রসংগত উল্লেখ্য যে এই চুক্তিতে কংগ্রেস মুসলমানদের পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা স্বীকার করিয়া লয়—এমনকি মুসলমানদের অধিক আসন দেওয়ার দাবিও কংগ্রেস মানিয়া লয়। কংগ্রেসের ধারণা ছিল, যৌথ সংগ্রামের ফলে মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক মনোভাব হ্রাস পাইবে। পরবর্তী ঘটনাবলী কংগ্রেসের এই আশা ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত করে। (৩) ১৯১৫ সালে গোখেল ও দাদাভাই নৌরজীর মৃত্যুর ফলে কংগ্রেস চরমপন্থীদের হাতে চলিয়া যায় ও তাহারা স্বায়ত্তশাসনের জন্য সংগ্রাম করিতে থাকে। ইতিমধ্যে অ্যানি বেসান্ত ও তিলক **হোম রুল লীগ** (*Home Rule League*) স্থাপন করিয়া স্বায়ত্তশাসনের জন্য জোর আন্দোলন চালাইতে থাকেন। তিলক ঘোষণা করেন : 'হোম রুল বা স্বায়ত্তশাসন আমাদের জন্মগত অধিকার এবং ইহা পাইতে আমরা দৃঢ়সঙ্কল্প।'[১] বিশ্বযুদ্ধের (প্রথম বিশ্বযুদ্ধ—১৯১৪-১৮) অবস্থাকে বেসান্ত ও তিলক তাঁহাদের আন্দোলনের কাজে লাগাইতে থাকেন। পরিশেষে, ১৯১৭ সালে যুদ্ধ বিশেষ সংকটজনক অবস্থা ধারণা করে। এই অবস্থায় ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের সহযোগিতা পাইবার সকল প্রকার প্রচেষ্টা চালাইতে থাকে। ইহা ছাড়া **১৯১৭ সালের মার্চ মাসের রাশিয়ার বিপ্লব** ভারতীয় আন্দোলনকে উৎসাহিত করে।[২]

৭.২. **১৯১৭ সালের ঘোষণা :** উপরি-উক্ত পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ হইতে কমন্স সভায় ১৯১৭ সালের আগষ্ট মাসের ২০ তারিখে ভারত-সচিব মিঃ মণ্টেগু (Edwin Montagu) ব্রিটিশ নীতি সম্পর্কে এক ঘোষণা করেন। ব্রিটিশ সরকারের এই ঘোষণায় বলা হয় যে ভারতীয়দের ক্রমবর্ধমানমাত্রায় শাসনকার্যে সংশ্লিষ্ট করা হইবে। **ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশ হিসাবে** ভারতে স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান ক্রমশ প্রবর্তিত হইতে থাকিবে যাহাতে দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থা উত্তরোত্তর প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩] অবিলম্বে এই উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। অগ্রগতির সময় ও মাত্রা ব্রিটিশ ও ভারত সরকার স্থির করিবে।

এই ঘোষণা পরবর্তী সময়ে ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের প্রস্তাবনা হিসাবে যুক্ত করা হয়। ঘোষণাটির কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতে পারে।

---

১. "Home Rule is our birth right and we will have it." Tilak

২. R. Palme Dutt : *India To-day*

৩. "The policy of His Majesty's Government is that of increasing association of Indians in every branch of administration and the gradual development of self-governing institutions with a view to the progressive realisation of responsible government in India as an integral part of the British Empire." Edwin Montagu

ঘোষণাটির তাৎপর্য : (১) ভারতের শাসনকার্যে ভারতীয়দের অধিকমাত্রায় ক্রমশ সংশ্লিষ্ট করা হইবে। অবশ্য এইরূপ প্রতিশ্রুতি কোনও নূতন ব্যাপার নয়। বহুদিন হইতেই ঐ একই প্রতিশ্রুতি ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করিয়া আসিয়াছে।

(২) ঘোষণা বা প্রস্তাবনায় বলা হয় যে উত্তরোত্তর ক্রমপর্যায়ে অগ্রগতির মাধ্যমে ভারতে দায়িত্বশীল সরকার প্রবর্তিত করা হইবে। সুতরাং ১৯১৯ সালের অনুসারে শাসনসংস্কারের লক্ষ্য হইল দায়িত্বশীল সরকার প্রবর্তন করা।

(৩) প্রস্তাবনা বা ঘোষণায় দায়িত্বশীল সরকারের কথা বলা হইলেও স্বায়ত্তশাসনের দিকে অগ্রগতি কতটা হইবে না-হইবে এবং কোন সময় হইবে তাহা ব্রিটিশরাজ স্থির করিবে। সুতরাং ভারতীয়দের এ-সম্পর্কে কোন অধিকারই থাকিবে না। বিভিন্ন মহলে এই ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করা হয়।[১]

(৪) অগ্রগতির পূর্বশর্ত হইল যে ভারতীয়রা কিভাবে সহযোগিতা করিবে এবং কতদূর দায়িত্বশীলতা প্রদর্শন করিবে। ইহার অর্থ দাঁড়ায় যে ভারতীয়দের ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত শাসনসংস্কারের দায়িত্বের সহিত গ্রহণ ও কার্যকর করিতে হইবে। নতুবা ব্রিটিশরাজ শাসনসংস্কারের গতি বন্ধ করিয়া দিতে পারে।

যাই হোক, উপরি-উক্ত ঘোষণা ও নীতিকে কার্যকর করার উদ্দেশ্যে ভারত-সচিব মণ্টেগু (E. S. Montagu) এবং গভর্ণর-জেনারেল চেমসফোর্ড (Lord Chelmsford) প্রস্তাব রচনার ভারার্পণ করা হয়। তাহাদের প্রস্তাব অনুসারেই ১৯১৯ সালের আইন প্রণীত ও প্রবর্তিত হয়।

এখন দেখা যাক, ১৯১৯ সালের আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি।

৮. ১৯১৯ সালের আইনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য—প্রদেশগুলিতে দ্বৈত শাসন-ব্যবস্থা এবং আংশিক দায়িত্বশীলতা (Dyarchy and Partial Responsibility in the Provinces) :

আইনটির দ্বারা এই সর্বপ্রথম আংশিকভাবে দায়িত্বশীল সরকারের গোড়াপত্তন করা হয়। প্রথমত, ১৯১৯ সালের আইন অনুযায়ী প্রণীত নিয়মাবলীর সাহায্যে কেন্দ্র ও প্রদেশগুলির মধ্যে **শাসনসংক্রান্ত বিষয়সমূহকে ভাগাভাগি** করিয়া দেওয়া হয়। কতকগুলি বিষয় ছিল কেন্দ্রীয় এবং কতকগুলি বিষয় ছিল প্রাদেশিক (Central and Provincial Subjects)। অবশ্য মনে রাখিতে হইবে, প্রাদেশিক বিষয়সমূহ প্রত্যর্পিত নিয়মকানুন (Devolution Rules) দ্বারা কেন্দ্র কর্তৃক প্রদেশগুলির হস্তে প্রত্যর্পিত হয়।

৮.১. সংরক্ষিত ও হস্তান্তরিত ক্ষমতা : প্রদেশগুলির নিয়ন্ত্রণাধীন বিষয়সমূহ আবার দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছিল : সংরক্ষিত বিষয়সমূহ (Reserved Subjects) এবং হস্তান্তরিত বিষয়সমূহ (Transferred Subjects)। ইহার মধ্যে হস্তান্তরিত ক্ষমতাগুলি গভর্ণর মন্ত্রীদের সাহায্যে পরিচালিত করিতেন। মন্ত্রিগণকে প্রাদেশিক আইন পরিষদের (Legislative Council) নিকট **যৌথভাবে নয়,** পৃথক পৃথক ভাবে

১. See Tej Bahadur Sapru : *The Indian Constitution* (1926)

দায়িত্বশীল থাকিতে হইত।[১] অর্থাৎ, প্রত্যেক মন্ত্রীকে আইন পরিষদ অনাস্থা প্রকাশ করিয়া পদচ্যুত করিতে পারিত। আইন পরিষদের নির্বাচিত সদস্যসংখ্যা বাড়াইয়া ৭০ শতাংশ করা হয়। মন্ত্রিগণ গভর্ণর কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন এবং তাঁহাদিগকে আইন পরিষদের সদস্য হইতে হইত। **হস্তান্তরিত বিষয়গুলির ক্ষেত্রে** সাধারণত গভর্ণর মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুযায়ীই কার্য করিতেন, কিন্তু বিশেষ কারণ দেখা দিলে মন্ত্রীদের পরামর্শ অগ্রাহ্যও করিতে পারিতেন।

অপরদিকে সংরক্ষিত বিষয়গুলি গভর্ণর শাসন পরিষদের (Executive Council) মাধ্যমে পরিচালিত হইত। শাসন পরিষদের সদস্যগণ ব্রিটিশরাজ কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন। পরিষদের অন্তত একজন ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের (Indian Civil Service) মধ্য হইতে মনোনীত হইতেন। সরকারী কার্যে বেসরকারী ভারতীয়দের নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যেই শাসন পরিষদে ইংরাজদের নিযুক্ত করার ব্যবস্থা হয়।[২] **শাসন পরিষদ অবশ্যই ছিল একটি যৌথ সংস্থা।** ইহার সিদ্ধান্ত গভর্ণরকে বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ করিতে হইত। তবে প্রদেশের নিরাপত্তা, শান্তিশৃংখলা এবং স্বার্থের প্রশ্ন জড়িত থাকিলে গভর্ণর শাসন পরিষদের পরামর্শ বা সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিতেন।

৮.২. প্রাদেশিক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ শিথিলকরণ (Relaxation of Central Control over the Provinces): ইংগিত দেওয়া হইয়াছে যে, প্রত্যর্পণ সংক্রান্ত আইন (Devolution Rules) দ্বারা শাসন সংক্রান্ত বিষয়গুলিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়: **কেন্দ্রীয় বিষয়সমূহ** এবং **প্রাদেশিক বিষয়সমূহ।** প্রাদেশিক বিষয়সমূহের পরিচালন-ভার ন্যস্ত হয় প্রদেশগুলির হস্তে। সুতরাং শাসন, আইন-প্রণয়ন ও রাজস্ব প্রভৃতি ব্যাপারে প্রদেশগুলির হস্তে বিভিন্ন ক্ষমতা অর্পিত হয়। তবে প্রদেশগুলির ক্ষমতা নানাভাবে সীমাবদ্ধ করা হইয়াছিল। যেমন, ১৯১৯ সালের আইনে স্পষ্টতই বলা হইয়াছিল যে প্রদেশগুলির উপর তদারকি বা নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা ভারত সরকারের থাকিবে। স-পরিষদ গভর্ণর-জেনারেলের আদেশনির্দেশ প্রদেশগুলিকে মান্য করিয়া চলিতে হইবে। আইন-প্রণয়নের ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা হয়। প্রদেশগুলির নির্দিষ্ট বিষয়গুলির সম্পর্কে আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা থাকিলেও কেন্দ্রীয় আইনসভাকে যে-কোন বিষয় সম্পর্কে সর্ব-ভারতীয় আইন-প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। প্রাদেশিক আইন পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত বিলকে গভর্ণর এবং গভর্ণর-জেনারেল নাকচ করিয়া দিতে সমর্থ ছিলেন। কতকগুলি বিষয় সম্পর্কে গভর্ণর প্রাদেশিক বিলকে গভর্ণর-জেনারেলের বিচারবিবেচনার জন্য প্রেরণ করিতে পারিতেন, এমনকি **ব্রিটিশ রাজশক্তিও** (Crown) প্রাদেশিক আইন পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত বিলকে নাকচ করিয়া দিতে পারিত।

১. **Refer Tej Bahadur Sapru : *The Indian Constitution*, p. 91.**

২. **" ... it was considered necessary that with the introduction of non-officials into the government, there should be a counterpoise provided by an increase in the number of European members." Tej Bahadur Sapru**

সুতরাং দেখা যাইতেছে, বিশেষ সীমাবন্ধভাবে প্রদেশগুলিকে স্বাতন্ত্র্য প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

৮.৩. **কেন্দ্রীয় সরকার ও আইনসভা** (Central Government and Legislature) : কেন্দ্রে কোন **দায়িত্বশীল সরকার প্রবর্তন করা হয় নাই—** পূর্বের অবস্থাই অক্ষুণ্ণ রাখা হইয়াছিল। গভর্ণর-জেনারেলের শাসন পরিষদের সদস্যগণকে কেন্দ্রীয় আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল করা হয় নাই। আইনসভায় অনাস্থাসূচক প্রস্তাব পাস হইলেও ইঁহাদের কিছু আসিয়া যাইত না। ইঁহারা ভারত-সচিব এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিকট দায়িত্বশীল ছিলেন।

৮.৪. **গঠন-প্রকৃতি** : যাই হোক, একথা বলা যায় যে কেন্দ্রীয় আইনসভার গঠনকে অধিকতর মাত্রায় প্রতিনিধিমূলক করিবার প্রয়াস করা হয়। কেন্দ্রীয় আইনসভাকে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট করা হয়। দুইটি কক্ষের মধ্যে নিম্নতর কক্ষ হইল **বিধানসভা** (Legislative Assembly)। ইহার মোট সদস্যসংখ্যা ১৪৪ জনের মধ্যে ১০৪ জন সদস্য নির্বাচিত হইতেন। অপরপক্ষে উচ্চতর কক্ষ **রাষ্ট্রীয় পরিষদের** (Council of State) মোট সদস্যসংখ্যা ছিল ৬০ জন। উহার মোট সদস্যদের মধ্যে ৩৪ জন সদস্য নির্বাচিত হইতেন। উভয় কক্ষই সমান ক্ষমতা ভোগ করিত। তবে বাজেট ও ব্যয় অনুমোদনের ক্ষেত্রে ক্ষমতা একমাত্র বিধানসভাই ভোগ করিত।

সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে সদস্য নির্বাচন : অবশ্য মনে রাখিতে হইবে যে সদস্য নির্বাচন সাম্প্রদায়িক ও বিভিন্ন স্বার্থের ভিত্তিতে করা হইত। যেমন মুসলমান, শিখ, ইংগ-ভারতীয়, ইংরাজ, খৃীষ্টধর্মাবলম্বী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক পৃথক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা হয়। ইহার ফলে সাম্প্রদায়িকতা সম্প্রসারিত হয়।

৮.৫. **আইনসভার ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা** : ইহা ছাড়া কেন্দ্রীয় আইনসভা গভর্ণর-জেনারেলের হস্তে ন্যস্ত কতকগুলি ক্ষমতার দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল :

(১) আইনের প্রস্তাব বা বিল সম্পর্কে গভর্ণর-জেনারেলের হস্তে **সার্টিফিকেট প্রদানের ক্ষমতা** (power of certification) ন্যস্ত করা হয়। এই ক্ষমতাবলে গভর্ণর-জেনারেল ব্রিটিশ ভারতের নিরাপত্তা ও শান্তি ক্ষুণ্ণ হইবে এই অজুহাতে আইনসভার যে কোন বিলের আলোচনা বন্ধ বা বাতিল করিতে সমর্থ ছিলেন। অপরপক্ষে আবার আইনসভা কোন বিল উত্থাপনে বাধা দিলে বা বাতিল করিয়া দিলে গভর্ণর-জেনারেল ঐ বিলকে সার্টিফিকেটের সাহায্যে পাশ করিতে পারিতেন। স্যার তেজ বাহাদুর সপ্রু (Sir Tej Bahadur Sapru) এই ক্ষমতা সম্পর্কে উক্তি করেন যে, ইহা দায়িত্বশীল সরকারের অগ্রগতির সংগে অসংগতিপূর্ণ বলিয়াই মনে হয়।[১]

---

১. "Such a large measure of the power of certification...is altogether incompatable, even in the present stage of transition with the progress of the Legislature towards Responsible Government." Sir Tej Bahadur Sapru : *The Indian Constitution* (1926), op. cit.

(২) কতকগুলি বিষয় সম্পর্কে বিল উত্থাপন করিতে হইলে **গভর্ণর-জেনারেলের পূর্বানুমোদন** (prior approval) প্রয়োজন হইত।

(৩) গভর্ণর-জেনারেল আইনসভা কর্তৃক গৃহীত যে-কোন বিলকে নাকচ করিয়া দিতে পারিতেন। আবার আইনসভা কর্তৃক পাস করা যে-কোন বিলকে রাজশক্তির (Crown) বিবেচনার জন্য ধরিয়া রাখিতে পারিতেন। রাজশক্তিও ইচ্ছা করিলে ঐ বিলকে নাকচ করিয়া দিতে পারিতেন। রাজশক্তির এই ভিটো প্রদানের ক্ষমতার তাৎপর্য হইল যে ইহার দ্বারা সাম্রাজ্যবাদী ইংল্যাণ্ডের স্বার্থকে সুরক্ষিত করা।[১]

(৪) পরিশেষে, গভর্ণর-জেনারেল জরুরী অবস্থায় ভারতের শান্তি ও সুশাসনের উদ্দেশ্যে **অর্ডিনান্স (ordinace)** জারি করিতে সমর্থ ছিলেন।

৯. মূল্যায়ন : ইতিপূর্বেই ১৯১৯ সালের আইনের কতকগুলি ত্রুটির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। আরও দু'একটি ত্রুটিপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতে পারে।

ক। কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের ব্যাপকতা : যদিও প্রদেশগুলির হস্তে কিছু কিছু ক্ষমতা প্রত্যর্পণ এবং যদিও হস্তান্তরিত ক্ষমতাগুলি মন্ত্রীদের দ্বারা পরিচালনার ব্যবস্থা করা হয় তবুও কিন্তু ১৯১৯ সালের আইন দ্বারা এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থা চালু রাখা হয় এবং কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণকে সংরক্ষিত করা হয়। প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যের বিশেষ গুরুত্ব বা তাৎপর্য ছিল না।

ভারতের শাসন-ব্যবস্থার প্রধান স্তম্ভ ছিলেন গভর্ণর-জেনারেল এবং তাহার মাধ্যমে ভারত-সচিব ও ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট তাহাদের দায়দায়িত্ব পালন ও ক্ষমতা প্রয়োগ করিতেন।[২] আবার **গভর্ণর-জেনারেল নিজেই স্থির করিতেন বিশেষ বিষয়টি প্রদেশাধীন বা কেন্দ্রাধীন।** কতকগুলি বিষয় সম্পর্কে বিল প্রাদেশিক আইনসভায় উত্থাপন করিতে হইলে গভর্ণর-জেনারেলের অনুমোদন প্রয়োজন হইত।

খ। দ্বৈত শাসন-ব্যবস্থার ত্রুটি : দ্বৈত শাসন-ব্যবস্থা, নানা দিক হইতে বিশেষভাবে সমালোচিত হয়। (১) সংরক্ষিত ও হস্তান্তরিত বিষয়গুলির মধ্যে সুস্পষ্ট সীমারেখা ছিল না ; ফলে মন্ত্রীদের পক্ষে হস্তান্তরিত বিষয়গুলি পরিচালিত করিতে অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইত। (২) রাজস্বসংক্রান্ত বিষয় ছিল সংরক্ষিত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত এবং রাজস্ব বিভাগ পরিচালিত হইত একজন কাউন্সিলর (a Councillor) দ্বারা। অপরপক্ষে উন্নয়নমূলক কার্যাদি ছিল মন্ত্রীদের ক্ষমতাধীন ; কিন্তু অর্থের অভাবে এই বিষয়গুলিকে কার্যকর করা মন্ত্রীদের পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব ছিল। কারণ, অর্থ-

১. **"This power of veto vested in the Crown should not be treated as a mere constitutional symbol of the supremacy of the Crown, but as a power of great value enabling the Crown to protect Imperial interests." Sir Tej Bahadur Sapru**

২. **"... it is through the Governor-General in Council that the Secretary of State and ultimately Parliament, discharged their responsibilities for the peace, order and good government of India." Report of the Joint Parliamentary Committee : Simon Commission Report Vol. I**

বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কাউন্সিলরের বিবেচনার উপর নির্ভর করিতে হইত। মন্ত্রীদের অনেক প্রস্তাবই অর্থের অভাবের দরুন প্রত্যাখ্যাত হইত। (৩) মন্ত্রীদের নীতি-নির্ধারণের ক্ষমতা (policy-making power) থাকিলেও নীতি কার্যকর করার ভার ন্যস্ত ছিল পদস্থ সরকারী কর্মচারীদের হস্তে। এই সকল **পদস্থ কর্মচারীদের দায়ী থাকিতে হইত ভারত-সচিবের নিকট**। কর্মচারীরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ছিলেন ইংরেজ। ইহারা মন্ত্রীদের বিশেষ গুরুত্ব দিতেন না এবং প্রয়োজন হইলে গভর্ণরের নিকট সোজা চলিয়া যাইতে পারিতেন। মন্ত্রীদের সংগে মতভেদ হইলে কর্মচারীদের মতই প্রাধান্য লাভ করিত।[১] এই অবস্থায় মন্ত্রীদের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে কাজ করা সম্ভব ছিল না—এমনকি পদস্থ কর্মচারীরা মন্ত্রীদের অমান্য করিয়া চলিলেও তার কোন প্রতিবিধানের উপায় ছিল না। বস্তুত, অনেক ক্ষেত্রে পদস্থ কর্মচারীরাই নীতি নির্ধারণ করিতেন।

গ। বিভক্ত করিয়া শাসন করার ব্রিটিশ নীতি: 'বিভক্ত করিয়া শাসন কর' (Divide and Rule) এই নীতিকে অব্যাহত রাখা হয়। আইনসভাগুলিতে সম্প্রদায়, শ্রেণী ও স্বার্থের ভিত্তিতে নির্বাচন করার ব্যবস্থাকে প্রসারিত করা হয়।

উপসংহার : মোটকথা, ১৯১৯ সালের আইনে যে প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য ও দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছিল—এই দাবি প্রহসন ভিন্ন আর কিছুই নয়। ঐতিহাসিক বিচারে এইরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। ভারতীয়রা, এমনকি সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজরাও, দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করে।[২]

---

১০. ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন প্রবর্তনের পূর্ববর্তী ঘটনাবলী: ১৯১৯ সালের আইন প্রবর্তনের ব্যাপারে প্রথমে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়।

প্রতিক্রিয়া: নরমপন্থীরা (Moderates) এই আইনকে মোটামুটিভাবে স্বাগত জানায়। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ১৯১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত বার্ষিক অধিবেশনে ১৯১৯ সালের আইনকে অসন্তোষজনক বলিয়া ঘোষণা করিলেও ঐ আইনকে কার্যকর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ইহার পর কতকগুলি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটায় কংগ্রেস ১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে অসহযোগ আন্দোলন এবং কাউন্সিলগুলিকে বয়কট করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এইভাবে কংগ্রেস অসহযোগ আন্দোলন ও আইন অমান্য আন্দোলনের মধ্য দিয়া ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে বদ্ধপরিকর হয়।

১০.১. রাওলাট, কার্জন, জালিয়ানওয়ালাবাগ, ইত্যাদি: যে-সকল ঘটনাবলীর জন্য সংগ্রামের সূত্রপাত হয় তাহাদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করিতে হয় পূর্বোক্ত

১. "Nothing could be more irritating and humiliating to a minister than to see his subordinates take an appeal against his decision to the Governor and get it reversed" K. V. Punniah: *The Constitutional History of India*, pp. 187-88

২. "Dyarchy was universally condemned, not only by Indian opinion but also after a few years' experience by ruling imperialist opinion.... The 'responsibility' of the Indian Ministers was admittedly a farce" R Palme Dutt: *India To day*

(৪০ পৃষ্ঠা) ১৯১৯ সালের **রাওল্যাট আইন (Rowlatt Act)**। ব্রিটিশরাজ এই আইন পাস করে ভারতীয় আন্দোলনকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে। এই আইনের বিরোধিতা করিয়া ১৯১৯ সালের এপ্রিল মাসে গান্ধীজী হরতালের ডাক দেন। রাওল্যাট বিলের বিরুদ্ধে পাঞ্জাবে আন্দোলন ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়ে। সরকার ডাঃ সত্যপাল ও ডাঃ কিচলুকে বহিষ্কারের আদেশ দেয় এবং গান্ধীজীকে ৯ই এপ্রিল আটক করা হয়। ইহার ফলে জনগণের মধ্যে বিক্ষোভ ছড়াইয়া পড়ে এবং শোভাযাত্রা ও সভাসমিতি করিয়া আন্দোলন চালানো হয়। ব্রিটিশ সরকার তখন মরিয়া হইয়া উঠে, এবং ১৯১৯ সালের এপ্রিল মাসের ১৩ই তারিখে অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগের জনসাধারণের মিটিং-এর উপর জেনারেল ডায়ারের (General Dyer) আদেশক্রমে গুলি চালানো হয়। ইহার ফলে বহুলোক হতাহত হয়। মহাত্মা গান্ধী ইহার প্রতিবাদ করেন এবং দাবি করেন সরকারকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

১০.২. **অসহযোগ আন্দোলন** : সরকার এই দাবি মানিয়া লইতে অস্বীকার করিলে ১৯২০ সালে গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলনের দিকে ঝুঁকেন। ইহার সহিত সংযুক্ত হয় **খিলাফৎ আন্দোলন (The Khilafat Movement)**। ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায় তুরস্কের (Turkey) সুলতানকে প্রধান ধর্মীয় খলিফা (Khalifa) গণ্য করিত যুদ্ধের পর মিত্রশক্তিরা তুরস্ককে বিভক্ত করে (১৯২০ সাল)। ইহার ফলেই সূত্রপাত হয় খিলাফৎ আন্দোলনের। গান্ধীজী আন্দোলনকে সমর্থন জানান এবং অসহযোগ আন্দোলনে মুসলমানদের যোগদানে উৎসাহিত করেন। সুতরাং **দুইটি ঘটনা**—জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড ও খিলাফৎ আন্দোলন—**কংগ্রেসকে আন্দোলনের মুখে ঠেলিয়া দেয়।**

১০.৩. **চৌরি চৌরা** : ১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে নাগপুর অধিবেশনে ঘোষণা করা হয় যে ভারতের লক্ষ্য হইল স্বরাজপ্রাপ্তি (attainment of Swaraj)। ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের ৫ই তারিখে যুক্তপ্রদেশের (United Provinces) চৌরি চৌরাতে (Chauri Chaura) হিংসাত্মক আকার ধারণ করায় গান্ধীজী আইন অমান্য বা অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করিয়া লন।[১] ইহাতে অবশ্য বিভিন্ন মহলে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। এই আন্দোলন বন্ধ হওয়ার পর স্বরাজ্য দল (Swarajya Party) কাউন্সিলগুলিতে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

১১. সাইমন কমিশন (Simon Commission) : ১৯২৭ সালে ভারতীয় আন্দোলনের গতি মন্থর হইয়া পড়ে। ঐ সালেই কিন্তু ব্রিটিশ সরকার ভারতে তথ্যানুসন্ধানের জন্য একটি বিধিবদ্ধ কমিশন নিয়োগের কথা ঘোষণা করে। কমিশন ৭ জন সদস্য লইয়া গঠিত হয় এবং ইহার চেয়ারম্যান ছিলেন স্যার জন সাইমন (Sir John Simon)। তাই এই কমিশন সাইমন কমিশন (Simon Commission) নামেই পরিচিত। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, কমিশন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ৭ জন

১. ৫১ পৃষ্ঠা দেখ।

শ্বেতকায় সদস্য লইয়া গঠিত হয়—**ইহাতে কোন ভারতীয়কে লওয়া হয় নাই।** স্বভাবতই ভারতীয়রা ইহাকে সুনজরে দেখে নাই। বস্তুত, এই কমিশনকে ভারতের পক্ষে অপমানজনক সংস্থা বলিয়াই গণ্য করা হইয়াছিল। ফলে যখন ১৯২৮ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে কমিশন ভারতে পদার্পণ করে তখন ইহার বিরুদ্ধে **হরতাল** ও **বিক্ষোভ** প্রদর্শন করা হয়। লাঠিচালনা করিয়া এই বিক্ষোভকে ভাঙিয়া দেওয়া হয়।

১১.১. কমিশনের সুপারিশ : যাই হোক, **১৯৩০ সালে** সাইমন কমিশন যে-সকল সংস্কারের সুপারিশ করে তাহা সংক্ষেপে হইল এইরূপ : (ক) প্রদেশগুলিতে দ্বৈত শাসন-ব্যবস্থার অবসান ঘটাইয়া মন্ত্রীদের সকল বিষয় সম্পর্কে দায়িত্বশীল করিতে হইবে। কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের এবং সংরক্ষিত বিষয়সমূহ সংক্রান্ত শাসন বিভাগগুলির অবসান করিতে হইবে। (খ) কতকগুলি বিষয় সম্পর্কে—যেমন, প্রদেশের শান্তিশৃংখলা রক্ষা, সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সংরক্ষণ প্রভৃতি—বিশেষ ব্যবস্থা (safeguards) অবলম্বন করিতে হইবে। (গ) এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থা ভারতের পক্ষে অকাম্য এবং **যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা যুক্তিযুক্ত** বলিয়া বিভিন্ন বিষয় কেন্দ্র ও প্রদেশগুলির মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতে হইবে। (ঘ) ভোটাধিকারকে কিছুটা সম্প্রসারিত করিতে হইবে—অন্তত ১০ শতাংশ হইতে ১৫ শতাংশ করিতে হইবে, যদিও বা **সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচন** অনুষ্ঠিত হইবে। ইহা ছাড়াও অন্যান্য কতকগুলি সুপারিশও ছিল।

১২. নেহরু কমিটি কর্তৃক রচিত সংবিধানের খসড়া :

ইতিমধ্যে ব্রিটিশ শাসকদের চ্যালেঞ্জ (challenge) যে ভারতীয়েরা ঐক্যবদ্ধভাবে কোন সংবিধান রচিতে পারিবে না তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিবার জন্য ভারতীয়েরা নিজেরাই সংবিধান রচনার দিকে অগ্রসর হয়। ১৯২৮ সালে **সর্বদলীয় সম্মেলন** (All-Parties Conference) আহ্বান করা হয়। এই সম্মেলনে সংবিধান রচনার জন্য মতিলাল নেহরুর সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির অন্যান্য সদস্যের মধ্যে ছিলেন স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু, স্যার আলি ইমাম, এম. এস. এ্যানি, সুভাষচন্দ্র বসু, জওহরলাল নেহরু প্রভৃতি। কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ডোমিনিয়ন-মর্যাদাকেই লক্ষ্য বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন (Dominion Status)। অপরপক্ষে কিন্তু জওহরলাল নেহরু ও সুভাষচন্দ্র বসুর দাবি ছিল যে **সম্পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতাই** (Full National Independence) হইবে ভারতের লক্ষ্য।

১২.১. নেহরু রিপোর্টের সুপারিশ : নেহরু রিপোর্টের সুপারিশসমূহ সংক্ষেপে হইল : (ক) ভারতকে পূর্ণ ডোমিনিয়ন মর্যাদা দিতে হইবে : (খ) **কেন্দ্র** ও **প্রদেশগুলিতে দায়িত্বশীল সরকার** গঠন করিতে হইবে। এই দায়িত্বশীলতা হইবে যৌথ প্রকৃতির। (গ) কেন্দ্রে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা থাকিবে আর প্রদেশগুলির আইনসভা হইবে এককক্ষবিশিষ্ট। কেন্দ্রের নিম্নতন কক্ষ এবং প্রদেশগুলির আইনসভার সদস্যগণ প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হইবেন। (ঘ) যুক্তরাষ্ট্রীয় ভিত্তিতে কেন্দ্র এবং প্রদেশগুলির মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করিতে হইবে। অবশিষ্ট

ক্ষমতা কেন্দ্রের হস্তে থাকিবে। (ঙ) কতকগুলি মৌলিক অধিকার সংবিধানভুক্ত করিতে হইবে। (চ) সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থার অবসান ঘটাইয়া **যৌথ নির্বাচনের** (joint electorates) **ব্যবস্থা** করিতে হইবে। (ছ) একটি **সুপ্রীম কোর্ট** স্থাপন করিতে হইবে যাহা হইবে সর্বোচ্চ আপিল আদালত।

এই রিপোর্ট লইয়া সুভাষচন্দ্র বসু ও জওহরলাল নেহরুর সহিত অন্যান্যদের মতবিরোধ ঘটে। বসু এবং নেহরু ডোমিনিয়ন মর্যাদার বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করেন ; তাঁহারা চাহিয়াছিলেন ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা। শেষ পর্যন্ত ১৯২৮ সালের কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় যে যদি ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে নেহরু রিপোর্ট ব্রিটিশ সরকার গ্রহণ না করে তবে কংগ্রেস অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে নামিবে।

ইংরাজরা ডোমিনিয়ন মর্যাদা প্রদানের ব্যাপারে টালবাহনা করিতে থাকে। ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে **লাহোরে** কংগ্রেসের অধিবেশন বসে। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জওহলাল নেহরু। অধিবেশনে **'পূর্ণ স্বাধীনতা'র** (complete independence) প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।[১]

ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের দাবিতে কর্ণপাত না করায় ১৯৩০ সালে সুরু হয় **আইন অমান্য আন্দোলন** (Civil Disobedience Movement)। ১৯৩০ সালের ১২ মার্চ মহাত্মা গান্ধী লবণ আইন ভংগ করিবার জন্য **ডাণ্ডি অভিমুখে পদযাত্রা** (Dandi March) সুরু করেন।

১২.২. গোল টেবিল বৈঠক : এদিকে সারা দেশ আইন অমান্য আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়ে। এই আন্দোলন চলাকালেই ইংল্যাণ্ডে গোল টেবিল বৈঠকের (Round Table Conference) ব্যবস্থা করা হয়। ইহাতে কংগ্রেসের কোন প্রতিনিধি যোগদান করে না। এই বৈঠকে স্থির হয় যে, ভারতে **যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা** প্রবর্তিত হইবে, প্রদেশগুলিতে কতকগুলি সর্তসাপেক্ষে ও কেন্দ্রে আংশিকভাবে **দায়িত্বশীল সরকার** গঠিত হইবে।

১২.৩. দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠক : ইহার পর কংগ্রেস যাহাতে পরবর্তী গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করে তাহার জন্য ভাইসরয় (Viceroy) প্রচেষ্টা চালান। যাহাতে একটি রফা হয় তাহার জন্য ডাঃ জয়াকর ও স্যার তেজবাহাদুর সপ্রুও প্রচেষ্টা করতে থাকেন। অবশেষে মহাত্মা গান্ধী এবং লর্ড আরউইনের (Lord Irwin) মধ্যে একটা চুক্তি সম্পাদিত হয়। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে আইন অমান্য আন্দোলনকে স্থগিত রাখা হয় এবং গান্ধীজী দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। কিন্তু এই বৈঠকও বিশেষ ফলপ্রসূ হয় না। বরং ইহাতে সাম্প্রদায়িকতার প্ররোচনা দানের মাধ্যমে ভারতীয়দের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির প্রচেষ্টা চলে। স্বভাবতই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের

---

১. **স্মর্তব্য :** এই লাহোরেই ১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চ তারিখে **মুসলিম লীগ পাকিস্তান গঠনের প্রস্তাব** গ্রহণ করে। সুতরাং লাহোরই হইল স্বাধীন ভারত ও স্বতন্ত্র পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য সংকল্পের প্রসূতি।

দাবিদাওয়ার মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করা সম্ভবপর হয় না। মুসলমানরা বাংলা পাঞ্জাব আসাম বোম্বাই মাদ্রাজ সংযুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি প্রদেশগুলিতে আসন বণ্টনের ক্ষেত্রে সুবিধা পাইতে চায়। অনুরূপ সুবিধা শিখ, তফশীলী বর্ণসমূহ এবং ইয়োরোপীয় বা ইংরাজ-সম্প্রদায়ও দাবি করে। এইভাবে সাম্প্রদায়িক সমস্যা মাথা চাড়া দিয়া উঠে এবং উহার কোন সমাধান হয় না।

১২.৪. সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা : দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকের পর যখন দেখা গেল যে সাম্প্রদায়িক সমস্যার কোন ফয়সালা হইল না তখন ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী **র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড** (Ramsay Macdonald) আইনসভায় সদস্য বণ্টনের এক বাটোয়ারার ব্যবস্থা করেন। এই বাটোয়ারা অনুসারে প্রদেশগুলির আইনসভায় মুসলমান, শিখ, ভারতীয় খৃষ্টান, ইংগ-ভারতীয়, নারীদের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা থাকিবে। শ্রম, ব্যবসায়, শিল্প, জমিদার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যও পৃথক নির্বাচনক্ষেত্রের এবং নির্দিষ্ট আসনের ব্যবস্থা করা হয়। মারাঠাদের জন্য বোম্বাই প্রদেশে ৭টি আসন সংরক্ষিত করিবার সিদ্ধান্ত করা হয়। অনুন্নত শ্রেণীর (the Depressed Classes) জন্য দুইটি ব্যবস্থা করা হয় : (ক) অনুন্নত শ্রেণীর লোকেরা আলাদা বিশেষ নির্বাচন-কেন্দ্র হইতে নির্দিষ্টসংখ্যক সদস্য নির্বাচিত করিতে পারিবে ; (খ) আবার সাধারণ নির্বাচনক্ষেত্রেও ভোট প্রদানের অধিকার পাইবে।

এই **বাটোয়ারার বিরুদ্ধে আন্দোলন** গড়িয়া উঠে। বলা হয় যে, এই বাটোয়ারায় হিন্দুদের প্রতি অবিচার করা হইয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা হইয়াছে। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ হইল যে ইংরাজরা এই বাটোয়ারা দ্বারা নিজেদের স্বার্থে সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দিয়াছে।[১] কারারুদ্ধ গান্ধীজী ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া জেলে আমরণ অনশন সুরু করেন। অবস্থা চরমে উঠিবার পর গান্ধীজীকে বিনা সর্তে মুক্তি দেওয়া হয়।

১২.৫. পুণা চুক্তি : ইহার পর অনুন্নত শ্রেণীর নেতা ডাঃ আম্বেদকরের সহিত পুণায় এক চুক্তি সম্পাদিত হয়। পুণা চুক্তি (Poona Pact) অনুযায়ী **অনুন্নত শ্রেণীর জন্য অধিক আসনের ব্যবস্থা** হয় কিন্তু **পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থাকে পরিহার** করা হয়। ব্রিটিশ সরকার এই পুণা চুক্তিকে মানিয়া লয়।

১২.৬. তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠক : তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠক বসে ১৯৩২ সালের ১৭ই নভেম্বর হইতে ২৪শে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত। এই বৈঠকে সংরক্ষণশীল ও সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের আহ্বান করা হয়। কংগ্রেস ইহাতে কোন অংশ গ্রহণ করে না। ১৯৩৩ সালের মার্চ মাসে ব্রিটিশ সরকার উহার **প্রস্তাবসম্বলিত একটি শ্বেতপত্র** (The White Paper) প্রকাশ করে। উহাকে ১৯৩৩ সালের এপ্রিল মাসে ব্রিটিশ

১. "... Communal Award was regarded as a clever device to rule India by dividing Indians and creating more and more dissensions among them." Dr R. N. Aggarwala

পার্লামেণ্টের এক যুক্ত সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। এই **কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতেই পাস করা হয় ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন।**

এখন এই ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনেরই সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করা হইতেছে।

১৩. ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন (The Government of India Act, 1935): প্রাদেশিক ক্ষেত্রে দ্বৈত শাসন-ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত ও অন্যান্য ত্রুটি দিনের পর দিন সুস্পষ্টভাবে অনুভূত হইতে থাকে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হইল যে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে (The Government of India Act, 1935) প্রদেশগুলিতে দ্বৈত শাসন-ব্যবস্থার বিলোপসাধন করা হইলেও কেন্দ্রীয় শাসনক্ষেত্রে ইহারই প্রবর্তনের পরিকল্পনা করা হয়।

১৩.১. কেন্দ্রে দ্বৈত শাসন-ব্যবস্থা: ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে যে-যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা পরিকল্পিত হয় তাহাতে এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল যে, চারিটি বিষয়: প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্রসংক্রান্ত ব্যাপার, উপজাতীয় সম্পর্ক এবং খ্রীষ্টধর্মসংক্রান্ত ব্যাপার গভর্ণর-জেনারেলের হস্তে সংরক্ষিত থাকিবে এবং তাঁহার দ্বারা নিযুক্ত তিনজন উপদেষ্টার সাহায্যে পরিচালিত হইবে। অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে বিধান ছিল যে, **স্ববিবেকানুযায়ী** (*discretion*) অথবা **ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি** (*individual judgement*) অনুসারে কার্য করিবার প্রয়োজন না হইলে গভর্ণর-জেনারেল মন্ত্রি-পরিষদের পরামর্শ অনুসারেই ঐগুলিকে পরিচালিত করিবেন। আটটি বিষয়ে গভর্ণর-জেনারেলের উপর **বিশেষ দায়িত্ব** (*special responsibilities*) অর্পিত হইয়াছিল। এই বিষয়গুলি সম্পর্কে তিনি মন্ত্রি-পরিষদের সহিত পরামর্শ করিতে বাধ্য ছিলেন, কিন্তু পরামর্শ করিবার পর সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি অনুসারে কার্য করিতে পারিতেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে কেন্দ্রীয় শাসনক্ষেত্রে বিশেষ সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থার সহিত দায়িত্বশীল শাসন-পদ্ধতি (responsible government *with safeguards*) প্রবর্তনের পরিকল্পনা করা হইয়াছিল। এই শাসনপদ্ধতি দ্বৈত শাসন ছাড়া আর কিছুই নহে। ইহাকে ১৯৩৫ সালের আইনের প্রথম বৈশিষ্ট্য বলিয়া গণ্য করা যায়।

১৩.২. প্রধান বৈশিষ্ট্য—যুক্তরাষ্ট্র গঠনের ব্যবস্থা: অবশ্য ঐ আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল **বৃহত্তর ভারতের** (greater India) জন্য—অর্থাৎ ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যসমূহকে লইয়া সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য—এক যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা।

১৩.৩. প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য—আর একটি বৈশিষ্ট্য: এই পরিকল্পনাকে কার্যকর করিবার জন্য **১১টি গভর্ণর-শাসিত প্রদেশকে স্বাতন্ত্র্য দান করা হয়।** বস্তুত, ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন বা মণ্টফোর্ড শাসনসংস্কার দ্বারা প্রবর্তিত বিকেন্দ্রিকরণ-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিয়া ব্রিটিশ ভারতকে খণ্ডিত করা হয় ১১টি গভর্ণর-শাসিত প্রদেশে। পূর্বে অবশ্য প্রদেশের সংখ্যা কম ছিল। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন দ্বারাই সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ১১তে লইয়া যাওয়া হয়।

উক্ত প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যই (provincial autonomy) ১৯৩৫ সালের ভারত শাসনের আইনের অন্যতম বা দ্বিতীয় প্রধান বৈশিষ্ট্য বলিয়া গণ্য। এখন শেষোক্ত **দুইটি প্রধান বৈশিষ্ট্য**—যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনা ও প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য—সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হইতেছে।

১৪. প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি (Nature of the Proposed Federation):

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন দ্বারা প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রকে 'অস্বাভাবিক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা' (abnormal federalism) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

ক। বিকেন্দ্রিকরণ পদ্ধতিতে যুক্তরাষ্ট্র: প্রথমত, ইহা ছিল **বিভক্তিকরণ** বা **বিকেন্দ্রিকরণ পদ্ধতিতে** (by disaggregation or decentralisation) যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা। অর্থাৎ, একটি এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থাকে ভাঙিয়া প্রদেশগুলির স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিয়া লইয়া কেন্দ্র ও প্রদেশগুলির মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ইহা **যুক্তরাষ্ট্র গঠনের ঐতিহাসিক পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিপরীত** (federation by reversal)।[১]

খ। অসম প্রকৃতির উপাদান ও সম্পর্ক-বৈচিত্র্য: দ্বিতীয়ত, প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রের **আংগিক উপাদানগুলিও অভিন্ন প্রকৃতির ছিল না**। 'ব্রিটিশ ভারত' বা ১১টি গভর্ণর-শাসিত প্রদেশের সহিত কেন্দ্রের যে-সম্পর্ক তাহা হইতে যে দেশীয় রাজ্যগুলি যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিবে তাহাদের সম্পর্ক সম্পূর্ণ পৃথক হইতে পারিত। আবার কেন্দ্রের সহিত যোগদানকারী সকল দেশীয় রাজ্যের সম্পর্কও যে অভিন্ন প্রকৃতির হইবে এমন কোন কথা ছিল না। ব্যাপারটি ছিল এই প্রকার :

কোন দেশীয় রাজ্য প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিতে চাহিলে তাহার পদ্ধতি এবং যোগদানের পর আইনগত লেনদেনের বিশদ বর্ণনা ১৯৩৫ সালের আইনে করা হইয়াছিল। এই উদ্দেশ্যে যোগদানে ইচ্ছুক দেশীয় রাজ্যের রাজাকে **যোগদান সম্পর্কিত দলিল** (Instrument of Accession) সহি করিতে হইত। সেই দলিলে তিনি কোন্ কোন্ সর্তে যোগদানে রাজী তাহা বর্ণনা করিতে পারিতেন। ব্রিটিশ রাজশক্তি এই সকল সর্ত মানিয়া লইলে তবেই যোগদান সম্ভব হইত।

অতএব, যোগদানকারী দেশীয় রাজ্যগুলির সহিত কেন্দ্রের সম্পর্ক সর্ত-সাপেক্ষ কিন্তু প্রদেশগুলির সহিত সম্পর্ক সর্তবিহীন হইবার কথা ছিল। এবং যোগদানকারী বিভিন্ন রাজ্যের কেন্দ্রের সহিত সম্পর্কের ব্যাপারে মোটামুটি **প্রকারভেদ** (variation) থাকিবারও সম্ভাবনা ছিল। কারণ, সকল দেশীয় রাজাই যে যোগদানের একই সর্ত আরোপ করিবে এরূপ কল্পনা করাও ছিল দুষ্কর।

দেখা যাইতেছে, এক জটিল যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার (a complex federation) **পরিকল্পনা করা হইয়াছিল।**

১. বর্তমান দিনে নাইজেরিয়ায় অবশ্য এইভাবে যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা হইয়াছে।

গ। **কেন্দ্রীয় প্রাধান্য** : তৃতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্তনের পরিকল্পনা করা হইলেও তাহাতে কেন্দ্রীয় প্রাধান্য যথাসম্ভব বজায় রাখিবার প্রচেষ্টা করা হইয়াছিল বিশেষ করিয়া ক্ষমতা বণ্টনের (distribution of powers) দিক দিয়া।

১৪.১. ক্ষমতা বণ্টন (Division of Powers) : ক্ষমতার **তিনটি তালিকা** প্রণয়ন করা হইয়াছিল : কেন্দ্রীয় তালিকা (Central List), প্রাদেশিক তালিকা (Provincial List) এবং যুগ্ম তালিকা (Concurrent List)।[১] কিন্তু **অবশিষ্ট** বা **তালিকা-বহির্ভূত ক্ষমতা** (*residuary* or *unenumerated power*) সম্পর্কে ব্যবস্থা ছিল যে গভর্ণর-জেনারেল যথেচ্ছভাবে এইরূপ কোন বিষয়কে কেন্দ্র বা প্রদেশকে সমর্পণ করিতে পারিতেন। আবার কয়েক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় আইনসভা প্রাদেশিক বিষয়সমূহের উপর আইন প্রণয়নের অধিকারী হইতে পারিত।

১৪.২. যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত (Federal Court) : যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংগ হিসাবে একটি 'যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত' (a Federal Court) গঠনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, কিন্তু ইহার ক্ষমতা নানাভাবে সীমিত করা হইয়াছিল। অর্থাৎ, ইহা **যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতই** (Federal Court) **ছিল, প্রধান ধর্মাধিকরণ** (Supreme Court) **ছিল না**।

১৪.৩. যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা (Federal Legislature) : কেন্দ্রীয় আইনসভা **দ্বিকক্ষবিশিষ্ট** করার প্রস্তাব করা হইয়াছিল। নিম্নতন কক্ষ হইবে **যুক্তরাষ্ট্রের বিধানসভা** (*Federal Assembly*) এবং উচ্চতন কক্ষ **রাষ্ট্রীয় পরিষদ** (*Council of State*) বলিয়া অভিহিত হইবে। বিধানসভা ১২৫ জন দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধি এবং প্রদেশগুলির ২৫০ জন প্রতিনিধি লইয়া গঠিত করার প্রস্তাব হয়। রাষ্ট্রীয় পরিষদে প্রদেশগুলির প্রতিনিধি সংখ্যা হইবে ১৫৬ এবং দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধি হইবে ১০৪। **বিশেষভাবে উল্লেখ্য** যে যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধানসভায় প্রদেশগুলি হইতে পরোক্ষভাবে এবং পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে কিন্তু রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যরা প্রদেশগুলি হইতে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হইবেন—এই ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। **আসল ব্যাপার** হইল যে ব্রিটিশরাজের উদ্দেশ্য ছিল ভারতের গণতন্ত্রের প্রসারের পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা।[২] স্বভাবতই প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় আইনসভা গঠনে দেশীয় রাজ্যগুলিকে অন্যায্য গুরুত্ব প্রদান করা হইয়াছিল। শুধু যে তাহাদের জনসংখ্যার তুলনায় দেশীয় রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রীয় আইনসভায় অধিক আসন প্রদান করা হইয়াছিল তাহাই নহে, প্রদেশসমূহ হইতে 'প্রতিনিধিগণ' কেন্দ্রীয় আইনসভায় নির্বাচিত হইয়া আসিলেও দেশীয় নৃপতিবর্গকে প্রদান করা হইয়াছিল তাঁহাদের মনোনীত প্রতিনিধিদের ঐ আইনসভায় প্রেরণ করিবার অধিকার। এইভাবে

১. Schedule VII (সপ্তম সূচী)। ভারতের বর্তমান সংবিধান ইহাই অনুসরণ করিয়াছে।

২. **"It is difficult to deny the justification of the contention in India that federation was largely evoked by the desire to evade the issue of extending responsible Government to the Central Government of British India." A. B. Keith : *A Constitutional History of India*, pp. 474-75**

ঘটিয়াছিল গণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী ব্যবস্থার এক অশ্রুতপূর্ব সংমিশ্রণ (an unheard of hotchpotch)। এই প্রসংগে অধ্যাপক কীথ (A. B. Keith) উক্তি করিয়াছেন যে, ইহা করা হইয়াছিল **"ব্রিটিশ ভারতের বিপজ্জনক গণতান্ত্রিক গতিকে প্রতিরোধ করিবার জন্য"** (to combat any dangerous element of democracy contributed by British India)।[১]

মূল্যায়ন—সাম্রাজ্যবাদী সংবিধানের উপাদান: মোটকথা, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ছিল এক সাম্রাজ্যবাদী সংবিধান (an imperialist constitution) এবং পরিকল্পিত যুক্তরাষ্ট্র ছিল উহার অন্যতম আংগিক উপাদান।

১৫. প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য (Provincial Autonomy): প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য বলিতে বুঝায় নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে (in the field marked out for it) প্রদেশগুলির স্বতন্ত্রভাবে—অর্থাৎ কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে না থাকিয়া—আইন প্রণয়ন ও শাসনকার্য পরিচালনা করিবার 'স্বাধীনতা' বা অধিকার। এখন যদি প্রাদেশিক সরকার অন্য কোন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে পরিচালিত হয় তবে প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য হইয়া দাঁড়ায় সম্পূর্ণ অর্থহীন। সুতরাং প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যের স্বাভাবিক অন্তসিদ্ধান্ত হইল যে প্রাদেশিক শাসনকার্য (ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত) গভর্ণর দ্বারা পরিচালিত না হইয়া দায়িত্বশীল মন্ত্রি-পরিষদ দ্বারাই পরিচালিত হইবে।

দুইটি উপাদান: অতএব, প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যের দুইটি উপাদানের নির্দেশ করা হয়: (ক) নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে প্রদেশগুলির স্বাতন্ত্র্য বা নিয়ন্ত্রণবিহীন ক্ষমতা, এবং (খ) দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থা।[২]

১৫.১. **প্রকৃতি:** ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন দ্বারা প্রস্তাবিত প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য ছিল কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। প্রথমত, ঘোষণা করা হইয়াছিল যে প্রাদেশিক সরকারসমূহের শাসন ও ব্যবস্থা বিভাগ (the executive and legislature) কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ হইতে **মূলত** (broadly) মুক্ত থাকিবে—অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে নয়।[৩] দ্বিতীয়ত, শাসন বিভাগ ব্যবস্থা বিভাগের নিকট 'মূলত' দায়িত্বশীল থাকিলেও শাসকপ্রধান গভর্ণরের হস্তে অর্পণ করা হইয়াছিল প্রভূত পরিমাণে 'বিশেষ ক্ষমতা' (special powers or responsibilities)।

১৫.২. **আইন-প্রণয়নে সীমাবদ্ধতা:** প্রাদেশিক আইনসভাসমূহকে কেন্দ্রের বা গভর্ণর-জেনারেলের নিয়ন্ত্রণাধীন করা হয় ইহার আইন প্রণয়ন ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করিয়া। **কতকগুলি বিষয়ে** আইন-প্রণয়ন বা আইনের সংশোধনী বিল (Amend-

১. A. B. Keith: *A Constitutional History of India, 1600-1935*

২. Chintamani and Masani *India's Constitution at Work*

৩. "Governors' Provinces will possess an executive and a legislature...*broadly* free from the control of the Central Government." *Joint Parliamentary Committee's Report*

ment Bill) আনয়নের জন্য **গভর্ণর-জেনারেলের পূর্বানুমতি লওয়ার প্রয়োজন ছিল**—যথা,

(ক) ব্রিটিশ ভারতের জন্য ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট কোন আইন পাস করিয়া থাকিলে তাহার বিলোপসাধন বা সংশোধনের জন্য বিল ;

(খ) গভর্ণর-জেনারেলের কার্য বা অর্ডিন্যান্স বিরোধী বিল ;

(গ) যে-সকল ব্যাপারে গভর্ণর-জেনারেল তাঁহার স্ববিবেকানুযায়ী (in his discretion) কার্য করিতে সমর্থ ছিলেন সেই সকল ব্যাপারের কোনটির বিরোধী বিল ; এবং

(ঘ) ইয়োরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাদের (European British Subjects) ফৌজদারী দণ্ডবিধি (criminal proceedings) সংক্রান্ত বিল।

১৫.৩. গভর্ণরের বিশেষ দায়িত্ব : ইহা ছাড়া গভর্ণরের **বিশেষ দায়িত্ব** (special responsibilities) দ্বারাও প্রাদেশিক আইনসভাসমূহের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করা হইয়াছিল। এবং গভর্ণরের বিশেষ দায়িত্ব ছিল প্রদেশের মধ্যে শান্তিশৃংখলা (peace and tranquility) রক্ষার ব্যবস্থা করা, সংখ্যালঘুদের ন্যায়সংগত স্বার্থ (legitimate interests) সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা, সরকারী কর্মচারীর অধিকার ও বৈধ স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা, ব্রিটিশ নাগরিক ও কোম্পানীর বিরুদ্ধে যাহাতে কোন প্রভেদাত্মক আচরণ করা না হয় তাহা দেখা, ইত্যাদি ইত্যাদি।

১৫.৪. গভর্ণরের স্ববিবেকানুযায়ী কার্য ও ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি অনুসারে কার্য : শাসন বা কার্যনির্বাহ ক্ষেত্রে (in the executive field) গভর্ণর তাঁহার **বিশেষ দায়িত্ব** (special responsibilities) **পালন করিতেন ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি অনুসারে**।(*in his individual judgement*)। ইহার অর্থ হইল, এই সকল ব্যাপারে তিনি মন্ত্রীদের সহিত পরামর্শ করিতে বাধ্য ছিলেন, কিন্তু পরামর্শ অনুসারে কাজ করিতে বাধ্য ছিলেন না—অর্থাৎ পরামর্শ গ্রহণের পর ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি অনুসারে কাজ করিতে পারিতেন। অপরদিকে **স্ববিবেকানুযায়ী কার্যের ক্ষেত্রে** (while acting in his discretion) তাঁহার পক্ষে মন্ত্রীদের সহিত পরামর্শ করারই কোন বাধ্য-বাধকতা ছিল না, তবে ইচ্ছা করিলে তিনি পরামর্শ করিতে পারিতেন।[১]

যে-সকল ক্ষেত্রে গভর্ণর তাঁহার স্ববিবেচনা অনুযায়ী কার্য করিতে পারিতেন তাহার মধ্যে কয়েকটি বিশেষভাবে উল্লেখ্য হইল : (ক) গভর্ণর মন্ত্রিসভায় সভাপতিত্ব করিতে পারিতেন ; (খ) কোন বিষয় সম্পর্কে তিনি স্ববিবেচনা অনুযায়ী বা ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী কার্য করিবেন, তাহা তিনি স্ববিবেচনা অনুযায়ীই স্থির করিতেন, (গ) মন্ত্রীদের

১. "The difference between a Governor 'acting in his discretion' and 'exercising his individual judgement' lies in this: that while in the former case the Governor need not consult at all his Ministers, in the latter he may consult them, but is not bound by their advice. In both cases the Ministers' opinion is ineffective, either because it is not invited at all, or because, though invited, is expressly made not binding upon the Governor." K. T. Shah : *Provincial Autonomy*

নিয়োগ বা পদচ্যুত করিতে পারিতেন ; (ঘ) আইনসভার অধিবেশন ডাকা, মুলতবী রাখা এবং নিম্নতন কক্ষকে ভাঙিয়া দেওয়ার ক্ষমতা তাঁহার ছিল ; (ঙ) কোন বিলে তিনি সম্মতি দিতে অস্বীকার অথবা বিলকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিতেন ; (চ) প্রদেশে গভর্ণরের প্রত্যক্ষ শাসন প্রবর্তিত করিতে পারিতেন (**৯৩ ধারা**)[১] ; (ছ) প্রাদেশিক বাজেটের কোন্ কোন্ খাত আইনসভার ভোট-নিরপেক্ষ (non-votable) হইবে তাহা স্থির করিতে পারিতেন। ইহা ছাড়া আরও কতকগুলি ক্ষেত্রে গভর্ণর স্ববিবেচনা অনুযায়ী কার্য করিতে পারিতেন।

এই প্রসংগে উল্লেখ্য যে, গভর্ণর যখন স্ববিবেকানুযায়ী অথবা ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী কার্য করিতেন তখন তিনি **গভর্ণর-জেনারেলের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকিতেন** এবং গভর্ণর-জেনারেলের মাধ্যমে **ভারত সচিবের** (Secretary of State for India) **নিকট দায়ী** থাকিতেন।[২] সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ব্যাপক ক্ষেত্রে গভর্ণর তাঁহার মন্ত্রি-পরিষদের পরামর্শ ছাড়াই কার্য করিতে পারিতেন।[৩]

প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্তিত হইলেও ১৯৩৭ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য সংক্রান্ত অংশটুকু (only Provincial Autonomy part of the Act) কার্যকর করার ব্যবস্থা করা হয়। অনুষ্ঠিত নির্বাচনে কংগ্রেস ৬টি প্রদেশে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং তিনটি প্রদেশে বৃহত্তম দল হিসাবে পরিগণিত হয়।

নির্বাচনের পর উক্ত ৬টি প্রদেশে কংগ্রেসকে মন্ত্রিসভা গঠনে আহ্বান জানানো হইলে কংগ্রেস দাবি করে যে শাসন-ব্যাপারে গভর্ণর মন্ত্রীদের দৈনন্দিন কার্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না—এইরূপ দ্ব্যর্থহীন প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে গভর্ণর-জেনারেলের ঘোষণার পর—জুলাই মাস হইতে—কংগ্রেস বিভিন্ন প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠনে রাজী হয়। ইহার পূর্বেই অবশ্য বিভিন্ন প্রদেশে অকংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছিল।

১. ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের এই কুখ্যাত **৯৩ ধারাই** বর্তমান সংবিধানের **৩৫৬ অনুচ্ছেদের** সহিত তুলনীয়। তবে ৯৩ ধারা গভর্ণর স্বয়ং প্রয়োগ করিতে পারিতেন, ৩৫৬ অনুচ্ছেদ প্রয়োগের ক্ষমতা কিন্তু হইল (মন্ত্রি-পরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী) রাষ্ট্রপতির।

২. "But notwithstanding the introduction of Provincial Autonomy, the Act of 1935 retained control of the Central Government over the Provinces in a certain sphere—by requiring the Governor to act 'in his discretion, or in the exercise of his 'individual judgement' in certain matters. In such matters the Governor was to act without ministerial advice and under the control and direction of the Governor General, and, through him of the Secretary of State" D. D. Basu

৩. "Taken collectively, the effect of all these powers and functions, to be exercised by the Governor in his discretion, is that: substantially the most important part of the executive work is removed from the sphere of the Governor's Constitutional Advisers." K. T. Shah

১৬. কার্যক্ষেত্রে প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য—দায়িত্বশীল সরকারের বিকাশে বাধা: প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য কার্যকরকরণের ফলে ভারতের সাংবিধানিক ইতিহাসে **সর্বপ্রথম পুরাপুরি সংসদীয়** বা **দায়িত্বশীল** সরকার প্রবর্তিত হয়। মন্ত্রিগণ গঠনমূলক কার্যে ও ব্রিটিশ শাসনকালে সংকুচিত ব্যক্তি-স্বাধীনতার পুনরুদ্ধারে বিশেষভাবে সচেষ্ট হন। অনেক ক্ষেত্রেই গভর্ণরের সহিত সংঘর্ষ বাধে রাজ-বন্দীদের (detenus) মুক্তি লইয়া। এই ব্যাপারে মিটমাট হওয়ার পর ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের উচ্চতর পদাধিকারীদের দৃষ্টিভংগি মন্ত্রীদের দায়িত্বশীলভাবে কার্য করার পথে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায়। আবার মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভংগিও দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থার বিকাশের সহায়ক ছিল না। আরও বলা যায়, কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশ-সমূহে মন্ত্রিসভা ও মন্ত্রিগণের উপর ছিল কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ড ও পার্লামেণ্টারী বোর্ডের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান। ইহাও পার্লামেন্টীয় শাসন-ব্যবস্থার সার্থকতার অন্তরায় হিসাবে গণ্য হইত। এই প্রসংগে একজন বিশেষজ্ঞ উক্তি করিয়াছেন: "বৈধ কেন্দ্রের কর্তৃত্ব হইতে মুক্ত হইয়া প্রদেশগুলি কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় সংস্থার অধিকতর নিয়ন্ত্রণের অধীন হইয়া পড়ে।"[১]

১৭. উপসংহার—গুরুত্বপূর্ণ শাসনতান্ত্রিক অধ্যায়: তবুও সকল দিক দিয়া বিচার করিয়া বলা যায় যে, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন (The Government of India Act 1935) অনুসারে প্রবর্তিত প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য ভারতে দায়িত্বশীল বা সংসদীয় শাসন-ব্যবস্থার ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে, যাহার দরুনই স্বাধীন ভারতে ঐ প্রকার শাসন ব্যবস্থা গ্রহণ ও কার্যকর করা সহজ হয়।

১৯৩৭ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যসংক্রান্ত অংশটুকু কার্যকর করা হইলেও কেন্দ্রীয় শাসনক্ষেত্রে শাসনযন্ত্র প্রধানত ১৯১৯ সালের শাসন-পদ্ধতি অনুসারেই পরিচালিত হইতে থাকে। এই ব্যবস্থা ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট অবধি—অর্থাৎ ক্ষমতা হস্তান্তর পর্যন্ত বর্তমান ছিল।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন দ্বারা পরিকল্পিত যুক্তরাষ্ট্র গঠিত না হইলেও প্রদেশগুলিকে স্বাতন্ত্র্যদানের ফলে শাসন-ব্যবস্থার রূপ হইয়া দাঁড়ায় যুক্তরাষ্ট্রীয়। (১) কেন্দ্র ও প্রদেশগুলির মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন, (২) সংবিধানের দুষ্পরিবর্তনীয়তা এবং (৩) যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত—যুক্তরাষ্ট্রের এই তিনটি বৈশিষ্ট্যই ১৯৩৭ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ভারতের শাসন-ব্যবস্থায় প্রতিফলিত হয়। এইভাবে যুক্তরাষ্ট্রের যে কাঠামোটি প্রস্তুত হয় তাহারই সামান্য রদবদল করিয়া সাধারণতান্ত্রিক ভারতের শাসন-ব্যবস্থায় রূপ দেওয়া হইয়াছে।

১৮. শাসনতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতি—১৯৪০-৪৭ (Constitutiona' and Political Developments—1940-47): ১৯৩৭ সালের ১লা এপ্রিল তারিখ হইতে প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য প্রবর্তিত হইবার পর কংগ্রেস,

১. "... freed from the control of the legitimate centre, the Provinces were subjected to a far closer and stricter control of the Congress Centre." Coupland: *The Constitutional Problem of India*

মুসলিম লীগ এবং ব্রিটিশের মধ্যে ক্ষমতার **ত্রিমুখী লড়াই** চলিতে থাকে। একদিকে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ ক্ষমতা দখলের এবং অপরদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যতটা সম্ভব ক্ষমতা হাতে রাখিবার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হয়।

১৮.১. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ : এহেন অবস্থা কিছুদিন চলিবার পর বাধিয়া উঠে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫)। ভারতের জনমত যাচাই না করিয়া—বস্তুত ঐ জনমতকে উপেক্ষা করিয়া ভারতকে যুদ্ধে জড়ানোর প্রতিবাদে বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে, এবং **দাবি জানায় পূর্ণ স্বাধীনতার** (ডিসেম্বর, ১৯৩৯)।

১৮.২. মুসলিম লীগের শক্তিসঞ্চয় : ইতিমধ্যে প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যের সুযোগ লইয়া মুসলিম লীগ নিয়মিত শক্তিসঞ্চার করিতেছিল। কংগ্রেস মন্ত্রিসভাসমূহের পদত্যাগ এই ব্যাপারে আরও সুযোগ আনিয়া দেয়। তাহারা ১৯৩৯ সালের ২২শে ডিসেম্বরকে কংগ্রেসী ফ্যাসীবাদ হইতে মুক্তির দিন হিসাবে উদযাপন করে, এবং ইহার কয়েক মাস পরে (১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চ) বিখ্যাত লাহোর অধিবেশনে গৃহীত হয় ভারতের স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র বা **পাকিস্তান গঠনের প্রস্তাব**।

১৮.৩. কংগ্রেসের প্রস্তাব প্রত্যাখান : ১৯৪০ সালের জুলাই মাসে কংগ্রেস আবার প্রস্তাব করে যে ব্রিটিশ সরকার যদি ভারতের স্বাধীনতা এবং কেন্দ্রীয় আইনসভার আস্থাশীল অন্তর্বর্তীকালীন জাতীয় সরকারের (Provisional National Government) দাবি স্বীকার করিয়া লয় তাহা হইলে কংগ্রেস দেশের প্রতিরক্ষার ব্যাপারে সহযোগিতা করিতে রাজী। ব্রিটিশ সরকার এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। কারণ হিসাবে বলা হয়, মুসলিম লীগ এবং দেশীয় নৃপতিগণ ঐ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে না।

১৮.৪. ১৯৪০ সালের আগস্ট ঘোষণা : ইহার পর যুদ্ধের অনুকূলে সকল জনমত সংগঠিত করিবার জন্য ১৯৪০ সালের ৭ই আগস্ট ভাইসরয় একটি ঘোষণা করেন যাহার বিষয়বস্তুকে সংক্ষেপে এইভাবে বর্ণনা করা যায় : (ক) যুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর ভারতের জাতীয় জীবনের মুখ্য অংশসমূহ (principal elements) লইয়া এক প্রতিনিধিমূলক সংস্থা গঠন করা হইবে যে-সংস্থা ভবিষ্যৎ ভারতের জন্য সংবিধান রচনা করিবে। (খ) গভর্ণর-জেনারেলের পরিষদে কয়েকজন ভারতীয়কে লওয়া হইবে এবং ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রতিনিধি লইয়া একটি সমর-উপদেষ্টা পর্ষদও (a War Advisory Council) গঠন করা হইবে ; (গ) ভারতের জাতীয় জীবনের কোন বড় অংশীদারের সম্মতি ব্যতীত ক্ষমতা হস্তান্তর বা অনুরূপ কোনকিছু করা হইবে না।

উক্ত আগস্ট ঘোষণা কোন রাজনৈতিক দলকেই সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই—সকলেই উহা প্রত্যাখ্যান করে।

১৮.৫. আতলান্তিক সনদ : ১৯৪১ সালে একদিকে জার্মেনী সোবিয়েত ইউনিয়নের এবং অপরদিকে জাপান পার্ল হারবারের (Pearl Harbour) উপর আক্রমণ সুরু করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আতলান্তিক সনদের দ্বারা ব্রিটিশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঘোষণা করে যে যুদ্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য হইল পরাধীন জাতিগুলির

সার্বভৌমত্বের অধিকার এবং স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করা। এই অবস্থায় কংগ্রেস ১৯৪২ সালে মিত্রশক্তির যুদ্ধকে ফ্যাসীবাদ-বিরোধী যুদ্ধ বলিয়া বর্ণনা করে। তবে বলা হয়, একমাত্র স্বাধীন ভারত মিত্রশক্তির যুদ্ধের সামিল হইতে পারে।

---

১৯. ক্রীপস প্রস্তাব (Cripps' Proposals) : উপরিলিখিত অস্পষ্ট আগস্ট প্রস্তাব যে প্রত্যাখ্যাত হইবে এবং আতলান্তিক সনদের ঘোষণাও যে ভারতবাসীর মনে বিশেষ কোন রেখাপাত করিবে না তাহা ইংরাজরা ধরিয়াই লইয়াছিল। সুতরাং তাহাদের পক্ষে হতাশার কোন কারণ ছিল না। কিন্তু ১৯৪২ সালে যুদ্ধ ছড়াইয়া পড়িলে এবং জাপানীরা ভারতের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে ব্রিটিশ শক্তির পক্ষে বিচলিত হইবার কারণ ঘটে। তখন অবস্থার চাপে ব্রিটিশ সরকার ভারতের সম্মুখে সাংবিধানিক সংস্কারের (সংগে সংগে কিছুটা ক্ষমতা হস্তান্তরেরও) এক দফা প্রস্তাব রাখিবার সিদ্ধান্ত করে।

১৯.১. বিভিন্ন উপাদান : এই উদ্দেশ্যে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস (Sir Stafford Cripps) ভারতে প্রেরিত হন। তিনি যে প্রস্তাব সংগে লইয়া আসেন তাহার সংক্ষিপ্তসার হইল নিম্নলিখিত রূপ : (ক) যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই এক নির্বাচিত সংস্থার মাধ্যমে ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধান প্রণয়ন করা হইবে। (খ) এই সংবিধান সভায় (স্থূল অর্থে গণপরিষদে) ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যসমূহ—উভয়েরই প্রতিনিধি থাকিবে। (গ) **ব্রিটিশ ভারতের যে-কোন প্রদেশ এই ব্যবস্থার বাহিরে থাকিতে পারে** এবং পরে যোগদানের সিদ্ধান্তও করিতে পারে। (ঘ) যে-সকল প্রদেশ যোগদান করিবে না তাহারা তাহাদের নিজস্ব সংবিধান প্রণয়ন ও গ্রহণ করিতে পারিবে। (ঙ) সংবিধান সভা ও ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে সন্ধি অনুসারেই ভারত ও ব্রিটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারিত হইবে। (চ) যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় অবশ্য ভারতের প্রতিরক্ষা ও অন্যান্য সম্পর্কিত দায়িত্ব ব্রিটিশ সরকারের উপরই ন্যস্ত থাকিবে। (ছ) তবে সকল ক্ষেত্রেই এই সক্রিয় এবং গঠনমূলক কার্যে এখন হইতেই ভারতীয় জনগণের প্রধান প্রধান অংশকে সহযোগিতায় আহ্বান করা যাইবে।[১]

১৯.২. নতুন ব্রিটিশ দৃষ্টিভংগির পরিচয় : ক্রীপস প্রস্তাবও সকল দল ও গোষ্ঠী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়। কিন্তু ইহা মোটেই তাৎপর্যহীন নহে—ইহাতেই প্রথম ব্রিটিশের এক বিশেষ দৃষ্টিভংগির পরিচয় পাওয়া যায় : ভারতকে (দুই বা ততোধিক অংশে) খণ্ডিত করিয়া তবেই ভারত ছাড়া হইবে।

---

২০. ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা (Cabinet Mission Plan) : শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতির দিক দিয়া ক্রীপস প্রস্তাবের পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হইল ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা। ইহার **পটভূমিকা** ছিল এইরূপ :

যতদিন পর্যন্ত ব্রিটেনে রক্ষণশীল দল এবং চার্চিলের মত গোঁড়া সাম্রাজ্যবাদী ক্ষমতায় আসীন ছিলেন ততদিন ভারতে ক্ষমতা-হস্তান্তর বা প্রকৃত শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতির

---

১. ৪২ ইত্যাদি পৃষ্ঠাও দেখ।

ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু আশা করে নাই। কিন্তু ১৯৪৫ সালের গ্রীষ্মকালে সাধারণ নির্বাচনে রক্ষণশীল দলের পরিবর্তে শ্রমিক দল ক্ষমতায় আসে। শ্রমিক দলের নেতা ও নূতন প্রধান মন্ত্রী অ্যাট্লী (Clement Attlee) ভারতের বন্ধু বলিয়াই খ্যাত ছিলেন। ক্ষমতায় আসীন হইয়াই তিনি ভারতকে যে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হইবে সে-বিষয়ে সুস্পষ্ট ঘোষণা করেন। এই উদ্দেশ্যে ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের তিনজন সদস্য—লর্ড পেথিক লরেন্স (Lord Pethick Lawrence)[১], স্যার স্টাফোর্ড ক্রীপস এবং এ. ভি. আলেকজাণ্ডার—ভারতে প্রেরিত হন। ইহাই ক্যাবিনেট মিশন নামে অভিহিত। ভারতে মিশনের সহিত সংশ্লিষ্ট হন তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল।

২০.১. **বিশ্লেষণ**: বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠির সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া ক্যাবিনেট মিশন যে প্রস্তাব পেশ করে তাহাই ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা (Cabinet Mission Plan) নামে অভিহিত। পরিকল্পনাটি ছিল নিম্নলিখিত রূপ :

(ক) ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যসমূহকে লইয়া সমগ্র ভারতের এক ইউনিয়ন গঠন করা হইবে যাহার হস্তে মাত্র **চারিটি ক্ষমতা** থাকিবে : প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্রসংক্রান্ত বিষয়, সংসরণ (communications) এবং এই তিনটি বিষয় পরিচালনা করিবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহ।

(খ) ইউনিয়ন বা কেন্দ্রীয় আইনসভায় ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যসমূহ—উভয়েরই প্রতিনিধি থাকিবে।

সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের সমাধানের ব্যবস্থা : (গ) আইনসভায় কোন গুরুত্বপূর্ণ সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন নির্ধারণে প্রধান সম্প্রদায় দুইটিরই (হিন্দু ও মুসলমান) সমর্থন প্রয়োজন হইবে।

(ঘ) অন্যান্য সকল ক্ষমতা প্রদেশগুলির হস্তে অর্পণ করা হইবে।

(ঙ) প্রদেশগুলি গোষ্ঠী গঠন করিয়া প্রাদেশিক বিষয়গুলির (common provincial subjects) পরিচালনার ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

(চ) গণপরিষদ : একটি গণপরিষদের মাধ্যমেই ভবিষ্যৎ সংবিধান প্রণয়ন করা হইবে, যে গণপরিষদের সদস্যগণ প্রাদেশিক বিধানসভায় নিজ নিজ সম্প্রদায় কর্তৃক (পরোক্ষভাবে) নির্বাচিত হইয়া আসিবেন।

(ছ) অন্তর্বর্তীকালীন সরকার: আশু ক্ষমতা হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে এক অন্তর্বর্তীকালীন সরকার (an interim government) গঠন করা হইবে, যে সরকারে থাকিবেন সকল দলেরই প্রতিনিধি। কেন্দ্রীয় সরকারের সকল দপ্তরই (portfolios) অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে ভারতীয়দের নিকট হস্তান্তরিত হইবে। স্বচ্ছন্দ ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য ব্রিটিশ সরকার এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে সর্বতোভাবে সহায়তা করিবে।

২০.২. **মূল্যায়ন—ভারতকে অখণ্ড রাখার শেষ প্রচেষ্টা** : লক্ষণীয় বিষয় হইল যে ক্যাবিনেট মিশন ভারত-দ্বিখণ্ডনের প্রস্তাব করে নাই, এক দুর্বল কেন্দ্রের (a weak

১. লর্ড পেথিক লরেন্স ছিলেন অ্যাট্লী সরকারের ভারত-সচিব (Secretary of State for India)।

centre) পরিকল্পনা মাত্র করিয়াছিল। সকল দিক দিয়া বিচার করিলে বলা যায়, ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনা ছিল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের দাবি ও দৃষ্টিভংগির মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানের উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা। মহাত্মা গান্ধীও ইহাকে সমর্থন জানাইয়াছিলেন।

মুসলিম লীগ কিন্তু ইহাকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে, যদিও বা পরে জিন্না স্বীকার করিয়াছিলেন যে পরিকল্পনাটি ছিল পাকিস্তান গঠনের পথে প্রথম পদক্ষেপের বিশেষ সহায়ক।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার (Interim Government) গঠিত হয়। প্রথমে মুসলিম লীগ ইহাতে যোগদান না করিলেও পরে করে। তবুও কিন্তু ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনার ব্যাখ্যা সম্পর্কে মতবিরোধ চলিতে থাকে এবং মুসলিম লীগ গণপরিষদের সহিত সকল সম্পর্ক ছেদ করে।

ইতিমধ্যে মুসলিম লীগ পাকিস্তানের সপক্ষে বিভিন্ন পদ্ধতিতে আন্দোলন চালাইয়া যাইতে থাকে। ফলে দেশে সাম্প্রদায়িক আবহাওয়া বিষাক্ত হইয়া উঠে।

২১. ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এ্যাটলীর ঘোষণা (Attlee's Announcement, February, 1947): ভারতের আভ্যন্তরীণ গোলযোগ এবং আন্তর্জাতিক অবস্থার চাপে পড়িয়া ব্রিটিশ সরকার যথাসম্ভব শীঘ্র আপোস-মীমাংসার ভিত্তিতে ক্ষমতা-হস্তান্তরের দিকে ঝুঁকে।

২১.১. ক্ষমতা-হস্তান্তরের গূঢ় কারণ: আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্তালিনগ্রাডে সোবিয়েত ইউনিয়নের নিকট জার্মানীর পরাজয়, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অভ্যুত্থান (upheavals), ইংল্যাণ্ডের মর্যাদা ও ক্ষমতা হ্রাস, কমিউনিজমের উত্তাল তরংগ প্রভৃতি ব্রিটিশ সরকারকে ভীতসন্ত্রস্ত করিয়া তুলে। এদিকে ভারতের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে নানা গোলযোগ—সৈন্য বাহিনীতে বিদ্রোহ, গণজাগরণ ইত্যাদি মীমাংসার মাধ্যমে ভারতের হস্তে ক্ষমতা হস্তান্তরের পথ প্রশস্ত করে।[১]

২১.২. ভারত দ্বিখণ্ডনের সিদ্ধান্তের হেতু: কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের হস্তে ক্ষমতা প্রদান করিয়া ব্রিটিশ সরকার উহার স্বার্থ কতকটা সংরক্ষিত করিবার পরিকল্পনা করিতে থাকে। **ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করিবার সিদ্ধান্ত করে এই কারণে যে ইহার ফলে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে দরাদরি ও সুবিধা আদায় করিবার সুযোগ ঘটিবে।** এই কারণেই আবার সাম্প্রদায়িকতাকে উসকানি দিয়া যাইতে থাকে এবং দেশীয় রাজ্যগুলিকে স্বাধীন করিয়া দেয়।

উপরি-উক্ত পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ হইতে এ্যাটলী ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে এক ঘোষণা করেন।

২১.৩. ঘোষণার বিষয়বস্তু: এই ঘোষণাটি সংক্ষেপে হইল এইরূপ:

(১) ব্রিটিশ সরকার বদ্ধপরিকর যে ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে দায়িত্বশীল ভারতীয়দের হস্তে (responsible Indian hands) ক্ষমতা হস্তান্তর করা হইবে। কারণ, ভারতের বর্তমান অবস্থা আশংকাজনক এবং কোন রকমে বিলম্ব করা চলিবে না।

১. D. N. Sen: *From Raj to Swaraj*; A. R. Desai: *Recent Trends in Nationalism*

(২) যদি দেখা যায়, ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনা অনুযায়ী গঠিত প্রতিনিধিমূলক গণপরিষদ রচিত সংবিধান সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হইতেছে না, তাহা হইলে ব্রিটিশ সরকার স্থির করিবে যে নির্দিষ্ট তারিখে কাহার হস্তে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হইবে।

(৩) দেশীয় রাজ্যগুলি সম্পর্কে বলা হয় যে ইহাদের উপর রাজশক্তির সর্বময় ক্ষমতার (paramountcy) অবসান ঘটিবে—অর্থাৎ নৃপতি-শাসিত **দেশীয় রাজ্যগুলি ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বেই স্বাধীন হইবে।**

(৪) ক্ষমতা হস্তান্তরের ফলে যে-সকল বিষয় উদ্ভূত হইবে সে-সকল বিষয় সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকার সংশ্লিষ্ট দলগুলির সহিত আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে চুক্তি সম্পাদন করিবে।

(৫) ব্রিটিশ সরকার আশা পোষণ করে যে ব্রিটেনের ব্যবসায় ও শিল্পস্বার্থ উভয় দেশের স্বার্থে বিবেচনা করা হইবে। অর্থাৎ, ব্রিটিশ স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করা হইবে না।

(৬) ব্রিটিশ সরকার আশা করে যে ভারতের হাতে ক্ষমতা-হস্তান্তরের ফলে ব্রিটেনের সংগে সম্পর্ক ছিন্ন হইবে না।

ঘোষণাটির তাৎপর্য : ঘোষণাটি হইতে ইহা সহজেই বুঝা যায় যে ব্রিটিশ সরকার যখন দেখিল যে প্রত্যক্ষভাবে শাসন ও শোষণ চলিবে না তখনই বুঝাপড়ার মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত করিল এবং যাহাতে ব্রিটিশ-স্বার্থ যথাসম্ভব সংরক্ষিত হয় তাহার জন্য দায়িত্বশীল হস্তে চুক্তির মাধ্যমে ক্ষমতা-হস্তান্তরের প্রস্তাব রাখিল। ইহা ব্যতীত ভারত বিভাগের প্রচ্ছন্ন ইংগিতও দেওয়া হইল।

---

২২. মাউণ্টব্যাটেন পরিকল্পনা (Mountbatten Plan) : ক্ষমতা হস্তান্তরকে ত্বরান্বিত করা এবং ঘোষণাকে কার্যকর করার জন্য ব্রিটিশ সরকার লর্ড মাউণ্টব্যাটেনকে ১৯৪৭ সালে ভারতের ভাইসরয় (Viceroy) হিসাবে পাঠায়। মাউণ্টব্যাটেন কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও অন্যান্য দলের প্রতিনিধিদের সহিত আলাপ-আলোচনার পর **১৯৪৭ সালের জুন মাসে** তিনি রাজনৈতিক অচলাবস্থার অবসান ঘটাইবার জন্য এক পরিকল্পনা ঘোষণা করেন।

২২.১. দেশ দ্বিখণ্ডনের পরিকল্পনা : এই পরিকল্পনায় ভারতকে খণ্ডবিখণ্ডিত করার প্রস্তাব করা হয়। বলা হয়, গঠিত গণপরিষদ বাংলা আসাম ও সিন্ধুপ্রদেশের মুসলিম লীগের সদস্যগণ বর্জন করায় বর্তমান গণপরিষদ কর্তৃক রচিত সংবিধান সমগ্র ভারতের উপর চাপাইয়া দেওয়া সমীচীন হইবে না। কিভাবে সমস্যার সমাধান করা হইবে তাহার বিবরণ পরিকল্পনা দেওয়া হয়। বাংলা ও পাঞ্জাবের মুসলমান-প্রধান জিলাগুলি ও অ-মুসলমান-প্রধান জিলাগুলি পৃথকভাবে বৈঠকে বসিবে। ইহারা সাধারণ ভোটে স্থির করিবে পাঞ্জাব ও বাংলাকে খণ্ডিত করা হইবে কি না। যদি খণ্ডিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তাহা হইলে প্রত্যেক অংশ বর্তমান গণপরিষদে প্রতিনিধিরা যোগদান করিবে কি করিবে না, অথবা কোন নূতন গণপরিষদ গঠন করিয়া উহাতে যোগদান করিবে—তাহা ঠিক করিবে।

২২.২. **দুইটি গণপরিষদের প্রস্তাব :** অনুরূপভাবে সিন্ধুপ্রদেশের আইনসভা স্থির করিবে যে ঐ প্রদেশ বর্তমান গণপরিষদে অথবা কোন এক নূতন গণপরিষদে যোগদান করিবে। আসামের মুসলমান-প্রধান সিলেট জিলা গণভোটের (referendum) মাধ্যমে সাব্যস্ত করিবে যে ঐ জেলা আসামের অংশ থাকিবে, না পূর্ববংগের সহিত সংযুক্ত হইবে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেও (N. W. F. P.) গণভোটের মাধ্যমে স্থির করিবে যে ঐ প্রদেশ ভারত না পাকিস্তানের সংগে সংযুক্ত হইবে। অনুরূপভাবে বালুচিস্তানকে সিদ্ধান্ত করার অধিকার দেওয়া হয় যে, উহা ভারতীয় ইউনিয়নের সহিত যোগদান করিবে কি করিবে-না।

ভারত এবং পাকিস্তান উভয়কেই **প্রথমে ডোমিনিয়ন মর্যাদা** দেওয়া হইবে ; তবে পরে ইহারা কমনওয়েলথের সহিত সম্পর্ক ছিন্নও করিতে পারিবে অথবা ঐ সম্পর্ক বজায়ও রাখিতে পারিবে।

২২.৩. **পরিকল্পনার ফলে দেশের অভূতপূর্ব দ্বিখণ্ডন :** কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ—উভয় দলই মাউণ্টব্যাটেন পরিকল্পনাকে স্বীকার করিয়া লয়। ইহার ফলে পাঞ্জাব এবং বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করা হয়। সিন্ধুপ্রদেশের আইনসভা পাকিস্তানের সপক্ষে ভোট দেয়। আসামের সিলেট জিলা পূর্ববংগের সহিত যোগদান করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত প্রদেশের ক্ষেত্রে কংগ্রেস গণভোটে যোগদান করে না। সুতরাং ঐ প্রদেশ পাকিস্তানের সংগে সংযুক্ত হইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বালুচিস্তান পাকিস্তানের পক্ষে চলিয়া যায়।

২৩. ১৯৪৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা আইন (The Indian Independence Act, 1947)—উপক্রমণিকা :

ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের দ্বারা ব্রিটিশ-সরকারের **১৯৪৭ সালে জুন মাসের প্রস্তাব বা ঘোষণাকে লিপিবদ্ধ আইনের রূপ** দেওয়া হয়। এই আইনটি ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে পাস করা হয় এবং আইনটি ১৫ই আগস্ট কার্যকর করিয়া ভারত ও পাকিস্তান দুইটি ডোমিনিয়ন সৃষ্টি করে।

২৩.১. **চুক্তিপত্র :** অনেক লেখক আইনটিকে আপস-মীমাংসার মাধ্যমে **ক্ষমতা হস্তান্তরের চুক্তিপত্র** (a deed of compromise) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।[১] ইহার অর্থ দাঁড়ায় যে ভারতীয় কংগ্রেস কোন বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা অধিকার করে নাই, ক্ষমতা পাইয়াছে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে।[২] ক্ষমতা-হস্তান্তরের এই আইনটির দ্বারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পরিকল্পনাকেই কার্যকর করা হয়।

২৩.২. **পরিকল্পনাটির কতকগুলি বৈশিষ্ট্য** পরিকল্পনাটির কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় : (১) ভারতীয় ঐক্যের ধারণাকে বর্জন করা হয়।

---

১. **D. N. Sen :** ***From Rāj to Swaraj***

২. **"The transfer of powers was a constitutional device arrived at by negotiation." A. R. Desai :** ***Recent Trends in Indian Nationalism***

(২) রাজন্যবর্গের স্বার্থ, ব্রিটিশ ব্যবসাবাণিজ্যের স্বার্থ ও ভারত-সচিব কর্তৃক নিয়োজিত রাষ্ট্রকৃত্যক (civil servants) প্রভৃতির স্বার্থ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সংরক্ষিত করার ব্যবস্থা করা হয়। (৩) ধর্মের ভিত্তিতে **ভারতকে দ্বিখণ্ডিত** করা হয়।

ভারতীয় গণপরিষদ সার্বিক ভোটের দ্বারা নির্বাচিত হয় নাই—নির্বাচিত হইয়াছিল পরোক্ষভাবে ব্রিটিশ ভারতের সীমাবদ্ধ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত প্রাদেশিক আইনসভাগুলি দ্বারা। ইহা ছাড়া দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিগণ অংশত মনোনীত (nomination) এবং অংশত রাজ্যগুলির গণ-কংগ্রেস (States People's Congress) কর্তৃক নির্বাচিত হন।

সুতরাং বলা হয়, গণপরিষদে জনগণের মতামত প্রতিফলিত হয় নাই, অথবা ইহা কোন বৈপ্লবিক সংস্থা ছিল না।

২৪. ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের মৌল ব্যবস্থা (Main Provisions of the Indian Independence Act, 1947):

ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি নির্দেশ করা যায় :

ক। সংসদীয় শাসন-ব্যবস্থার পূর্ণ রূপ : ক্ষমতা-হস্তান্তরের পূর্বে ভারতে কেন্দ্রীয় শাসনক্ষেত্রে অন্তবর্তী সরকার (Interim Government) গঠিত হয়। এই সরকার গঠনের উদ্দেশ্য ছিল ক্ষমতা-হস্তান্তরের পদ্ধতিকে সহজ করিয়া তোলা। অন্তবর্তী সরকারে কেন্দ্রের ক্ষেত্রে সংসদীয় শাসন-ব্যবস্থার অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। সুতরাং বলা যায়, কেন্দ্রীয় শাসনক্ষেত্রে সংসদীয় সরকারের সূত্রপাত করে অন্তবর্তী সরকার। ১৯৪৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের (The Indian Independence Act, 1947) দ্বারা ১৫ই আগস্ট ক্ষমতা-হস্তান্তরিত হইলে অন্তবর্তী সরকারের অবসান ঘটে এবং ভারতে একরূপ পুরাপুরি সংসদীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। এই সংসদীয় শাসন-ব্যবস্থা হইল ডোমিনিয়ন ভারতের (Indian Dominion) শাসন-ব্যবস্থা। কারণ, আইনের দৃষ্টিতে ১৯৪৭ সালের **ভারতীয় স্বাধীনতা আইন** (Indian Independence Act, 1947) **ভারতকে স্বাধীনতা দান করে নাই**—ভারত ও পাকিস্তান এই দুইটি ডোমিনিয়নের সৃষ্টি করিয়াছিল মাত্র। কিন্তু এই স্বাধীনতা আইনই ভারত ও পাকিস্তানের গণপরিষদকে (Constituent Assemblies) সুস্পষ্টভাবে সার্বভৌম বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল। সুতরাং গণপরিষদের ইচ্ছা অনুসারে ভারতের পক্ষে **সাধারণতন্ত্র** (Republic) হিসাবে পরিগণিত হইবার পক্ষে কোনই বাধা ছিল না।

খ। দুই ডোমিনিয়নের সীমানা নির্ধারণ : দুইটি ডোমিনিয়নের সীমানা স্থির করিয়া দেওয়া হয়। বাংলা ও পাঞ্জাবের ক্ষেত্রে সীমানা স্থির করার ক্ষমতা সীমানা কমিশনের (Boundary Commission) হস্তে ন্যস্ত হয়। এই কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন র্যাডক্লিফ (Radcliff)। কিন্তু সীমানা সম্পর্কে কমিশনে মতবিরোধ হওয়ায় চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্তকে কার্যকর করা হয়।

গ। ভারত-সচিবের দপ্তরের বিলোপসাধন: ভারত-সচিবের দপ্তরের (Office of the Secretary of State for India) বিলোপসাধন করা হয়। প্রত্যেক ডোমিনিয়নে একজন করিয়া গভর্ণর-জেনারেল থাকিবেন। ইঁহাদের ইংল্যাণ্ডের রাজশক্তি সংশ্লিষ্ট ডোমিনিয়নের সহিত পরামর্শ করিয়া নিয়োগ করিবে। গভর্ণর-জেনারেল নিয়মতান্ত্রিক শাসক হিসাবে কার্য করিবেন এবং তাঁহার স্ববিবেচনা অনুযায়ী বা স্বকীয় ইচ্ছানুযায়ী কার্য করিবার কোন ক্ষমতা থাকিবে না।

ঘ। রাষ্ট্রকৃত্যক প্রভৃতির স্বার্থ সংরক্ষণ: আইনটিতে ভারত-সচিব কর্তৃক নিযুক্ত রাষ্ট্রকৃত্যক এবং ফেডারেল কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারকদের বেতন, ছুটি, পেনসন প্রভৃতি সংরক্ষিত করার ব্যবস্থা হয়।

ঙ। দেশীয় রাজ্যগুলিকে স্বাধীনতা প্রদান: দেশীয় নৃপতিশাসিত রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে ব্রিটিশ রাজশক্তির সর্বময় কর্তৃত্বের (Paramountcy) অবসান করা হয়। সুতরাং, **আইনত** দেশীয় রাজ্যগুলি স্বাধীন হয় এবং চুক্তির মাধ্যমে দুইটি ডোমিনিয়নের যে-কোনটির সহিত যুক্ত হইতে পারে অথবা স্বাধীন থাকিতে পারে—এই অধিকার তাহাদিগকে দেওয়া হয়।

চ। গণপরিষদের দ্বৈত ভূমিকা: দুইটি ডোমিনিয়নের গণপরিষদ সাময়িক-ভাবে (অর্থাৎ যে-পর্যন্ত-না সংবিধান রচনাকার্য সমাপ্ত হইতেছে) দুই দেশের আইনসভা হিসাবেও কার্য করিবে এবং ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন (Government of India Act, 1935) সংশোধিত আকারে চালু থাকিবে।

২৫. কংগ্রেসের ভারত বিভাগকে স্বীকার করিয়া লওয়ার কারণ (The Reasons for Congress Acceptance of the Partition of India): কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ বহুদিন ধরিয়াই ভারত বিভাগের বিপক্ষে সংগ্রাম করিয়াছে এবং ভারত এক ও অভিন্ন—এই মত পোষণ করিয়া আসিয়াছে। এ-অবস্থায় প্রশ্ন উঠে, কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারের ভারত বিভাগের প্রস্তাবকে স্বীকার করিয়া লইল কেন? ইহার উত্তরে নানা কারণের কথা বলা হইয়া থাকে। অবশ্য প্রশ্নটির উত্তর সংক্ষেপে এইভাবে দেওয়া যাইতে পারে:

(ক) কংগ্রেস মুসলিম লীগের সহিত মতৈক্য হওয়ার বিষয়ে একপ্রকার নিরাশ হয়। সুতরাং কংগ্রেসের পক্ষে দেশবিভাগকে স্বীকার করিয়া লওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। (গ) সাম্প্রদায়িক দাংগাহাংগামা এরূপ ব্যাপক আকার ধারণ করে যে দেশবিভাগ ছাড়া উপায় থাকে না। (গ) ব্রিটিশ সরকার যখন ঘোষণা করে কাহার বা কাহাদের নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা হইবে, তখন মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস ভীত হইয়া পড়িল যে ক্ষমতা হয়ত অন্যের হস্তে চলিয়া যাইবে। এই ভীতির কারণ দেশের অভ্যন্তরে গণ-আন্দোলন ক্রমশ তীব্র হইতে তীব্রতর আকার ধারণ করিতেছিল। সুতরাং ক্ষমতা হস্তগত করিবার

প্রেরণায় কংগ্রেস দেশবিভাগের প্রস্তাব এবং ভারতীয় স্বাধীনতা আইন স্বীকার করিয়া লইল।[১]

২৬. ডোমিনিয়ন ভারতের শাসন-ব্যবস্থা (Constitution of the Dominion of India) : বলা হইয়াছে, ডোমিনিয়ন ভারতে একরূপ **পুরাপুরি** সংসদীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।

ক। কেন্দ্রীয় শাসনক্ষেত্রে পরিবর্তন : এই উক্তির ব্যাখ্যা হিসাবে প্রথমে কেন্দ্রীয় শাসন-পদ্ধতি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ডোমিনিয়ন ভারতে গভর্ণর-জেনারেল হইয়া দাঁড়ান সম্পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা (Constitutional Head)। আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল মন্ত্রি-পরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী তিনি কার্য করিতেন।

আইনসভার দ্বৈত কার্য : ডোমিনিয়ন ভারতে ১৯১৯ সালের শাসন-পদ্ধতি অনুসারে গঠিত কেন্দ্রীয় আইনসভার বিলোপসাধন করিয়া গণপরিষদকেই আইনসভার কার্য পরিচালনা করিতে দেওয়া হয়। সুতরাং গণপরিষদকে দুইটি কার্য সম্পাদন করিতে হইয়াছিল : (ক) ভবিষ্যতের জন্য সংবিধান প্রণয়ন করা এবং (খ) কেন্দ্রীয় আইনসভার কার্যসম্পাদন। যখন কেন্দ্রীয় আইনসভা হিসাবে কার্য করিত তখন গণপরিষদকে পার্লামেণ্ট (সংসদ) বলিয়া অভিহিত করা হইত এবং যখন উহা সংবিধান প্রণয়ন করিত তখন **গণপরিষদ** বা সংবিধান সভা (Constituent Assembly)—এই আখ্যা পাইত।

খ। প্রাদেশিক শাসনক্ষেত্রে পরিবর্তন ডোমিনিয়ন ভারতে প্রাদেশিক শাসনক্ষেত্রেও পুরোপুরি দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে প্রাদেশিক গভর্ণরগণের যে-সকল বিশেষ ক্ষমতা ও দায়িত্ব ছিল ডোমিনিয়ন ভারতে তাহা সকলই অপসারিত হওয়ার ফলে তাঁহারা হইয়া দাঁড়ান গভর্ণর-জেনারেলের প্রতিমূর্তি—সম্পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা। একদলীয় মন্ত্রসভা (one-party ministry) শাসন বিভাগের সকল কার্যের জন্য সম্পূর্ণভাবে প্রাদেশিক আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল হওয়ায় প্রাদেশিক শাসনক্ষেত্রে সর্বপ্রথম পূর্ণ দায়িত্বশীল ও পার্লামেন্টীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়।

---

১. "... the executives of both the organisations (the Muslim League and the Congress) wanted power lest the progressive forces should combine and mobilise themselves in such a manner that the ambitions of the upper strata of society were frustrated and their aims completely defeated." D. N. Sen : *From Raj to Swaraj* ;

"The prize of power was also a great temptation for the Congress leaders who had already tested its fruit and were naturally reluctant to part with it at the moment of triumph." Michael Breeber : *Nehru—A Political Biography* ; and

"... they (the Congress and the Muslim League) viewed with apprehension the extending mass movements which were assuming violent revolutionary forms." A. R. Desai : *Recent Trends in Indian Nationalism*

গ। গণপরিষদ কর্তৃক নূতন সংবিধান রচনা ও গ্রহণ: ডোমিনিয়ন ভারতে গণপরিষদ ভারতীয় জনগণের পক্ষে নূতন শাসনতন্ত্রের রচনা করিতে থাকে। রচনাকার্য সমাপ্ত হইলে ইহা ১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর ভারতীয় জনগণের পক্ষেই গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে ঠিক দুই মাস পরে—অর্থাৎ ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী—এই শাসনতন্ত্রের প্রবর্তন করা হয়। ইহা ভারতীয় সংবিধান (The Constitution of India) নামে অভিহিত এবং ইহাই হইল বর্তমান সাধারণতান্ত্রিক ভারতের (Republication India) শাসনতন্ত্র। অবশ্য প্রবর্তনের পর হইতে এ-পর্যন্ত (মার্চ, ১৯৮৬) সংবিধানের ৫২ দফা সংশোধন করা হইয়াছে।

---

২৭. গণপরিষদ ও ভারতীয় সংবিধান (Constituent Assembly and the Constitution of India): দেখা গিয়াছে, ভারতের বর্তমান সংবিধান গণপরিষদ দ্বারা রচিত।

২৭.১ গণপরিষদের ধারণা: যে সভা বা সংস্থা সংবিধান রচনা করে তাহাকেই গণপরিষদ বা সংবিধান সভা আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। জওহরলাল নেহরুর মতে অবশ্য গণপরিষদের এরূপ সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা কখনই উহার গুরুত্ব ও মর্যাদার পূর্ণাংগ পরিচায়ক হইতে পারে না।।

পূর্ণ অর্থে গণপরিষদ: পূর্ণ অর্থে গণপরিষদ বলিতে বুঝায় সমগ্র জাতির পক্ষে নূতন জীবনাদর্শের পথে পদসঞ্চার—নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের মাধ্যমে নূতন জীবন-পদ্ধতির সংহিতা রচনা (framing the code of a new way of life)। এই সংহিতা পুরাতন হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন না হইলেও পুরাতন মোহ, পুরাতন বন্ধন হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইবে। ইহাতে একদিকে যেমন রূপায়িত হইবে স্বাধীনতা-সংগ্রামীর ধ্যানধারণা, অপরদিকে তেমনি প্রতিফলিত হইবে জনসাধারণের আশা-আকাংক্ষা। ফলে সকলেই প্রণীত সংবিধানকে আপন করিয়া গ্রহণ করিবে। সুতরাং গণপরিষদের বৈপ্লবিক তাৎপর্য রহিয়াছে।[১]।

রাজনৈতিক আদর্শ হিসাবে গণপরিষদ সম্বন্ধে এই ধারণা অতি উচ্চ এবং এইভাবে গণপরিষদ দ্বারা প্রণীত সংবিধানও সমালোচনার উর্ধ্বে। কিন্তু ভারতীয় সংবিধানের প্রসংগে প্রশ্ন হইল, গণপরিষদের উপরি-উক্ত আদর্শবাদমূলক ধারণা কতদূর কার্যকর হইয়াছিল এবং কতদূরই বা জনসাধারণের আশা-আকাংক্ষা গণপরিষদ-রচিত সংবিধানে প্রতিফলিত হইয়াছে? এ-সম্বন্ধে আলোচনা সংবিধানের প্রস্তাবনা প্রসংগে পরে করা হইতেছে।

---

১. **Nehru:** *Unity of India*; and

"A Constituent Assembly may be any Assembly which draws up a constitution of a country. And yet this is a poor enough definition. ... It means the masses of a country in action through their elected representatives. It has thus a definite revolutionary significance." Nehru's Foreward to *Constituent Assembly and Indian Federation* by Y. G. Krishnamurti

এখন যে গণপরিষদ ভারতীয় সংবিধান রচনা করিয়াছে তুলনার পরিপ্রেক্ষিতে তাহার প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করা যাইতে পারে।

২৭.২. **অন্যান্য কয়েকটি দেশের গণপরিষদ** : গণপরিষদ ইয়োরোপীয় ধারণা।

ক। **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র** : আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের পরবর্তী সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান রচনার জন্য ১৭৮৭ সালে ফিলাডেলফিয়াতে (Philadelphia) **সাংবিধানিক কনভেনশন** (Constitutional Convention) আহূত হয়। এই কনভেনসনে সভাপতিত্ব করেন জর্জ ওয়াশিংটন (George Washington)। এই গণপরিষদ ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে **বিপ্লবের ফলস্বরূপ** বলিয়াই মনে করা হয়।[১] যাঁহারা এই পরিষদের সদস্য ছিলেন তাহাদের মধ্যে প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিলেন রক্ষণশীল—এমনকি প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিসমূহ। সদস্যদের মধ্যে ছিলেন আইনজ্ঞ ও ব্যবসায়ী। ইঁহারা সকলেই প্রবর্তিত সমাজ-ব্যবস্থাকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। সহজ ভাষায়, সম্পত্তিশালী ব্যক্তিরাই ছিলেন এই কনভেনসন-এর সদস্য। স্বভাবতই সংবিধানে **ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার** সরকার বা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনপ্রতিনিধির আওতার ঊর্ধ্বে বলিয়া ঘোষণা করা হয়।[২] আবার একথাও মনে রাখিতে হইবে, গণপরিষদ বা কনভেনসন কর্তৃক গৃহীত সংবিধান সমগ্র জনসংখ্যার এক-ষষ্ঠাংশের অধিক প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের দ্বারা অনুমোদিত হয় নাই। সুতরাং এই উপসংহারে আসা যায় যে, ঐ কনভেনসন ছিল বুর্জোয়াপ্রধান সংস্থা এবং ঐ সংবিধানকেও **বুর্জোয়া-সংবিধান** বলিতে হয়।

খ। **ফ্রান্স** : আঠার শতকের ফরাসী বিপ্লবও ছিল বুর্জোয়া বিপ্লব। ইহার অন্যতম ধ্বনি ছিল স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাত্র (Liberty, Equality and Fraternity)। এই বিপ্লব সংগঠিত হয় বর্ধিষ্ণু ব্যবসায়ীশ্রেণীর নেতৃত্বে। জনসাধারণকে এই বিপ্লবের সামিল করা হয়। ইহার লক্ষ্য ছিল স্বৈরাচারী শাসন, অভিজাত সামন্তপ্রভু ও রাজতন্ত্রের বিলোপসাধন করা। অবশ্য বিপ্লবের পরবর্তী কালে স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাত্র জনসাধারণের জীবনে সার্থক হইয়া উঠিতে পারে নাই, কারণ ব্যবসায়ী-শ্রেণী উপরি-উক্ত আদর্শগুলিকে নিছক **আনুষ্ঠানিক অধিকারে** পরিণত করে।[৩] অবশ্য

---

১. D. N. Sen : *Revolution by Consent ?*

২. "The Constitution was essentially **an economic document** based upon the concept that the fundamental property rights are anterior to government and morally beyond the reach of popular majorities". Charles A. Beard : *An Economic Interpretation of the Constitution of the United States* (1913)

৩. "It should be remembered that the French Constituent Assembly was in essence the fruit of a **bourgeois-democratic revolution.** In 1789, the objective aimed at the overthrow of absolutism and nobility. The bourgeoisie had confidence in their strength and could afford to unite with peasantry. ... This alliance contributed to the victory of the revolution although once firmly in the saddle the bourgeoisie betrayed their allies." D. N. Sen : *Revolution by Consent ?* Also H. W. Laidler : *A History of Socialist Thought*

১৭৮৯ সালের বিপ্লবের পর যে গণপরিষদ গঠিত হয় তাহা বিপ্লবের আদর্শের উপর ভিত্তি করিয়া অধিকারের ঘোষণা রচনা করিবার দিকে অগ্রসর হয়। তবে ফরাসী বিপ্লব ছিল **বুর্জোয়া বিপ্লব,** ১৭৯১ সালের **সংবিধানও ছিল বুর্জোয়া ধরনের।** ইহার পর ১৭৯২ সালে যে জাতীয় কনভেনসন (National Convention of 1792) নির্বাচিত হয় উহার সদস্যদের মধ্যে ছিলেন আইনজ্ঞ, ব্যবসায়ী, বণিক ও বিভিন্ন পেশার লোক। কিন্তু শ্রমজীবীদের প্রতিনিধিদের সংখ্যা ছিল অতি সামান্যই। এই কনভেনসনই ফ্রান্সের প্রথম সাধারণতন্ত্রী সংবিধান রচনা করে। কনভেনসনের গঠন-প্রকৃতি হইতে ইহা সহজেই বুঝা যায় যে সংবিধানে মূলত বুর্জোয়াদের স্বার্থ সংরক্ষিত করিবার ব্যবস্থাই হয়।

গ। **রাশিয়া বা সোবিয়েত দেশ**: রাশিয়ায় প্রথম বিপ্লব সংঘটিত হয় ১৯০৫ সালে। ইহাও মোটামুটিভাবে ছিল বুর্জোয়া বিপ্লব। জার (Tsar) নৃশংসভাবে ইহাকে দমন করেন। কিন্তু সামরিক পরাজয় এবং গণ-অভ্যুত্থানের ভয়ে জার প্রতিনিধিমূলক আইনসভা প্রতিষ্ঠা করিতে প্রতিশ্রুত হন ও **ডুমা** নামে (Duma) আইনসভাও প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু জারের হাতে আসল ক্ষমতা থাকিয়া যায়। ইহার পর জনসাধারণের মধ্যে নানাপ্রকারের বিক্ষোভ দেখা যায়। সোস্তাল ডেমোক্রাটসরা বা সমাজবাদী দল (Social Democrats) ধ্বনি তুলিতে থাকে যে জারের পতন হউক, ডুমারও পতন ঘটুক এবং দাবি করা হয় যে অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার (a Provisional Revolutionary Government) গঠন করিয়া প্রকৃত প্রতিনিধিমূলক আইনসভা প্রবর্তিত হউক। দেখা যাইতেছে, এই দাবি কোন সমঝোতার ভিত্তিতে গণপরিষদ গঠনের দাবি ছিল না। তাৎপর্য হইল, ক্ষমতা দখলের ভিত্তিতে (seizure of power) এই গণপরিষদ গঠিত হইবে এবং অভ্যুত্থানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত অস্থায়ী সরকার কর্তৃক আহূত হইবে।[১] কিন্তু জনসাধারণের অবস্থার অবনতিই ঘটিতে থাকে এবং ১৯১৬ সালের যুদ্ধের ফলে দেশের দুর্দশা বাড়িয়া যায়। চারিদিকে বিক্ষোভ ছড়াইয়া পড়ে। অবশেষে ১৯১৭ সালে মার্চ মাসে ঘটিল জারের পতন। এই সময় ডুমা একটি অস্থায়ী সরকার গঠন করিল। ঘোষণা করা হয় শীঘ্রই গণপরিষদ গঠনের সকল ব্যবস্থা করা হইবে। ইতিমধ্যে বলশেভিকরা ধ্বনি তুলে যে সমস্ত ক্ষমতা সোবিয়েতগুলির হাতে দিতে হইবে (All power to the Soviets)। ইহার পরই ১৯১৭ সালের ২৫ অক্টোবর তারিখে[২] (৭ই নভেম্বর) বলশেভিকদের নেতৃত্বে পেট্রোগ্র্যাডে অস্থায়ী সরকারের অবসান ঘটাইয়া সোবিয়েত সরকারের গোড়াপত্তন করা হয়।[৩] এই বিপ্লবই **মহান অক্টোবর বিপ্লব** বলিয়া অভিহিত। ইত্যবসরে গণপরিষদ নির্বাচিত হয়। কিন্তু প্রতিবিপ্লবী শক্তিসমূহ এই গণপরিষদকে সোবিয়েতগুলির বিরোধিতা করিতে প্রণোদিত করে। একথা সত্য যে কমিউনিস্টরা গণপরিষদ গঠনকে সমর্থন জানাইয়াছিল। কিন্তু ১৯১৮ সালের

১. *Ibid*

২. রাশিয়ার পুরাতন জুলিয়ান বর্ষপঞ্জী (The Jullian Calender)

৩. A Denisov and M. Kirichenko : *Soviet State Law*

১৯শে জানুয়ারী গণপরিষদ প্রতিক্রিয়াশীল সংস্থা বলিয়া সোবিয়েত সরকার উহাকে ভাঙিয়া দেয়। **গণপরিষদের স্থানাধিকার করে সোবিয়েত কংগ্রেস।** এবং ১৯১৮ সালেই তৃতীয় সমগ্র রাশিয়ার সোবিয়েত কংগ্রেস (the Third All-Russian Congress of Soviets) শ্রমজীবীদের অধিকার ঘোষণা করে।

লেনিন: এই প্রসংগে লেনিনের বক্তব্য উল্লেখযোগ্য। তাঁহার মতে, বুর্জোয়া সাধারণতন্ত্রে গণপরিষদের দাবি যুক্তিযুক্ত ছিল। কিন্তু বুর্জোয়া গণতন্ত্র হইতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উত্তরণের পথে এই গণপরিষদের কোন মূল্য থাকিতে পারে না। কারণ, উহাতে শ্রমজীবীদের বিশেষভাবে সম্যক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা হয় নাই। এ-অবস্থায় সোবিয়েত সাধারণতন্ত্র গণপরিষদ অপেক্ষা অধিকমাত্রায় গণতন্ত্রসম্মত। সুতরাং গণপরিষদকে ভাঙিয়া দিয়া সোবিয়েতগুলির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে।[১]

২৭.৩. ভারতের বুর্জোয়াপ্রধান গণপরিষদ: উপরি-উক্ত তিনটি দেশের গণপরিষদের সংগে তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে ভারতীয় গণপরিষদ কোন বিপ্লবের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ইহা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সহিত আপোষ-মীমাংসার মাধ্যমে ব্রিটিশ আইন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়—এমনকি কোন অস্থায়ী সরকার কর্তৃকও গণপরিষদ আহূত হয় নাই। অনেকেই মন্তব্য করেন যে ভারতীয় গণপরিষদ ছিল বুর্জোয়াপ্রধান প্রতিষ্ঠান। বস্তুত, ভারতের স্বাধীনতা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সহিত মীমাংসারই ফল এবং গণপরিষদ রচিত সংবিধান বুর্জোয়া ধরনের সংবিধান।

নিয়ে এ-সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইতেছে।

২৮. ভারতের গণপরিষদ (The Constituent Assembly of India):

ভারতের গণপরিষদের চরিত্র সম্যক উপলব্ধি করিতে হইলে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের প্রকৃতি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা প্রয়োজন। কারণ, ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের পুরোভাগে ছিল কংগ্রেস। বস্তুত, ভারতের জাতীয় আন্দোলন কংগ্রেসেরই আন্দোলন, আর **ভারতীয় গণপরিষদ ছিল প্রধানত কংগ্রেসী সংস্থা।** এবং কংগ্রেসের পক্ষ হইতে ভারতীয় গণপরিষদে যাহারা নেতৃত্ব প্রদান করেন তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইলেন জওহরলাল নেহরু, সর্দার প্যাটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রভৃতি রাজনীতিবিদগণ। সুতরাং ইঁহাদের ধ্যানধারণাই গণপরিষদ-রচিত সংবিধানে প্রতিফলিত হইয়াছে।

১. "... in a bourgeois republic the Constituent Assembly constitutes the highest form of democracy...while putting forward the demand for summoning of a Constituent Assembly, the revolutionary Social Democracy repeatedly since the beginning of the revolution of 1917 emphasised its opinion that *a republic of Soviets is a higher form of democracy* than the ordinary bourgeois republic with a Constituent Assembly. From the point of view of transition from the bourgeois to socialist order, *a republic of Soviets is not only a higher form or type of democratic institutions, as compared with the ordinary bourgeois republic crowned with a Constituent Assembly, but also the only form capable of securing the most painless transition to Socialism.*" Lenin (The *Pravda*, January 8, 1918)

২৮.১. ভারতের জাতীয় আন্দোলনের প্রকৃতি ও গণপরিষদ : ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের মৌল প্রকৃতি বা ধারা ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উপর চাপ সৃষ্টি করিয়া আপোষ-মীমাংসার মাধ্যমে সুযোগসুবিধা আদায় করা। প্রথমদিকে নরমপন্থীরা ছিলেন মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোক এবং ইহাদের সংগে আপামরজনসাধারণের সংগে সম্পর্ক ছিল না বলিলেই হয়। যখন চরমপন্থীরা কংগ্রেসের নেতৃত্বে তখন তাঁহারা জনসাধারণের গুরুত্ব উপলব্ধি করিলেও জনসাধারণকে বিপ্লবের দিকে লইয়া যাইতে পারেন নাই। মহাত্মা গান্ধী (তাঁহার যুগ—১৯১৯-১৯৪৭) জনসাধারণকে (কৃষিজীবী ও শ্রমিকশ্রেণী) জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে টানিয়া আনেন। ইহার সংগে সংগে আবার মালিকশ্রেণীও (capitalists) আন্দোলনের সংগে যোগসূত্র স্থাপন করে—বিশেষ করিয়া অর্থসাহায্য করিয়া কংগ্রেসকে সমর্থন করিতে থাকে। জনসাধারণ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সক্রিয় হইলেও গান্ধীজী তাহাদের আন্দোলন সীমাবদ্ধ রাখেন। তাহাদের সাহায্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উপর চাপসৃষ্টি করা হইলেও গান্ধীজী বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের কথা চিন্তা করেন নাই। পূর্বের ন্যায় আপোষ-মীমাংসার মধ্যে সুযোগসুবিধা আদায় করাই হইয়া দাঁড়ায় তাঁহার নীতি। মোটকথা, **জাতীয় কংগ্রেসের জাতীয় আন্দোলন বুর্জোয়া আন্দোলনই থাকিয়া যায়।**[১]

২৮.২. নেহরুর দাবি—প্রাপ্তবয়স্কদের ভিত্তিতে গণপরিষদ : এই শতকের তৃতীয় দশকে নেহরু মার্ক্সবাদের দিকে ঝুঁকেন। তিনি সুস্পষ্টভাবে উক্তি করেন, বিপ্লব ব্যতীত স্বাধীনতা—বিশেষত আর্থিক ও সামাজিক স্বাধীনতা—উপলব্ধি করা যাইবে না, এবং সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গঠিত গণপরিষদেই ভারতের সংবিধান প্রণীত হইতে পারে। তাঁহার মতে, ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান না ঘটাইয়া প্রকৃত স্বাধীনতা—রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা—প্রবর্তিত করা সম্ভব নয়।

জওহরলাল নেহরুর এই সকল উক্তি মালিকশ্রেণীকে বিচলিত করিয়া তুলে। তাহারা গান্ধীজীর আশ্রয় গ্রহণ করেন। গান্ধীজী ও অন্যান্য রক্ষণশীল নেতাদের চাপে পড়িয়া নেহরু অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই; তিনি আপোষ-মীমাংসার নীতিকে গ্রহণ করিতে বাধ্য হন।[২] বড়জোর বলা যায় যে, তিনি **ফেবিয়ান সমাজতন্ত্রবাদ** (*Fabian Socialism*) বা **উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক নীতির** জন্য সংগ্রাম করিতে থাকেন।

২৮.৩. আপোষ-মীমাংসার মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন ও গণপরিষদ গঠন : শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, ভারতে স্বাধীনতা আসিয়াছে আলাপ-আলোচনা ও মীমাংসার মাধ্যমে। ব্রিটিশরা অনুভব করে যে বিশ্বের পরিস্থিতি ও ভারতের আন্দোলনের গতি যেভাবে চলিয়াছে তাহাতে পুরাতন পদ্ধতিতে ভারতকে আর শোষণ ও শাসন করা সম্ভব হইবে না। ফলে তাহারা কতকগুলি সর্তসাপেক্ষে ভারতের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করিবার দিকে ঝুঁকে। এই সর্তগুলির মধ্যে থাকে ভারতকে দুই

১. **Bipan Chandra :** ***Nationalism and Colonialism in Modern India***
২. **Bipan Chandra :** ***Nationalism and Colonialism in Modern India***

ভাগে বিভক্ত করা হইবে, ব্রিটিশদের ব্যবসায়ের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করা হইবে না, দেশীয় নৃপতিদের সুযোগসুবিধা এবং ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে (Indian Civil Service) নিযুক্ত ব্যক্তিদের স্বার্থ সংরক্ষিত হইবে। ভারতীয় গণপরিষদ কর্তৃক রচিত সংবিধানে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দাবিগুলি মানিয়া লওয়া হয়।

উপসংহার : উপসংহারে পুনরুক্তি করা যায় যে, ভারতের স্বাধীনতা বৈপ্লবিক পদ্ধতিতে ক্ষমতা দখলের ভিত্তিতে অর্জিত হয় নাই, অর্জিত হইয়াছে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে। ভারতীয় গণপরিষদও কোন বৈপ্লবিক সংস্থা ছিল না, ইহা ব্রিটিশরাজ কর্তৃক গঠিত হয় এবং ব্রিটিশ আইনের দ্বারা প্রবর্তিত হয়।[১]

এই পটভূমিতে ভারতীয় গণপরিষদের পর্যালোচনা করা হইতেছে।

২৮.৪. কংগ্রেসের বিভিন্ন প্রবক্তার অভিমত—ক। গান্ধীজী : ভারত কর্তৃক তাহার নিজস্ব সংবিধান প্রণয়নের দাবি বহুদিন হইতে করা হইয়াছে। যেমন, ১৯২২ সালে মহাত্মা গান্ধী উক্তি করেন যে স্বরাজ ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কোন স্বেচ্ছাকৃত দান হইবে না—ইহা হইবে ভারতের আত্মপ্রকাশের দাবির ঘোষণা। যদিও পার্লামেন্টের আইনের মাধ্যমে ইহা স্বীকৃত হইবে তবু ইহা ভারতীয় জনগণের ইচ্ছাকেই মাত্র রূপদান করিবে।[২]

খ। নেহরু : দাবি এইরূপ থাকিলেও গণপরিষদ গঠনের দাবি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন ১৯৩৩ সালে জওহরলাল নেহরু।[৩] তিনি বলেন যে ভবিষ্যৎ ভারতের সংবিধান জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত গণপরিষদ কর্তৃক রচিত হইবে। তাহার ব্যাখ্যা অনুসারে গণপরিষদের দাবির অর্থ হইল যে ভারতের স্বাধীনতা ধাপে ধাপে আপোস-মীমাংসার ভিত্তিতে ব্রিটিশ আইনের মাধ্যমে আসিবে না, আসিবে ক্ষমতা দখল ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটাইয়া। সুতরাং নেহরু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে এবং শোষণের অবসান ঘটাইতে জনসাধারণকে আহ্বান জানান। যখন অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ আপোস-মীমাংসার মাধ্যমে ব্রিটিশরাজের নিকট হইতে সুযোগসুবিধা আদায়ের

১. Refer D. N. Sen : *Raj to Swaraj* ; A. R Desai ; *Recent Trends in Indian Nationalism* ; Dietmar Rothermund : *The Phases of Indian Nationalism and Other Essays*

২. "Swaraj will not be a free gift of the British Parliament ; it will be a declaration of India's full self-expression. That it will be expressed through an Act of Parliament is true but it will be merely a courteous ratification of the declared wish of the people of India even as it was in the case of the Union of South Africa." Gandhi

৩. "The National Congress stands for independence and a democratic state. It has proposed that the constitution of free India must be framed, without outside interference, by a Constituent Assembly elected on the basis of adult franchise. This is the democratic way and there is no other way short of revolution, which can bring the needed result. An Assembly so elected will represent the people as a whole and will be far more interested in the economic and social problems of the masses than in the petty communal issues, which affect small groups." Jawaharlal Nehru (1933)

পক্ষপাতী ছিলেন, তখন—এই শতকের তৃতীয় দশকে—জওহরলাল নেহরু বৈপ্লবিক পদ্ধতিতে ক্ষমতা দখলের দাবি জানাইয়াছিলেন।[১] পরবর্তীকালে অবশ্য নেহরু কংগ্রেসের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের চাপে—বিশেষ করিয়া গান্ধীজির প্রভাবে—আপোস-মীমাংসার নীতি গ্রহণ করিতে বাধ্য হন।

গ। জাতীয় কংগ্রেস: ইহার পর ১৯৩৪ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস **সরকারীভাবে গণপরিষদের দাবি** উত্থাপন করে। ১৯৩৬ সালে ফৈজপুর অধিবেশনে এক প্রস্তাব পাস করিয়া বলে যে কংগ্রেসের দাবি হইল প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র যেখানে ক্ষমতা জনগণের হস্তে অর্পিত হইবে এবং সরকার তাহাদের দ্বারা সম্যকভাবে নিয়ন্ত্রিত হইবে। এইরূপ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তখনই যখন দেশের সংবিধান রচনার ক্ষমতাসম্পন্ন গণপরিষদ প্রতিষ্ঠিত হইবে।[২] ১৯৩৯ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি (the Working Committee of the Congress) এই গণপরিষদের দাবির পুনরুত্থাপন করে এবং জানাইতে থাকে। কিন্তু ব্রিটিশরাজ এই দাবির প্রতি কর্ণপাত করে না। যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে ব্রিটিশরাজ সংকটের সম্মুখীন হয় তখন গণপরিষদের কথা বিচারবিবেচনা করিতে বাধ্য হয়।

১৯৪২ সালে যুদ্ধ ছড়াইয়া পড়িতে থাকে এবং জাপান ভারতের দ্বারদেশে উপস্থিত হয়। এই পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সরকার স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসকে (Sir Stafford Cripps) এক প্রস্তাব দিয়া ভারতে প্রেরণ করে। তাহার বক্তব্য ছিল, দুইটি সম্প্রদায়—কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ—স্বীকৃত হইলে এই প্রস্তাবকে কার্যকর করা হইবে। ইতিপূর্বেই প্রস্তাবগুলির আলোচনা করা হইয়াছে (৭৮ পৃষ্ঠা)। এখানে সংক্ষেপে উহাদের পুনরুল্লেখ করা অপ্রাসংগিক হইবে না।

২৮.৫. ক্রীপসের প্রস্তাব: ক্রীপসের প্রস্তাব অনুসারে: (১) ভারতের সংবিধান ভারতের **জনসাধারণ দ্বারা নির্বাচিত গণপরিষদ** দ্বারা রচিত হইবে। এই সংবিধান ভারতকে ডোমিনিয়ন মর্যাদা দিবে। (২) প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য লইয়া একটি ভারতীয় ইউনিয়ন গঠিত হইবে। (৩) যদি কোন প্রদেশ রচিত সংবিধান গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হয় তাহা হইলে ঐ প্রদেশ ব্রিটিশ সরকারের সহিত পৃথক চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে পারিবে।

দুইটি প্রধান দল—কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ—এই প্রস্তাব সম্পর্কে একমত না হইতে পারায় প্রস্তাবটি প্রত্যাহৃত (withdrawn) হয়। মুসলিম লীগ পাকিস্তানের দাবি জানায় এবং পাকিস্তানের জন্য পৃথক গণপরিষদ উহার অন্তর্ভুক্ত হয়। ইত্যবসরে জনসাধারণের মধ্যে বিক্ষোভ ধূমায়িত হইতে থাকে ও তাহারা বিদ্রোহের দিকে ঝুঁকে। যুদ্ধাবসানে

১. **Bipan Chandra**: ***Nationalism and Colonialism in Modern India***

২. **"The Congress stands for a genuine democratic State in India, where power has been transferred to the people as a whole and the Government is under their effective control. Such a State can only come into existence through a Constituent Assembly having the power to determine finally the constitution of the country."**
Resolution of the Indian National Congress at Faijpur Session (1936)

সশস্ত্রবাহিনীতে বিদ্রোহ ছড়াইয়া পড়িতে থাকে এবং বোম্বাই করাচী ও মাদ্রাজে নৌবাহিনীতে অভ্যুত্থান দেখা দেয়। এ-অবস্থায় ব্রিটিশ সরকার আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য করিয়া আবার আপোস-মীমাংসার দিকে প্রচেষ্টা চালাইতে থাকে। অবশ্য একথাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কংগ্রেস কিংবা মুসলিম লীগ জনসাধারণের বৈপ্লবিক ও সহিংস মনোভাবকে সুনজরে দেখে নাই। উভয়ই আপোষের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিল।

২৮.৬. ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনা : যাহা হউক, ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সমস্যার সুরাহা করিবার উদ্দেশ্যে ক্যাবিনেট মিশন নামে একটি দলকে ভারতে প্রেরণ করে। ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবসমূহ পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে (৭৮-৭৯ পৃষ্ঠা)। এই প্রসংগে সংক্ষিপ্তভাবে উহার কিছুটা পুনরুল্লেখ করা হইতেছে। মিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ভারতের **গণপরিষদ পরোক্ষভাবে প্রাদেশিক আইনসভাগুলি সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে সমানুপাতিক ভোটপদ্ধতিতে নির্বাচিত** হইবে। প্রদেশগুলির মোট সদস্যসংখ্যা হইবে ২৯২ আর দেশীয় রাজ্যগুলির সদস্যসংখ্যা হইবে অনধিক ৯৩টি। প্রত্যেক প্রদেশের আসন মুসলিম, শিখ ও সাধারণ (Muslims, Sikhs and General)—এই তিনভাগে ভাগ করিয়া প্রাদেশিক আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত হইবে। দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিগণকে কিভাবে নির্বাচন করা হইবে তাহা দেশীয় রাজ্যগুলির সহিত আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারিত হইবে।

২৮.৭. সাম্প্রদায়িক ভিত্তি : কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ আপত্তি-সাপেক্ষে ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনা অনুযায়ী গণপরিষদের নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে। ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে গণপরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রদেশগুলি উহাদের প্রতিনিধি প্রেরণ করে। নির্বাচনের ফলে কংগ্রেস ২৯২টি আসনের মধ্যে ২০৮টি আসন দখল করে আর মুসলিম লীগ পায় ৭৩টি আসন। আলাপ-আলোচনার পর স্থির হয় যে দেশীয় রাজ্যসমূহের সংরক্ষিত আসনের ৫০ শতাংশ নির্বাচন ও ৫০ শতাংশ দেশীয় নৃপতিগণ কর্তৃক মনোনয়নের মাধ্যমে পূরিত হইবে। মুসলিম লীগ এই গণপরিষদকে বয়কট করে। দেশবিভাগের পর পাকিস্তানের স্বতন্ত্র গণপরিষদ গঠিত হইলে ভারতীয় গণপরিষদে কংগ্রেস ৮২ শতাংশ আসনের অধিকারী হয়। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসের হিসাব হইতে দেখা যায় যে ভারতীয় গণপরিষদের মোট সদস্যসংখ্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে ২৯৯। ইহার মধ্যে প্রদেশগুলির সদস্যসংখ্যা হয় ২২৯ আর দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতিনিধিসংখ্যা ৭০।

২৮.৮. সীমিত ভোটের পদ্ধতিতে গঠন : উপরি-উক্ত বিবরণে **দুইটি বিষয়** সুস্পষ্ট হইয়া দাঁড়ায় : (ক) কংগ্রেসের পূর্বের দাবি যে গণপরিষদ প্রাপ্তবয়স্কের ভোটের দ্বারা নির্বাচিত হইবে তাহা মোটেই হয় নাই। প্রদেশগুলির আইনসভা পরোক্ষভাবে গণপরিষদের সদস্যগণকে নির্বাচিত করে। এই সকল প্রাদেশিক আইনসভা তৎকালীন সীমিত ভোটাধিকারের (১৪ শতাংশ) ভিত্তিতে গঠিত হইয়াছিল।

এদিকে বিচার করিলে জনসাধারণকে ভারতীয় সংবিধানের উৎস বলিয়া কোনমতেই বর্ণনা করা যায় না।

(খ) আরও বলা যায়, এই সংবিধান পরে **গণভোটে অনুমোদিতও হয় নাই।** ইহার উত্তরে অবশ্য বলা হয় যে, প্রাপ্তবয়স্কের ভোটে গণপরিষদ যদি নির্বাচিত হইত তাহা হইলেও কংগ্রেস ও উহার নেতৃবৃন্দেরই প্রাধান্য থাকিত। তৎসত্ত্বেও কিন্তু তত্ত্বগতভাবে বলা চলে যে সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটের মাধ্যমেই গণপরিষদ নির্বাচিত হওয়া উচিত ছিল। দ্বিতীয়ত দেখা যায় যে গণপরিষদ কংগ্রেসেরই সংস্থা হইয়া দাঁড়ায়। এবং কংগ্রেসের মুষ্টিমেয় নেতা ইহার উপর আধিপত্য বিস্তার করেন।

২৯. ভারতীয় গণপরিষদের কার্য সম্পাদন (Working of the Constituent Assembly) : অনেক লেখক দাবি করেন যে ভারতীয় গণপরিষদে সর্বশ্রেণীর লোক ছিলেন। এই দাবি সত্ত্বেও বলিতে হয় যে **গণপরিষদ কংগ্রেসী সংস্থাই ছিল।** পূর্বেই বলা হইয়াছে যে কংগ্রেসের মধ্যে আবার মুষ্টিমেয় নেতাই (যেমন, নেহরু প্যাটেল প্রসাদ আজাদ প্রভৃতি কয়েকজন ব্যক্তি) প্রধান ছিলেন। ইহারাই বিশেষ করিয়া নেহরু ও প্যাটেল তাঁহাদের ধ্যানধারণা অনুযায়ী গণপরিষদের কার্যাবলীকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করিতে থাকেন। **সকল সিদ্ধান্তই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে (Congress Working Committee) গৃহীত হইত** এবং গণপরিষদ এই সকল সিদ্ধান্তকে অনুমোদন করিত।[১] ইহাদের আইনগত রূপ প্রদান করিত খসড়া-প্রণয়ন কমিটি (The Drafting Committee) যাহার শীর্ষে ছিলেন ডঃ আম্বেদকর। সুতরাং বলা যায় যে নেহরু ও প্যাটেলই ছিলেন প্রকৃত নিয়ামক। সুতরাং **ডঃ আম্বেদকরকে সংবিধানের জনক বলা ভুল।**[২] সর্দার প্যাটেল ছিলেন রক্ষণশীল। পূর্বে মার্ক্সবাদ ও সমাজতন্ত্রের আদর্শের দ্বারা আকৃষ্ট হইলেও সংবিধান রচনার সময় নেহরু পাশ্চাত্য ধরনের উদারনৈতিক আদর্শের দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিলেন। ইহা সত্ত্বেও নেহরু যেখানে সমাজতন্ত্রের কথা বলিতে চেষ্টা করিয়াছেন সেখানে প্যাটেল তাঁহাকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখেন।[৩] বস্তুত যে সংবিধান গণপরিষদ কর্তৃক রচিত হয় তাহার

১. "... both the Assembly and its Drafting Committee were the formal centres of **work**; the real place of work was the premises where congress leaders used to meet **and take** important decisions. *The Congress Working Committee became the real architect of our Constitution.*" J. C. Johari : *Indian Government and Politics*

২. "My reading of the Constitution makes me feel that it is inappropriate to call Dr. Ambedkar the father of the Constitution. If any people are entitled to be called so, they are Nehru and Patels, but I would like to call them the Presiding Deities, the sources of all ideas of the Constitution—real makers of the Constitution." K. V. Rao : *Parliamentary Democracy of India*

৩. "Nehru had been interested by Fabianism when at Cambridge, and his studies of Marx and his trip to Europe—including Russia—during 1926—had greatly influenced him. Yet over the years leading to the Constituent Assembly he changed *from a Marxist of Laski's-style socialist to an empirical gradualist.* Patel probably did have a moderating influence on Nehru. ..." G. Austin : *The Indian Constitution—Cornerstone of a Nation*

প্রধান উৎস ছিল ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন (the Government of India Act, 1935)। ইহা ছাড়া অন্যান্য দেশের মধ্যে ইংল্যাণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান হইতে কিছু কিছু বিষয় গ্রহণ করা হয়। আবার কিছু কিছু সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকারের কথা বলা হইলেও ঐগুলিকে নির্দেশমূলক নীতি হিসাবে গৃহীত হয় এবং ঐগুলিকে বলবৎযোগ্য করা হয় না। অনেকেই অভিযোগ করিয়া বলিয়াছেন যে, সংবিধান রাজনৈতিক দলিল হইলেও ইহাকে **সামাজিক ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের সনদ বলা চলে না**।[1]

সংক্ষেপে বলা যায়, গণপরিষদ তথাকথিত কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের (Welfare State) গোড়াপত্তন করে মাত্র। অতএব, পুনরুক্তি করা যাইতে পারে, ভারতীয় সংবিধান প্রকৃতপক্ষে হইল বুর্জোয়া সংবিধান (a bourgeois Constitution)।[2]

২৯.১. **কমিটির মাধ্যমে কার্য পরিচালনা** : দেখা যায়, ভারতীয় গণপরিষদ কতকগুলি কমিটি গঠন করিয়া তাহাদের মাধ্যমে কার্য পরিচালনা করিতে থাকে। এই কমিটিগুলির অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ ছিল নিয়মসংক্রান্ত কমিটি, ষ্টিয়ারিং বা পরিচালনা কমিটি, [illegible] কমিটি, [illegible] কমিটি, ইউনিয়ন বিষয়সংক্রান্ত কমিটি, ইউনিয়নের শাসন-ব্যবস্থাসংক্রান্ত কমিটি, প্রদেশগুলির শাসন-ব্যবস্থাসংক্রান্ত কমিটি ও দেশীয় রাজ্যসংক্রান্ত কমিটি। এই কমিটিগুলির সভাপতি ছিলেন নেহরু বা প্যাটেল [illegible]। ইহা ছাড়া যাহারা গণপরিষদে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন রাজেন্দ্রপ্রসাদ, সিতারামাইয়া, [illegible] আয়েংগার, মুন্সী, আম্বেদকর, সত্যনারায়ণ সিং, প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ। ইহারা উচ্চশিক্ষিত ও **মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক।** অনেক বিশিষ্ট সদস্যই ছিলেন আইনবিদ। শাসনসংক্রান্ত পরামর্শদাতা ছিলেন **বি. এন. রাউ** (B. N. Rau)। এখানে উল্লেখ্য যে ইহারা সকলেই ছিলেন পশ্চিমী উদারনৈতিক গণতন্ত্রে অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্রে বিশ্বাসী—সমাজতন্ত্রে নয়। ইহাদের ধ্যানধারণাই গণপরিষদ রচিত সংবিধানে প্রতিফলিত হয় এবং সংবিধানের ভিত্তি হইয়া দাঁড়ায় প্রধানত ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন, যদিও বা কিছু কিছু অংশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আয়ারল্যাণ্ড জাপান প্রভৃতি দেশ হইতে গ্রহণ করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে **গান্ধীজীর আদর্শও সংবিধানে বিশেষ স্থান পায় নাই।**

২৯.২. **আদর্শ লইয়া বিতর্ক :** ভারতীয় সংবিধানের আদর্শ কি হইবে না-হইবে তাহা গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত **উদ্দেশ্যসংক্রান্ত প্রস্তাবে** (Objectives Resolutions) ঘোষণা করা হয়। এই প্রস্তাব ১৯৪৬ সালের ১৩ই ডিসেম্বর নেহরু উত্থাপন করেন এবং ১৯৪৭ সালের ২২শে জানুয়ারী গণপরিষদে গৃহীত হয়। প্রস্তাবে যাহা বলা হয়

---

১. **"The Constitution's aim, as explained by Dr. Ambedkar, or as can be derived from the wording of the Constitution itself, is almost entirely political and *not at all social or economic.*" K. T. Shah**

২. **A. R. Desai : *Recent Trends in Indian Nationalism*, op. cit.**

তাহা সংক্ষেপে হইল এইরূপ : (ক) ভারত একটি **স্বাধীন সার্বভৌম সাধারণতন্ত্রে** (an Independent Sovereign Republic) পরিণত হইবে। (খ) এই স্বাধীন সার্বভৌম সাধারণতন্ত্র সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন এলাকা লইয়া একটি **ইউনিয়ন** বা রাজ্যসংঘ হইবে। (গ) সকল **ক্ষমতার উৎস হইবে জনগণ**। (ঘ) ভারতীয় সাধারণতন্ত্রে ন্যায় সাম্য স্বাধীনতার অধিকার, বিশ্বাসের অধিকার, সমিতি গঠনের অধিকার প্রভৃতি স্বীকৃত হইবে। (ঙ) অনুন্নত শ্রেণীর স্বার্থ-সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকিবে। (চ) সাধারণতন্ত্রী ভারতের অখণ্ডতা সুরক্ষিত করিতে হইবে। (ছ) দেশ আন্তর্জাতিক শান্তি ও মানব-কল্যাণ নিশ্চিত করিতে সচেষ্ট হইবে।

এই আদর্শ ও নীতির ভিত্তিতে চূড়ান্ত সংবিধান গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয়। গণপরিষদ উহার কায ১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর মাসে সমাপ্ত করে এবং প্রণীত সংবিধানকে ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী মাসে প্রবর্তিত হয়।[১]

৩০. রচিত সংবিধানের বৈশিষ্ট্য : এই সংবিধানের বৈশিষ্ট্যের কথা পরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইতেছে। ইত্যবসরে মূল সংবিধানের কয়েকটি দিকের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাইতে পারে।

ক। সংসদীয় সরকার : প্রথমত, সংবিধান রচয়িতৃগণ ইংল্যাণ্ডের মত পার্লামেণ্টীয় বা ক্যাবিনেট শাসন-ব্যবস্থা ভারতে চালু করেন এবং **প্রাপ্তবয়স্কের ভিত্তিতে নির্বাচনের ব্যবস্থা** করা হয়। রাষ্ট্রপতি-শাসিত বা অন্যান্য ধরনের শাসনের কথা আলোচিত হইলেও উহার কোনটিকেই গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করা হয় নাই। ক্যাবিনেট শাসন-ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষে যুক্তি ছিল যে ইহার দ্বারা গণতন্ত্রকে সম্যকভাবে নিশ্চিত করা সম্ভব হইবে। ইহা ছাড়া বলা হইয়াছিল, ভারতীয়রা ঐ ধরনের শাসন-ব্যবস্থার সহিত বহুদিন হইতে পরিচিত। সুতরাং **১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনকে অনুসরণ করা হয়**। স্মর্তব্য যে সংবিধান শাসন বিভাগের হাতে ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান করে। যেমন, রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার মধ্যে জরুরী অবস্থার ঘোষণা, রাজ্যে অচলাবস্থার ঘোষণা প্রভৃতি ক্ষমতার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। রাজ্যপালকে প্রকৃতপক্ষে কেন্দ্রের 'এজেণ্ট' হিসাবেই পরিণত করা হয়। ইহাতে প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে।[২]

এই প্রসংগে একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতে পারে। সংসদীয় শাসন-ব্যবস্থাকে সফল করিতে হইলে জনগণের সম্মতি ও জনগণের মধ্যে সমাজ-ব্যবস্থার মূল বিষয়গুলি সম্পর্কে ঐক্যের ভাব থাকা প্রয়োজন। ইহার জন্য অর্থনৈতিক নিরাপত্তা থাকা দরকার। ভারতে এই ঐক্যের মনোভাব বা অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অভাব পরিলক্ষিত

---

১. ৮৬ পৃষ্ঠায় দেখ।

২. **"The makers of the Indian Constitution came closer and closer to the letter and the spirit of the Act of 1935, which was designed to compensate the grant of provincial autonomy by an explicit assertion of the prerogatives of the Centre."** **Dietmar Rothermund :** ***The Phases of Indian Nationalism and Other Essays***

হয়। ইহা ব্যতীত যে সংবিধান গৃহীত হয় তাহাতে যে বলা হইয়াছে জনগণ কর্তৃক সংবিধান রচিত ও গৃহীত হইয়াছে। এই **দাবি শূন্যগর্ভ**। কারণ, জনগণকে কোন পর্যায়েই সংবিধান রচনা বা গ্রহণের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট করা হয় নাই। এমনকি বলা যায় যে গণপরিষদের মধ্যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিও গ্রহণ করা হয় নাই। সংবিধান প্রণয়নের ব্যাপারে নেহরু প্যাটেল ইত্যাদি-নেতাদের অভিমতই ছিল চূড়ান্ত; অন্যান্য দল বা গোষ্ঠী বা ব্যক্তির কোন কথাতেই কর্ণপাত করা হয় নাই।[১] গণ-পরিষদের অনেক সদস্য যেমন, অধ্যাপক কে. টি. সাহা সমাজতন্ত্রের কথা সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহিলেও রাজেন্দ্র-প্রসাদ ও প্যাটেল উহার বিরোধিতা করেন।[২]

খ। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা: দ্বিতীয়ত, গণপরিষদ প্রণীত চূড়ান্ত সংবিধানে ভারতে **কেন্দ্রপ্রবণ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা** প্রবর্তন করা হয়। এ-সম্পর্কেও গণপরিষদ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের কাঠামোকে অনুকরণ করে। অবশ্য কেন্দ্রকে অধিকতর মাত্রায় শক্তিশালী করা হয়। দেশবিভাগ ও পাকিস্তান হওয়ার পূর্বে অংগ-রাজ্যগুলির হস্তে অধিকতর ক্ষমতা প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু দেশবিভাগের পর যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে অধিক কেন্দ্রাশ্রয়ী করা হয়।[৩] এই কেন্দ্রিকতার লক্ষণ হইল ক্ষমতা বিভাজন—আইনসংক্রান্ত, শাসনসংক্রান্ত ও অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতার বণ্টন ব্যাপারে সংবিধান বিশেষমাত্রায় কেন্দ্রপ্রবণ। ইহা ছাড়া রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরুরী অবস্থা ও রাজ্যের অচলাবস্থা ঘোষণার অধিকার যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে এককেন্দ্রিক ব্যবস্থায় পরিণত করিতে পারে। ফলে রাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্য বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ করা হয়। বস্তুত, রাজ্যগুলি কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়ে। পরবর্তীকালে দেখা যায় যে রাজ্যগুলির মধ্যে এ-সম্পর্কে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ।

গ। অধিকারের উল্লেখ: তৃতীয়ত, গণপরিষদ সংবিধানে কতকগুলি অধিকার সন্নিবিষ্ট করে। এই অধিকারগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়: মৌলিক অধিকার

১. "One of the biggest drawbacks, it is often said by critics, *is the lack of sanction from the people*. As it is, the term "We, the People of India" in the Preamble is high-sounding but empty; the people were neither directly nor indirectly connected with the framing of the Constitution either at the beginning or at the end." K. V. Rao: *Parliamentary Democracy of India*

২. K. V. Rao: *Parliamentary Democracy of India*, pp. 21-26;

"One may speculate that it was principally Patel's conservative influence that kept the Constitution from having a greater socialist content than it has." Austin: *The Indian Constitution—Cornerstone of A Nation*

৩. "In the 'Objectives Resolution', the Constituent Assembly contemplated a weak centre and fairly autonomous Units having residuary powers. Partition of the country, however, led to the reversal in the attitude of the Constituent Assembly in the matter. As a separate state of 'Pakistan' was formed for the Muslims, the rest of India decided to have a strong Central Government. In the Constitution the residuary powers are left with Centre and the States are placed at the mercy of the Central Government in many matters" Dr. R. N. Aggarwala: and "With the partition of the country in 1947, the prime motive of the Congress for the stress on provincial autonomy seemed to have lost its force. *The Congress veered round to a federal structure essentially unitary in character.*" K. M. Kurian and P. N. Varghese: *Centre-State Relations*

(Fundamental Rights) এবং নির্দেশমূলক নীতি (Directive Principles of State Policy)। মৌলিক অধিকারগুলি আদালতে বলবৎযোগ্য (Justiciable) কিন্তু নির্দেশমূলক নীতিসমূহ আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য নয়। অনেকে সদস্যই বলবৎযোগ্য নয় এরূপ অধিকার বা নীতি সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করিবার পক্ষপাতী ছিলেন না এবং অধিকারগুলিকে অনেকেই কতকগুলি **অযথা উপদেশ** (a superfluous sermon) বা দলীয় কর্মসূচী (a party programme) বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। আবার যে মৌলিক অধিকারগুলি সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত হয় সেগুলির উপর ব্যাপক বাধানিষেধ আরোপ করা হয়। ইহা ছাড়াও নিবর্তনমূলক আটকের (preventive detention) ব্যবস্থা করা হয়। এই বাধানিষেধগুলি প্রধানত রক্ষণশীল নেতা প্যাটেলের পরামর্শের ফলেই সংবিধানে সন্নিবিষ্ট হয়।

গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত অন্য **এক বিতর্কিত বিষয়** ছিল ব্যক্তিগত **সম্পত্তির অধিকার** যাহা মৌলিক অধিকারের অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট হয়। ইহার ফলে সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা সংরক্ষিত হয়। আবার এই অধিকার মাত্র নাগরিকরাই পায় নাই, অ-নাগরিক-বা বিদেশীয়রা এই অধিকার ভোগ করিতে সমর্থ ছিল। এবং সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়ারও ব্যবস্থা করা হয়। ইহাতে জমিদার, দেশীয় মূলধন-মালিক-শ্রেণী ও বিদেশীয়দের ব্যবসাবাণিজ্যের সুবিধা হয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তি সংক্রান্ত অনুচ্ছেদটি নেহেরু কর্তৃক উত্থাপিত হয় এবং নানা অছিলায় উহাকে গণপরিষদে পাস করাইয়া লইয়া হয়।[১] এই কারণেই অনেক লেখকই ভারতীয় সংবিধানকে বুর্জোয়া সংবিধান বলিয়া মনে করেন।[২] অবশ্য পরে ১৯৭৮ সালের ৪৪তম সংশোধন দ্বারা সম্পত্তির অধিকার মৌলিক অধিকারের অধ্যায় হইতে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বর্তমানে এই অধিকারটি অন্যতম বিধিবদ্ধ অধিকার মাত্র—অর্থাৎ আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও সংরক্ষিত হয়। ৪৪তম সংশোধন অনুসারে সংবিধানের ৩০০ (ক) অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে, আইনের নির্দেশ ব্যতীত কাহাকেও সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না (no person shall be deprived of his property *save by the authority of law*)। সুতরাং সম্পত্তি অধিকারের বিলোপসাধন করা হয় নাই।

ঘ। ধর্মনিরপেক্ষতা বা অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র: গণপরিষদ রচিত সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের ব্যবস্থা করা হয়। অর্থাৎ, **ধর্মনিরপেক্ষতা** (secularism) ভারতীয় রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য—এ দেশে **রাষ্ট্রীয় ধর্ম** (State Religion) বলিয়া কিছু নাই। গৃহীত সংবিধানে ধর্ম ও বিশ্বাসের অধিকার অন্যতম মৌলিক অধিকার। বলা

---

১. "Pandit Nehru, while introducing the relevant article in the Constituent Assembly, made a brilliant speech in which he concealed the fundamental conservatism of this article behind a screen of verbal radicalism." Dietmar Rothermund : *The Phases of Indian Nationalism and Other Essays*

২. "The Constitution by guaranteeing bourgeois property rights acquired *the decisive character of a bourgeois constitution.*" A. R. Desai

হইয়াছে যে রাষ্ট্র কোন ধর্মের প্রতি বিভেদমূলক আচরণ করিবে না। এই প্রসংগে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে পরে—১৯৭৬ সালের ৪২তম সংশোধনের দ্বারা—প্রস্তাবনায় বলা হয় যে ভারত একটি **ধর্মনিরপেক্ষ** বা **অসাম্প্রদায়িক** (secular) সাধারণতন্ত্র।

ঙ। গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র : গণপরিষদ গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের (democratic socialism) আদর্শ গ্রহণ করে। অন্যভাবে বলা যায়, গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র হইল **জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র** বা **মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থারই** দ্যোতক। গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত মূল সংবিধানের প্রস্তাবনায় এই 'সমাজতন্ত্রে'র কথাটি উল্লিখিত হয় নাই। কিন্তু পরে ১৯৭৬ সালের ৪২তম সংশোধনের দ্বারা 'সমাজতন্ত্র' কথাটি প্রস্তাবনায় সংযুক্ত করা হয়।

চ। বৈধতা বিচার : আদালত দ্বারা **সংবিধানের ব্যাখ্যা** (interpretation of the constitution) ও **আইনের বৈধতা বিচারের** (judicial review) ব্যবস্থা ভারতীয় গণপরিষদ গৃহীত সংবিধানে করা হয়। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের বৈধতা বিচারের যে ব্যাপক ক্ষমতা রহিয়াছে, আমাদের সংবিধানে আদালতকে অতটা ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই।

ছ। ব্রিটিশ স্বার্থ সংরক্ষণ : পরিশেষে আর দু'একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতে পারে। ব্রিটিশরাজ যখন মীমাংসার মাধ্যমে ক্ষমতা-হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত করে তখন প্রত্যক্ষভাবেই হোক বা পরোক্ষভাবেই হোক কতকগুলি সর্তের কথা বলে। ইহাদের মধ্যে ছিল : (১) ব্রিটিশ সম্পত্তি ও ব্যবসায়ের স্বার্থ সংরক্ষণ ; (২) দেশীয় রাজন্যবর্গের স্বার্থ সংরক্ষণ ; (৩) ব্রিটিশ আই. সি. এস.-এর (I. C. S.) অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রকৃত্যকদের স্বার্থ সংরক্ষণ।[১]

গণপরিষদে কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত **সংবিধানে এই তিনটি স্বার্থই সংরক্ষিত** করার ব্যবস্থা হয়। সম্পত্তির অধিকারের দ্বারা দেশীয় মালিকশ্রেণীর সহিত ব্রিটিশ মালিক-শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষিত করা হয়। সংবিধানে রাজন্যবর্গের অর্থনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়—বিশেষ করিয়া ইহাদের বিপুল পরিমাণ রাজন্যভাতা ([illegible]vy Purse) দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ভারতীয় বেসামরিক কৃত্যকদের (I. C. S.) সুবিধাসুযোগও সংরক্ষিত করা হয়। অবশ্য পরে বিভিন্ন সংশোধনের মাধ্যমে এগুলির অবসান ঘটানো হয়।[২] তবে বলা যায়, সংশোধনের পূর্বেই সংশ্লিষ্ট স্বার্থগুলি তাহাদের প্রাপ্য ভোগদখলও আদায় করিয়া বিদায় গ্রহণ করে। ইহা ছাড়া নৃপতিরা এখন কোন-না-কোন ভাবে মূলধন-মালিকে পরিণত হইয়াছেন এবং কোন কোন ব্রিটিশ মালিক সর্ত-সাপেক্ষে এদেশে শিল্পবাণিজ্যে লিপ্ত রহিয়াছেন।

---

১. "...guarantees as to the protection of interests of the princes, the services and British trade, commerce and industry, we[illegible] conditions precedent to the transfer of power..." D. N. Sen : *From Raj to Swaraj*

২. ১৯৭১ সালের ২৬তম সংশোধনের দ্বারা দেশীয় রাজন্যবর্গের পদ ও রাজন্যভাতা এবং অন্যান্য সুযোগসুবিধার অবসান ঘটানো হয়। আবার ১৯৭২ সালের ২৮তম সংশোধন দ্বারা পূর্বেকার আই. সি. এস কর্মচারী যে-সকল বিশেষ সুযোগসুবিধা ভোগ করিত তাহার অবসান করা হয়।

স্মর্তব্য

১. ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস মোটামুটি ভারতে ব্রিটিশ শাসনেরই ইতিহাস।

২. এই ইতিহাস ১৯০ বৎসরের—১৭৫৭ হইতে ১৯৪৭ পর্যন্ত। অবশ্য ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনকার্য নিয়ন্ত্রিত হয় ১৭৭৩ সাল হইতে।

৩. কোম্পানীর নিকট হইতে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিকট ভারত-শাসন হস্তান্তরিত হয় ১৮৫৮ সালে।

৪ ইহার পর ধীরে ধীরে—বিন্দু বিন্দু পরিমাণে ভারতে প্রতিনিধিমূলক শাসন-ব্যবস্থার বিকাশ ঘটানো হয়।

৫. ১৯১৯ সালের ভারত-শাসন আইন দ্বারা প্রদেশগুলিতে কিছু পরিমাণ দায়িত্বশীল সরকারের ব্যবস্থাও করা হয়। ইহার নাম ছিল ডায়ার্কি বা দ্বৈত শাসন।

৬. প্রদেশগুলিতে দ্বৈত শাসন প্রবর্তনের পূর্ব হইতেই ব্রিটিশ সরকার ভারতের জনসম্প্রদায়কে 'বিভক্ত করিয়া শাসন করার নীতি' অনুসরণ করিয়া আসিতেছিল। ইহার দরুনই শেষ পর্যন্ত ঘটে দেশবিভাগ।

৭. পরবর্তী ১৯৩৫ সালের আইনে সমগ্র ভারতের জন্য এক যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা করা হয়। ইহার ফলেই স্বাধীন ভারতের শাসন-ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রীয় রূপ ধারণ করে।

৮. ভারত স্বাধীনতা পায় ১৯৪৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা আইন বলে। এবং স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনা করে ভারতের গণপরিষদ।

৯ এই গণপরিষদ মোটেই প্রতিনিধিমূলক ছিল না।

১০ ইহা মোটামুটি পুরাতন কাঠামোর উপর কিছু কিছু নূতন উপাদান সহযোগে রচনা করে ভারতীয় সংবিধান—The Constitution of India, যাহা লিখিত সংবিধানসমূহের মধ্যে বৃহত্তম।

অনুশীলনী

1. Give a brief historical retrospect of the (present) Constitution of India
[ভারতীয় (বর্তমান) সংবিধানের উপর একটি সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক পরিক্রমা প্রদান কর।]

[৭০-৭৩, ৮২-৮৬ পৃষ্ঠা]

2. Discuss the main features of the Government of India Act, 1919 with special reference to its system of dyarchy. (N.B.U. 1985)

[১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের মূল বৈশিষ্টগুলি আলোচনা কর এবং এই প্রসংগে দ্বৈত শাসন-ব্যবস্থার উপর বিশেষ আলোচনা কর।] (৭০-৭৬ পৃষ্ঠা)

3. The federation proposed by the Government of India Act, 1935 has been called an *abnormal federalism.* Explain why.

[১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন দ্বারা প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রকে অস্বাভাবিক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। কেন করা হইয়াছে ব্যাখ্যা কর।] (৭১-৭৩ পৃষ্ঠা)

4. Discuss the nature of Provincial Autonomy introduced by the Government of India Act, 1935.

[১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন দ্বারা প্রবর্তিত প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যের প্রকৃতির পর্যালোচনা কর।]

(৭০-৭১, ৭৩-৭৫ পৃষ্ঠা)

5. Write an analytical note on the Cabinet Mission Plan giving your own evaluation of it. (N.B.U. 1985)

[তোমার নিজস্ব মূল্যায়নসহ ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনার উপর একটি বিশ্লেষণমূলক টীকা রচনা কর।] (৭৮-৮০ পৃষ্ঠা)

6. Write a critical note on the Constituent Assembly of India.

ভারতীয় গণপরিষদের উপর একটি সমালোচনামূলক টীকা রচনা কর।]

(৮৬-৮৭, ৮৯-৯৪ পৃষ্ঠা)

7. Compare the Indian Constituent Assembly with those of (a) U.S.A., (b) France and (c) Russia.

[ভারতীয় গণপরিষদের সহিত (ক) মার্কিন, (খ) ফরাসী ও (গ) রাশিয়ার গণপরিষদের তুলনা কর।]

(৮৬-৮৯ পৃষ্ঠা)

8. Explain why it is said the Constitution of India is a bourgeois constitution :

[ভারতীয় সংবিধানকে বুর্জোয়া সংবিধান বলা হয় কেন ?] (৮৬-৮৭, ৮৯, ৯০-৯১ ও ৯৮ পৃষ্ঠা)

9. (a) What is meant by Communal Award ? (C. U. 1984)

[সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা কাহাকে বলে ?] (৬৯ পৃষ্ঠা)

(b) Why was the Constituent Assembly formed ? (C. U. 1983)

[গণপরিষদ কেন গঠিত হইয়াছিল ?] (৭৯ পৃষ্ঠা)

(c) When was the Constitution of India adopted and when did in come into force ? (C. U. 1985)

[ভারতীয় সংবিধান কবে গৃহীত হয় এবং কবে কার্যকর হয় ?] (৯৬ পৃষ্ঠা)

10. Fill in the blank :

Members belonging to the - Party were predominant in the Constituent Assembly. (C. U. 1982)

[ভারতের গণপরিষদের -- দলের সদস্যদের প্রাধান্য ছিল।] (৮৯ পৃষ্ঠা)

৬ সংবিধানের দার্শনিক এবং অর্থ নৈতিক ও সামাজিক ভিত্তি

(THE PHILOSOPHICAL AND SOCIO-ECONOMIC BASES OF THE CONSTITUTION)

"*The personal integrity of the ruler and the moral sense of the citizenry are the* keys *to sound government and prosperous society offered by* Manu *and* Gandhi *alike. No trick of administrative technique or organisation, no constitutional devices or amendments can save a government or state lacking these essentials. And for that polity which possesses them, state machinery* is *of secondary importance. D. M. Brown : The White Umbrella.*

১. সোবিয়েত ইউনিয়নের সংগে তুলনা : আজিকার দিনের রাষ্ট্র-ব্যবস্থার পটভূমিকায় বিশালত্ব ও বিভিন্নতা—এই দুই দিক দিয়া ভারতকে বোধ হয় একমাত্র সোবিয়েত ইউনিয়নের সহিতই তুলনা করা চলে। চীনও বিরাট, কিন্তু বিভিন্নতার এরূপ প্রকাশ ঐ দেশে ঘটে নাই। অর্ধ-শতাধিক আংগিক রিপাব্লিক (Union-Republics), স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন রিপাব্লিক (Autonomous Republics), স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন অঞ্চল (Autonomous Regions) এবং জাতীয় অঞ্চলের (National Areas) সমবায়ে গঠিত সোবিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় এলাকা পৃথিবীর মোট স্থলভাগের এক-ষষ্ঠাংশের মত। এই বিশাল ভূখণ্ডের ব্যাপ্তি হইল ইউরোপ ও এসিয়া—উভয় মহাদেশেই। বর্তমান জনসংখ্যা ২৫ কোটির বেশ কিছুটা উপরে। উহারা ১৮০-র উপর ভাষাভাষী। এবং ৪০টির মত ধর্ম অনুসরণকারী এই ভাষাবৈচিত্র্যই সোবিয়েত ইউনিয়নের জাতীয় বৈচিত্র্যের (racial variety) দ্যোতক। ধর্ম আচারব্যবহার রীতিনীতি এমনকি পোশাকপরিচ্ছদেও বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর এমন সমন্বয় আর কোথাও দেখা যায় না।

ভারতের ভূখণ্ডের আয়তন সোবিয়েত ইউনিয়নের তুলনায় অনেক ক্ষুদ্র এবং ভূখণ্ড সোবিয়েত ইউনিয়নের মত দুই মহাদেশ ব্যাপিয়া নহে। তবুও আয়তনের মাপকাঠিতে ভারত পৃথিবীতে সপ্তম স্থানাধিকারী। অপরদিকে জনসংখ্যার আয়তনের দিক দিয়া ভারতের স্থান সোবিয়েত ইউনিয়নের উপরে—সমগ্র পৃথিবীতে দ্বিতীয়। সুতরাং ভারত এখনও—অর্থাৎ খণ্ডিত হওয়ার পরও—অন্যতম বিশাল দেশ।

১.২. বৈচিত্র্যের দিক দিয়া সংগতি : এই বিশাল ভারতের জাতীয় বৈচিত্র্য অনন্যসাধারণ না হইলেও মোটেই অতিসাধারণ নহে। পূর্বসূত্রের উল্লেখ করিয়া বলা যায়, ভাষা ধর্ম আচারব্যবহার পোশাকপরিচ্ছদ উপজীবিকা এবং এমনকি দৃষ্টিভংগির যে তারতম্য ভারতীয়দের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় তাহার তুলনা একমাত্র বোধ হয় সোবিয়েত ইউনিয়নেই মিলে। ভারতীয় সংবিধানে মাত্র ১৫টি ভাষা তালিকাভুক্ত[১] হইলেও আরও অন্তত ৩০টি ভাষা আছে যাহাদের প্রত্যেকটির মাধ্যমে অন্তত লক্ষাধিক লোক ভাবের আদানপ্রদান করে। সোবিয়েত ইউনিয়নে খ্রীষ্টান মুসলমান ও বৌদ্ধ—মোটামুটি এই তিন প্রকার ধর্মাবলম্বীর

১. Eighth Schedule বা অষ্টম তপশীল। এই পনেরটি ভাষা হইল : (১) অসমীয়া, (২) বাংলা, (৩) গুজরাটী, (৪) হিন্দী, (৫) কানাড়া, (৬) কাশ্মীরী, (৭) মালয়ালাম, (৮) মারাঠী, (৯) ওড়িয়া, (১০) পাঞ্জাবী, (১১) সংস্কৃত (১২) সিন্ধি, (১৩) তামিল, (১৪) তেলেগু এবং (১৫) উর্দু। উল্লেখ্য, **ইংরাজী** তপশীলভুক্ত অন্যতম ভাষা নহে।

সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া অবশ্য কিছু ইহুদিও আছে। (মোট অনুসৃত ধর্মের সংখ্যা অবশ্য ৪০-এর মত।) ভারতে কিন্তু প্রধান ধর্মসম্প্রদায় (**major religious communities**) হইল ছয়টি: হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রীষ্টান জৈন এবং বৌদ্ধ। ইহার উপর বিভিন্ন জনজাতীয় (tribal) ও আদিবাসী অঞ্চলের অপ্রধান ধর্ম-সম্প্রদায়সমূহের কথা ধরিলে ধর্মবৈচিত্র্যের মাপকাঠিতে ভারত অন্য যে-কোন দেশের অনেক ঊর্ধ্বে থাকিবে। পরিশেষে, আচারব্যবহার পোশাকপরিচ্ছদ রীতিনীতির বৈচিত্র্যে উভয় দেশ যেন সমান্তরালভাবেই চলিয়াছে।

১.৩. এই দিক দিয়াই মৌল পার্থক্য: তবুও এই বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রেই সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের মধ্যে রহিয়াছে মৌল পার্থক্য। সোভিয়েত রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা রচয়িতৃবৃন্দের নিকট এই বৈচিত্র্যই ছিল সমস্যা; ফলে প্রয়োজন ছিল সমন্বয়সাধনের। ভারতে কিন্তু বিভিন্নতার অন্তস্তল দিয়া প্রবাহিত হইয়াছিল ঐক্যের ফল্গুধারা। মুঘল আমলে ভারত যখন একই শাসনাধীনে আসে তখন হইতেই এই ঐক্যধারা বহিতে থাকে। আওরঙ্গজেবের যে দাক্ষিণাত্য অভিযান, যাহার ফলে মুঘল সাম্রাজ্য অর্থসামর্থ্যশূন্য হইয়া পতনের পথে অগ্রসর হয়, আদর্শের দিক দিয়া তাহা ছিল এই ঐক্যধারাকে বজায় রাখিবার—ভারতকে এক অভিন্ন শাসনাধীনে রাখিবার জন্যই।[১]

১.৪. মহাভারতের সত্তা: ব্রিটিশ আমলে এই ঐক্যবন্ধন দিন দিন দৃঢ়তর হয় এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের ফলে প্রত্যেক ভারতবাসী এক 'মহাভারতের সত্তা' অনুভব করিতে থাকে। মুসলিম লীগের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবিজনিত আন্দোলনের ফলে এই ঐক্যধারা কতকটা ব্যাহত হইলেও উহাতে সম্পূর্ণ ছেদ পড়ে নাই। বরং পাকিস্তান 'ভারতবর্ষ' হইতে বিচ্যুত হওয়ার পর খণ্ডিত স্বাধীন ভারতে ঐক্যবন্ধন হয় সুপরিস্ফুট। এইরূপ অনুকূল রাজনৈতিক আবহাওয়াতেই সুরু হয় স্বাধীন ভারতের সংবিধানের প্রণয়নকার্য।

---

২. শাসন-ব্যবস্থার পুরাতন কাঠামো: আবহাওয়া অনুকূল হওয়ার দরুন শাসন-ব্যবস্থাকে ঢালিয়া সাজাইবার সুযোগ আসিয়াছিল—সাম্রাজ্যবাদী বিদেশীর অধীনে যে শাসন-ব্যবস্থা বিবর্তিত হইয়াছিল তাহার পূর্ণ রূপান্তরসাধনের পথে কোন অন্তরায়ই ছিল না। কিন্তু **সংবিধান-রচয়িতৃগণ সেই পুরাতন কাঠামোকেই বজায় রাখিলেন।** ফলে যে মূর্তির রূপদান করা হইল, নূতনত্বের সংযোজন প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাহা নূতন কিছু হইল না। নাক-মুখ-চোখ কিছুটা বদলাইল বটে, কিন্তু সেই অতি পরিচিত রূপ সকলের কাছে সহজেই ধরা পড়িতে লাগিল।

এই পরিচিত রূপের পরিবর্তনের প্রচেষ্টা করিয়া আসা হইতেছে সংবিধানের সংশোধন দ্বারা। যেমন, ৪২তম সংশোধন দ্বারা অন্যান্যের সহিত (গণতান্ত্রিক) সমাজতন্ত্র (democratic socialism) গ্রহণের সংকল্প গ্রহণ করা হইয়াছে, নাগরিকের মৌল কর্তব্য এক নূতন অধ্যায় হিসাবে সংবিধানভুক্ত হইয়াছে, ইত্যাদি। এবং ৪৪তম সংশোধন দ্বারা সম্পত্তির অধিকারকে মৌলিক অধিকারের অধ্যায় হইতে সরাইয়া লইয়া গিয়া মাত্র বিধিবদ্ধ অধিকারের (statutory right) মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে।[২] তবুও কিন্তু ভারতীয় সংবিধানে নূতন ও পুরাতনের সংমিশ্রণ রহিয়া গিয়াছে, এবং আরও বহু

---

১. Panikkar: *The Foundations of New India*

২. ৯৮ পৃষ্ঠা দেখ।

সংশোধনের পরও উহা থাকিবে। এই নূতন ও পুরাতনের সমন্বয়ের মধ্যে কতটা নূতন এবং কতটাই বা পুরাতন, সে-সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করা যাইতে পারে।

২.১. পূর্বতন সংবিধান হইতে গৃহীত তিনটি মৌল বৈশিষ্ট্য : তত্ত্বের দিক দিয়া দেখিলে ভারতীয় সংবিধানের মৌল বৈশিষ্ট্য মাত্র তিনটি : (ক) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা, (খ) সংসদীয় সরকার এবং (গ) বিচার বিভাগ কর্তৃক আইনের বৈধতা বিচার (judicial review)। এই তিনটি উপাদানই পূর্ববর্তী শাসন-ব্যবস্থা হইতে গৃহীত।

১৯১৯ সালের আইন : ক্রমবিকশিত **সংসদীয় সরকার** প্রবর্তিত হয় ১৯১৯ সালের মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসনসংস্কার (Montagu-Chelmsford Reforms, 1919) হইতে; আবার ঐ শাসনসংস্কার দ্বারাই **যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার ভিত্তিপ্রস্তর** স্থাপন করা হয়। পরবর্তী বা ১৯৩৫ সালের শাসনসংস্কার (Government of India Act, 1935) দ্বারা ভারতে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনাই করা হয়। সংগে সংগে আবার দায়িত্বশীল বা সংসদীয় সরকারের সম্প্রসারণের ব্যবস্থাও করা হয়। **পরিকল্পিত যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্তিত না হইলেও সরকার যুক্তরাষ্ট্রীয় রূপই গ্রহণ করে।** অপরদিকে আবার কেন্দ্রীয় সরকার দায়িত্বশীল শাসন-পদ্ধতিতে পুনর্গঠিত না হইলেও প্রদেশগুলির ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থা বিশেষভাবে সম্প্রসারিত হয়। এইভাবে মোটামুটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ও দায়িত্বশীলতার সমন্বয়ে সংগঠিত শাসন-ব্যবস্থা দশ বৎসরের উপর (১৯৩৭ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট পর্যন্ত) প্রবর্তিত থাকে। ফলে **ভারতবাসী যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতি ও সংসদীয় শাসন-ব্যবস্থাতে কতকটা অভ্যস্ত হইয়া পড়ে।**

আবার ভারতবাসী বিচার বিভাগীয় পুনরীক্ষণ বা বৈধতা বিচারের সহিতও পরিচিত ছিল। ব্রিটিশ শাসকবর্গ ভারতের সংবিধান বা ভারত শাসন আইন প্রণয়নকালে সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভংগি দ্বারা পরিচালিত হইলেও আইনের অনুশাসনের ধারণাকে (The Concept of the Rule of Law) সম্পূর্ণ পরিহার করিতে পারেন নাই। তাই তাঁহারা বিচার বিভাগীয় বৈধতা বিচারকে সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলেন। এবং ইহারই বিশেষ প্রতিফলন দেখিতে পাওয়া যায় ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন দ্বারা **যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত** (Federal Court) প্রতিষ্ঠায়।

স্বাভাবিকভাবেই, যখন স্বাধীন ভারতের জন্য নূতন শাসন-ব্যবস্থা রচনার সুযোগ উপস্থিত হয়, তখন মৌলিক উপাদান হিসাবে গ্রহণ করা হয় ঐ যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতি, সংসদীয় সরকার ও (স্বাভাবিক অনুসিদ্ধান্ত হিসাবে) বিচার বিভাগীয় বৈধতা বিচারকে। বলা হয়, ইহা ছাড়া অন্য কিছু করা বিপজ্জনক হইতে পারিত। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা ও সংসদীয় সরকারের অধীনে বিভিন্ন প্রদেশে জননেতৃবৃন্দ শাসনক্ষমতার স্বাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থা বা অন্য কিছু প্রবর্তনের প্রচেষ্টা করিলে আন্দোলনের আশংকা ছিল।

অতএব, স্বাধীন ভারতের সংবিধানের জন্য '১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন' (The Government of India Act, 1935) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ভিত্তিকেই গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত হইয়াছিল।

২.২. **পূর্বতন সংবিধান হইতে গৃহীত অন্যান্য বিষয়**: কিন্তু স্বাধীন ভারতের (মূল) সংবিধান-প্রণেতৃবর্গ এইখানেই থামেন নাই, তাঁহারা এই সংবিধানের মোটামুটি দুই-তৃতীয়াংশ পূর্ববর্তী সংবিধান বা উপরি-উক্ত ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন হইতেই আহরণ করিয়াছিলেন। অবশ্য তাঁহারা সকল ব্যবস্থা অপরিবর্তিত আকারে গ্রহণ করেন নাই, তবুও কিন্তু **১৯৩৫ সালের আইনের সুস্পষ্ট ছাপ** যে বর্তমান সংবিধানের উক্ত **দুই-তৃতীয়াংশে** রহিয়া গিয়াছে তাহা অনস্বীকার্য। উদাহরণস্বরূপ, ভারতীয় সংবিধানে 'রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা ঘোষণা'র proclamation on the breakdown of the constitutional machinery in the States) উল্লেখ করা যাইতে পারে। বর্তমান সংবিধানের ৩৫৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি যদি রাজ্যপালের নিকট হইতে সংবাদ পাইয়া বা অন্য কোন কারণে মনে করেন যে, সংশ্লিষ্ট রাজ্যের শাসনকার্য সংবিধান-নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে চলিতে পারে না, তবে তিনি ঐ রাজ্য সম্পর্কে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা ঘোষণা করিয়া উহাতে সাময়িকভাবে পার্লামেন্টীয় বা দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থার অবসান ঘটাইতে পারেন। এই ব্যবস্থাটি ১৯৩৫ সালের আইনের বিখ্যাত বা **কুখ্যাত ৯৩ ধারার** (Sec. 93) অনুকরণে রচিত। তবে পার্থক্য হইল যে, তখন প্রাদেশিক গভর্ণরগণই এই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিতেন, আর এখন রাজ্যপালের সুপারিশমত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন রাষ্ট্রপতি— অর্থাৎ কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগ (Union Executive)। ১৯৭৬ সালে সংবিধানের ৪২তম সংশোধন অনুসারে রাষ্ট্রপতি সকল ক্ষেত্রেই মন্ত্রি-পরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করিতে বাধ্য [৭৪ (১) অনুচ্ছেদ]।[২]

বৈশিষ্ট্য ও বিষয়গুলির কতটা ব্রিটিশ? অবশ্য পূর্ববর্তী বা ব্রিটিশ আমলের সংবিধান হইতে গৃহীত বলিয়াই যে বর্তমান সংবিধানের ব্যবস্থাসমূহ বিরুদ্ধ সমালোচনার যোগ্য, এরূপ বিচারবিহীন যুক্তির অবতারণা করা হইতেছে না। ব্রিটিশের নিকট হইতে আমরা যাহা পাইয়াছি তাহার সবটাই 'ব্রিটিশ ছাপ-মারা' নহে—ব্রিটিশের মাধ্যমেই আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে মাত্র। যেমন, **যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা কোনমতেই ব্রিটেনে উদ্ভূত নহে।** এমনকি, অনেকের মতে, সংসদীয় শাসন-ব্যবস্থাও ব্রিটেনের দান নহে। এই প্রসংগে অধ্যাপক বার্কার (Prof. Ernest Barker) বলেন যেখানেই **নির্বাচিত আইনসভা** বা **সংসদের মাধ্যমে** গণতান্ত্রিক শাসন-পদ্ধতির ব্যবস্থা

১. ৭৫ পৃষ্ঠা।

২. ১৯৭৮ সালের ৪৪তম সংশোধন অনুসারে রাষ্ট্রপতি কোন বিষয়কে মন্ত্রি-পরিষদের পুনর্বিবেচনার জন্য প্রেরণ করিতে পারেন মাত্র, কিন্তু পুনর্বিবেচনার পর পরামর্শ অনুসারে কার্য করিতে বাধ্য।

করা হইয়াছিল, সেখানেই সংসদীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছিল বলিয়া ধরা যায়। এই দিক দিয়া স্পেন সুইডেন হল্যাণ্ড সুইজারল্যাণ্ডে ইংল্যাণ্ডের সহিত একই সংগে বা ইংল্যাণ্ডের পূর্বেই সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।[১]

অবশ্য, সংসদীয় শাসন-ব্যবস্থা বা সরকার বলিতে যদি ব্রিটিশ অর্থে ক্যাবিনেট বা মন্ত্রি-পরিষদ-শাসিত সরকার বুঝান হয় তবে তাহা ব্রিটেনেরই অবদান। এই মন্ত্রি-পরিষদ-শাসিত সরকার ছাড়া শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কিত শাস্ত্রে ব্রিটেনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দানও আছে। উদাহরণস্বরূপ, **দ্বিপরিষদত্বের** (bicameralism) উল্লেখ করা যাইতে পারে। ব্রিটেনেই দ্বিপরিষদসম্পন্ন আইনসভার উদ্ভব ঘটে এবং এই ব্যবস্থা ক্রমশ সমগ্র পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়ে।

অতএব, ব্রিটিশ-প্রবর্তিত শাসন-ব্যবস্থা হইতে কতটা গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা দেখার পর আলোচনা করা প্রয়োজন যে, কতটা গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত হইয়াছে। আবার এই মূল্যায়নকার্যে অগ্রসর হওয়ার জন্য প্রয়োজন হইল সংবিধানের বাকী অংশের—অর্থাৎ যে অংশ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন হইতে গৃহীত হয় নাই তাহার—বিশ্লেষণের।

২.৪. **বিভিন্ন আধুনিক সংবিধান হইতে গৃহীত অন্যান্য ব্যবস্থা** : এই বাকী অংশের আকার সমগ্র সংবিধানের **এক-তৃতীয়াংশের মত**। কিন্তু ইহার মধ্যেই আছে ভারতীয় সংবিধানের বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ : প্রস্তাবনা (Preamble), মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights), রাষ্ট্র-পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি (Directive Principles of State Policy), ভোটাধিকার বিস্তারের ব্যবস্থা, সরকারী ভাষা সম্পর্কিত বিধান, ইত্যাদি। এইগুলি ব্রিটেনের দান না হইলেও অন্যান্য আধুনিক[২] সংবিধান হইতে গৃহীত। যেমন, মৌলিক অধিকারসংক্রান্ত অধ্যায়টি সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের** ও অন্যান্য সংবিধানের অনুসরণে এবং রাষ্ট্রের নির্দেশমূলক নীতিসমূহ সন্নিবেশিত হইয়াছে **আয়ারল্যাণ্ডের** শাসনতন্ত্রের অনুকরণে। তবুও বলা হয়, এইগুলির মধ্যেই ভারতীয় **সংবিধানের মৌলিকত্বের** সন্ধান পাওয়া যাইবে। এই অভিমত কতদূর গ্রহণযোগ্য তাহার আলোচনা '**প্রস্তাবনা**' (Preamble) হইতে সুরু করা যাইতে পারে, যাহাতে প্রতিফলিত হইয়াছে সংবিধান-প্রণেতৃবর্গের ধ্যানধারণা বা রাষ্ট্রদর্শন (political philosophy)।

৩. প্রস্তাবনা ও সংবিধানের দার্শনিক ভিত্তি (Philosophical Foundation of the Preamble and of the Constitution) :

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে মার্কিন সংবিধান-রচয়িতৃগণ সংবিধানের সহিত একটি প্রস্তাবনা সংযুক্ত করেন। তখন হইতে প্রস্তাবনা যেন লিখিত

১. **Barker** : ***Essays on Government***

২. পরে সন্নিবিষ্ট নাগরিকের মৌল কর্তব্য (**Fundamental Duties**) আধুনিক সংবিধান হইতে গৃহীত, যদিও বা ইহাকে প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের প্রতিফলন হিসাবে গণ্য করা যায়।

সংবিধানের একরূপ আংগিক উপাদানে পরিণত হইয়াছে—সকল লিখিত সংবিধানের প্রারম্ভে একটি করিয়া প্রস্তাবনা সংযুক্ত করা যেন রীতিতে দাঁড়াইয়াছে।

ব্রিটিশ আমলের সংবিধানসমূহেও প্রস্তাবনা সংযুক্ত ছিল, কিন্তু রাজনৈতিক আদর্শের দিক দিয়া এই সকল **প্রস্তাবনার বিশেষ গুরুত্ব ছিল না।** দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৯১৯ সালের শাসনতন্ত্রের (Government of India Act, 1919) উল্লেখ করা যাইতে পারে। ঐ শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাবনায় বলা হইয়াছিল : (১) ভারত চিরকালই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ থাকিবে ; (২) তবে ভারতের **দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থার উত্তরোত্তর সম্প্রসারণ** (progressive realisation of responsible government) করা হইবে ; (৩) কিন্তু কখন কিভাবে ইহা করা হইবে, তাহা নির্ধারণের ভার থাকিবে একমাত্র ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের উপর।

ক। পাশ্চাত্য রাজনৈতিক আদর্শ বা দর্শন : পরবর্তী সংবিধান অ. ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে কোন প্রস্তাবনা সংযুক্ত না করিয়া বলা হয় যে ১৯১৯ সালের আইনের মুখবন্ধই অক্ষুণ্ণ থাকিবে।[১] এই প্রস্তাবনায় 'দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থা' বা কিছুটা গণতান্ত্রিকতা ছাড়া অন্য কোন রাজনৈতিক আদর্শেরই উল্লেখ ছিল না—বিদেশী শাসক-প্রবর্তিত সংবিধানে ইহার বেশী আশাও করা যায় না। সুতরাং অনেকেই এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে ইহার সহিত যখন ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় উল্লিখিত আদর্শগুলির সহিত তুলনা করা হয় তখন চমৎকৃত না হইয়া—শ্রদ্ধা না জানাইয়া পারা যায় না।

বার্কারের প্রশংসা : বার্কার (Prof. Ernest Barker) তাঁহার শেষজীবনে লিখিত রাজনৈতিক রচনা 'Principles of Social and Political Theory'-তে ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনার সমগ্রটাই উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন : আমি এই প্রস্তাবনাটি উদ্ধৃত করিলাম এই কারণে যে, ইহার মধ্যেই এই গ্রন্থে আলোচিত সমগ্র উচ্চ রাজনৈতিক আদর্শের—যাহা সামগ্রিকভাবে পাশ্চাত্য রাজনৈতিক ঐতিহ্য (Western political tradition) বলিয়া অভিহিত—সন্ধান পাওয়া যাইবে। অধ্যাপক হোয়ারের (K. C. Wheare) মতে, ন্যায় স্বাধীনতা সাম্য মৈত্রীবন্ধন প্রভৃতি রাজনৈতিক আদর্শ প্রাচীন হইলেও উহাদের পুনরাবৃত্তি করিবার প্রয়োজন আছে। উনিশ শতকের সুরে গাঁথা হইলেও উহাদের প্রয়োজনীয়তা আজও ফুরায় নাই। কারণ, এই সকল আদর্শ কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

গ। ফরাসী ও রাশিয়ার বিপ্লবের আদর্শের সমন্বয় : অনেকে সংবিধানের প্রস্তাবনাকে অভিনন্দন জানাইয়া বলিয়াছেন যে ইহাতে ফরাসী বিপ্লব [যাহার বাণী ছিল 'স্বাধীনতা, ঐক্য এবং সৌভ্রাত্র' (Liberty, Equality and Fraternity)] এবং রাশিয়ার বিপ্লবের [যাহার উদ্দেশ্য ছিল **সামাজিক, অর্থনৈতিক** ও **সামাজিক**

১. Sec 311 of the Government of India Act, 1935.

ন্যায় (Social, Economic and Political Justice)] মধ্যে সার্থক সমন্বয় ঘটিয়াছে।[১]

৪. ঘোষিত আদর্শসমূহ (Incorporated Ideas): এখন দেখা যাক, আমাদের সংবিধানে ও প্রস্তাবনায় সংবিধানের কি কি আদর্শের কথা ঘোষণা করা হইয়াছে।

ক। জনগণের সার্বভৌমিকতা: প্রথমেই উল্লেখ করিতে হয়, ভারতীয় সংবিধানে যে-সকল আদর্শের কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহার সূচনা হয় ১৯৪৭ সালে নেহরু কর্তৃক প্রস্তাবিত ও গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত উদ্দেশ্য সংক্রান্ত প্রস্তাবে (Objectives Resolution)। ইহাতে **জনগণের সার্বভৌমিকতা, ভারতের স্বাধীনতা** ও **সার্বভৌমিকতা, অর্থনৈতিক রাজনৈতিক** ও **সামাজিক ন্যায়, সাম্য** ও **স্বাধীনতা** প্রভৃতি আদর্শের কথা সুস্পষ্টভাবেই ঘোষিত হয়। প্রধানত এই আদর্শগুলিই সংবিধানের প্রস্তাবনায় স্থান পাইয়াছে।

প্রস্তাবনার প্রারম্ভেই বলা হইয়াছে যে, ভারতীয় সংবিধান জনগণ কর্তৃক গৃহীত ও রচিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা **জনগণের সার্বভৌমিকতার** (popular sovereignty) নীতি স্বীকৃত হইয়াছে। মূল সংবিধানের প্রস্তাবনায় আর একটি সংকল্পের কথা বলা হয়। ইহা হইল ভারত সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রে (sovereign democratic republic) রূপান্তরিত হইবে। অর্থাৎ, ভারত এখন আর বৈদেশিক শক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারত সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত সমমর্যাদা ভোগ করে।

খ। গণতন্ত্র: আবার ভারতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করার আদর্শ গ্রহণ করা হইয়াছে। গণতন্ত্রের বিভিন্ন রূপ রহিয়াছে—যথা, রাজনৈতিক গণতন্ত্র, সামাজিক ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্র। ইহার মধ্যে **রাজনৈতিক গণতন্ত্র সংবিধানে স্বীকৃত হইয়াছে**, কারণ প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের ভোটাধিকার রহিয়াছে এবং প্রত্যেক নাগরিকের সমভাবে নির্বাচিত হওয়ার অধিকারও আছে।

---

১. **The Preamble is "the combination of two Great Revolutions in history —the French Revolution (which was inspired by the concepts of Liberty, Equality and Fraternity) and the Russian Revolution which was inspired by the concept of** Justice (according to Nehru)". M. N. Kaul: *Parliamentary Institutions and Procedures*

তবে একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে ফরাসী বিপ্লবের ফলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা। এরূপ সমাজে স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাত্র শূন্যগর্ভ আনুষ্ঠানিক আদর্শমাত্র। অপরদিকে রাশিয়ার বিপ্লবের আদর্শ ছিল শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন করিয়া মানুষের সর্বাংগীণ বিকাশের পথ খুলিয়া দেওয়া। একটি বিপ্লব হইল বুর্জোয়া বিপ্লব আর অপরটি হইল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। দুই-এর মধ্যে সমন্বয় কিভাবে সাধিত হইতে পারে তাহা উপলব্ধি করা কঠিন ...। **Refer Howard Selsam:** ***What is Philosophy*** **; also John Lewis' Article 'On Human Rights',** ***Human Rights*** **(A Symposium, Edited by UNESCO)**

স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পূর্বে অনেকেই মনে করিতেন যে রাজনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলেই জনসাধারণের সকল সমস্যার সমাধান হইবে। কিন্তু নিছক রাজনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করাই যথেষ্ট নয়। বস্তুত, দারিদ্র্যক্লিষ্ট, দুর্দশাগ্রস্ত ও বুভুক্ষিত জনগণের নিকট ভোটাধিকার নিছক উপহাস ভিন্ন আর কিছুই নয়।[১] এই কারণে সামাজিক অর্থনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া ব্যাপক দারিদ্র্য ও অশিক্ষা দূর করিতে হইবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। এই উপলব্ধি সংবিধান রচয়িতৃগণের ছিল না তাহা বলা যায় না। জওহরলাল নেহরু এবং ডঃ আম্বেদকারের বিভিন্ন উক্তি হইতে বুঝা যায় যে এই উপলব্ধি ছিল।[২]

গ। সামাজিক ন্যায়: এই কারণেই প্রস্তাবনায় উল্লেখ করা হইয়াছে যে সংবিধানের লক্ষ্য ও আদর্শ হইল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায় (Justice, social, economic and political) ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করা। অর্থাৎ, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শোষণের অবসান ঘটাইয়া, সামাজিক অর্থনৈতিক সম্পর্ককে সাম্যভিত্তিক করিয়া আপামর সাধারণকে দুর্দশা, দারিদ্র্য ও অকাম্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভেদাভেদের হাত হইতে মুক্ত করিয়া তাহাদের পূর্ণ বিকাশের সুযোগ করিয়া দিতে হইবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। রাজনৈতিক ন্যায়—অর্থাৎ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সকলের সমান অধিকার দেওয়াও এই **সামাজিক-অর্থনৈতিক ন্যায়ের** উপর ভিত্তিশীল।

ঘ। সাম্য: এই উদ্দেশ্যেই আবার সংবিধানের প্রস্তাবনায় ঘোষণা করা হইয়াছে যে সংবিধানের উদ্দেশ্য হইল সকলের মর্যাদা ও সুযোগের সমতা (Equality of status and of opportunity) সুনিশ্চিত করা। বলা হয় যে, এই আদর্শকে বাস্তব করার জন্য সংবিধানের **অন্যত্র সাম্য প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা** করা হইয়াছে। যেমন, মৌলিক অধিকারের অধ্যায়ে সাম্যের অধিকার (Right to Equality) অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে, সকল ব্যক্তি **আইনের চক্ষে সমান** এবং কোন ব্যক্তিকে **আইন কর্তৃক সমভাবে সংরক্ষিত** হওয়ার অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না।

---

১. "When India became free it was realised that the faith in the ability of political freedom to cure all socio-economic ills was no more than superstition." P. B. Gajendragadkar: *The Constitution of India: Its Philosophy and Basic Postulates*

২. "While we have established political democracy, it is also the desire that we should lay down as our ideal economic democracy", "Political democracy cannot last unless there lies at the base of it social democracy." Dr. Ambedkar. নেহরুও অনুরূপ উক্তি করিয়া বলিয়াছেন: 'The service of India means the service of the millions who suffer. It means the ending of poverty and ignorance and disease and inequality of opportunity ... as long as there are tears and suffering, our work will not be over."

করা হয়: **সমাজতন্ত্রবাদ** (socialism)[১] ও **ধর্ম-নিরপেক্ষতা** (secularism); এবং নাগরিকের মৌল কর্তব্যের (Fundamental Duties of the Citizen) উপর একটি অধ্যায়ও যোগ করা হয়। ফলে আদর্শগত দিক দিয়া ভারতীয় সংবিধান হইয়া দাঁড়াইয়াছে বিশেষ ব্যাপক এবং পাশ্চাত্য ও ভারতীয় আদর্শের প্রতিফলন। স্মরণ রাখিতে হইবে যে **ভারতীয় রাজনৈতিক আদর্শ অধিকার অপেক্ষা কর্তব্যের উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ** করে। মনু হইতে সুরু করিয়া মহাত্মা গান্ধী—সকল চিন্তাবিদের রচনাতেই এই বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়, যাহা পাশ্চাত্য রাজনৈতিক সাহিত্যে অতটা পরিমাণে দেখা যায় না। অবশ্য বলা যায়, নাগরিকের মৌল কর্তব্যের অন্তর্ভুক্তি সোবিয়েত, চৈনিক ইত্যাদি দেশের সংবিধানকে অনুসরণ করিয়াই করা হইয়াছে, প্রাচীন ভারতের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য নয়।[২] সন্নিবিষ্ট মৌল কর্তব্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হইতেছে।

৫. ঘোষিত আদর্শসমূহ কতটা প্রতিফলিত: মোটামুটিভাবে বলা যায়, প্রস্তাবনা অবশ্যই সংবিধানের কার্যকর অংশের (operative parts) অন্তর্ভুক্ত নয় বলিয়া সংবিধানে রাজনৈতিক আদর্শের প্রতিফলনের দিক দিয়া প্রস্তাবনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা অযৌক্তিক। কিন্তু যেহেতু প্রস্তাবনায় সংবিধান রচয়িতৃগণের ইচ্ছা ও আদর্শ ব্যক্ত হয়, সেইহেতু সংবিধানের স্বরূপ অনুধাবনে প্রস্তাবনার তাৎপর্য উপেক্ষা করিতে পারা যায় না। যদি প্রস্তাবনায় অধিকার স্বাধীনতা সাম্য মৈত্রী প্রভৃতির উল্লেখ থাকে তবে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, সংবিধানের কার্যকরী অংশেও এই সকল আদর্শের প্রতিফলন দেখা যায়। তবুও বলা যায় যে প্রস্তাবনার আদর্শগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করিতে হইলে সাম্যভিত্তিক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা প্রবর্তন করা প্রয়োজন। এদিক হইতে ভারতীয় সমাজ ত্রুটিমুক্ত নয়। কারণ, এই সমাজ এখনও সাম্যভিত্তিক নয়—অর্থনৈতিক বৈষম্য অতি প্রকট এবং ব্যক্তিগত মালিকানার কোন অবসান ঘটানো হয় নাই।

৬. আদর্শ ও উপাদানের কতটা পাশ্চাত্য কতটা ভারতীয়?: কিন্তু বক্তব্য হইল, যে-সকল আদর্শ ও উপাদান ভারতীয় সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে **মূলত** তাহা **পাশ্চাত্য তত্ত্ব ও জীবন হইতেই গৃহীত**, ভারতীয় রাজনৈতিক ধ্যানধারণা সংবিধানে (নাগরিকের মৌল কর্তব্য সন্নিবিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও) বিশেষ স্থান পায় নাই। অবশ্য গ্রাম-পঞ্চায়েত গঠন, মাদক দ্রব্যের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ, গোহত্যা

১. এই প্রসংগে উল্লেখ্য যে 'সমাজতন্ত্র' শব্দটি অস্পষ্টতা দোষে দুষ্ট। কারণ, শব্দটির নানা ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। মার্ক্সীয় দৃষ্টিতে দেখা হইলে ইহার দ্বারা বুঝায় যে উৎপাদনের উপায়সমূহের উপর মালিকানা ও উৎপন্নের বণ্টন সমাজের হাতে থাকিবে। ভারতের বর্তমান শাসকশ্রেণীর মতে, ইহার দ্বারা বুঝায় **সমাজতান্ত্রিক ধরনের সমাজ ও মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা।** আদালত ইহাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করিবে তাহা সঠিকভাবে এখনই বলা যায় না। Refer D. D Basu: *Constitution Law of India*

২. ১০৬ পৃষ্ঠার ২নং পাদটীকা দেখ।

ও দুগ্ধবতী পশুহত্যা নিষিদ্ধকরণ ইত্যাদির জন্য সংবিধানের যে নির্দেশ তাহাকে গান্ধীবাদের প্রতিফলনের ন্যায় ভারতীয় ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। এবং ডক্টর সর্বপল্লী **রাধাকৃষ্ণণ প্রমুখের** মতে, ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় উল্লিখিত ন্যায় স্বাধীনতা সাম্য মৈত্রীবন্ধন প্রভৃতিও ভারতীয় রাজনৈতিক আদর্শের দ্যোতক।

এই অভিমত মানিয়া লইলেও ভারতীয় সংবিধানে ভারতীয় রাজনৈতিক আদর্শের অতি সামান্য বা প্রায় একপ্রকার উপেক্ষণীয় প্রকাশে বিস্মিত না হইয়া পারা যায় না। তবে পূর্বোল্লিখিত নাগরিকের মৌল কর্তব্য সংবিধানে সন্নিবিষ্ট করিয়া এ-ব্যাপারে কিছুটা ত্রুটি দূর করা হইয়াছে। পুনরুক্তি করা যাইতে পারে যে, ভারতীয় রাজনৈতিক ঐতিহ্যের মূলকথা হইল কর্তব্য বা দায়িত্ব, অধিকার নহে। কিন্তু মূল সংবিধানে নাগরিকদের কোন কর্তব্যের উল্লেখ করা হয় নাই, শুধু অধিকারের কথাই ছিল। মাত্র রাষ্ট্রের নির্দেশমূলক নীতির অধ্যায়টিতে শাসকবর্গের দায়িত্বের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হইয়াছিল। অনেকে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, সংগে সংগে যদি নাগরিকদের দায়িত্বের একটি তালিকা দেওয়া হইত এবং উহা যদি অধিকারের সংগে সংযুক্ত করা হইত—অর্থাৎ যদি ঐ সকল কর্তব্য পালন না করিলে অধিকার ভোগ না করা যাইত, তবে জাতীয় সংহতির সমস্যা (the problem of national integration) এরূপ আকার ধারণ করিত না।

সম্প্রতি সন্নিবিষ্ট মৌল কর্তব্যের প্রকৃতি: ৪২তম সংশোধন (১৯৭৬) দ্বারা অবশ্য নাগরিক-দায়িত্ব বা নাগরিকের মৌল কর্তব্য সংবিধানভুক্ত করা হইলেও ঐ সকল **কর্তব্যকে অধিকারভোগের সহিত সংযুক্ত করা হয় নাই।** আবার নাগরিক এই সকল মৌল কর্তব্য পালন না করিলে কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের কথাও সংবিধানে বলা হয় নাই। সুতরাং প্রকৃতিতে **মৌল কর্তব্যসকল মাত্র সংবিধানের আশা-আকাংক্ষাই ব্যক্ত করে,** এবং এদিক দিয়া উহারা রাষ্ট্রের নির্দেশমূলক নীতিসমূহের সহিতই তুলনীয়। তবে বলা যায়, নির্দেশমূলক নীতিসমূহকে উপেক্ষা করিলে শাসকবর্গকে জনসাধারণের নিকট একরূপ জবাবদিহি করিতে হয়, কিন্তু মৌল কর্তব্য পালন না করিলে নাগরিকদের ঐরূপ কোন ভীতি নাই।

আবার প্রাচীন ভারতে সমাজ ও রাষ্ট্র উভয়ই ছিল **'ধর্ম'-শাসিত।**[1] ধর্ম বলিতে ভারতীয়রা কোন আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বা উপাসনা-পদ্ধতি বুঝেন নাই, বুঝিয়াছিলেন মহান লক্ষ্যাভিমুখে প্রসারিত জীবন-পদ্ধতিকে (way of life)। অতএব, ভারতীয়দের নিকট যে-সকল বিধিনিয়ম সুন্দর কাম্য জীবনের অনুপন্থী বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল, সামগ্রিকভাবে তাহারাই ছিল 'ধর্ম' (*Dharma*)। ন্যায় (Justice), আইনের অনুশাসন (The Rule of Law) প্রভৃতি হইতে ধর্মের ধারণা মহত্তর এবং এই সকল আদর্শ ধর্মেরই অংগীভূত। এই মহত্তর আদর্শ—ধর্মের কথা ভারতীয় সংবিধানে কোথাও উল্লিখিত হয় নাই। বলা হয়, অন্তত সংবিধানের প্রস্তাবনায় যদি ন্যায় স্বাধীনতা সাম্য ইত্যাদির সংগে **'ধর্ম'** বা **কল্যাণকৃৎ চরম বিধির** (benevolent supreme law) উল্লেখ করা হইত, তবে প্রস্তাবনাটি পাশ্চাত্য আদর্শ ও ভারতীয় ঐতিহ্যের সমন্বয়ে অনন্যসাধারণ রূপ ধারণ করিত।

---

১. ভূদেব মুখোপাধ্যায়: সামাজিক প্রবন্ধ

আরও বলা যায়, গান্ধীবাদ বা ভারতীয় আদর্শের অনুসরণে গ্রাম-পঞ্চায়েত গঠনের নির্দেশ দেওয়া হইলেও **পৌর স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থাকে** (urban local self-government) **সেই পাশ্চাত্য কাঠামোর মধ্যে রাখা হইয়াছে।** সুতরাং প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসরণের যে-সামান্য প্রচেষ্টা করা হইয়াছে, তাহার মধ্যেও খাদ রহিয়াছে। অতএব, এই অভিমত প্রকাশ করা যায় যে, অতীতের সহিত বর্তমান জীবনের যোগসূত্র প্রায় ছিন্ন হইয়াই গিয়াছে।[১]

অবশেষে যাই বলা হোক না কেন, সংবিধানে যে-সকল আদর্শের কথা বলা হইয়াছে সেগুলিকে ভারতে বর্তমানে প্রচলিত সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে না বিচার করিলে বাস্তবক্ষেত্রে উহাদের প্রকৃত তাৎপর্য ও মূল্য সম্যকভাবে নির্ধারণ করা যাইবে না। কারণ, এই আদর্শগুলি সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের (social and economic relations) সহিত ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট। ইতিপূর্বেই এসম্পর্কে কিছুটা ইংগিত দেওয়া হইয়াছে। আর একটু বিস্তৃততর আলোচনার অবকাশ আছে বলিয়া মনে হয়। সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক ন্যায়, চিন্তা, মতামত প্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম ও উপাসনার স্বাধীনতা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও সুযোগের সমতা ; ব্যক্তির মর্যাদা ও জাতীয় ঐক্য ও সংহতি ; ধর্মনিরপেক্ষ সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র ; প্রভৃতি আদর্শগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করিতে হইলে **সমাজতন্ত্র গড়িয়া অর্থ-ব্যবস্থাকে শোষণমুক্ত ও সাম্যভিত্তিক** করা প্রয়োজন। অর্থাৎ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যভিত্তিক অর্থ-ব্যবস্থার অবসান ঘটাইয়া সমাজতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থা প্রবর্তিত করিতে হইবে। অর্থনৈতিক ন্যায় ব্যতীত রাজনৈতিক বা সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভবপর নয়।

---

৮. মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা : বর্তমান ভারতের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে ভারতে এখনও ব্যক্তিগত উদ্যোগের অবসান করা হয় নাই। যাহা প্রবর্তিত করা হইয়াছে তাহা হইল মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা (mixed) বা জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র। এই মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা উদারনৈতিক ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্রেরই দ্যোতক। ইহাতে মুষ্টিমেয় সম্পত্তিশালী শ্রেণীর স্বার্থ ও সম্পত্তিবিহীন অসংখ্য জনস্বার্থের মধ্যে এক সমঝোতা করিবার প্রবণতা দেখা যায়। কিন্তু এই সমঝোতার মাধ্যমে সমাজে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করা যায় না। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে স্বাধীনতা, সাম্য ও অধিকার থাকিতে পারে না।[২] বস্তুত দেখা যায় যে, ভারতের বর্তমান অর্থ-ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত উদ্যোগের প্রাধান্য এখনও রহিয়াছে।

১. কোন কোন লেখকের মতে, অবশ্য ভারতীয় সংবিধান মূলতঃ পাশ্চাত্য তত্ত্ব ও জীবনের ভিত্তিতে রচিত হইলেও উহার শাসনতান্ত্রিক গঠন (administrative structure) হইল প্রধানত ভারতীয়। মৌর্য সাম্রাজ্য হইতে সুরু করিয়া মুঘল আমল অবধি যে শাসনতান্ত্রিক গঠন বিবর্তিত হইয়াছিল স্বাধীন ভারত মোটামুটি তাহাই গ্রহণ করিয়াছে। ইহাতে ব্রিটিশ ছাপ-মারা থাকিলেও উপাদানের দিক দিয়া ইহা একান্তভাবে ভারতীয়। Panikkar : *The Foundations of New India*

২. Refer C. B. McPherson : *Democratic Theory—essays in retrieval* (Clarendon Press—Oxford, 1973)

৯. **নেতিবাচক মৌলিক অধিকার**: ইহা ছাড়া সংবিধানে যে মৌলিক অধিকারগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে সেগুলি প্রধানত নেতিবাচক—অর্থাৎ ব্যক্তিগত অধিকারগুলিকে প্রধানত রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ হইতে বিমুক্ত রাখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এই সকল অধিকারকে সার্থক করিবার জন্য অর্থনৈতিক ভিত্তির ব্যবস্থা করা হয় নাই। অনেক সময়ই বলা হয় যে অধিকারগুলিকে কার্যকর করার জন্য বিচারালয় রহিয়াছে। এই যুক্তির বিরুদ্ধে কতকগুলি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। যেমন, বলা হয় দারিদ্র্যক্লিষ্ট ব্যক্তিদের পক্ষে ব্যয়বাহুল্যের জন্য আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করা সম্ভব হয় না এবং যোগ্য কৌঁসুলি নিয়োগ করা দরিদ্রশ্রেণীর আয়ত্তের বাইরে থাকিয়া যায়।[১] ইহা ছাড়া আদালতে অধিকারভংগের অভিযোগ না আনা হইলে আদালত কোন অধিকার সম্পর্কে বিচার করিতে পারে না। আর একটি দিক দিয়াও আদালতে ন্যায়বিচার পাওয়া কষ্টসাধ্য। শিক্ষাদীক্ষা ও নিয়োগ-পদ্ধতি বিচারকদের দৃষ্টিভংগি আর্থিক প্রতিপত্তিশালী শ্রেণীর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন করিয়া তুলে। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। আবার দেখা যায় যে, **গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকারসমূহকে নির্দেশমূলক নীতিরূপে** উপস্থাপিত করা হইয়াছে। যেমন, কর্মের অধিকার, অবসর ভোগ করার অধিকার, সমান কার্যের জন্য সমান বেতন পাওয়ার অধিকার, শিক্ষার অধিকার, বেকারাবস্থায় বার্ধক্যে পীড়িতাবস্থায় অংগহানি হইলে অথবা অন্যভাবে অনুচিত অভাবে পড়িলে সাহায্যপ্রাপ্তির অধিকার, জীবনধারণের উপযোগী মজুরিপ্রাপ্তির অধিকার প্রভৃতি হইল নির্দেশমূলক নীতি—মৌলিক অধিকার নয়। অবশ্য নির্দেশমূলক নীতিসংক্রান্ত অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল দেখা যে সর্বসাধারণের হিতার্থে দেশের সম্পদের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ যেন বণ্টিত হয় এবং যেন সম্পদ ও উৎপাদনের উপায়সমূহ মুষ্টিমেয় লোকের হাতে পুঞ্জীভূত না হয় (অনুচ্ছেদ ৩৯)। এই সকল নির্দেশমূলক নীতিসমূহ কার্যকর করা কিন্তু রাষ্ট্রের পক্ষে বাধ্যতামূলক নয় এবং উহারা আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্যও নয়।[২]

---

১. **"There is no gainsaying the fact that *we are saddled with a legal system which is out of the reach of the vast bulk of the people.* ......It is surprising that our governments while professing to be anxious to do social justice should be wholly indifferent in making available to the poor the benefit of the rule of law."** ***Justice Hegde***

২. প্রসংগত উল্লেখ্য যে নির্দেশমূলক নীতিকে মৌলিক অধিকারের উপর প্রাধান্য দেওয়ার জন্য সংবিধানের ৪২তম সংশোধন (১৯৭৬) বলা হইয়াছিল যে নির্দেশমূলক নীতিসমূহে কার্য করার জন্য আইন পাস করা হইলে উহা মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত সাম্যের অধিকার ও স্বাধীনতার অধিকার ভংগ করিয়াছে বলিয়া অবৈধ হইবে না। আর বলা হইয়াছিল, পার্লামেন্ট মৌলিক অধিকারসহ সংবিধানের যে কোন অংশের সংশোধন করিতে পারিবে। উভয় ক্ষেত্রেই আদালতে বৈধতার প্রশ্ন তোলা যাইবে না। ১৯৮০ সালে মিনার্ভা মিলস মামলায় (Minerva Mills Case) উপরি-উক্ত সংশোধনের দুইটি বিষয়কেই অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে এই কারণে যে উহাদের দ্বারা সংবিধানের মৌলিক বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছে। ইহার ফলাফল দাঁড়াইয়াছে যে নির্দেশমূলক নীতিসমূহ মৌলিক অধিকারের উপর প্রাধান্য পাইবে না—মৌলিক অধিকারকে নির্দেশমূলক নীতিসমূহকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কার্যকর করিতে হইবে। ইহার **তাৎপর্য**: নেতিবাচক মৌলিক অধিকারগুলিই প্রাধান্য পাইবে ইতিবাচক সামাজিক অধিকারগুলি নয়।

১০. নির্দেশমূলক নীতিসমূহ কি তাৎপর্যহীন ? এই কারণে অনেকেই মন্তব্য করিয়াছেন যে এই নীতিগুলি **নিছক সদিচ্ছা** (mere pious wishes) ছাড়া আর কিছুই নয়।[১] পূর্বেই বলা হইয়াছে যে বর্তমান ব্যক্তিগত উদ্যোগপ্রধান মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রস্তাবনায় উল্লিখিত অর্থনৈতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক ন্যায়, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র, স্বাধীনতার অধিকার, সৌভ্রাত্র, জাতীয় ঐক্য প্রভৃতি আদর্শকে রূপায়িত করা একরূপ অসম্ভব। এগুলিকে রূপায়িত করিতে হইলে এবং জনগণের জীবনে তাৎপর্যপূর্ণ করিয়া তুলিতে হইলে সমাজতন্ত্র গড়িয়া অর্থ ও সমাজ ব্যবস্থাকে শোষণমুক্ত সাম্যভিত্তিক করা প্রয়োজন—অর্থাৎ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদভিত্তিক অর্থ-ব্যবস্থার অবসান ঘটাইয়া সমাজতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থা প্রবর্তিত করিতে হইবে। অবশ্য ইহা সহজ কার্য নয়—ইহার জন্য অব্যাহত প্রচেষ্টা ও বিরতিবিহীন সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে হইবে।

এই আলোচনা হইতে ইহা উপলব্ধি করা যায় যে প্রস্তাবনার আদর্শগুলি অন্যনিরপেক্ষ নয় ; এগুলি দেশের সমাজ ও অর্থ ব্যবস্থার আপেক্ষিক। সুতরাং আমাদের বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়া দেখা দরকার যে সংবিধানের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভিত্তি কোন প্রকারের। এই আলোচনাই এখন করা হইতেছে।

১১. সংবিধানের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভিত্তি—দুই সমাজতান্ত্রিক দেশের সহিত তুলনা : সোবিয়েত দেশ বা চীনের সংবিধানে যেভাবে উহাদের সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি কি এবং শ্রেণীপ্রকৃতি কি বর্ণনা করা হইয়াছে ঠিক সেইভাবে ভারতীয় সংবিধানে ভারতীয় সমাজের শ্রেণীবিন্যাস বা অর্থনৈতিক ভিত্তি কি তাহা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করা হয় নাই। সোবিয়েত দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি হইল সমাজতন্ত্র। উৎপাদনের উপায়সমূহের (means of production) মালিকানা সমাজের। ঐ দেশে শ্রেণীবিভাগ হইল কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণী। ইহা ছাড়া রহিয়াছে বুদ্ধিজীবী। ইহারা সকলে বন্ধুত্বের সূত্রে গ্রথিত। শ্রমিক ও কৃষকের মিলিত প্রয়াসে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের প্রয়োজনীয়তা চৈনিক সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত।

১১.ক. অর্থনৈতিক ভিত্তি : ভারতীয় সংবিধানে ভারতীয় রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্র কি অথবা অর্থ-ব্যবস্থা কি প্রকার তাহা প্রত্যক্ষ বা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত না হইলেও ভারতীয় সংবিধানের অর্থনৈতিক ভিত্তি সম্বন্ধে এক কথায় বলা যায় যে, উহা **ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ** ছাড়া আর কিছুই নয়। অবশ্য এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ লক বা অ্যাডাম স্মিথের পূর্ণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ নহে—ইহাকে 'গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র' (Democratic Socialism) বলিয়া অভিহিত করা চলে, যাহা আধুনিক রূপে **নিয়ন্ত্রণ-সহ মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা**

১. "While appreciating the distinction between justiciable and non-justiciable rights, I feel that owing to the very fact of making the distinction, the latter are likely to be treated as so many pious wishes, which can have no very great binding effect in daily life." K. T. Shah

(Mixed Economy with Control) নামে আখ্যাত।[১] এইরূপ অর্থ-ব্যবস্থা সমগ্র উন্মুক্ত সমাজেই (open society) প্রবর্তিত।[২] তফাৎ হইল মাত্র নিয়ন্ত্রণের পরিমাণের ও সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের (public sector) আয়তনের। অর্থাৎ, পার্থক্য সম্পূর্ণ পরিমাণগত, প্রকৃতিগত নহে।

১১.খ. ঘোষিত সমাজতন্ত্রের তাৎপর্য: অবশ্য একদিক দিয়া ইহাকে গান্ধীজীর ধর্মীয় নৈরাজ্যবাদ (religious anarchism) অপেক্ষা জওহরলাল নেহরুর গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদের প্রতিফলন হিসাবে গ্রহণ করা চলে। তবুও বলা যায়, সংবিধানের প্রস্তাবনায় যে অর্থনৈতিক ন্যায় (economic justice) এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংকল্প ব্যক্ত হইয়াছে তাহার তাৎপর্য অতি সামান্য। ইহার অর্থ, ভারত-রাষ্ট্র অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস করিয়া, উৎপাদনের উপায়সমূহের মালিকানা ক্রমশ রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়া বিবর্তনশীল সমাজতন্ত্রের (evolutionary socialism) পথে চলিবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হইতে সকল উন্মুক্ত সমাজের গতিই যে এই দিকে তাহা অস্বীকার করা যায় কিরূপে?

বস্তুত, সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদ বিশ্লেষণ করা হইলে এবং গণপরিষদের প্রধান প্রবক্তাদের (নেহরু, প্যাটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, আজাদ প্রভৃতি) মতামত বিচার করা হইলে দেখা যাইবে যে **ভারত ব্রিটিশ ধরনের কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র ও মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থার নীতি গ্রহণ করিয়াছে।**[৩] সংবিধানের খসড়া রচনার দায়িত্ব যাঁহাদের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছিল তাঁহারা ব্রিটিশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানকে এবং ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনকে অনুসরণ করিয়াছিলেন। সুতরাং ভারতীয় গণপরিষদ যে যুক্তরাজ্যের (the United Kingdom) সংবিধানকে অনুসরণ করিয়া ধনতান্ত্রিক কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র প্রবর্তন করিবে ইহাতে আশ্চর্যের কিছু নাই। এই কারণেই অনেক মার্ক্সবাদী লেখক ভারতকে **মূলত ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র** বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।[৪] ইঁহাদের মতে, ভারত ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই সামাজিক ও **অর্থনৈতিক** উন্নয়নের পথে অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু যে-সময় ভারত ধনতন্ত্রের পথে পদসঞ্চার করিয়াছে সেই সময়ই সর্বত্র ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা সংকুচিত হইয়া আসিয়াছে। বিশেষ করিয়া ভারতের পক্ষে

১. নামকরণ নোবেল পুরস্কারবিজয়ী অধ্যাপক পল স্যামুয়েলসনের।

২. উন্মুক্ত সমাজের দুই প্রকার অর্থ করা হয়: (ক) রাজনৈতিক দিক দিয়া তাহাকেই উন্মুক্ত সমাজ বলা হয় যাহার সম্বন্ধে মোটামুটি সবকিছু খোলাখুলিভাবে জানা যায়। (খ) অর্থনৈতিক অর্থে উন্মুক্ত সমাজ বলিতে সেই দেশকেই বুঝায় যাহা অন্যান্য দেশের সহিত সরাসরি ব্যবসাবাণিজ্য চালায়।

৩. "The belief in parliamentary government seemed, in fact, to be nearly universal...nearly everyone in the Assembly was **Fabian and Laski-ite** enough to believe that 'socialism' is ***everyday politics for social regenaration*** and that 'democratic constitutions are inseparately associated with the drive towards economic equality'." G. Austin: ***The Indian Constitution***

৪. A. R. Desai: ***Recent Trends in Indian Nationalism***; D. N. Sen: ***The Paradox of Freedom***

আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজার ক্রমশ সীমাবদ্ধ হইতেছে এবং আর্থিক বৈষম্যও বাড়িয়া চলিয়াছে।

মোটকথা, সমাজতন্ত্রবাদ (Socialism), গণতন্ত্র (Democracy), ইত্যাদি শুধু রাজনৈতিক আদর্শই নহে, **উল্লাসকর শব্দও** (hurrah word) বটে। আধুনিক যুগে ইহাদের উপেক্ষা করা কঠিন। মার্কিন সংবিধান প্রণয়নের সময় মানুষের অধিকার (Rights of Man) মানুষের মনকে যেরূপ আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছিল বর্তমানে সমাজতন্ত্রবাদের ভূমিকা ঠিক অনুরূপ। সুতরাং অতীত নহে, বর্তমানের ধাঁচেই সংবিধানের সংশোধন করা হইতেছে—সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা যে আমাদের লক্ষ্য তাহাই ঘোষণা করা হইয়াছে।

১১.গ. সম্পত্তির অধিকার বিলুপ্ত হয় নাই : ভারতের সমাজ ও অর্থ ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 'সমাজতন্ত্র' শব্দটির তাৎপর্য কি তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতে পারে। পূর্ণাংগ অর্থে সমাজতন্ত্র বলিতে বুঝায় উৎপাদনের উপায়সমূহের ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটাইয়া সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা করা এবং সমাজ কর্তৃক উৎপন্ন সম্পদের বণ্টনের ব্যবস্থা করা। মূল (ভারতীয়) সংবিধানের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃত হইয়াছিল এবং যে-ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাষ্ট্র কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইত সে-ক্ষেত্রে তাহার জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। যদিও ৪৪তম সংশোধন দ্বারা সম্পত্তির অধিকার মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত অধ্যায় হইতে সরাইয়া লওয়া হইয়াছে তবুও কিন্তু ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকারের বিলোপসাধন করা হয় নাই। বলা হইয়াছে, এই অধিকার এখন সাধারণ আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে (will be a statutory right)। সংবিধানে ঘোষণা করা হইয়াছে যে **কাহাকেও আইন ব্যতীত সম্পত্তির অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না** (No person shall be deprived of his property save by authority of law.—Art. 300A)। সুতরাং ভারতীয় অর্থ-ব্যবস্থা হইল পূর্বোক্ত মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা এবং ব্যক্তিগত ও সরকারী উভয় উদ্যোগেই অর্থনৈতিক কাজকর্ম পরিচালিত হইবে।[১]

১১.ঘ. নির্দেশমূলক নীতি সংক্রান্ত অধ্যায়ে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা : অবশ্য নির্দেশমূলক নীতি (Directive Principles) সংক্রান্ত অধ্যায়ে কতকগুলি **সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের কথা** রহিয়াছে। যেমন, বলা হইয়াছে যে রাষ্ট্র এমন একটি সমাজ-ব্যবস্থার প্রবর্তন করিতে চেষ্টা করিবে যাহাতে জাতীয় জীবনের সর্বত্র সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা হয়। রাষ্ট্র এমনভাবে নীতি পরিচালনা করিবে

১. "The Indian Constitution, therefore, does *not seek to abolish private property* altogether but seeks to put it under restraints so that it may be used in the interests of the nation, which includes the upliftment of the poor. Instead of a total nationalisation of all property and industry, it envisages a 'mixed economy', but aims at offering 'equal opportunity' to all, and the abolition of vested interests." D. D. Basu : *Introduction to the Constitution of India*

যেন—(১) স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে নাগরিকগণ পর্যাপ্ত জীবিকার্জনের অধিকার ভোগ করিতে পারে; (২) সর্বসাধারণের হিতার্থে সম্পদের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ বণ্টিত হয়; এবং (৩) অর্থ-ব্যবস্থার ফলে যাহাতে ধন ও উৎপাদনের উপায়সমূহ মুষ্টিমেয় লোকের হস্তগত হইয়া জনসাধারণের স্বার্থের হানি না করে। (৪) রাষ্ট্রকে কর্মের অধিকার ও বেকার অবস্থায়, বার্ধক্যে ও রোগগ্রস্ত হইলে সরকারী সাহায্য পাওয়ার অধিকার সুনিশ্চিত করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। (৫) যাহাতে শ্রমিকরা শিল্প-পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিতে পারে তাহার জন্য রাষ্ট্রকে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

এই সকল প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত নীতিগুলি ছাড়াও সংবিধানে অন্যান্য নীতির কথাও রহিয়াছে।

উপরি-উক্ত নীতিগুলি **সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের হইলেও প্রকৃতপক্ষে ঐগুলি কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র বা মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থারই দ্যোতক।** উদারনৈতিক গণতন্ত্রে বিশ্বাসী লেখকগণ মনে করেন, জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থাদি এবং মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থার মাধ্যমেই স্থিতিশীল সাম্যভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত করা যাইবে। অপরদিকে মার্ক্সবাদী লেখকগণ বিশ্বাস করেন যে, এইরূপ রাষ্ট্র বা অর্থ-ব্যবস্থা সমাজে মৌল পরিবর্তন আনয়ন করিতে পারে না—সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান করিয়া শ্রেণীবিহীন সমাজ গঠন করিতে পারে না।[১]

মার্ক্সবাদীদের ধারণায় সমাজের শ্রেণীবিন্যাসের বা শ্রেণীভিত্তিক বিশ্লেষণ ব্যতীত রাষ্ট্রের চরিত্র ও প্রকৃতি উপলব্ধি করা যায় না।[২] সুতরাং তাঁহারা ভারতীয় রাষ্ট্রের শ্রেণীবিন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভাবনার বিচার করিয়া থাকেন।

১২. ভারত-রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্র (Class Character of the Indian State): এখন দেখা যাক মার্ক্সবাদীদের মতে ভারত-রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্র কি ধরনের এবং কি ধরনের অর্থ-ব্যবস্থার উপর সংবিধান ভিত্তিশীল। আমরা এই আলোচনাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া করিতে পারি: (ক) শিল্পক্ষেত্রে শ্রেণীবিন্যাস, (খ) কৃষিক্ষেত্রে শ্রেণীবিন্যাস।

১২.১. শিল্পক্ষেত্রে শ্রেণীবিন্যাস: পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে ভারতীয় সংবিধানের অর্থনৈতিক ভিত্তি হইল মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা। মূল সংবিধানে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার স্বীকৃত ছিল। ভূমিসংস্কার সংক্রান্ত আইন পাস করা হইলেও জমিদারদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইয়াছে। জমিদারদের মধ্যে অনেকেই পুঁজিপতি বা সংগতিপন্ন চাষী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিদেশীদের ক্ষেত্রেও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা ছিল। বর্তমানে সংবিধানের ৪৪তম সংশোধনের ফলে সম্পত্তির অধিকার আর মৌলিক অধিকার নহে। তবে

---

১. **R. Miliband:** *The State in Capitalist Society*

২. "One of the methods of determining the nature of the state is to examine the mode of production and see which class or classes own and control the means of production." *India and Society—A Marxian Approach* (edited by K. Mathew Kurian)

সংবিধানের অন্যত্র [৩০০ (ক) অনুচ্ছেদ] বলা হইয়াছে কাহাকেও আইন ব্যতীত সম্পত্তির অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না। সুতরাং অবস্থাটা দাঁড়াইয়াছে যে রাষ্ট্র কর্তৃক সম্পত্তি অধিগ্রহণ আইন দ্বারা স্থিরীকৃত হইবে। ইহা ব্যতীত সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত দেশীয় নৃপতিদের রাজন্যভাতা (privy purse) দেওয়ার ব্যবস্থা অব্যাহত ছিল। নৃপতিদের মধ্যে অনেকেই এখন ব্যবসায় লিপ্ত হইয়াছেন।

শিল্পক্ষেত্রে যে এখনও ব্যক্তিগত মালিকানা বজায় রহিয়াছে তাহা ভারত সরকারের শিল্পনীতি হইতে বুঝা যায়। এই শিল্পনীতি প্রথমে ঘোষণা করা হয় ১৯৪৮ সালে এবং পরে ১৯৫৬ সালে ইহা কিছুটা সংশোধিত হয়। বর্তমানে এই নীতিকে অনুসরণ করা হইতেছে। ১৯৪৮ সালের নীতিতে সুস্পষ্টভাবেই ঘোষণা করা হয় যে সরকারী নীতি হইল মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থাকে অবলম্বন করিয়া অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে অগ্রসর হওয়া। অর্থাৎ, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ও ব্যক্তিগত উদ্যোগ পাশাপাশি চালু থাকিবে।

১৯৫৬ সালের সংশোধনও মোটামুটিভাবে মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখে, যদিও পরবর্তী সময়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগের ক্ষেত্র ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রকে ভাগাভাগি করিয়া দেওয়া হয়।[১] ইহার পর যৌথ উদ্যোগের ক্ষেত্রের (Joint Sector) ধারণা চালু করা হয়, এবং ১৯৮৫ সাল হইতে ব্যক্তিগত উদ্যোগের ক্ষেত্রের (Private Sector) উপর পুনঃপ্রাধান্য দেওয়া হইতেছে।

অভিযোগ করা হয় যে ভারত ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অবলম্বন করিয়াই অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে অগ্রসর হইয়াছে। সরকার কর্তৃক অনুসৃত শিল্পনীতি প্রায় সকল ভোগ্যপণ্য উৎপাদন ব্যক্তিগত উদ্যোগের হাতে ছাড়িয়া দিয়াছে। মূলধন-দ্রব্যাদির ক্ষেত্রেও ব্যক্তিগত উদ্যোগের ভূমিকা নগণ্য নয়। সুতরাং ব্যক্তিগত মালিকানা ও সরকারী উদ্যোগ এক সংগে চালু থাকিলেও ব্যক্তিগত মালিকানার প্রাধান্যই পরিলক্ষিত হইতেছে।[২]

মালিক-শ্রেণীবিন্যাস : যাই হোক, মার্কসবাদীর বিশ্লেষণ অনুসারে মূলধন-মালিকদের কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া দেখানো যায় : (ক) একচেটিয়া বৃহৎ বুর্জোয়া (Monopoly Bourgeoisie), (খ) মাঝারি বুর্জোয়া (Medium-sized Bourgeoisie) এবং (গ) ক্ষুদ্রাকারের বা পাতি-বুর্জোয়া (Small or Petit-bourgeoisie)। ইহাদের মধ্যে বৃহৎ বুর্জোয়ার স্থান গুরুত্বপূর্ণ। মাত্র কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের হস্তে অধিকাংশ উৎপাদন পুঞ্জীভূত। ইহা ছাড়া বৃহৎ শিল্পগুলি কয়েকটি শিল্প-ভবনে (Industrial Houses) কেন্দ্রীভূত। ছোটখাটো শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি নিছক টিকিয়া থাকার জন্য সংগ্রাম করিতেছে এবং ইহাদের সংখ্যাও ক্রমশ হ্রাস পাইতেছে।

---

১. *India* 1981

২. "India is a mixed economy with private and public sectors, where the former is by far the dominant one, in terms of size". R. Sau : *India's Economic Development—Aspects of Class Relations*

ধনবৈষম্যের প্রকটতা : অপরদিকে শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যা কিছুটা বৃদ্ধি পাইলেও ইহাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত নয়। ইহা ব্যতীত বেকার ও অর্ধ-বেকারের সংখ্যাও বাড়িয়া চলিয়াছে। ফলে ধনবৈষম্য প্রকট রূপ ধারণ করিতেছে।

জানা যায়, ভারতের মোট জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ দারিদ্র্য-সীমার নিচে বসবাস করিতেছে।[১] ধনী ও দরিদ্রদের মধ্যে আর্থিক ব্যবধান ক্রমবর্ধমান। সুতরাং আভ্যন্তরীণ বাজার সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। আন্তর্জাতিক বাজারও বিদেশী ব্যবসায়ীদের প্রতিযোগিতার দরুন সংকুচিত হইয়াছে। এই কারণেই বিদেশী ও দেশী মূলধন লইয়া **যৌথ ব্যবসায়** (joint ventures) প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। প্রসংগত সরকারী মালিকানাধীন শিল্পগুলির কথা উল্লেখ করা হয়। বলা হয়, সরকার প্রথমে সেই শিল্পগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়াছে যেগুলিকে বলা হয় রুগ্ন (sick units or industries)। ইহা ছাড়া অন্যান্য যে-সকল শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের পরিচালনাধীন তাহা সাধারণত ব্যক্তিগত মালিকানাধীন শিল্পের স্বার্থই সাধন করিয়া থাকে।

অনেক লেখকেরই মত হইল **বণ্টন-ব্যবস্থার মাধ্যমে ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।** একমাত্র অর্থ-ব্যবস্থাকে সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে গড়িয়া তুলিতে পারিলেই অর্থনৈতিক সামাজিক ও কৃষ্টিগত সমস্যার সমাধান সম্ভব হইবে।[২]

১২.২. কৃষিক্ষেত্রে শ্রেণীবিন্যাস : যদিও বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত নেতৃবর্গের ও সংবিধানের ঘোষিত নীতি হইল বর্ণবিহীন ও শ্রেণীবিহীন সমাজ (casteless and classless society) প্রবর্তনের মাধ্যমে আর্থিক ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করা, যদিও বা সংবিধানের আদর্শ হইল সকল ব্যক্তিকে সমান অর্থনৈতিক সুযোগ প্রদান করা, যদিও বা সংবিধান প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে আয়বৈষম্য দূরীভূত করা হইবে এবং যদিও বা সংবিধান ঘোষণা করিয়াছে যে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হস্তে আর্থিক সম্পদ পুঞ্জীভূত হইবে না, তবুও কিন্তু গত বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে **গ্রামীণ সমাজও বিশেষভাবে শ্রেণীবিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে।** অপরদিকে আবার বর্ণভেদ ও বর্ণসংঘর্ষ বাড়িয়াই চলিয়াছে। উপরন্তু, মনে রাখিতে হইবে যে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত সম্পত্তির অধিকার সংবিধানে অন্যতম মৌলিক অধিকার বলিয়া গণ্য করা হইত। তাই জমিদার তালুকদার জায়গিরদার প্রভৃতিকে জমি অধিগ্রহণের জন্য বিরাট ক্ষতিপূরণ দেওয়া

১. ষষ্ঠ পরিকল্পনায় (১৯৮০-৮৫) প্রদত্ত হিসাব অনুসারে দারিদ্র-সীমার নিচে ছিল মোট জনসংখ্যার ৪৮'৩৪ শতাংশ। সপ্তম পরিকল্পনায় (১৯৮৫-৯০) অবশ্য দাবি করা হইয়াছে যে উহা কমিয়া ৩৭ শতাংশে দাঁড়াইয়াছে। এই সপ্তম পরিকল্পনার লক্ষ্য হইল ১৯৯০ সালের মধ্যে দারিদ্র-সীমার নিচে অবস্থিত জনসংখ্যাকে মোটের ২৬ শতাংশে লইয়া যাওয়া।—*Seventh Five Year Plan* (1985-90) and *Long-term Fiscal Policy*—Dec., '85

২. "...the fundamental problems (economic, social and cultural) of the Indian society can be resolved only when the state power is transferred from the hands of the vested interests to the toiling masses and then too on a socialist basis." A. R. Desai : *Recent Trends in Indian Nationalism*

হইয়াছে। ইহারা হয় শিল্পপতি না-হয় পুঁজিবাদী কৃষকে (capitalist farmers) পরিণত হইয়াছে।[১]

১২.৩. গ্রামাঞ্চলে শ্রেণীবিন্যাস : মোটামুটিভাবে, গ্রামীণ শ্রেণীবিন্যাসকে সংক্ষেপে এইভাবে দেখান যায়।[২] (১) কৃষি-মজুর (agricultural workers) : ইহাদের প্রায় ক্ষেত্রেই কোন জমি নাই ফলে দিনমজুর হিসাবে খাটিয়া জীবিকানির্বাহ করে। (২) দরিদ্র চাষী (poor peasants) : ইহাদের সামান্য পরিমাণ জমি আছে কিন্তু ইহারা মজুর হিসাবে খাটিয়াই জীবনযাপন করে। (৩) মাঝারি ধরনের কৃষক (middle peasants) : ইহাদের জমি আছে, প্রধানত ইহারা নিজেরাই জমিতে খাটে আবার মজুরও লাগায়। (৪) বিত্তশালী কৃষক (rich peasants) : ইহারা সাধারণত দিনমজুর খাটায় তবে চাষে নিজেরাও খাটে। যে-ক্ষেত্রে ইহারা অধিক পরিমাণে মজুর খাটায় সে-ক্ষেত্রে ইহাদিগকে ধনতান্ত্রিক চাষী বলা যায়। ইহাদের আয় যথেষ্ট এবং নিজেদের সংসার নির্বাহ করিয়াও সাধারণত বেশকিছু পরিমাণ সঞ্চয় করিয়া থাকে। (৫) ভূস্বামী (landlords) : ইহারা জমিতে কোন কায়িক পরিশ্রম করে না—ম্যানেজার বা কর্মচারী রাখিয়া তাহাদের মাধ্যমে মজুর খাটাইয়া আয় বা মুনাফা অর্জন করে।

১২.৪. ধনী-দরিদ্রের সমস্যা : গ্রামীণ স্তরে একদিকে দেখা যায় যে সম্পদশালী কৃষক, ভূস্বামী, ধনতান্ত্রিক চাষী, মহাজন প্রভৃতির প্রতাপপ্রতিপত্তি। অপরপক্ষে রহিয়াছে দারিদ্র্যক্লিষ্ট চাষী ও দিনমজুর। ব্যাপক আকারে ইহাদের মধ্যে আছে বেকারত্ব ও অর্ধ-বেকারত্ব।[৩] কৃষি ও কৃষির উন্নয়নকল্পে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পরিকল্পনা সত্ত্বেও এরূপ অবস্থা দাঁড়াইল কেন ? ইহা বুঝিতে হইলে সরকারী নীতির স্বরূপ কি তাহা বুঝিতে হইবে। সরকার যে-সকল ব্যবস্থা ও প্রকল্প অবলম্বন করিয়াছে তাহার কয়েকটি দিকের সামান্য আলোচনা করা প্রয়োজন।

১২.৫. ভূমি-সংস্কার ব্যবস্থার মূল্যায়ন : পরিকল্পনাগুলির মধ্যে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল ভূমি-সংস্কারমূলক আইন। ইহার দ্বারা জমিদার তালুকদার ও অন্যান্য মধ্যস্বত্বভোগীর জমি অধিগ্রহণ করা হয় ; অবশ্য ফুলফল চাষ, মৎস্য চাষ প্রভৃতির ক্ষেত্রে এই আইন খাটে না। ইহা ছাড়া সরকার জমির উর্ধ্বসীমা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে। এখন ভূমিসংস্কার সংক্রান্ত আইনের বহু ফাঁক রহিয়াছে। যাহার ফলে জমিদার ও অন্যান্য সম্পদশালী চাষী নানাভাবে আইনের ফাঁকের সুযোগ গ্রহণ করিয়াছে। যেমন, ফুলফলের বাগান মৎস্যচাষ প্রভৃতির নামে জমিদার ও বিত্তশালী শ্রেণী অনেক জমি নিজেদের আওতায় রাখিয়া চাষবাস করিয়া চলিয়াছে। আবার অনেক যৌথ পরিবার আইনত ভিন্ন হইয়া যাইয়া জমির উর্ধ্বসীমাকে (ceiling of land holding) এড়াইয়া

---

১. "A basis has been laid for the possible development of Indian agriculture along capitalist lines ... ." Gunnar Myrdal : *Asian Drama*

২. Refer *India : State and Society* (edited by Dr. K. Mathew Kurian)

৩. A. R. Desai : *Recent Trends in Indian Nationalism* ; R. Sau : *India's Economic Development—Aspects of Class Relations*

গিয়াছে।[১] বেনামীতেও বহু জমি রহিয়াছে।[২] পরিকল্পনা কমিশনও স্বীকার করিয়াছে যে, ভারতে **ভূমি-সংস্কার ব্যবস্থায় বিলম্ব ও অদক্ষতারই পরিচয় মিলিয়াছে** (land reform measures have been tardy and inefficient)।

দ্বিতীয়ত, সরকার গ্রাম ও চাষের উন্নয়নের জন্য আরও কতকগুলি পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। ইহার মধ্যে আছে সমষ্টি-উন্নয়ন প্রকল্প ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা, সমবায় সমিতি, সমবায়িক চাষ, জলসেচ ব্যবস্থা, উন্নত ধরনের বীজ, সার ও যন্ত্রপাতির প্রবর্তন। সম্প্রতি আবার ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণপ্রদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

কিন্তু এই সকল ব্যবস্থা দ্বারা গ্রামীণ জীবন এবং ভূমিহীন ও দরিদ্র চাষীদের বিশেষ কোন সুরাহা হয় নাই। বরং গ্রামের প্রতিপত্তিশালী শ্রেণীই উপকৃত হইয়াছে।[৩] অন্যভাবে বলা যায় ধনী চাষী, কুসীদজীবী বা সুদ-ব্যবসায়ী, ধনতান্ত্রিক চাষী প্রভৃতির উপকার সাধিত হইয়াছে।

ইহার কারণও আছে। যেমন, সমবায়িক ঋণ ও ব্যাংক কর্তৃক ঋণদানের সুবিধা-সুযোগ প্রতিপত্তিশালী চাষীশ্রেণী গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহারাই সমসাময়িক সংস্থা, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রভৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। সেচ বীজ সার ও কৃষি-যন্ত্রপাতি সরকার বিনা পয়সায় দেয় না। সুতরাং ইহা সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে অর্থসম্পন্ন ও ধনতান্ত্রিক চাষীরা এগুলিকে ক্রয় ও ব্যবহার করিতে সমর্থ। এমতাবস্থায় স্বভাবতই সমৃদ্ধ কৃষকদের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে এবং স্থলবিশেষে তাহারাই সবুজ বিপ্লবের (Green Revolution) মুনাফা গ্রহণ করিয়াছে। ফলে গ্রামাঞ্চলে শ্রেণীবিন্যাস সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করিয়াছে। অগণিত ভূমিহীন চাষী ও মজুরদের অবস্থার অবনতি ঘটিয়াছে।[৪]

অতএব দেখা যাইতেছে, সংবিধানে যে **অর্থনৈতিক** ও **সামাজিক** ন্যায় এবং অর্থনৈতিক সাম্যের কথা বলা হইয়াছে তাহার কোনটাই সরকারী পরিকল্পনার সাহায্যে পূরণ করা সম্ভব হয় নাই।[৫]

---

১. Sau: *India's Economic Development—Aspects of Class Relations*

২. Dr. K. Mathew Kurian's article in *India—State and Society*

৩. Gunnar Myrdal: *Asian Drama*, op. cit.

৪. "A sharp *conflict of interests and resultant social cleavage* are developing in the rural areas as a result of the measures of the government, Central and State. On one side, there are prosperous peasants, landlords, village moneylenders and traders and the richer sections of the rural people; on the other, *the middle and small cultivators, the mass of land labourers and ruined non-agrarian population.*" *Transaction of the Third Congress of World Sociological Congress*

৫. "The feeling is now widespread that governmental *measures to reduce inequalities* in the agrarian structure have been unsuccessful." Andre Peteille: *Inequality and Social Change*: also, Bhanu Pratap Singh: *Time to Change Rural Policies*

১৩. সামাজিক ভিত্তি (The Social Base) : সংবিধান অনুসারে ভারতে সমাজ-ব্যবস্থা হইল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়ের উপর ভিত্তিশীল (৩৮ অনুচ্ছেদ)।[১] প্রস্তাবনা অনুসারেও ভারতীয় সংবিধানের সামাজিক ভিত্তি হইল **রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক** ও **সামাজিক ন্যায়।** ইতিপূর্বেই সংবিধানের অর্থনৈতিক ভিত্তির আলোচন করা হইয়াছে। **অর্থনৈতিক ন্যায়** কথাটির দ্বারা বুঝানো হইয়াছে যে জনকল্যাণমূলক কার্যাদি ও পরিকল্পনার সাহায্যে দারিদ্র্য দূর করা এবং অর্থনৈতিক সাম্যের প্রতিষ্ঠা করা এবং সমকার্যের জন্য সম-মজুরি বা বেতনের ব্যবস্থা করা। **প্রস্তাবনায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথাও বলা হইয়াছে।**

রাজনৈতিক ন্যায়ের অর্থ হইল সমাজে সকলেই সমানভাবে নির্বাচন করিবার ও নির্বাচিত হইবার অধিকার ভোগ করিবে।

অবশ্য সংবিধানের সামাজিক ভিত্তি হইল প্রধানত ও মূলত সামাজিক ন্যায়। সুতরাং সামাজিক ন্যায় সম্পর্কে একটু বিস্তৃত আলোচনা করা প্রয়োজন। সামাজিক ন্যায়ভিত্তিক সমাজের বৈশিষ্ট্য হইল স্বাধীনতা ও সাম্যের ভিত্তিতে মানুষে মানুষে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন।

১৩.১. বৈষম্য ও ব্যাহত সামাজিক ন্যায় : সুতরাং দেখা যাইতেছে, সামাজিক ও **অর্থনৈতিক ন্যায় পরস্পরের সহিত অংগাংগিভাবে সম্পর্কিত।** আবার অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হইলেই লোকের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ, জাতীয় ঐক্য ও সংহতি এবং ব্যক্তি-মর্যাদা সুনিশ্চিত করা যায়।

সংবিধান প্রবর্তনের সময় ও তৎপরবর্তীকালেও দেখা যায় যে ভারতে ধর্ম বর্ণ জাতি সাম্প্রদায়িকতা অস্পৃশ্যতা প্রাদেশিকতা জন্ম প্রভৃতির ভিত্তিতে মানুষে মানুষে ও সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে নানা প্রকারের ভেদাভেদ ও দ্বন্দ্ব রহিয়াছে।

ইহা ছাড়া রহিয়াছে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রকট ধনবৈষম্য।

১৩.২. বৈষম্য অপসারণের উদ্দেশ্যে সাংবিধানিক ব্যবস্থা : এই সকল অন্যায় অবিচার ও বৈষম্যের হাত হইতে সমাজকে মুক্ত করিয়া সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রবর্তন করা এবং সকল শ্রেণীর লোকের বিকাশের পথ প্রশস্ত করা হইল সংবিধানের ঘোষিত লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে পৌছাইবার জন্য সংবিধানে **বিভিন্ন অধিকার ও ব্যবস্থার কথা** বলা হইয়াছে। যেমন, শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতা, সরকারী চাকরিতে সমান অধিকার, দুর্বল ও অনুন্নত শ্রেণীদের জন্য বিশেষ সুযোগসুবিধা প্রদান, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে পর্যাপ্ত জীবিকা অর্জনের অধিকার, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কৃষ্টি ও ভাষা সংরক্ষণ, শিশুদের সুকুমার বয়সের অপপ্রয়োগ নিষিদ্ধকরণ, সামাজিক ও সংস্কৃতিগত সুযোগ প্রদান, শিক্ষার অধিকার, খাদ্যপুষ্টি বৃদ্ধি, জীবিকার মান উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতিবিধান, আর্থিক দিক দিয়া অসমর্থ ব্যক্তিদের বিনা ব্যয়ে আইনগত

---

১. "The Constitution emphatically declares that the Democratic Republic of India shall be Welfare State committed to the persui, of the ideal of socio-economic justice." Gajendragadkar.

সাহায্য প্রদান, শিশুরা যাহাতে সুস্থ ও স্বাধীনভাবে এবং মর্যাদার সহিত গড়িয়া উঠিতে পারে তাহার জন্য সুযোগসুবিধা প্রদান, তপশীলী বর্ণ ও তপশীলী উপজাতিদের শিক্ষা-বিষয়ক ও আর্থিক স্বার্থের উন্নতিসাধন এবং সামাজিক শোষণ হইতে সংরক্ষণ, গ্রামাঞ্চলের আর্থিক উন্নয়ন, ধর্ম-নিরপেক্ষতা প্রভৃতি ব্যবস্থাদির দ্বারা সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার কর্মসূচী ভারতীয় সংবিধান গ্রহণ করিয়াছে।

১৩.৩. মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থায় উহাদের কার্যকারিতা: তবে সংবিধানের ভিত্তি সামাজিক ন্যায় বলিয়া ঘোষণা করা হইলেও ইহা কখনই বাস্তবে রূপায়িত হইতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত-না আর্থিক সাম্যের ভিত্তিতে সামাজিক সম্পর্ককে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এই সম্পর্ক সমাজকল্যাণমূলক বা মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রবর্তিত করা সম্ভব নয়, কারণ সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা যতক্ষণ পর্যন্ত আছে ততক্ষণ পর্যন্ত শ্রেণী-সম্পর্ক থাকিবেই এবং সমাজ ধনী-দরিদ্রে বিভক্ত হইবেই।[১] প্রতিপত্তিশালী শ্রেণীও ধর্ম বর্ণ সাম্প্রদায়িকতা অস্পৃশ্যতা প্রভৃতির সুযোগ গ্রহণ করিতে ছাড়িবে না।

এই প্রসংগে বর্ণভেদ প্রথা সম্বন্ধে কিছুটা বিস্তৃততর আলোচনা করা যাইতে পারে। কারণ, ইহার সামাজিক ও সাংবিধানিক দিক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

১৪. বর্ণভেদ প্রথা: বলা হয়, বর্তমানে বর্ণবৈষম্য বা বর্ণভেদ ও অস্পৃশ্যতা ভারতীয় সমাজের অন্যতম অভিশাপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রসংগত ইহাও উল্লেখ্য যে, শ্রেণীসংঘর্ষ ও বর্ণসংঘর্ষ একসংগে কাজ করে।[২] দেখা যায় যে উচ্চ বর্ণসমূহ প্রতিপত্তি ও সম্পদশালী। ইহারা শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, রাজনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রেও সুযোগসুবিধা ও ক্ষমতা ভোগ করে। ইহারা দারিদ্র্যক্লিষ্ট নিম্ন বর্ণসমূহকে শোষণ করিয়া থাকে। হরিজন সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার ও নিপীড়ন ইহারই দৃষ্টান্ত। সাম্প্রতিক কালে গুজরাট উত্তরপ্রদেশ বিহার দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন অংশ—প্রায় সকল রাজ্যেই বর্ণসংঘর্ষ কোন-না-কোন আকারে সময়ান্তরে দেখা দেয়। সুতরাং ভারতীয় বর্ণভেদ প্রথার আরও কিছু পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে।

১৪.১. বর্ণ-ব্যবস্থার ইতিহাস: বর্ণভেদ ভারতীয় সমাজের অন্যতম প্রাচীন প্রতিষ্ঠান।[৩] বৈদিক যুগের পূর্বেও ইহার সন্ধান পাওয়া যায়। মোটামুটিভাবে বলা চলে যে আদিতে হিন্দুসমাজ চারি ভাগে বিভক্ত ছিল : ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র। ইহাদের পেশাও ছিল ভিন্ন। ব্রাহ্মণদের পূজা শাস্ত্র ও শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে একচেটিয়া অধিকার ছিল। ক্ষত্রিয়দের পেশা ছিল যুদ্ধ ও শাসন। বৈশ্যরা ব্যবসাবাণিজ্যে লিপ্ত থাকিত। শূদ্ররা নিম্নস্তরের কার্যাদি সম্পাদন করিত। ইহা হইতে সহজেই বুঝা যায় যে বর্ণ-ব্যবস্থা কর্মবিন্যস্ত ও স্তরবিন্যস্ত ছিল। ব্রাহ্মণরা সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিত। ইহার পরবর্তী

১. এইরূপ সমাজকে প্রখ্যাত ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী ডিজরেইলী (Disraili) দ্বি-জাতি সমন্বিত সমাজ (Two-nation Society) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন।

২. "...there is broad coherence between the caste hierarchy and economic hierarchy and this coherence continues in this towns and cities." M. N. Srinivas

৩. "Caste is an old social institution." Swami Vivekananda

স্থান ছিল ক্ষত্রিয়দের। ক্ষত্রিয়দের পরে স্থান পাইত বৈশ্যরা। সর্বনিম্ন স্তরে ছিল শূদ্ররা। ইহারা নিম্ন ধরনের কাজকর্ম করিত এবং পরবর্তী সময়ে অস্পৃশ্য বর্ণে পরিণত হয়। এই বর্ণসমূহ একে অপরের পরিপূরক হিসাবে কার্য করিত। এইভাবে মানুষের পেশা ও মর্যাদা জন্ম দ্বারা নির্ধারিত হইত।

১৪.২. বৈশিষ্ট্য : কালক্রমে এই বর্ণভেদ শাখাপ্রশাখায় পল্লবিত হইয়া বহু জাতিতে পরিণত হয়। বর্ণভেদের ফলে বিভিন্ন জাতির রীতিনীতি, প্রথা, আচার-আচরণ বিভক্ত হইয়া পড়ে। এক বর্ণের সংগে অন্য কোন বর্ণের বিবাহ নিষিদ্ধ হয়। বর্ণগুলির মধ্যে খাওয়াদাওয়া ও মেলামেশাও নিষিদ্ধ হয়। বিশেষ করিয়া অস্পৃশ্যতা হইয়া দাঁড়ায় বর্ণভেদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

১৪.৩. ব্রিটিশ আমলে কঠোরতা হ্রাস : ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তনের ফলে বর্ণভেদ প্রথার কঠোরতা কতকটা শিথিল হয়। সমাজ-সংস্কারকদের কার্যাবলী, শিক্ষাবিস্তার, শিল্পায়ন, গমনাগমনের সুযোগসুবিধা, থিয়েটার-সিনেমার বিস্তার, রেস্তোরাঁ-হোটেলের প্রসার প্রভৃতির ফলে বর্ণসমূহের মধ্যে মেলামেশার সুযোগ ঘটিয়া যায়—এমন কি মেলামেশা অপরিহার্য হইয়া পড়ে। যেমন, একই কারখানায় বিভিন্ন বর্ণের লোকদের পাশাপাশি কাজ করিতে দেখা যায়। আবার কর্মব্যপদেশে ট্রেন বাস ট্রাম প্রভৃতি যানবাহনে বিভিন্ন বর্ণকে একসংগে যাতায়াত করিতে হয়। জাতীয় আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রাম ও শ্রেণীসংগ্রাম জাতিভেদকে সাময়িকভাবে স্তিমিত করিয়া দেয়। ইহা হইলেও ব্যক্তিগত জীবনে বিভিন্ন জাতি নিজেদের জাতিগত প্রথা ও সংস্কার মানিয়া চলে। এই প্রসংগে ইহাও স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতে পারে যে ব্রিটিশরাজ নিজেদের স্বার্থে বর্ণ বৈষম্য ও বর্ণসংঘর্ষকে উস্কানি দিতে থাকে।[১] ইহা ছাড়া ধনিকশ্রেণী গণ-আন্দোলনকে বাধা দেওয়ার জন্য বর্ণভেদকে জিয়াইয়া রাখিতে সচেষ্ট হয়।

১৪.৪. বর্ণপ্রথা ও স্বাধীনতার পরবর্তী যুগ : স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর বর্ণপ্রথার প্রকোপ কতকটা হ্রাস পাইলেও বর্ণভেদের অবসান ঘটে নাই।[২] **ভারতীয় সংবিধানে** সাম্যের নীতি স্বীকৃত হইয়াছে এবং **অস্পৃশ্যতা-আচরণকে দণ্ডনীয় করা হইয়াছে।** ইহা ছাড়া তপশীলী জাতি ও উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়ের উন্নতিবিধানের নানা প্রকারের সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা সংবিধানে করা হইয়াছে। ইহার ফলে অনগ্রসর জাতিসমূহ উহাদের উন্নয়ন সম্পর্কে সচেতন হইয়াছে এবং উন্নতিবিধানকল্পে সংগ্রামের দিকে ঝুঁকিয়াছে।

১৪.৫. কায়েমী স্বার্থগোষ্ঠীর চক্রান্ত : বর্ণভেদ প্রথার দুইটি গতি লক্ষ্য করা যায়। একদিকে যেমন শিল্প যানবাহন নগরাঞ্চল ব্যবসাবাণিজ্য শিক্ষাদীক্ষা প্রভৃতির দ্রুত প্রসারের ফলে বর্ণভেদ হ্রাস পাইতেছে, অপরদিকে তেমনি আবার কায়েমী স্বার্থগোষ্ঠী

১. "It may be doubted if the existence of caste is on the whole unfavourable to the permanence of our rule. It may even be considered favourable to it, provided we acted with prudence and forbearance. Its spirit is opposed to national union." James Kerr

২. "Caste continues to throw its shadow on the social scene." K. M. Panikkar : *The Foundations of New India*

(vested interests) তাহাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য বর্ণে বর্ণে সংঘর্ষ বাধাইয়া দিতে বিলম্ব করে না। দেখা যায়, গ্রামাঞ্চলে এই অবস্থা প্রকট রূপ ধারণ করে। স্বার্থগোষ্ঠী স্পৃশ্য বর্ণসমূহকে অস্পৃশ্য বর্ণদের—বিশেষত হরিজনদের—বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া দেয়। আবার নির্বাচনের সময়ে জাতি বা বর্ণের ভিত্তিতে বিভিন্ন দল প্রার্থী মনোনয়ন করে এবং ভোট আদায় করে।[১]

পরিশেষে, বর্ণপ্রথার (caste system) দুইটি বিশেষ দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতে পারে : প্রথমত, বর্ণপ্রথা কিভাবে রাজনীতির সহিত সম্পর্কিত এবং দ্বিতীয়ত, বর্ণ ও শ্রেণীর মধ্যে কোন যোগসূত্র আছে কি না ?

১৪.৬. বর্ণভেদ প্রথা ও রাজনীতি (Caste System and Politics) : সুদূর অতীতে উদ্ভূত বর্ণভেদ প্রথার প্রভাব আজও রাজনীতির সর্বস্তরে পরিলক্ষিত হয়—বিশেষ করিয়া রাজ্য ও গ্রামীণ রাজনীতিতে ইহার গুরুত্ব ও প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না।[২]

ব্রিটিশরাজ কর্তৃক ভারতীয়দের হস্তে ক্রমান্বয়ে ক্ষমতা-হস্তান্তরের ফলে—বিশেষ করিয়া স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর—বর্ণসমূহ বিশেষভাবে আত্মসচেতন হইয়াছে, ইহাদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বাড়িয়া গিয়াছে এবং নিম্নস্তরের বর্ণসমূহ নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছে। সংক্ষেপে, রজনী কোঠারির ভাষায় বলা যায় যে, **বর্তমান রাজনীতির প্রভাবে বর্ণসমূহ রাজনীতি-সচেতন হইয়াছে**। অপরদিকে রাজনৈতিক দলগুলি বর্ণগোষ্ঠীগুলিকে সংগঠিত করিয়া সমর্থন পাইবার প্রচেষ্টা করিয়া থাকে। অনেকে অবশ্য অভিযোগ করেন যে, রাজনৈতিক দলগুলি বর্ণ বা জাতিসমূহকে রাজনীতিতে আনিয়া ভারতীয় রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার বিচ্ছিন্নতাকে উসকানি দিতেছে।[৩] নিম্নবর্ণগুলি আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য সংস্কৃতিকরণের পদ্ধতির (Sanskritization) আশ্রয় নিয়াছে। সংস্কৃতিকরণ পদ্ধতির দ্বারা বুঝায় যে নিম্নবর্ণসমূহ কর্তৃক উচ্চবর্ণের আচার-আচরণ, ধ্যানধারণা, রীতিনীতি, অনুষ্ঠান, জীবনযাত্রার পদ্ধতি ইত্যাদি গ্রহণ করা।[৪] ইহার ফলে নিম্নবর্ণগুলির রাজনৈতিক প্রভাব প্রসারিত হইয়াছে। বর্তমান সংবিধানে সকলকে

১. "Nowadays, *all political parties try to put up candidates belonging to the locally preponderant castes.*" M. N. Srinivas

২. "At any level, but especially at the rural and local levels, those most directly affecting the vast majority of the people of India, caste is obviously a most important factor in Indian politics, and will probably remain so for the indefinite future." N. D. Palmer : *The Indian Political System*

৩. "The alleged 'casteism' in politics, is thus no more and no less than *politicisation of caste*...By drawing the caste system into its web of organisation, politics finds material for its articulation and moulds it into its own design. In making politics their sphere of activity, caste and kin groups, on the other hand, get a chance to assert their identity and strive for positions···*Politicians mobilise caste groupings and identities in order to organise their power.*" Rajani Kothari's *Introduction to Caste in Indian Politics* (Editor : Rajani Kothari)

৪. Sanskritization means "the process by which a 'low' caste or tribe or other groups take over the customs, rituals, beliefs, ideology, and style of life of a high and, in particular, a twice-born *dwija* caste." M. N. Srinivas

নির্বাচন করার ও নির্বাচিত হওয়ার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। ইহার ফলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচনের সময় জাতি বা বর্ণের ভিত্তিতে প্রার্থী মনোনয়ন করে ও ভোট আদায় করে।[১] বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে নিজ নিজ বর্ণের প্রার্থীকেই ভোট দেওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। বর্ণ ও জাতিসমূহের রাজনৈতিক কার্যকলাপ বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও বিভিন্ন স্থানের আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। ভারতের **দক্ষিণাঞ্চলে দেখা যায় ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ বর্ণের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা।**

মাত্র দক্ষিণাঞ্চলেই নয়, গুজরাট বিহার উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি অন্যান্য অঞ্চলে বর্ণের প্রভাব রাজনৈতিক দল ও নির্বাচনে প্রতিফলিত হয়। কংগ্রেস, কমিউনিস্ট এবং অন্যান্য দলও বর্ণের প্রভাব হইতে মুক্ত নয়।

যে-সকল বর্ণ প্রথমেই পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইতে সমর্থ হইয়াছে তাহারা সরকারী চাকরি, পেশা ও ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রাধান্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছে। এই সুযোগসুবিধা উচ্চবর্ণের লোকেরাই প্রধানত ভোগ করিয়া চলিয়াছে। ইহার ফলে বর্ণে-বর্ণে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইয়াছে, এমনকি সংঘর্ষের আকার ধারণ করিয়াছে।

সংবিধানে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের ব্যবস্থা সত্ত্বেও অস্পৃশ্যতা দূর হয় নাই। প্রায়ই শুনা যায়, বিভিন্ন অঞ্চলে অস্পৃশ্য বর্ণগুলির—বিশেষ করিয়া হরিজনদের—উপর অবিচার অত্যাচার ও নিপীড়নের কাহিনী।

১৪.৭. দুর্বল শ্রেণীসমূহের জন্য বিশেষ সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা : দুর্বল শ্রেণী, তপশীলী জাতি ও উপজাতিদের জন্য বিভিন্ন সুযোগসুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা রহিয়াছে —যেমন, আইনসভায় আসন সংরক্ষণ, সরকারী চাকরিতে বিশেষ সুবিধা প্রদান এবং শিক্ষায়তনে ভর্তির ব্যাপারে সুযোগ প্রদান ইত্যাদি।

ইহার বিরুদ্ধেও অন্যান্য বর্ণ আন্দোলন করিয়া চলিয়াছে—এমনকি সংঘর্ষে লিপ্ত হইতেও দ্বিধাবোধ করিতেছে না।

১৪.৮. বর্ণভিত্তিক সভাসমিতি : বিভিন্ন বর্ণ আবার রাজনৈতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও প্রসারণ করার জন্য বর্ণভিত্তিক বিভিন্ন সমিতি ও সংঘ (caste associations and caste federations) গড়িয়া তুলিয়াছে। গ্রামাঞ্চলে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু করার পর বিভিন্ন **পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানের** নির্বাচনে বর্ণে-বর্ণে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে এবং সংঘর্ষও বাধিয়া যায়।

১৪.৯. বর্ণপ্রথার গুণাগুণ লইয়া বিতর্ক : অনেকের মতে, বর্ণপ্রথা চিরাচরিত ব্যবস্থা অব্যাহত রাখিতে চায় এবং ফলে দেশের আধুনিকীকরণ ও রাজনৈতিক উন্নয়নের পথে বাধার সৃষ্টি করিতেছে। অপরদিকে আবার অনেক সমাজবিজ্ঞানী মনে করেন যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আধুনিকীকরণ ও সামাজিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনিতে **বর্ণভেদ প্রথার**

১. *India—Social Structure* (Publication Division, Government of India)

অবদান রহিয়াছে।[১] তবে অধিকাংশ চিন্তাবিদই বর্ণপ্রথার প্রভাবকে প্রতিক্রিয়াশীল বলিয়া মনে করেন। এবং সকল রাজনৈতিক দলই ধ্বনি তুলিয়াছে যে ভারতে 'এক বর্ণবিহীন ও শ্রেণীবিহীন সমাজ' (a casteless and classless society) গড়িয়া তুলিতে হইবে। অনেক লেখকের মতে, 'বর্ণবিহীন এবং শ্রেণীবিহীন' কথাটি অসংগতিপূর্ণ। ইহাদের মতে সমাজ কোন-না-কোন ভাবে স্তরবিন্যস্ত হইতে বাধ্য। ভারতের মত **চিরাচরিত সমাজে** (traditional society) এই স্তরবিন্যাস বর্ণভেদের উপর ভিত্তিশীল। আবার **উন্মুক্ত সমাজে** স্তরবিন্যাস শ্রেণীভিত্তিক।[২] এই মত অবশ্য গ্রহণ করা কঠিন, কারণ এমন সমাজ ভবিষ্যতে গঠন করা সম্ভব যে বর্ণভেদ বা শ্রেণীবিভাগ থাকিবে না। মার্ক্সবাদীরা কমিউনিস্ট সমাজের কথা বলিয়া থাকেন। এই কমিউনিস্ট সমাজে বর্ণের ভিত্তিতে ভেদাভেদ থাকিবে না এবং শ্রেণীদ্বন্দ্বের অবসান ঘটিবে।

তবে বর্তমানে বর্ণপ্রথা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে অন্যতম প্রভাবশীল শক্তি তাহা অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই।

১৫. বর্ণ বা জাতি এবং শ্রেণী (Castes and Classes):

এখন দেখা যাউক যে ভারতে বর্ণ বা জাতি এবং শ্রেণীর মধ্যে সম্পর্কের প্রকৃতি কি। এই প্রসংগে প্রথমেই উভয়ের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা যাইতে পারে।

১৫.১. উভয়ের বৈশিষ্ট্য : বর্ণের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে মানুষের সামাজিক মর্যাদা ও প্রতিপত্তি নির্ভর করে জন্মের উপর, উহা সম্পদ বা অর্থ দ্বারা নির্ধারিত হয় না।[৩] অপরদিকে **শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য** হইল যে মানুষের সহিত উৎপাদনের উপায়সমূহের (instruments of production) সম্পর্কের উপরই নির্ভর করে মানুষের সামাজিক ও আর্থিক মর্যাদা। অন্যভাবে বলা যায়, সামাজিক প্রভাবপ্রতিপত্তি ও সম্মান নির্ভর করে আর্থিক সংগতির উপর।

বর্ণের ক্ষেত্রে বর্ণভেদ এবং বর্ণের রীতিনীতি ও কার্যকলাপ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। শ্রেণীর ক্ষেত্রে জন্মের দ্বারা মানুষের সামাজিক প্রতিপত্তি নিয়ন্ত্রিত হয়

১. "There is plenty of evidence, as any first-hand observer can testify, of the reactionary and stultifying influence of caste. But some students of Indian politics hold that in the political arena, where it assumes new dimensions and operates in different ways, caste is becoming a significant force for modernisation and social change." N. D. Palmer : *The Indian Political System*

২. "... the Constitution aims at the establishment of a 'casteless and classless' society which is a *contradiction in itself*. Every society has to be stratified along some lines with members occupying some positional rank either in a caste hierarchy as in a rigidly stratified society or in class hierarchy as in a comparatively open society. Egalitarianism, therefore, does not mean the absence of various levels of stratification. It has to be understood more in its economic context, in terms of equality of opportunity." R. N. Saksena's Article entitled *'Intercaste Tension' in Tribe, Caste and Religion* (Edited by Ramesh Thapar ,

৩. "Castes were groups with a well-developed life of their own, the membership whereof, unlike that of voluntary association of classes, was determined not by selection but by birth. The status of a person depended not on his wealth as in the classes of modern Europe, but on the traditional importance of the caste in which he had the luck of being born." G. S. Ghurye ; *Caste and Race in India*

না বলিয়া প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এক শ্রেণী অন্য শ্রেণীতে পরিণত হইতে পারে। অতএব, **শ্রেণীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য গতিশীলতা।**

১৫.২. **বর্ণ ও শ্রেণীর মধ্যে সম্পর্ক** : দেখা যায়, জাতি বা বর্ণ শ্রেণীর সহিত বিভিন্নভাবে সম্পর্কিত। অনেক ক্ষেত্রেই জাতির স্তরবিন্যাস অর্থনৈতিক স্তরবিন্যাসের সংগে যোগাযোগ রহিয়াছে।[১] গ্রামাঞ্চলে মুষ্টিমেয় উচ্চস্তরের বর্ণগুলি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রাধান্য ভোগ করিয়া থাকে; অপরদিকে অধিকাংশ নিম্নবর্ণের লোক, যেমন **অনুন্নত** শ্রেণী, তপশীলী বর্ণ ও উপজাতিসমূহ, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নিম্নস্থান অধিকার করিয়া থাকে—অর্থাৎ নিম্নবর্ণের মানুষ আর্থিকভাবে দুস্থ ও দুদশাগ্রস্ত। **আনুষ্ঠানিকভাবে** বেশ কিছুটা ভূমিসংস্কার সম্পাদিত হইলেও সম্পদশালী ও ধনিক মালিকশ্রেণীর চাষীরা (ইহারা উচ্চবর্ণের লোক) গ্রামীণ সমাজে আধিপত্য করিয়া থাকে, এবং দিন দিন তাহারা আরও বিত্তশালী হইয়া উঠিতেছে। পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা (community development projects) শিল্পক্ষেত্র প্রভৃতি সকল দিকেই ইহাদের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। ইহার ফলে বিত্তশালী মালিকশ্রেণী ও দিনমজুররা মূলত হইয়া দাঁড়াইয়াছে দুইটি বিবদমান গোষ্ঠী। বিত্তশালী শ্রেণী নিজেদের স্বার্থে ভূমিহীন কৃষিশ্রমিক (ইহারা নিম্নবর্ণভুক্ত) ও হরিজনদের দমাইয়া রাখিবারই প্রচেষ্টা করে, এবং অপরদিকে নিম্নবর্ণসমূহ নিজেদের সংগঠিত করিবার দিকে ঝুঁকিয়াছে।

এই প্রসংগে সংগ্রামের আর একটি দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতে পারে। বর্ণে বর্ণে প্রভেদ থাকিলেও অনেক সময় দেখা যায় যে দারিদ্র্যক্লিষ্ট ও শোষিত বিভিন্ন বর্ণ পরস্পরের সহিত হাত মিলাইয়া অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে একসংগে আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে সচেষ্ট হইয়াছে।[২] রাজনৈতিক দলগুলি, এমনকি কোন কোন বামপন্থী দলও, ভোট সংগ্রহ ও রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে উচ্চবর্ণের বিত্তশালী চাষীদের মদত দিয়া চলিয়াছে। এই অবস্থায় নিম্নবর্ণভুক্ত দরিদ্র কৃষকদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ না হইয়া পারে না।

নগরাঞ্চলেও বর্ণ বা জাতিসমূহ এবং শ্রেণীর মধ্যে কতকটা সম্পর্ক দেখা যায়। শিল্পায়ন ও গ্রামাঞ্চলে জমির জনসংখ্যার চাপের ফলে শিল্পাঞ্চলে নিম্নবর্ণের লোকজনের ভিড় দেখা যায়। ইহারা কলকারখানায় শ্রমিক হিসাবে বা অনুরূপ কাজ করে। যেমন, বোম্বাই-এর বস্ত্রশিল্পে এইভাবে ভূমিহীন কৃষকশ্রেণী ও অন্যান্য দুবল শ্রেণীর

১. **"Eminent scholars as well as numerous Government Commission Reports have shown that there is a peculiar correlation between caste and economic status." A. R. Desai :** ***Recent Trends in Indian Nationalism***

২. **"Bitter Economic Competition among various classes which happen also to correspond to definite castes has grown more acute. ... The wealthy classes, the capitalist landlords and rich farmers who constitute also the upper castes are strengthening their hold over the agrarian society due to their increased strength,... A movement to organise class organisation cutting across caste lines and launch class struggles against exploiting classes as well as their government is also growing," A. R. Desai ;** ***Recent Trends in Indian Nationalism***

বর্ণগুলি—যথা, মহারাষ্ট্রের হরিজন শ্রেণী ও তাঁতীরা—মজুর হিসাবে কাজ করিয়া থাকে। টাটা ইস্পাত কারখানায় বেশকিছু সংখ্যক সাঁওতাল শ্রমিক হিসাবে কাজ করে। আবার স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতে পারে যে এই সকল দারিদ্র্যক্লিষ্ট শ্রেণী যে নগরাঞ্চলের দিকে ধাবিত হইয়াছে তাহা নগরাঞ্চলের আকর্ষণের কারণে নয়, গ্রামে কর্মহীনতা ও জমির উপর চাপের ফলে গ্রামাঞ্চলে বিকর্ষণ শক্তির কার্যকারিতার দরুন।[১] অপরদিকে শিল্পপতিগণ ছাড়া উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা উচ্চবর্ণ হইতে আসেন। কারণ, উচ্চশিক্ষা ইহাদের পক্ষে সহজলভ্য। যদিও সংবিধানে বলা হইয়াছে যে সরকারী চাকরিতে সকলের সমান অধিকার থাকিবে কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা মোটামুটি তাৎপর্যহীন। কারণ, উচ্চপদের পাশপোর্ট হইল উচ্চশিক্ষা যাহা দরিদ্র নিম্ন বর্ণ বা জাতিগুলির আয়ত্তের বাহিরে। ইহার ফলাফল সহজেই উপলব্ধি করা যায়। নিম্ন বর্ণ বা জাতিগুলিকে নিম্নপদের চাকরি লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হয়।

আরও দেখা যায় যে, সরকার অনুন্নত শ্রেণীসমূহের জন্য সুযোগসুবিধা দিলে উচ্চ বর্ণ বা জাতিসমূহ উহার বিরোধিতা করে, এমনকি হিংসাত্মক কার্যকলাপেও লিপ্ত হয়। সাম্প্রতিক কালে গুজরাটে সংরক্ষণ-বিরোধী আন্দোলন (Anti-reservation Movement) ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। আর একটি বিষয়ও উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন বর্ণভুক্ত শ্রমিকশ্রেণী যখন মালিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালায় তখন সকল বর্ণের শ্রমিকের মধ্যে সংঘবদ্ধতা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু যখন ইহারা কলকারখানার আওতার বাহিরে থাকে তখন শ্রমিকশ্রেণীভুক্ত বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে সংঘর্ষ বাধিতে দেখা যায়। অবশ্য এক্ষেত্রে মালিকশ্রেণীর উসকানি অবশ্যই থাকে। মোটামুটিভাবে নগরাঞ্চলেও উচ্চ ও নিম্ন বর্ণের মধ্যে মর্যাদা ও আয়ের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।[২]

দেখা গেল, শ্রমিকশ্রেণী প্রধানত নিম্নবর্ণের লোক লইয়া গঠিত। গ্রামাঞ্চলে ও নগরাঞ্চলে ইহাদের অবস্থা শোচনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বর্ণভেদের ফলে মুষ্টিমেয় ধনিকশ্রেণী অর্থনীতি ও রাজনীতিতে প্রাধান্য ও সুযোগসুবিধা ভোগ করিয়া থাকে।[৩] সরকার বা মালিকশ্রেণী সুযোগসুবিধার সুষ্ঠু বণ্টন করিতে হয় অপারগ, না-হয় অনিচ্ছুক। ফলে বস্তিজীবন, আমোদপ্রমোদের সমস্যা দিন দিন প্রকটতর হইয়া উঠিতেছে। বাসস্থানের অভাবে পারিবারিক জীবন ব্যাহত হইয়া পড়ে, অপরাধ-

১. "Over the last hundred years migration from villages to towns has been steadily increasing. The '*push*' factor has been probably more important than the '*pull*' factor in this; the increased pressure of population on land has driven the most vulnerable section of rural population, the poorer tenants and labourers, to the cities and plantation. ... The towns have also beckoned the higher castes who saw in them the means of obtaining Western education, without which well-paid and prestigious jobs could not be secured (Italics supplied)." M. N. Srinivas : *India—Social Structure*

২. "...even the new towns tend to perpetuate traditional distances between higher and lower castes." M. N. Srinivas

৩. "The main beneficiaries of this casteism are undoubtedly the richer elements of about a couple of dozen upper castes in the whole country who still continue to dominate our economy and politics, both urban and rural." S. G. Sardesai ; *National Integration for Democracy and Socialism*

ভারতের শাসন-ব্যবস্থা

দ্বিতীয় খণ্ড

১. সংবিধানের বৈশিষ্ট্য
২. সংবিধানের প্রস্তাবনা
৩. রাজ্যসংঘের গঠন
৪. যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রকৃতি
৫. কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক
৬. রাজস্ব বণ্টন
৭. নাগরিকতা
৮. মৌলিক অধিকার
৯. নির্দেশমূলক নীতি
১০. মৌল কর্তব্য
১১. ইউনিয়নের শাসন বিভাগ
১২. জরুরী অবস্থাদি সংক্রান্ত ক্ষমতা
১৩. এটর্নি-জেনারেল
১৪. ব্যবস্থা বিভাগ বা সংসদ (পার্লামেণ্ট)
১৫. ভারতীয় সংসদের শাসনতান্ত্রিক মর্যাদা

১.৪. কতকগুলি নির্দেশমূলক নীতিরও উল্লেখ: ভারতীয় সংবিধান মৌলিক অধিকার ছাড়া **আয়ারল্যাণ্ডের** সংবিধানের অনুসরণ করিয়া কতকগুলি নির্দেশমূলক নীতিরও (Directive Principles) উল্লেখ করিয়াছে। মৌলিক অধিকারগুলির সহিত নির্দেশমূলক নীতিসমূহের পার্থক্য হইল যে, মৌলিক অধিকারগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য, কিন্তু নির্দেশমূলক নীতিগুলিকে কোন আদালত বলবৎ করিতে পারে না। এই নির্দেশমূলক নীতিসমূহের প্রধান **বিষয়বস্তু** হইল যাহাকে বলা হয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার (Economic and Social Rights): কর্মের অধিকার, বেকার বার্ধক্য অংগহানি ও পীড়িত অবস্থায় সরকারী সাহায্য পাইবার অধিকার, পর্যাপ্ত জীবিকার অধিকার, জীবনধারণোপযোগী মজুরির অধিকার, শ্রমিকদের শিল্প-পরিচালনায় অংশগ্রহণ, পরিবেশ (বনসম্পদ ও বন্যজীবন-সহ) সংরক্ষণ[১], ইত্যাদি।

১.৫. নাগরিকের মৌল কর্তব্য: মৌলিক অধিকার ও নির্দেশমূলক নীতি ছাড়া সংবিধানের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল নাগরিকের মৌল কর্তব্যের (Fundamental Duties) ঘোষণা। ইহাও করা হয় **৪২তম সংশোধন** ('৭৬) দ্বারা।

১.৬. যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান: মোটামুটিভাবে ভারতীয় সংবিধানকে যুক্তরাষ্ট্রীয় বলিয়া বর্ণনা করা যায়। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল কেন্দ্র এবং অংগরাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতাবণ্টন। ভারতীয় সংবিধানে তিনটি—যথা ইউনিয়ন, রাজ্য ও যুগ্ম-তালিকার মাধ্যমে ইউনিয়ন এবং অংগরাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতাবণ্টনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইউনিয়ন তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ সম্পর্কে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা হইল সম্পূর্ণভাবে পার্লামেণ্ট বা সংসদের। যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয় সম্পর্কে সংসদ ও রাজ্য বিধানমণ্ডল (State Legislature)—উভয়ই আইন প্রণয়ন করিতে সমর্থ। কিন্তু যেস্থলে সংসদের আইনের সহিত রাজ্যের বিধানমণ্ডল-প্রণীত আইনের বিরোধ বাধে সেস্থলে পার্লামেণ্টের আইনই বলবৎ হইবে এবং রাজ্যের আইনের অসংগতিপূর্ণ অংশটুকু বাতিল হইয়া যায়। সাধারণ ক্ষেত্রে রাজ্য তালিকা সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করিবার অনন্য ক্ষমতা (exclusive power) রাজ্য বিধানমণ্ডলের হইলেও কতকগুলি অবস্থায় পার্লামেণ্ট রাজ্য তালিকার উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারে।[২] ইহার উপর তিনটি তালিকার বহির্ভূত **অবশিষ্ট বিষয়াদি** (residuary powers) সম্পর্কে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা হইল সংসদ বা পার্লামেণ্টের।

ক্ষমতাবণ্টনে কেন্দ্রপ্রবণতা: এ-পর্যন্ত ক্ষমতাবণ্টনের আলোচনা হইতে এই উক্তি স্বচ্ছন্দেই করা যায় যে, সংবিধানে কেন্দ্রকে শক্তিশালী করিবার দিকে অত্যধিক দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে।

অতিশক্তিশালী কেন্দ্র ঠিক যুক্তরাষ্ট্রের দ্যোতক নহে।

১. ৪২তম সংশোধন দ্বারা সন্নিবিষ্ট।

২. কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে পার্লামেণ্ট এই হস্তক্ষেপ করিতে পারে সে-সম্বন্ধে পরে ক্ষমতাবণ্টন প্রসংগে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।

(৬)ক. ভারতীয় সংবিধান কতদূর যুক্তরাষ্ট্রীয়? (How far is the Indian Constitution truly Federal ?): অংগরাজ্যগুলির তুলনায় কেন্দ্র যে বিশেষ শক্তিশালী তাহা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি হইতে আরও প্রতিপন্ন হয়:

কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের ব্যাপকতার অন্যান্য লক্ষণ: (১) রাষ্ট্রপতি রাজ্যের রাজ্যপালকে নিযুক্ত করেন; রাজ্যপালকে অপসারিত করিবার ক্ষমতাও তাঁহার আছে। রাষ্ট্রপতি আবার রাজ্যপাল কর্তৃক প্রদত্ত সংবাদের ভিত্তিতে বা অন্যভাবে যদি নিশ্চিত হন যে, কোন রাজ্যের শাসনকার্য বিশেষ পরিস্থিতিতে সংবিধান অনুযায়ী চালিত হইতে পারে না, তাহা হইলে তিনি কেন্দ্রের হস্তে শাসনক্ষমতা তুলিয়া দিতে পারেন। (২) রাজ্যের আইনসভা বা বিধানমণ্ডল কর্তৃক অনুমোদিত বিলকে বাতিল করিবার ক্ষমতাও রাষ্ট্রপতির হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে। (৩) কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলিকে কোন কোন ক্ষেত্রে নির্দেশও প্রদান করিতে পারে। ঐ নির্দেশ প্রতিপালিত না হইলে ইউনিয়ন সরকার নিজের হস্তে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের শাসনক্ষমতা তুলিয়া লইতে পারে। (৪) **আর্থিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও সংবিধান কেন্দ্রপ্রবণ।**

যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি অনুসারে কেন্দ্র এবং অংগরাজ্যগুলি একে অপরের উপর অর্থের জন্য নির্ভরশীল হইবে না অর্থাৎ উভয় সরকারই ভোগ করিবে আর্থিক স্বাতন্ত্র্য (financial autonomy)। ভারতের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ ও সম্প্রসারণশীল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করগুলি কেন্দ্রের অধীন। অবশ্য সংবিধানে কেন্দ্র কর্তৃক রাজ্যগুলিকে নির্দিষ্ট এবং সাধারণ অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু সাধারণ অর্থসাহায্য কেন্দ্রের বিবেচনার উপর নির্ভর করে। এই অবস্থায় রাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্য যে সকল সময়ই ব্যাহত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহা ব্যতীত আপৎকালীন অবস্থায় রাষ্ট্রপতি কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে রাজস্ববণ্টন সম্পর্কিত ব্যবস্থাসমূহকে অকার্যকর করিয়া রাখিতে পারেন।

উপরি-উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে ক্ষমতাবণ্টন ব্যাপারে ভারতীয় সংবিধান প্রকৃতিতে যুক্তরাষ্ট্রীয় হইলেও কেন্দ্রিকতার দিকে উহার ঝোঁক অতিশয় প্রবল এবং সংবিধানের বিভিন্ন ধারার মধ্যে অংগরাজ্যগুলি সম্পর্কে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ছাপ সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনের রাষ্ট্র: এই কারণেই অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কে. সি. হোয়ারার (Prof. K. C. Wheare) উক্তি করিয়াছেন যে, ভারতীয় সংবিধানকে যুক্তরাষ্ট্রীয় বলা যায় না, বড় জোর বলা যায় যুক্তরাষ্ট্র-প্রতিম বা যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনের (quasi-federal)—আধা যুক্তরাষ্ট্র। ইহাতে এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে কিছু কিছু যুক্তরাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্য সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে।[১]

১. The Indian Constitution "established indeed, a system of government which is at most quasi federal......a unitary State with subsidiary federal features rather than a federal State with subsidiary unitary features."

(৬)খ. ভারতীয় সংবিধান সুপরিবর্তনীয়তা এবং দুষ্পরিবর্তনীয়তার সংমিশ্রণ : দ্বিতীয়ত বলা হয়, যাহাতে কেন্দ্র এবং অংগরাজ্যগুলির স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকে তাহার জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান ক্ষমতাবণ্টন বিষয়ে এমনভাবে দুষ্পরিবর্তনীয় হইবে যে, কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির উভয়ের সম্মতি ব্যতীত সংবিধান—**অন্তত উহার ক্ষমতা-বণ্টন সম্পর্কিত অংশের পরিবর্তনসাধন করা যাইবে না। এই দিক দিয়া ভারতীয় সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয়।** (১) আইন প্রণয়নের ক্ষমতাবণ্টন, রাষ্ট্রপতির নির্বাচন, ইউনিয়ন ও রাজ্যগুলির শাসনবিষয়ক ক্ষমতা (executive power) ইত্যাদি বিষয়ে ভারতীয় সংবিধানের পরিবর্তন করিতে হইলে প্রথমে সংশ্লিষ্ট বিলটি পার্লামেন্টের প্রত্যেক পরিষদে ভোটপ্রদানকারী সদস্যদের অন্তত দুই-তৃতীয়াংশের ভোটাধিক্যে এবং মোট সদস্যের অধিকাংশ দ্বারা পাস হওয়া প্রয়োজন। তারপর ঐ বিল রাজ্যগুলির বিধানমণ্ডলের অন্তত অর্ধেকের দ্বারা গৃহীত হওয়া আবশ্যক। (২) সংবিধানের কতকগুলি ধারার পরিবর্তনের বেলায় বিল পার্লামেন্টের মোট সদস্যসংখ্যার অধিকাংশ এবং ভোটদাতা সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ দ্বারা পাস হইলেই চলে, রাজ্যের বিধানমণ্ডলের সম্মতির প্রয়োজন হয় না। (৩) ইহার উপর কতকগুলি বিষয় আছে—যেমন, অংগরাজ্যের দ্বিতীয় পরিষদের প্রতিষ্ঠা বা বিলোপসাধন ইত্যাদি—যাহা সংসদ সাধারণ আইন পাসের পদ্ধতিতেই পরিবর্তিত করিতে সমর্থ।

সুতরাং সামগ্রিকভাবে দেখিলে **ভারতীয় সংবিধান সুপরিবর্তনীয়তা ও দুষ্পরিবর্তনীয়তার সংমিশ্রণ** (The Constitution of India combines *flexibility* with *rigidity*) এবং ইহাকে **সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য** বলিয়া গণ্য করা হয়।

অধ্যাপক কে. সি. হোয়ায়ার ভারতীয় সংবিধানের সংশোধন-পদ্ধতিকে সমর্থন করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে, সংবিধানের সংশোধনের এরূপ বিভিন্ন ব্যবস্থা যদিও কদাচিৎ দেখা যায়, তবুও ইহা সুবিবেচনামূলকই হইয়াছে।[১]

---

(৬)গ. যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত : অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্র এবং অংগরাজ্যগুলির মধ্যে অথবা অংগরাজ্যগুলির নিজেদের মধ্যে **বিবাদবিসংবাদের মীমাংসা** করিবার জন্য একটি সর্বোচ্চ স্বাধীন আদালত থাকা প্রয়োজন। ভারতীয় সংবিধান অনুসারে ভারতের সর্বোচ্চ আদালত হইল সুপ্রীম কোর্ট বা প্রধান ধর্মাধিকরণ। অন্যান্য কার্যের মধ্যে এই আদালতের দায়িত্ব হইল ইউনিয়ন ও রাজ্যগুলি অথবা রাজ্যগুলির নিজেদের মধ্যে বৈধ অধিকারজড়িত বিবাদের মীমাংসা এবং মৌলিক অধিকারগুলিকে বলবৎ করা।

(৬)ঘ. ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট সকল আইনের বৈধতার বিচার করিতে পারে না : এই প্রসংগে আমাদের সুপ্রীম কোর্টের একটি বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রাখা প্রয়োজন। ক্ষমতার দিক হইতে **ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট ইংল্যাণ্ড ও মার্কিন**

১. "This variety in the amending process is wise but is rarely found."

যুক্তরাষ্ট্রের বিচারালয়ের মাঝামাঝি স্থান অধিকার করে। ইংল্যাণ্ডের বিচারালয় পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রণীত কোন আইনকে অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে না। অপরপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্ট সেখানকার আইনসভার যে-কোন আইনের বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলিতে পারে। ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট কতকগুলি সীমাবদ্ধ বিষয়ে সংসদ বা পার্লামেণ্ট এবং রাজ্যের আইনসভার আইনের বৈধতার বিচার করিতে পারে। অন্যান্য বিষয়ে কিন্তু সংসদ ও রাজ্যের আইনসভাসমূহ নিজ নিজ এলাকায় সরময় ক্ষমতার অধিকারী।

(৬)ঙ. **অভংগনীয় ইউনিয়ন**: ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে উহা 'অভংগনীয় রাজ্যসমূহের সমন্বয়ে গঠিত অভংগনীয় ইউনিয়ন' (an indestructible Union of indestructible States) নহে। **ভারতীয় ইউনিয়ন অভংগনীয় হইলেও অংগরাজ্যসমূহের সংহতি বা অস্তিত্বের স্থায়িত্ব** ব্যাপারে **কোন নিশ্চয়তা নাই।**[১] কারণ, সংবিধান অনুসারে পার্লামেণ্ট আইন দ্বারা কোন রাজ্যের ভূখণ্ড পৃথক করিয়া লইয়া অথবা দুই বা ততোধিক রাজ্যের অংশকে একত্রিত করিয়া অথবা কোন ভূখণ্ডকে কোন রাজ্যের অংশের সহিত মিলিত করিয়া নূতন রাজ্য গঠন করিতে পারে। ইহা ব্যতীত কোন রাজ্যের আয়তনের হ্রাসবৃদ্ধি অথবা কোন রাজ্যের সীমানা বা নামের পরিবর্তনও সংসদ আইন পাস করিয়া করিতে পারে। এই ব্যাপারে বিল উত্থাপনের পূর্বে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মতামত রাষ্ট্রপতি জানিতে পারেন, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে ঐ মতামত গ্রহণ করা **বাধ্যতামূলক** নহে। ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের মতামত ব্যতীতই এককভাবে রাজ্যের সংহতি ক্ষুণ্ণ করিতে পারে—এমনকি যে-কোন রাজ্যের অস্তিত্বেরই বিলোপসাধন করিতে সমর্থ। এই ব্যবস্থা **যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতিবিরুদ্ধ** বলিয়াই মনে হয়। উল্লেখযোগ্য যে অন্য কোন যুক্তরাষ্ট্রে অংগরাজ্যের সম্মতি ব্যতীত উহার সীমানার রদবদল সম্ভব হয় না।

১.৭. **কেন্দ্র ও রাজ্যগুলিতে দায়িত্বশীল সরকার**: কেন্দ্রে ও রাজ্যগুলিতে ইংল্যাণ্ডের অনুকরণে সংসদীয় বা ক্যাবিনেট শাসন-ব্যবস্থার (Parliamentary or Cabinet System) প্রবর্তন ভারতীয় সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই ধরনের শাসন-ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধান হইলেন নিয়মতান্ত্রিক শাসক; তাঁহার নামে শাসনকার্য পরিচালিত হইলেও প্রকৃত শাসক হইলেন মন্ত্রিবর্গ। মন্ত্রীরা আবার শাসনকার্য পরিচালনার জন্য আইনসভার নিকট—বিশেষ করিয়া আইনসভার নিম্নতর কক্ষের নিকট—যৌথভাবে দায়িত্বশীল থাকেন এবং প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্বাধীনে কার্য করেন। এইজন্য ইহাকে দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থাও (Responsible Government) বলা হয়।

এই সংসদীয় বা দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থা ইংল্যাণ্ডের অবদান এবং উহার নিয়ম-কানুন আইনের ভিত্তিতে গড়িয়া উঠে নাই, প্রবর্তিত হইয়াছে **প্রথাগত রীতিনীতির** (*conventions*) **ভিত্তিতে।**

১. **In India only the Union is "indestructible; but *the states are not.*" Asok Chanda**

ইংল্যাণ্ডের অনুসরণে যে-সকল দেশ সংসদীয় শাসন-ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের মধ্যে আয়ারল্যাণ্ড, ভারত প্রভৃতি প্রথাগত রীতিনীতিগুলিকে অল্পবিস্তর আইনে রূপান্তরিত করিয়া লইয়াছে। যদিও আইনগতভাবে অনেক ক্ষমতা ভারতের (পরোক্ষভাবে) নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে, কার্যত তিনি ইংল্যাণ্ডের রাণীর মতই শাসনতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান। মূল সংবিধানে ছিল যে তাঁহার কার্যে সাহায্য এবং তাঁহাকে পরামর্শদানের জন্য প্রধান মন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী লইয়া গঠিত একটি মন্ত্রি-পরিষদ অবশ্যই থাকিবে। ১৯৭৬ সালের সংবিধানের ৪২তম সংশোধনে পরিষ্কারভাবে বলা হইয়াছে যে রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য ও পরামর্শদানের জন্য প্রধান মন্ত্রী-সহ একটি মন্ত্রি-পরিষদ থাকিবে এবং রাষ্ট্রপতি তাঁহার কর্তব্য সম্পাদনে এই মন্ত্রি-পরিষদের পরামর্শ গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

১৯৭৮ সালের ৪৪তম সংশোধন দ্বারা উপরি-উক্ত ব্যবস্থার সহিত যোগ করা হইয়াছে যে, রাষ্ট্রপতি মন্ত্রি-পরিষদকে উহার পরামর্শকে পুনর্বিবেচনা করিতে বলিতে পারেন, **কিন্তু পুনর্বিবেচনার পর মন্ত্রি-পরিষদ যে পরামর্শ দিবে রাষ্ট্রপতি তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকিবেন**। ইংল্যাণ্ডে রাজা বা রাণীকে প্রায় সকল বিষয়েই তাঁহার মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিতে বাধ্য থাকিতে হয়। ভারতীয় সংবিধানেও কিন্তু বর্তমানে রাষ্ট্রপতি আইনগতভাবে মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিতে বাধ্য। ইংল্যাণ্ডের মত ভারতেও মন্ত্রীরা সংবিধান অনুযায়ী নিম্নতর পরিষদের নিকট যৌথভাবে দায়ী।

(৭)ক. **ভারতে পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার প্রবর্তিত হইয়াছে কি না** : রাজ্যগুলিতে রাজ্যপালগণ মোটামুটিভাবে রাষ্ট্রপতির মত মন্ত্রি-পরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিবেন। ক্যানাডার অনুকরণে রাজ্যপালগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। তবে একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন, সংবিধান কর্তৃক রাজ্যপালকে **স্বেচ্ছামূলকভাবে কার্য করিবার ক্ষমতাও** (to act *in his discretion*) প্রদান করা হইয়াছে। অতএব, সাধারণ ক্ষেত্রে মন্ত্রি-পরিষদের পরামর্শ ব্যতিরেকেই কার্য করিতে সমর্থ। ইহা ব্যতীত সংবিধানে একথাও বলা হইয়াছে যে মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপাল কার্য করিতেছেন কি না, সে-বিষয়ে অনুসন্ধান করার ক্ষমতা কোন আদালতের নাই। এই সকল কারণে অনেকে মনে করেন যে **রাজ্যগুলিতে পূর্ণ দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থা** প্রবর্তিত হয় নাই।

১.৮. **পূর্বতন দেশীয় রাজ্যগুলি ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ** : সংবিধানের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে, পূর্বতন দেশীয় নৃপতি-শাসিত রাজ্যগুলি ভারতের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত হইয়া ভারতীয় সংবিধান অনুসারে শাসিত হইতেছে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি পাশাপাশি রাজ্যের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। অবশিষ্টগুলি হয় একত্রিত হইয়া বৃহদাকার ধারণ করিয়াছে, না-হয় পুরাতন পৃথক সত্তা বজায় রাখিয়াছে। রাজ্য পুনর্গঠনের (States Reorganisation) ফলে পৃথক সত্তা বজায় রাখিতে পারিয়াছে এরূপ দেশীয় রাজ্যের সংখ্যা অত্যল্প।

১.৯. ধর্ম-নিরপেক্ষতা : ধর্ম-নিরপেক্ষতা (secularism) ভারত-রাষ্ট্রের একটি বিশিষ্ট দিক বলিয়া অভিহিত করা হয়। ইতিপূর্বেই বলা হইয়াছে ১৯৭৬ সালের ৪২তম সংশোধনের দ্বারা প্রস্তাবনায় উল্লেখ করা হইয়াছে যে ভারত এক ধর্মনিরপেক্ষ সাধারণতন্ত্র। ভারতে কোন প্রকারের রাষ্ট্রীয় ধর্ম (State Religion) নাই। ধর্ম জাতি বর্ণ বিশ্বাস এবং স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল ভারতীয়ের জন্য এক এবং **অভিন্ন নাগরিক-অধিকারের ব্যবস্থা**[1] করা হইয়াছে। ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র কোন নাগরিকের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করিতে পারে না।

অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র : ধর্মনিরপেক্ষতা বলিতে অবশ্য ইহা বুঝায় না যে, ধর্মীয় স্বাধীনতা নাই—বুঝায় যে কতকগুলি যুক্তিযুক্ত বাধানিষেধসাপেক্ষে সকল ব্যক্তিরই বিবেকের স্বাধীনতায় এবং স্বাধীনভাবে ধর্মস্বীকার, ধর্মাচরণ ও ধর্মপ্রচারের সমান অধিকার রহিয়াছে। এইরূপ ধর্মনিরপেক্ষতাকে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ অসাম্প্রদায়িকতা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে, ভারতকে 'ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র' (Secular State) না বলিয়া 'অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র' (Non-Communal State) বলিয়া অভিহিত করাই যুক্তিযুক্ত।

১.১০. কতকগুলি অনুন্নত শ্রেণীর উন্নতিকল্পে বিশেষ ব্যবস্থা : যদিও সংবিধান সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নকে অস্বীকার করিয়াছে তবুও কতকগুলি অনুন্নত শ্রেণীর উন্নতিকল্পে বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছে—যথা, তপশীলী বর্ণ ও তপশীলী উপজাতিদের (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) জন্য আইনসভায় আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। এই ব্যবস্থা সংবিধান প্রবর্তিত হইবার পর ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত চালু থাকিবে।[2] সরকারী চাকরিতে ইহাদের দাবি বিবেচনার কথাও সংবিধানে উল্লিখিত হইয়াছে। তপশীলী উপজাতির কল্যাণসাধন এবং তপশীলভুক্ত এলাকাগুলির শাসন-ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে অর্থসাহায্যের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। বিহার উড়িষ্যা মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যে তপশীলী উপজাতিদের এবং প্রয়োজনবোধে তপশীলী বর্ণসমূহের স্বার্থের তদারক করিবার জন্য পৃথক একজন মন্ত্রী আছেন। তপশীলী বর্ণ ও তপশীলী উপজাতিসমূহের স্বার্থসংরক্ষণের জন্য যে-সংবিধানগত ব্যবস্থা আছে সেগুলির কার্যকারিতা সম্পর্কে অনুসন্ধান ও রিপোর্ট প্রদান করিবার জন্য একজন বিশেষ কর্মচারী (Special Officer) রহিয়াছেন।

১. ১৯৮৫ সালে ১৯৫৫ সালের নাগরিকতা আইনের সংশোধন দ্বারা আসামদের ক্ষেত্রে এক শ্রেণীর নাগরিকদের জন্য কিছুটা ভিন্ন ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই শ্রেণীর নাগরিকগণ ১০ বৎসর ধরিয়া অন্যান্য নাগরিক-অধিকার ভোগ করিবে কিন্তু ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত থাকিবেন। ভারতীয় নাগরিকত্ব সংক্রান্ত (৭ম) অধ্যায় দেখ।

২. মূল সংবিধানে এই সংরক্ষণ-ব্যবস্থা প্রথম ১০ বৎসর পর্যন্ত চালু রাখার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছিল। কিন্তু পরে সংবিধানের তিন দফা সংশোধন দ্বারা ঐ সংরক্ষণ-ব্যবস্থার মেয়াদ বৃদ্ধি করিয়া ৩০ বৎসর করা হইয়াছে—অর্থাৎ ১৯৯০ সালের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

১.১১. মূলত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদভিত্তিক সংবিধান: পরিশেষে, অনেকে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারতের নূতন সংবিধান মূলত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদভিত্তিক। যাঁহারা সংবিধান রচনা করিয়াছেন তাঁহারা বার্ক ডাইসি মিল প্রভৃতি লেখকের মতবাদ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। অবশ্য অপরদিকে **কিছু কিছু সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণাও** সংবিধানভুক্ত করা হইয়াছে। নির্দেশমূলক নীতিগুলি প্রধানত এই জাতীয়। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সম্প্রতি ১৯৭৬ সালের ৪২তম সংশোধনে ভারতকে **সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র** (প্রজাতন্ত্র) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

১১.ক. সমাজতন্ত্রের বিশ্লেষণ: সমাজতন্ত্র শব্দটি বিশেষ অস্পষ্ট—বিভিন্ন ভাবে ইহার ব্যাখ্যা করা হয়। যেমন, সোবিয়েত ইউনিয়নকে **সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র** বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে—এখানে সমাজতন্ত্র মার্ক্সীয় দৃষ্টিকোণ হইতে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। মার্ক্সবাদী দৃষ্টিকোণ হইতে ইহা দ্বারা বুঝায় যে উৎপাদন-উপায়সমূহের মালিকানা এবং বণ্টন-ব্যবস্থা সামগ্রিকভাবে সমাজের হস্তে ন্যস্ত থাকিবে। ভারতীয় সংবিধানে কিন্তু এই অর্থে সমাজতন্ত্র কথাটি ব্যবহৃত হয় নাই। ৪২তম সংশোধন প্রসংগে প্রয়াত প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, সুস্পষ্টভাবেই বলিয়াছিলেন যে সমাজতন্ত্র বলিতে 'রাষ্ট্রিক সমাজতন্ত্র' (state socialism) বা সমষ্টিবাদ (collectivism) বুঝায় না, বুঝায় সুযোগের সাম্য (equal opportunity) বা সামাজিক-অর্থনৈতিক সংস্কার (socio-economic reforms)। বস্তুত, ভারতীয় রাষ্ট্রের অর্থ-ব্যবস্থা হইবে মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা অথবা রাষ্ট্র হইবে কল্যাণমূলক রাষ্ট্র যেখানে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা বিরাজ করিবে। সংবিধান যে প্রধানত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী তাহা বুঝা যায় যখন নির্দেশমূলক নীতিসংক্রান্ত অধ্যায়ের ৩৯(গ) [39(c)] অনুচ্ছেদের দিকে দৃষ্টি দিলে। এই অনুচ্ছেদটির বক্তব্য হইল, রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল দেখা যে মুষ্টিমেয়ের হাতে সম্পদ ও উৎপাদনের উপায়সমূহের পুঞ্জীভূত হইতে সাধারণের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ না করে। সুতরাং **পরোক্ষভাবে ব্যক্তিগত-উদ্যোগের অধিকার স্বীকৃত** হইয়াছে যদিও বা রাষ্ট্র ইহার উপর বাধানিষেধ আরোপ করিতে পারিবে। ইহা ছাড়া **কেশবানন্দ বনাম কেরল রাজ্য** (১৯৭৩) ও **'মিনার্ভা মিলস্ বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন'** (১৯৮০) মামলায়[১] সুপ্রীম কোর্ট এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছে যে সংবিধানের মৌলিক বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ করা যাইবে না। এই দুইটি মামলার রায় অব্যাহত থাকিলে অর্থ-ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন পূর্ণাংগ অর্থে 'সমাজতন্ত্র' প্রবর্তিত করা সম্ভবপর হইবে না। তবে আদালত 'সমাজতন্ত্র' শব্দটির কি ব্যাখ্যা দিবে তাহা এখনই কিছু বলা যায় না।

"Essentiallv the Indian Constitution is an individualist document. Its prophets are Burke, Mill and Dicey : yet some at least of the members of the Constituent Assembly thcught in collectivist terms." Jennings

১. ৩ পৃষ্ঠা দেখ।

স্মর্তব্য

বিশ্লেষণ করিলে ভারতীয় সংবিধানের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি নির্দেশ করা যায় :

১. ভারতীয় সংবিধান বিরাটতম, বিষয়বহুল এবং জটিলতম।

২. সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারত 'সার্বভৌম (সমাজতান্ত্রিক ধর্ম-নিরপেক্ষ) গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

৩. সংবিধানে কতকগুলি মৌলিক অধিকার সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, এবং বর্তমানে উহাদের সংখ্যা ছয়। মৌলিক অধিকারগুলি বাধানিষেধ-সাপেক্ষ।

৪. কতকগুলি নির্দেশমূলক নীতি এবং নাগরিকের ১০-দফা মৌল কর্তব্যও সংবিধানে সন্নিবিষ্ট।

৫. ভারতীয় সংবিধান আধা-যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্তন করিয়াছে।

৬. সংবিধান সুপরিবর্তনীয়তা ও দুষ্পরিবর্তনীয়তার সংমিশ্রণে রচিত।

৭. সুপ্রীম কোর্টের বৈধতা বিচারের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ।

৮. কেন্দ্র ও রাজ্যগুলিতে দায়িত্বশীল সরকার প্রবর্তিত হইয়াছে। তবে রাজ্যের ক্ষেত্রে দায়িত্বশীলতা কিছু কিছু বাধানিষেধ-সাপেক্ষ।

৯. পূর্বতন দেশীয় রাজ্যগুলি লইয়া বৃহত্তর ভারত গঠিত হইয়াছে।

১০ ভারত অন্যতম ধর্ম-নিরপেক্ষ বা অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র।

১১. সংবিধানে কতকগুলি অনুন্নত শ্রেণীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

১২. সমাজতন্ত্রের কথা বলা হইলেও ভারতীয় সংবিধান মূলত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদীভিত্তিক।

অনুশীলনী

1. Discuss the salient features of the Constitution of India. (U. 1974)

[ভারতীয় সংবিধানের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যের পর্যালোচনা কর।] (১-২, ৪-৫, ৬-৭, ৮-১০ পৃষ্ঠা)

2. What appear to you to be the most striking features of the Constitution of India?

[তোমার নিকট ভারতীয় সংবিধানের কোন কোন বৈশিষ্ট্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে হয়?]

[পূর্ববর্তী প্রশ্নের উত্তর]

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা

২

(PREAMBLE TO THE CONSTITUTION OF INDIA)

"আমরা যে নতুন ভারত তৈরী ক'রব তার প্রতিষ্ঠা হবে মানবজাতির শ্রেষ্ঠতম আদর্শের উপর।" সুভাষচন্দ্র

১. সংবিধানের প্রস্তাবনা—বর্তমান দিনের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য: বর্তমান যুগে প্রায় সকল দেশের লিখিত সংবিধানের প্রারম্ভে একটি করিয়া প্রস্তাবনা (Preamble) যুক্ত করিয়া দেওয়া একপ্রকার রীতিতে পরিণত হইয়াছে। এ-বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই হইল পথিকৃৎ।

পথিকৃৎ—মার্কিন সংবিধান: ১৭৮৭ সালে ঐ দেশের সংবিধানের সহিত একটি প্রস্তাবনা সংযুক্ত করিয়া ঘোষণা করা হয়; "আমরা যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ অধিকতর পূর্ণাংগ সংঘ গঠনের উদ্দেশ্যে, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য, আভ্যন্তরীণ শান্তি নিশ্চিত করিবার জন্য, সকলের নিরাপত্তা বজায় রাখিবার জন্য সামগ্রিক কল্যাণসাধনের উদ্দেশ্যে এবং যাহাতে আমরা ও আমাদের বংশধরগণ স্বাধীনতার সুফল ভোগ করিতে সমর্থ হই সেই উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য এই সংবিধানের ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠা করিলাম।"[১]

১.১. বর্তমান সংবিধানসমূহের প্রস্তাবনা সংযোগ: পরবর্তী সময়ে অনেক দেশই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুকরণে সংবিধানের সহিত একটি করিয়া বিস্তৃত প্রস্তাবনা সন্নিবিষ্ট করিয়াছে। সাম্প্রতিক কালে যে-সকল সংবিধান রচিত হইয়াছে তাহার মধ্যে আয়ারল্যাণ্ড জাপান ব্রহ্মদেশ ভারত প্রভৃতি রাষ্ট্রের সংবিধানে অনুরূপ প্রস্তাবনা দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং লিখিত সংবিধানের পক্ষে প্রস্তাবনা অপরিহার্য নয়। ইহার পরই প্রশ্ন উঠে, সংবিধানে প্রস্তাবনা সংযুক্ত করিবার উদ্দেশ্য বা তাৎপর্য কি?

১.২. প্রস্তাবনার অর্থ, উদ্দেশ্য এবং তাৎপর্য (Meaning, Purpose and Significance of a Preamble): যে-কোন আইনের প্রস্তাবনার (Preamble) কার্য হইল ঐ আইনের সাধারণ উদ্দেশ্য ও নীতির উল্লেখ এবং কি কি অসুবিধা বা অন্যায়ের প্রতিকারসাধনের জন্য ঐ আইন প্রণয়ন করা হইল তাহার বর্ণনা করা। অন্যভাবে বলা যায়, সংশ্লিষ্ট আইনটি রচনা করিবার পশ্চাতে আইনসভার উদ্দেশ্য ও ইচ্ছা কি, প্রস্তাবনা সংক্ষেপে তাহাই ব্যাখ্যা করে। সংবিধান দেশের মৌলিক আইন। সুতরাং **সংবিধানের প্রস্তাবনারও কাজ হইল সংবিধানের উদ্দেশ্য ও নীতির** উল্লেখ করা। ইহার মাধ্যমে সংবিধান রচয়িতৃদের ইচ্ছা প্রকাশিত হয়। ইহা ব্যতীত প্রস্তাবনায় সংবিধানের উৎস এবং আইনগত ও নৈতিক ভিত্তির ইংগিত দেওয়া হয়। অর্থাৎ, সংবিধানের উৎপত্তিস্থল কি, কোন্ যুক্তিতে সাংবিধানকে দেশের মৌলিক বা

---

১. "We, *the people of the United States*, in order to form a more perfect Union establish justice, insure domestic tranquillity, provide for the common defence, promote the general welfare, and secure the blessings of liberty to ourselves and to our posterity, *do ordain and establish this Constitution* for the United States of America.", *Preamble to the Constitution of the United States* (1787)

সর্বপ্রধান আইন বলিয়া গণ্য করা হই... একতাই
বা কি ?—এই সকল প্রশ্নের উত্তরের ই...

ম্যাক্সওয়েল (Maxwell), ... আইন-
বিশেষজ্ঞের মত অনুসারে প্রস্তাব... উপায়,
আইন-প্রণেতৃবর্গের উদ্দেশ্য অনুধাব...

১৩. প্রস্তাবনা বনাম কার্য: ...বিধানের
ব্যাখ্যার ব্যাপারে প্রস্তাবনা অন্যতম ...রে মনে
রাখা প্রয়োজন, প্রস্তাবনাকে সংবিধানের কার্যকরী অংশের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরা হয় না। সংবিধানের কার্যকরী অংশের (operative parts) ভাষা বা উদ্দেশ্য পরিষ্কার থাকিলে প্রস্তাবনা উহার অর্থকে সংকুচিত বা সম্প্রসারিত কোনটাই করিতে পারে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের সুপ্রীম কোর্ট সুস্পষ্টভাবেই বলিয়াছে যে, সংবিধানের উদ্দেশ্য নির্ধারণ এবং ব্যাখ্যা প্রধানত সংবিধানের কার্যকরী অংশে ব্যবহৃত শব্দের স্বাভাবিক অর্থের ভিত্তিতেই করিতে হইবে।[১] প্রস্তাবনার সহিত কার্যকরী অংশের অসামঞ্জস্য বা অসংগতি দেখা দিলে প্রস্তাবনার পরিবর্তে সংবিধানের কার্যকরী অংশই বলবৎ হয়। অবশ্য কার্যকরী অংশের কোন বাক্য বা শব্দের একাধিক ব্যাখ্যার সম্ভাবনা দেখা দিলে—অর্থাৎ ভাষার বা উদ্দেশ্যের অস্পষ্টতা থাকিলে অস্পষ্টতা দূরীকরণের জন্য বা শব্দার্থ নির্ধারণের জন্য প্রস্তাবনার সাহায্য লওয়া যাইতে পারে।[২]

সুতরাং বলা যায়, অবস্থাবিশেষে এবং বিশেষ কারণ থাকিলে সংবিধানের ব্যাখ্যার জন্য আদালত প্রস্তাবনার সাহায্য লইতে পারে। তবে সাধারণত প্রস্তাবনা দ্বারা সংবিধানের কার্যকরী অংশ নিয়ন্ত্রিত হয় না—প্রস্তাবনায় যাহাই থাকুক না কেন, কার্যকরী অংশই বলবৎ হইবে।

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনার মূল্য ও গুরুত্ব নিরূপণে আমাদের ... সকল সময়ই মনে রাখিতে হইবে।

২. ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা ও উহার বিশ্লেষণ (Preamble to the Constitution of India and its Analysis) :

১৯৭৬ সালে ভারতীয় সংবিধানের মূল প্রস্তাবনা ৪২তম সংশোধনের দ্বারা পরিবর্তিত করা হইয়াছে।[৩] এই পরিবর্তিত প্রস্তাবনা হইল এইরূপ

১. *Jacobson* v *Massachussets* (1950), and *Gopalan* v *State of Madras* (1950)

২. "A Preamble, it is said, is not an operative part of the Constitution It indicates only the general purposes for which the people ordained and established the Constitution It has never been regarded as the source of any substantive power." T K. Jope : *Constitutional Law of India*

৩. মূল সংবিধানে ভারতকে **সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র** (Sovereign Democratic Republic) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছিল। ইহা ছাড়া 'জাতির ঐক্য ও সংহতি (the unity and integrity of the Nation) কথাটির পরিবর্তে জাতির ঐক্য (unity of the nation) কথাটি ছিল।

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা : "আমরা ভারতের জনগণ, ভারতকে সার্বভৌম (সমাজতান্ত্রিক ধর্ম-নিরপেক্ষ)[১] গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্ররূপে [Sovereign (Socialist Secular) Democratic Republic] গড়িয়া তুলিতে এবং উহার সকল নাগরিকই যাহাতে—

সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার (Justice) এবং চিন্তার, মতপ্রকাশের, বিশ্বাসের, ধর্মের ও উপাসনার স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা এবং সুযোগের সমতা লাভ করে এবং তাহাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তির মর্যাদা ও জাতির ঐক্য (ও সংহতি) সুনিশ্চিতভাবে রক্ষার অনুকূল ভ্রাতৃভাব (Fraternity) বর্ধিত হয়—

তাহার জন্য সত্যনিষ্ঠার সহিত সংকল্প করিয়া, আমাদের এই গণপরিষদে অদ্য, ১৯৪৯ সালের নভেম্বর মাসের ২৬ তারিখে, এতদ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ করিতেছি, বিধিবদ্ধ করিতেছি এবং নিজেদের অর্পণ করিতেছি।"[২]

২.ক. সংবিধানের রাজনৈতিক, আইনগত ও নৈতিক ভিত্তি (Political, Legal and Moral Bases of the Constitution): ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনার বিশ্লেষণে প্রথমেই "আমরা ভারতের জনগণ·· আমাদের এই গণপরিষদে···এই সংবিধান গ্রহণ করিতেছি, বিধিবদ্ধ করিতেছি এবং নিজেদের অর্পণ করিতেছি" এই কথাগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষিত হয়।

জনগণ—সংবিধানের উৎস বা আইনগত-ভিত্তি : ব্রহ্মদেশ জাপান ফ্রান্স আয়ারল্যাণ্ড প্রভৃতি অন্যান্য অনেক দেশের সংবিধানেই 'জনগণ কর্তৃক সংবিধান গৃহীত হইয়াছে' অথবা 'জনগণের হস্তে সার্বভৌম ক্ষমতা ন্যস্ত করা হইয়াছে' এরূপ উক্তি রহিয়াছে।

এই বিষয়ে অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই পথপ্রদর্শক।[৩]

আবার 'আমরা জনগণ' এই কথাটির তাৎপর্যও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও আইনগত তত্ত্বের অনুকরণে স্থির করা হয়। এই তত্ত্বের মূলকথা হইল, **গণতন্ত্রে জনগণই**

১. বন্ধনীর ভিতর অংশদ্বয় ৪২তম সংশোধন দ্বারা সন্নিবিষ্ট

২. "We, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN [SOCIALIST SECULAR] DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens;

JUSTICE, social economic and political,

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship

EQUALITY of status and of opportunity;

and to promote among them all;

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation;

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949; do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION."

৩. ১২ পৃষ্ঠা দেখ

চরম বা সার্বভৌম ক্ষমতার আধার। সুতরাং জনগণ অথবা জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে গণপরিষদেরই সংবিধান রচনা বা গ্রহণ করার ক্ষমতা আছে। আদালতও এই ক্ষমতাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

সংবিধান দেশের চরম বা মৌলিক আইন : আবার সংবিধান শুধু আইনই নয় ; ইহা দেশের মৌলিক বা চরম বিধি (Fundamental or Supreme Law)। কারণ, চরম আইন-প্রণেতা (supreme lawgiver) জনসাধারণ কর্তৃক সংবিধান গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং চরম বিধি হিসাবে **সংবিধান সরকার ও সাধারণ আইন উভয়েরই ঊর্ধ্বে।**

সংবিধানের নৈতিক ভিত্তি—জনগণের ইচ্ছা : এই ত গেল সংবিধানের আইনগত ভিত্তির কথা। এখন প্রশ্ন, সংবিধানের নৈতিক ভিত্তি কি ?—অর্থাৎ সংবিধানকে চরম আইন হিসাবে মান্য করিবার পশ্চাতে নৈতিক যুক্তি কি থাকিতে পারে ? ইহার উত্তরে বলা হয়, সর্বোচ্চ আইন হিসাবে সংবিধান হইল দেশের আইনশৃংখলার ভিত্তি। ইহাকে অমান্য করা হইলে রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়িবে এবং বিশৃংখলা ও অরাজকতা দেখা দিবে।

ইহা ছাড়া সংবিধান সার্বভৌম ক্ষমতা জনসাধারণ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে ; ইহা জনসাধারণের ইচ্ছারই প্রকাশ। এই অবস্থায় প্রত্যেকটি লোকের সংবিধানকে মান্য করিবার নৈতিক দায়িত্ব রহিয়াছে।[১]

উৎস হিসাবে জনগণের উল্লেখের সমালোচনা : সংবিধানের আইনগত ও নৈতিক ভিত্তি নির্ধারণের জন্য এই যে 'জনগণের কথা উল্লেখ করা হয় তাহা কাল্পনিক তত্ত্ব ভিন্ন আর কিছুই নয়। কোন দেশেই সামগ্রিকভাবে জনসাধারণ সংবিধান রচনায় অংশগ্রহণ করে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান সম্পর্কে ডক্টর বিয়ার্ড (Charles A. Beard) মন্তব্য করিয়াছেন যে, উহা প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ জনসংখ্যার এক-ষষ্ঠাংশের অধিক লোক দ্বারা সমর্থিত হয় নাই।[২] অনেক সংবিধানকে আবার অনুমোদনের জন্য জনগণের নিকট উপস্থিত করা হয় নাই, এমনকি সংবিধান-রচয়িতৃগণ সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোট দ্বারাও নির্বাচিত হন নাই। অথচ, এই সকল ক্ষেত্রে 'সংবিধান জনগণ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে' এবং 'জনগণের ইচ্ছার প্রকাশ' বলিয়াই ঘোষিত হইয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে সংবিধানে প্রণেতৃবর্গের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ধ্যান-ধারণাই মূলত প্রতিফলিত হয়, সার্বভৌম জনগণের ইচ্ছা নহে।

সংবিধান জনগণের নামে রচিত হইয়াছে এবং উহা আইনশৃংখলার ভিত্তিস্বরূপ বলিয়াই সকলের পক্ষে সর্বাবস্থায় উহাকে মান্য করার বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে, এরূপ ব্যাখ্যার অসুবিধাও আছে। সংবিধান সংখ্যাগরিষ্ঠ দ্বারা গৃহীত হইয়াছে—ইহা ধরিয়া লইলেও প্রশ্ন থাকিয়া যায়, সংবিধান-প্রতিষ্ঠিত আইনশৃংখলা কতদূর সমর্থনযোগ্য ? ল্যাস্কিকে (H. J. Laski) অনুসরণ করিয়া বলা যায়, শৃংখলার জন্য শৃংখলা কামনা করা হয় না, কামনা করা হয় উহা সুন্দর জীবনের অনুপন্থী নয় (order is good for what it

১. "... in the moral sphere it is sometimes argued that a constitution commands obligation because it expresses the will of the people." K. C. Wheare

২. *An Economic Interpretation of the Constitution* (of the USA)

implies and not for its own sake)। যে-ক্ষেত্রে আইনশৃংখলার মধ্যে থাকিয়া সাধারণ নাগরিক সুস্থ সবল ও পরিপূর্ণ জীবন যাপন করিবার সুযোগ পায় না অথবা যে-ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু জনসম্প্রদায়ের অধিকার বা স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়, সে-ক্ষেত্রে তাহাদের পক্ষে সংবিধান মান্য করিবার বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে।

এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় ব্যবহৃত 'আমরা ভারতীয় জনগণ…' ইত্যাদি কথার তাৎপর্য সহজেই অনুমান করা যায়। ইহার দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে যে, ভারতীয় সংবিধানের আইনগত ও নৈতিক ভিত্তি হইল ভারতের জনসাধারণ। অন্যভাবে বলা যায়, চরম সার্বভৌম ক্ষমতার আধার জনসাধারণই গণপরিষদে তাহাদের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে ভারতীয় সংবিধান প্রণয়ন ও গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং সংবিধান হইল দেশের সর্বপ্রধান মৌলিক আইন[১] এবং উহাকে মান্য করিবার আইনগত ও নৈতিক উভয় প্রকার দায়িত্বই প্রত্যেক ভারতবাসীর রহিয়াছে। ইহা ছাড়া সর্বজনীন ভোটাধিকার স্বীকৃত হওয়ায় আইনসভার সদস্য নির্বাচন করিবার ও নির্বাচিত হওয়ার অধিকার জনসাধারণের রহিয়াছে এবং তাহারা শাসনতান্ত্রিক উপায়েই সংবিধানের পরিবর্তন করিতে পারে। অতএব, সংবিধান ভংগ করিবার সপক্ষে কোন যুক্তিই থাকিতে পারে না অথবা রাষ্ট্রের কোন অংশকে বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকারও দেওয়া যাইতে পারে না।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, সার্বভৌম আইন-প্রণেতৃ জনগণের ইচ্ছার প্রকাশ এবং আইনশৃংখলার ভিত্তি ভারতীয় সংবিধান প্রত্যেক ব্যক্তি এবং প্রত্যেকটি অঞ্চলের নিকট বাধ্যতামূলক।

অভিমত—কেন জনগণ সংবিধানের উৎস ও ভিত্তি নহে : ভারতীয় জনগণই ভারতীয় সংবিধানের উৎপত্তিস্থল ও ভিত্তি, এই যুক্তির বিশেষ বিরুদ্ধ সমালোচনা করা হইয়াছে। সংবিধানকে জনসাধারণের সার্বভৌম ক্ষমতা বা ইচ্ছার উপর ভিত্তিশীল করিতে হইলে সংবিধান রচনাকার্যের সহিত জনগণকে কোন-না-কোন ভাবে সংশ্লিষ্ট করা প্রয়োজন।

(১) রচনাকার্যে তাহাদের কোন ভূমিকা ছিল না : সর্বপ্রথমেই সংবিধান-রচনাকারী গণপরিষদকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গঠিত করিতে হইবে—অর্থাৎ সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গণপরিষদের সদস্যদের নির্বাচিত করিতে হইবে। ইহা না করা হইলে গণপরিষদের সদস্যদের জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে গ্রহণ করা যায় না, এবং ফলে গণপরিষদকে প্রতিনিধিমূলক সংস্থাও বলা যায় না। অনেক ক্ষেত্রেই আবার গণপরিষদ কর্তৃক সংবিধান গৃহীত হওয়ার পর উহাকে জনগণের অনুমোদনের জন্য গণভোটে (referendum) পেশ করা হয়। যেমন, আয়ারল্যাণ্ডের সংবিধানকে জনসাধারণের নিকট পেশ করা হইয়াছিল এবং জনসাধারণ কর্তৃক গৃহীত হওয়ার পর ঐ সংবিধানকে চালু করা হয়। ভারতীয় সংবিধান রচনা ব্যাপারে উপরি-উক্ত **দুইটি পদ্ধতির** কোনটিই অনুসৃত হয় নাই।

ভারতীয় গণপরিষদ পার্লামেন্টের আইন বলে গঠিত হয় এবং সার্বভৌম ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। গণপরিষদের সদস্যরা সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন নাই। প্রদেশগুলি হইতে যাঁহারা

---

১. "The supremacy of the Indian Constitution ... arises from the fact that it claims to be the work of the people." K. C. Wheare

গণপরিষদে প্রেরিত হইয়াছিলেন তাঁহারা ১৯৩৫ সালের সংবিধান অনুযায়ী গঠিত প্রাদেশিক আইনসভাগুলি কর্তৃক পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ঐ ১৯৩৫ সালের সংবিধানে প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনে জনসংখ্যার মাত্র শতকরা ১৪ জনের ভোটাধিকার ছিল। দেশীয় রাজ্যগুলি হইতে যে-সকল প্রতিনিধি গণপরিষদে আসিয়াছিলেন তাঁহারা অংশত ছিলেন দেশীয় নৃপতিদের মুখপাত্র এবং অংশত দেশীয় রাজ্যগুলির জনপ্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্বাচিত হইয়াছিলেন। এইভাবে গঠিত গণপরিষদ কর্তৃক ভারতীয় সংবিধান রচিত হয়। সুতরাং সমালোচকগণ মতপ্রকাশ করেন যে, ভারতীয় সংবিধান জনগণ কর্তৃক রচিত হইয়াছে—এই যুক্তি সমর্থনযোগ্য নয়।

(২) রচিত সংবিধান তাহাদের দ্বারা অনুমোদিতও হয় নাই : এমনকি গণভোটের সাহায্যে সংবিধান সম্পর্কে জনসাধারণের মতামতও গ্রহণ করা হয় নাই। বলা হয়, এই অবস্থায় গণপরিষদের সদস্যদের পক্ষে সকল ভারতবাসীর প্রতিনিধিত্ব দাবি করার পশ্চাতে বিশেষ যুক্তি আছে বলিয়া মনে হয় না এবং ভারতীয় সংবিধান জনসাধারণ কর্তৃক রচিত এবং ভারতীয় সংবিধানের আইনগত ভিত্তি হইল জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতা—এরূপ বক্তব্যকে বাস্তব সম্পর্কচ্যুত কল্পনা ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না।

সংবিধানের প্রকৃত আইনগত ভিত্তি : প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় সংবিধানের আইনগত ভিত্তি হইল ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের আইন—ভারতীয় স্বাধীনতা আইন (Indian Independence Act, 1947), ভারতের সার্বভৌম জনসাধারণ নয়।[১]

ঐ আইন বলেই ভারত স্বাধীন হয় এবং আবার চূড়ান্ত ক্ষমতাসম্পন্ন গণপরিষদ গঠিত হয়। বিখ্যাত শাসনতন্ত্রবিদগণ এই অভিমতই সমর্থন করিয়াছেন।[২]

সমালোচনার উত্তর : সাধারণ ক্ষেত্রে এই সকল সমালোচনার উত্তরে বলা হয় যে, জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত গণপরিষদ দ্বারা সংবিধান রচনাই অবশ্য প্রকৃষ্ট পন্থা। কিন্তু যে অবস্থায় ভারত স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয় সেই অবস্থায় সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গণপরিষদ গঠনের ব্যবস্থা করা হইলে সংবিধান প্রণয়ন অকারণভাবে বিলম্বিত হইত এবং এই বিলম্ব তখনকার রাজনৈতিক অবস্থায় কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণই টানিয়া আনিত। উপরন্তু, যাঁহারা গণপরিষদে সংবিধান রচনা করিয়াছেন তাঁহারা ছিলেন দেশের সর্বজনসমর্থিত নেতা। গণপরিষদে কংগ্রেস দলই অধিকাংশ আসন দখল করে। একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, যদি সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গণপরিষদে সদস্য প্রেরণের ব্যবস্থা করা হইত তাহা হইলে ঐ দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাইত, কারণ তৎকালীন অবস্থায় কংগ্রেস দলের জনপ্রিয়তাই ছিল নিঃসন্দেহে সর্বাধিক এবং একপ্রকার অতুলনীয়। সংবিধানের গণ-অনুমোদনের প্রশ্ন সম্পর্কে বলা হয় যে, সংবিধান প্রবর্তনের পর প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে একাধিকবার সাধারণ নির্বাচন হইয়া গিয়াছে এবং ইহাতে জনসাধারণ অংশগ্রহণ করিয়াছে। ইহার দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে জনসাধারণ সংবিধানকে গ্রহণ করিয়া লইয়াছে। সুতরাং সংবিধান জনগণের সম্মতির উপরে ভিত্তিশীল নহে, এরূপ উক্তি করা যায় না।

---

১. "... a Constituent Assembly set up by the British and under a British law could not claim that it was the people of India." Dr D. N. Sen : *From Raj to Swaraj*

২. (*i*) "... the Constitution of 1949···derives validity from the Indian Independence Act, 1947." Jennings and Young ; *Constitutional Laws of the Commonwealth* ; (*ii*) "In one sense the source of authority of the Indian Constitution is the Act of the British Parliament ... ." G. N. Joshi

২.খ. প্রস্তাবনার অন্যান্য অংশের বিশ্লেষণ (Analyses of Other Parts of the Preamble) : প্রস্তাবনার আলোচনায় দ্বিতীয় বিচার্য বিষয় হইল যে ভারতকে 'সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র' (Sovereign [Socialist Secular] Democratic Republic) বলিয়া অভিহিত করার তাৎপর্য কি ?

(১) সার্বভৌম শব্দটির তাৎপর্য : 'সার্বভৌম শব্দটির দ্বারা বুঝানো হইয়াছে যে, ভারত-রাষ্ট্র তাহার ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে আনুগত্যলাভে সমর্থ এবং বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত ভারতের সম্পর্ক হইল স্বাধীনতার। সহজ ভাষায় বলা যায়, বৈদেশিক ব্যাপারেই হউক আর আভ্যন্তরীণ বিষয়েই হউক, ভারত স্বাধীনভাবে আপন নীতি অনুযায়ী কার্য করিতে সমর্থ এবং অন্য কোন রাষ্ট্র উহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না।

অনেকের মতে, 'সার্বভৌম' (Sovereign) শব্দটি রাষ্ট্রাভ্যন্তরে ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ককে বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ, আনুগত্য আদায় ও আইনভংগকারীকে শাস্তিপ্রদানের চরম শক্তিকে ('power to compel obedience, to punish for disobedience') বুঝাইতে সার্বভৌম' শব্দটি প্রয়োগ করা হয়। অপরদিকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এক রাষ্ট্রের সহিত অন্যান্য রাষ্ট্রের স্বাধীন সম্পর্ক বুঝাইবার জন্য 'স্বাধীনতা' (independence) কথাটি প্রয়োগ করাই সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

১৯৪৭ সালে ভারতীয় গণপরিষদ প্রথমে যে উদ্দেশ্য সম্পর্কিত প্রস্তাব (Objectives Resolution) গ্রহণ করে তাহাতে ভারতকে 'স্বাধীন সার্বভৌম সাধারণতন্ত্র' (Independent Sovereign Republic) বলিয়া অভিহিত করা হয়।

এই প্রস্তাবের ব্যাখ্যা প্রসংগে জওহরলাল নেহরু উক্তি করেন : "এক স্বাধীন সার্বভৌম গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হইল আমাদের দৃঢ় সংকল্প। ভারত সার্বভৌম (Sovereign) হইতে বাধ্য, ইহা স্বাধীন (Independent) হইতে বাধ্য এবং ইহা সাধারণতন্ত্র (Republic) হইতে বাধ্য।[১]"

(২) 'সমাজতন্ত্র' শব্দটির পর্যালোচনা : প্রস্তাবনায় সমাজতান্ত্রিক আদর্শের কথাও রহিয়াছে। বলা হইয়াছে, ভারত সমাজতান্ত্রিক (socialist) সাধারণতন্ত্র। এখন সমাজতন্ত্র শব্দটি **অস্পষ্টতা দোষে দুষ্ট**। বিভিন্ন শ্রেণীর লেখক ইহাকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন।[২] তবুও কিন্তু সমাজতন্ত্রের উল্লেখ দু'একটি বিষয়কে স্মরণ করাইয়া

---

১. **"...It is our firm and solemn resolve to have an *Independent Sovereign* Republic. India is bound to be *sovereign*, it is bound to be *independent* and it is bound to be a *republic*." Nehru (*While Moving the objectives Resolution in the Constituent Assembly*)**

২. **"Socialism is like a hat that has lost its shape because everybody wears it." Joad**

দেয়। ধনতন্ত্রের সহিত তুলনা করিলে সমাজতন্ত্রের সাধারণ বৈশিষ্ট্য দাঁড়ায় উৎপাদন-উপায়সমূহের সামাজিক মালিকানা ও উৎপন্ন দ্রব্যের সামাজিক বণ্টন।[১] ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় সমাজতন্ত্র শব্দটি ব্যবহার করা হইলেও ভারত মিশ্র অর্থনীতি (mixed economy) এবং সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রের (Welfare State) আদর্শ অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। **ব্যক্তিগত শিল্পোদ্যোগ ও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবসাবাণিজ্য** একই সংগে পাশাপাশি কার্য করিয়া চলিয়াছে।[২] অবশ্য সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতিসংক্রান্ত অধ্যায়ে কতকগুলি অর্থনৈতিক অধিকারের কথা রহিয়াছে। ইহাও বলা হইয়াছে যে রাষ্ট্র দৃষ্টি রাখিবে যাহাতে সাধারণের স্বার্থ ক্ষুন্ন করিয়া যেন মুষ্টিমেয়ের হস্তে সম্পদ এবং উৎপাদনের উপায়সমূহ কেন্দ্রীভূত না হয়। কিন্তু ইহার দ্বারা বুঝায় যে ভারতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বা হইতে চলিয়াছে। ইহার দ্বারা মাত্র বুঝায় যে রাষ্ট্র ধনতন্ত্রের ত্রুটিবিচ্যুতি দূর করিবার চেষ্টা করিবে।

(৩) ধর্ম-নিরপেক্ষ শব্দটির বিশ্লেষণ: ভারত একটি ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র তাহা প্রস্তাবনায় উল্লেখ করা হইয়াছে। এখন প্রশ্ন, ধর্ম-নিরপেক্ষ (secular) বলিতে কি বুঝায়? মোটামুটিভাবে বলা যায়, ভারত-রাষ্ট্র কোন বিশেষ ধর্মের উপর ভিত্তিশীল নয়। আবার ইহাও বুঝায় না যে রাষ্ট্র ধর্মবিরোধী অথবা রাষ্ট্রের মধ্যে কোন ধর্মের স্থান নাই। ধর্ম-নিরপেক্ষতার **তাৎপর্য** হইল যে ভারত-রাষ্ট্র বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে নিরপেক্ষতা বজায় রাখিয়া চলিবে। যাহাতে সকল ধর্মাবলম্বী লোক সমানভাবে ধর্ম ও বিবেকের স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং বিভিন্ন ধর্মের ব্যাপারে রাষ্ট্র নিরপেক্ষভাবে চলিবে। এই কারণেই ভারতীয় সংবিধানের **ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার** (Right to Freedom of Religion) অন্যতম মৌলিক অধিকার বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

তবে অনেকের মতে, ধর্ম-নিরপেক্ষতা ঠিক মানিয়া চলা হয় নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ হিন্দু সংহিতা (The Hindu Code) বনাম, শাহবানো মামলার রায়ের পর মুসলিম নারীর অধিকার সংক্রান্ত বিল ইত্যাদি ভারতীয় সংবিধানের ধর্ম-নিরপেক্ষ চরিত্র ক্ষুন্ন করিয়াছে বলিয়াই অনেকের ধারণা।[৩] আইনের দৃষ্টিতে সকল ভারতীয় নাগরিক যখন সমান তখন

---

১. "Socialism, a broad term that generally denotes ***a system of public ownership and management*** of the means of production and distribution of goods as contrasted to capitalism that emphasises private ownership and management." *Encyclopaedia Britannica*

২. "The indigenous 'swadeshi' socialism would help the simultaneous development of the collective and private ownership and control of the means and instruments of productions. This is called the 'Mixed Economy'. Indian socialism is the doctrine and political movement which combines ordinary (bourgeois) political democracy and such socio-economic and cultural measures as are scientifically known as bourgeois democratic reforms—or, in other words, the welfare state". E. M S. Namboodiripad : *Crisis into Chaos—Political India 1981*

৩. "Most worrisome of all is that the bill (Muslim Women's Rights), exempting by some citizens on the basis of religion, undercuts India's secular constitution." *Time*, March 17, '86

হিন্দুদের জন্য আলাদা সংহিতা রচিত হইবে কেন, অথবা মুসলমান নারীদের জন্যই বা আলাদা আইন পাস করা হইবে কেন ?

(৪) গণতান্ত্রিক শব্দটির অর্থ : ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'গণতান্ত্রিক' (Democratic) শব্দটি ব্যবহারের তাৎপর্য সম্পর্কে প্রথমেই বলা হয় যে ভারতীয় সংবিধানের উদ্দেশ্য হইল সংসদীয় বা রাজনৈতিক গণতন্ত্রের (parliamentary or political democracy) প্রতিষ্ঠা করা। রাজনৈতিক গণতন্ত্র বলিতে বুঝায় প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধির দ্বারা পরিচালিত সরকার। বলা হয়, এইরূপ সরকার জনসাধারণের নিকট দায়ী থাকে এবং জনসাধারণের নির্দেশে জনকল্যাণের স্বার্থে রাষ্ট্রকার্য পরিচালনা করিয়া থাকে। এই উদ্দেশ্য অনুযায়ী ভারতীয় সংবিধানে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। সংবিধানের ৩২৬ অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে, **২১ বৎসর প্রাপ্তবয়স্ক প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকের লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনে ভোটাধিকার থাকিবে।**

রাজনৈতিক গণতন্ত্র : সুতরাং ভারতীয় সংবিধান রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের প্রবর্তন করিয়াছে।

(৪) ক. এইরূপ গণতন্ত্রের পর্যাপ্তির প্রশ্ন : কিন্তু বর্তমানে **গণতন্ত্র** শব্দটি ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই অর্থে গণতন্ত্র বলিতে রাজনৈতিক গণতন্ত্র (political democracy), সামাজিক গণতন্ত্র (social democracy) এবং আর্থিক গণতন্ত্র (economic democracy)—এই তিনটি রূপকেই বুঝায়। সামাজিক গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য হইল জাতি বর্ণ বংশ ইত্যাদির ভিত্তিতে মানুষে মানুষে যে-বিভেদ সৃষ্ট করা হয় তাহা দূর করিয়া সকলের মধ্যে সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন করা। অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য আর্থিক সামর্থ্যের গণতন্ত্রীকরণ বা সমতা (democratisation of economic power) সৃষ্টি করা।

অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে, অর্থনৈতিক সাম্য ব্যতীত রাজনৈতিক বা সামাজিক গণতন্ত্র নিরর্থক হইয়া পড়ে। যে-সমাজে মানুষে মানুষে আর্থিক বৈষম্য প্রকট সেখানে যাহারা আর্থিক বলে বলীয়ান তাহারা সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অন্যের উপর প্রভুত্ব স্থাপন এবং রাষ্ট্রযন্ত্রকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে নিজেদের ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থের অনুকূলে পরিচালিত করিয়া সর্বজনের কল্যাণ ব্যাহত করে। শ্রেণীবিন্যস্ত সমাজে মানব-সম্বন্ধ ও সামাজিক সম্পর্ক বিকৃত হয়, অন্তর্দ্বন্দ্ব সামাজিক সহযোগিতাকে ক্ষুণ্ণ ও উৎপাদনশক্তির অপরিসীম সম্ভাবনাকে প্রতিহত করিয়া সামগ্রিক সম্পদ সৃষ্টির পথে বিঘ্ন ঘটায়: ফলে ঘটে সভ্যতার বিনাশ। রবীন্দ্রনাথকে উদ্ধৃত করিয়া বলা যায়, "সভ্যতা-বিনাশের কারণ সন্ধান করলে একটিমাত্র কারণ পাওয়া যায়, সে হচ্ছে মানব-সম্বন্ধের বিকৃতি বা ব্যাঘাত। যারা ক্ষমতাশালী ও যারা অক্ষম তাদের মধ্যেকার ব্যবধান প্রশস্ত হয়ে সেখানে সামাজিক সামঞ্জস্য নষ্ট হয়েছে।" সুতরাং অর্থনৈতিক গণতন্ত্র ব্যতীত ব্যক্তির স্বার্থ ও সামগ্রিক কল্যাণের মধ্যে মিলনসেতু রচনা করা সম্ভব হয় না এবং সামাজিক সম্পর্কের সহিত উৎপাদনশক্তির সামঞ্জস্যবিধান করিয়া সমাজের সম্পদবৃদ্ধি করা যায় না।

(৪) খ. ভারত অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের আদর্শও কি গ্রহণ করিয়াছে ? : দাবি করা হয় যে, ভারতীয় সংবিধান মাত্র রাজনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, উহা আদর্শবাদী স্বাধীনতা সৈনিকের স্বপ্নকে রূপ দিয়া সামাজিক ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার আদর্শও গ্রহণ করিয়াছে। ভারতীয় সংবিধানের খসড়া রচনা কমিটির (Drafting Committee) সভাপতি ডক্টর আম্বেদকর এইরূপ দাবিই করিয়াছিলেন।[১] **(১) প্রস্তাবনায়** বলা হইয়াছে : সংবিধানের উদ্দেশ্য হইল সকল নাগরিকের মধ্যে সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক ন্যায় (Justice, social, economic and political) ; চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম ও উপাসনার স্বাধীনতা (Liberty of thought, expression, belief, faith and worship) ; সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও সুযোগের সমতা (Equality of status and opportunity) ; ব্যক্তির মর্যাদা ও জাতির ঐক্য ও সংহতিকল্পে সকলের মধ্যে ভ্রাতৃভাব (*Fraternity* assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation) প্রতিষ্ঠা ও বর্ধন করা।

(২) অন্যান্য ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের প্রতিফলের দাবি : এই প্রসঙ্গে আরও বলা হয় যে, উক্ত উদ্দেশ্যগুলি মাত্র প্রস্তাবনাতেই স্থান পায় নাই, উহারা সংবিধানের বিভিন্ন অংশেও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে—যেমন, সাম্যের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার, শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার ইত্যাদি মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতিলাভ করিয়াছে। ইহা ছাড়া, ভারতীয় সংবিধানে আয়ারল্যাণ্ডের সংবিধানের অনুসরণে রাষ্ট্রপরিচালনার নীতি হিসাবে কতকগুলি **নির্দেশমূলক নীতি** (Directive Principles) গ্রহণ করা হইয়াছে। কর্মের অধিকার, বেকার বার্ধক্য ও পীড়িত অবস্থায় সাহায্যপ্রাপ্তির অধিকার প্রভৃতি অর্থনৈতিক অধিকার এই নির্দেশাবলীর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। উপরন্তু, সরকার দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা হইতে সমাজতান্ত্রিক ধরনের সমাজ (socialist pattern of society) প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যও গ্রহণ করিয়াছে।

(৪) গ. দাবির যৌক্তিকতা বিচার : কিন্তু স্বাধীনতার পর দীর্ঘকাল কাটিয়া গেলেও এবং তিন দশকেরও অধিককাল (১৯৫১-৮৬ = ৩৫ বৎসর) অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কার্যকর করা সত্ত্বেও ভারতে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান মোটেই সংকুচিত হয় নাই ; বরং বৃদ্ধি পাইয়াছে।[২] একদিকে মুষ্টিমেয়ের হস্তে সম্পদ পূর্বাপেক্ষা পুঞ্জীভূত হইয়াছে, অপরদিকে অগণিত জনসাধারণ দারিদ্র্য ও অনিশ্চয়তার মধ্যে জীবন যাপন করিয়া চলিয়াছে।

রাজনৈতিক সাম্য ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের মধ্যে এই বিরোধের দিকে লক্ষ্য করিয়াই অনেক সমালোচক ভারতীয় গণতন্ত্র সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। ইঁহাদের মতে, ভারতে যে গণতন্ত্রের প্রবর্তন করা হইতেছে তাহা হইল মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থার (mixed economy) উপর ভিত্তিশীল তথাকথিত কল্যাণকর রাষ্ট্র (Welfare State)।

---

১. "We have established political democracy, it is also the desire that we have lay down as our *ideal economic democracy*." Dr. Ambedkar

২. চূড়ান্ত ষষ্ঠ পরিকল্পনা (১৯৮০-৮৫) খসড়া অনুসারে মোট জনসংখ্যার ৪৮·৪৪ শতাংশ দারিদ্র্যসীমার (the poverty line) নিচে অবস্থিত। সপ্তম পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে যে উহা হ্রাস পাইয়া ৩৭ শতাংশে দাঁড়াইয়াছে। এবং সপ্তম পরিকল্পনার লক্ষ্য হইল উহাকে ২৬ শতাংশে লইয়া যাওয়া।

মাত্রার তারতম্য থাকিলেও বর্তমানে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে এইরূপ রাষ্ট্র-ব্যবস্থাই প্রচলিত। কিন্তু এইরূপ ব্যবস্থার অসুবিধা হইল যে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব আংশিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলেও উৎপাদনের উপায়সমূহের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। এবং এই ব্যক্তিগত মালিকানার প্রাধান্যই সমষ্টির কল্যাণ, সম্পদসৃষ্টি ও সুষ্ঠু মানব-সম্পর্কের অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় যে-সকল উদ্দেশ্যের কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা কার্যকর করা ব্যক্তিগত মালিকানার আমূল পরিবর্তন ও উৎপাদনের উপায়সমূহের উপর সামাজিক মালিকানা পূর্ণভাবে প্রবর্তিত ব্যতীত সম্ভব নয়। সম্প্রতি অবশ্য সংবিধানের বিভিন্ন সংশোধন (যেমন, ১৯৭১ সালের ২৫তম সংশোধন) ও আইন (যেমন, ১৯৭৬ সালের সহরাঞ্চলে খনি জমি ও সম্পত্তি সংক্রান্ত আইন) পাস, দারিদ্র্য দূরীকরণের কিছু কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন দ্বারা অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা করা হইতেছে। (অপরদিকে আবার কিন্তু শ্রীরাজীব গান্ধীর সরকার দ্বারা অনুসৃত অর্থনীতিতে ব্যক্তিগত উদ্যোগের উপর পূর্বাপেক্ষা বেশি আস্থা স্থাপন করায় এই দিকে গতি মন্থর হইয়া উঠিয়াছে।)

(৫) 'সাধারণতন্ত্র' শব্দটির ব্যবচ্ছেদ: প্রস্তাবনায় আবার ভারতকে **সাধারণতন্ত্র** (Republic)[১] বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। এই 'সাধারণতন্ত্র' শব্দটি প্রয়োগ করিবার সার্থকতা কি? শাসনতান্ত্রিক আইন বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এই শব্দটি কোন এক নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয় বলিয়া মনে হয় না। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে শব্দটি বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং বিভিন্ন লেখক ইহার বিভিন্ন অর্থ নির্দেশ করিয়াছেন। পেইনের (Thomas Paine) মতে, যে সরকার জনসাধারণের কল্যাণ-সাধন করে তাহাকেই সাধারণতন্ত্র আখ্যা দেওয়া যায়। জেলিনেকের (Jellinek) মতে, সাধারণতন্ত্র রাজতন্ত্রের (monarchy) বিপরীত রূপ। এই ধরনের সরকারের বৈশিষ্ট্য হইল সরকার কোন এক ব্যক্তির পরিবর্তে বেশ কিছুসংখ্যক লোক লইয়া গঠিত কোন যৌথ সংগঠনের হস্তে থাকিয়া ঐ সংগঠন দ্বারা পরিচালিত হয়। এই অর্থে রাজতন্ত্র ব্যতীত অন্য যে-কোন প্রকারের সরকারকে সাধারণতন্ত্র বলিয়া বর্ণনা করা যায়। ডুগুই (Duguit) প্রভৃতি লেখকের মতে, সাধারণতন্ত্রের লক্ষণ হইল যে রাষ্ট্রপ্রধানের পদ বংশগত নয়, নির্বাচনমূলক। ম্যাডিসনের (Madison) ধারণা অনুসারে আবার যে সরকার জনসাধারণের নিকট হইতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ক্ষমতা পায় সেই সরকারকেই 'সাধারণতন্ত্র' বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, সাধারণতন্ত্রে শাসনক্ষমতা জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত কতিপয় নাগরিকের হস্তে প্রদত্ত হয়।

(৫)ক. বর্তমান অর্থে দুইটি বৈশিষ্ট্য: অতএব দেখা যাইতেছে, সাধারণতন্ত্র শব্দটির বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। তবুও কিন্তু বর্তমান প্রয়োগের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া মোটামুটিভাবে বলা যায়, (ক), সাধারণতন্ত্রে সরকার প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের

১. **প্রজাতন্ত্রও** বলা যায়। তবে 'প্রজা' শব্দটির সহিত রাজতন্ত্রের স্মৃতি বিজড়িত আছে বলিয়া অনেকে প্রজাতন্ত্র শব্দটির পরিবর্তে সাধারণতন্ত্র শব্দটিই ব্যবহারের পক্ষপাতী।

ভিত্তিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ কর্তৃক পরিচালিত হয় এবং (খ) সেখানে বংশগত সূত্রে বা অন্য কোন ভিত্তিতে **রাজপদ বলিয়া কোন কিছু থাকে না।**[১] এই অর্থে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোবিয়েত ইউনিয়নকে সাধারণতন্ত্রী বলা হয়। অপরদিকে ইংল্যাণ্ডকে কিন্তু সাধারণতন্ত্র বলা যায় না, কারণ ঐ দেশে সর্বজনীন ভোটাধিকার স্বীকৃত হইলেও রাজতন্ত্র এখনও প্রবর্তিত রহিয়াছে। ভারতকে সাধারণতন্ত্র (প্রজাতন্ত্র) বলিয়া অভিহিত করার তাৎপর্য হইল যে ভারতে রাজা বা রাজতন্ত্রের কোন স্থান নাই। ভারত-রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান হইলেন রাষ্ট্রপতি ; তিনি পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। ইহা ছাড়া, স্ত্রীপুরুষ বংশ ধর্ম ইত্যাদি নির্বিশেষে প্রাপ্তবয়স্ক সকলের প্রতিনিধি নির্বাচন করিবার ও নির্বাচিত হইবার অধিকার রহিয়াছে।

(৫)* বৈশিষ্ট্য-বিনাশক একটি বিষয় : কিন্তু সংবিধান চালু হইবার পরও রাজ্যগুলিতে কিছুদিন পর্যন্ত পূর্বতন দেশীয় রাজ্যের নৃপতিগণকে রাজনৈতিক ক্ষেত্র হইতে সম্পূর্ণভাবে অপসারিত করা হয় নাই। প্রত্যেক **খ** শ্রেণীভুক্ত রাজ্যের শাসকপ্রধান ছিলেন **রাজপ্রমুখ** (Rajpramukh)। ইনি ছিলেন হয় সংশ্লিষ্ট রাজ্যের নৃপতি অথবা রাজ্য-সম্মেলনের (States Union) নৃপতিদের মধ্য হইতে নৃপতি-পরিষদ নির্বাচিত কোন এক ব্যক্তি। অবশ্য রাজপ্রমুখ হিসাবে পরিগণিত হইবার জন্য রাষ্ট্রপতির স্বীকৃতির প্রয়োজন হইত এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি স্বীকৃতি প্রত্যাহার করিতেও সমর্থ ছিলেন। কিন্তু রাজবংশজাত ছাড়া অপর কেহ রাজপ্রমুখ হইতে সমর্থ ছিলেন না। রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে বর্তমানে ক ও খ শ্রেণীর রাজ্যগুলির মধ্যে ব্যবধান অপসারিত হইয়াছে এবং রাজপ্রমুখের পদ তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। এখন প্রত্যেক রাজ্যের রাজ্য-প্রধান হইলেন রাজ্যপাল। পূর্বে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের রাজ্যপ্রধান **সদর-ই-রিয়াসৎ** (Sadar-I-Riyasat) নামে পরিচিত ছিলেন ; বর্তমানে তিনিও রাজ্যপাল বলিয়া অভিহিত হইতেছেন। সকল রাজ্যপালই রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং প্রতিবার পাঁচ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইলেও রাষ্ট্রপতি যতদিন ইচ্ছা করেন ততদিনই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন।

এখানে আরও একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে : ভারত যে (ব্রিটিশ) কমনওয়েলথের সদস্য তাহা ভারতের সাধারণতান্ত্রিক রূপের সহিত সংগতিপূর্ণ কি না? এ-সম্পর্কে আলোচনা পরিশিষ্টে করা হইতেছে।[২]

> *"The authority of government . . . to be strictly just . . . must have the sanction and consent of the governed."*
>
> Henry David Thoreau

১. **Republic means "a state in which the supreme power rests in the people and their elected representatives or officer, as opposed to one governed by a king or similar ruler."** ***The New English Dictionary***

২. ২য় খণ্ডের শেষে পরিশিষ্ট দেখ।

স্মর্তব্য

১. প্রস্তাবনা সংযোজন বর্তমান দিনের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য।

২. কার্যকরী বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত না হইলেও প্রস্তাবনা সংবিধানের চাবিকাঠিস্বরূপ।

৩. ভারতীয় সংবিধানের মূল প্রস্তাবনা ৪২তম সংশোধন দ্বারা সম্প্রসারিত হয়।

৪. সম্প্রসারিত প্রস্তাবনায় ভারতকে সার্বভৌম [সমাজতান্ত্রিক ধর্ম-নিরপেক্ষ] গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

৫. প্রস্তাবনা অনুসারে ভারতীয় সংবিধানের উৎস ভারতের জনগণ। ইহার যথার্থ্য লইয়া মতবিরোধ আছে।

৬. সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্ম-নিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক এবং সাধারণতন্ত্র—ভারত-রাষ্ট্রের প্রকৃতি-বর্ণনায় এই পাঁচটি শব্দের ব্যবহারও সমালোচনার উর্ধ্বে নহে।

অনুশীলনী

1. Analyse the Preamble to the Constitution of India and explain its significance. (C. U. 1975, '77) Or, Discuss its importance (C. U. 1985).

[ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা বিশ্লেষণ করিয়া উহার তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। অথবা উহার গুরুত্ব পর্যালোচনা কর। (১৪-১৫, ১৮-২০, ২২-২৩ এবং ১২-১৩ পৃষ্ঠা)

2 Discuss the constitutional significance and importance of the Preamble to the Indian Constitution. What pattern of state is envisaged in the Preamble ? (C. U. 1971)

[ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনার তাৎপর্য ও গুরুত্বের পর্যালোচনা কর। প্রস্তাবনায় ভারতের কি ধাঁচের রাষ্ট্র সৃষ্টি হইয়াছে ?] (১২-১৩, ১৮-১৯, ২২-২৩ পৃষ্ঠা)

3. Explain the underlying principles of the Preamble to the Constitution of India. (C. U. 1964, '73)

[ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনার অন্তর্নিহিত নীতিগুলি ব্যাখ্যা কর।] (১৪-১৫, ১৮-২০, ২২-২৩ পৃষ্ঠা)

4. Rewrite the following sentence, choosing the correct answer from the alternatives given within the braket :

The Preamble to the Constitution of India is (justiciable/non-justifiable). (C. U. 1982)

[বন্ধনীর ভিতরে প্রদত্ত বাছিয়া লইয়া নিম্নলিখিত বাক্যটি পুনরায় লিখ ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা আদালত কর্তৃক (বলবৎযোগ্য/বলবৎযোগ্য নহে)। (১২-১৩ পৃষ্ঠা)

5. Indicate any four ideals or aspirations mentioned in the Preamble the Constitution of India. (C. U. 1984)

[ভারতীয় সংবিধানে উল্লিখিত আদর্শ বা আকাংক্ষার মধ্যে যে-কোন চারিটির উল্লেখ কর।] (C. U. (1984) (১৪ পৃষ্ঠা)

6. India is a Sovereign Democratic Republic. Discuss. (B. U. 1985)

[ভারত অন্যতম সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র (সাধারণতন্ত্র) আলোচনা কর।] (১৮-২০, ২২-২৩ পৃষ্ঠা)

৩ | ভারতীয় রাজ্যসংঘের গঠন
(STRUCTURE OF THE INDIAN UNION)

"There are advantages in describing India as a Union although its constitution may be federal in structure."
Dr. Ambedkar

১. ভারতীয় ইউনিয়ন বা রাজ্যসংঘ (The Indian Union) : সংবিধানে ভারতকে একটি **রাজ্যসংঘ** বা **রাজ্যসমূহের ইউনিয়ন** (a Union of States) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

ভারতীয় শাসন ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনের, তৎসত্ত্বেও কিন্তু সংবিধান-প্রণেতৃবর্গ যুক্তরাষ্ট্র (federation) শব্দের পরিবর্তে ইউনিয়ন (Union) শব্দটি ইচ্ছা করিয়াই ব্যবহার করিয়াছেন।

এই প্রসংগে ডক্টর আম্বেদকর উক্তি করেন যে, খসড়া রচনা কমিটি (Drafting Committee) **ক্যানাডার** সংবিধান 'ব্রিটিশ নর্থ আমেরিকা আইনে'র (The British North America Act, 1867) প্রস্তাবনাকে অনুসরণ করিয়া ভারতকে 'ইউনিয়ন' বলিয়া বর্ণনা করার পক্ষপাতী এবং ভারত যুক্তরাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও এরূপ বর্ণনার অনেক সুবিধা আছে।

১.১. ইউনিয়ন শব্দটির তাৎপর্য : এখন প্রশ্ন, এই সুবিধা ঠিক কি এবং 'ইউনিয়ন' শব্দটির তাৎপর্যই বা কি? ডক্টর আম্বেদকরের মতে, **দুইটি বিষয়** বুঝাইবার জন্য 'ইউনিয়ন' শব্দটি ব্যবহার করা হইয়াছে: (১) ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র অংগরাজ্যগুলির মধ্যে চুক্তির ফলে প্রবর্তিত হয় নাই, এবং (২) চুক্তির মাধ্যমে প্রবর্তিত হয় নাই বলিয়া কোন অংগরাজ্যের যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকার নাই। সুতরাং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র অভংগনীয়।[১]

'ইউনিয়ন' শব্দটি শাসন-ব্যবস্থার প্রকৃতি-নির্দেশক নহে : এই ব্যাখ্যা সত্ত্বেও বলিতে হয় যে, শাসনতান্ত্রিক আইনে 'ইউনিয়ন' শব্দটির কোন নির্দিষ্ট অর্থ নাই। বিভিন্ন ধরনের শাসন-ব্যবস্থা ও সংবিধানের বর্ণনায় শব্দটি ব্যবহার করা হইয়াছে। **দক্ষিণ আফ্রিকার** শাসন-ব্যবস্থা এককেন্দ্রিক এবং সংবিধানে ঐ দেশকে 'ইউনিয়ন' বলিয়াই অভিহিত করা হইয়াছে। অপরদিকে কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৩টি** স্বাধীন উপনিবেশের মধ্যে চুক্তির ফলে উদ্ভূত হইলেও ঐ দেশের সংবিধানের প্রস্তাবনায় ও অন্যান্য অংশে মার্কিন দেশকে 'ইউনিয়ন' বলিয়া বর্ণনা করা

---

১. The Indian "Federation was not the result of an agreement by the States to join in a Federation and that the Federation not being the result of an agreement, no State has the right to secede from it. *The Federation is a Union because it is indestructible.*" Dr. Ambedkar

হইয়াছে। আবার **সোবিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানে** বলা হইয়াছে যে, সোবিয়েত সমাজতান্ত্রিক রিপাব্লিকগুলির ইউনিয়ন (The Union of the Socialist Republics) হইল সমান অধিকারের ভিত্তিতে স্বেচ্ছামূলকভাবে সংগঠিত একটি যুক্তরাষ্ট্র। এই সোবিয়েত সংবিধান অংগরাজ্য বা ইউনিয়ন-রিপাব্লিকগুলিকে স্বেচ্ছায় যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকার দিয়াছে। এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে বলা যায়, 'ইউনিয়ন' শব্দটির দ্বারা কোন নির্দিষ্ট ধরনের শাসন-ব্যবস্থা বুঝায় না—শাসন-ব্যবস্থার রূপ কি, তাহা সংবিধানের বিভিন্ন অংশ হইতে অনুধাবন করিতে হয়। এই এবং অন্যান্য কারণে সম্প্রতি দাবি উঠিয়াছে যে 'ইউনিয়ন' কথাটির পরিবর্তে 'যুক্তরাষ্ট্র' কথাটির ব্যবহার করা সমীচীন এবং প্রস্তাবনাতেও যুক্তরাষ্ট্র কথাটি সংযুক্ত করা প্রয়োজন।

২. ভারতীয় রাজ্যসংঘের গঠন (Structure of the Indian Union):

১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর শাসনতান্ত্রিক প্রয়োজন, আর্থিক সুবিধা এবং ভাষার ভিত্তিতে রাজ্যসমূহের পুনর্গঠন (reorganisation) করা হয়।

২.১. সংবিধান প্রবর্তনের সময় গঠন: ইহার পূর্বে ভারতীয় সংবিধানের প্রথম তপশীলে রাজ্যগুলি **ক খ ও গ** এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। আর প্রথম তপশীলের **ঘ** অংশের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জকে। ইহা **দ্বীপপুঞ্জ** ভারতের রাষ্ট্রক্ষেত্রের (Territory) অংশ হইলেও ভারতীয় ইউনিয়নের অংগরাজ্য (Constituent State) ছিল না। অংগরাজ্যসমূহের মধ্যে যেগুলি 'ক' শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিল তাহারা ছিল পূর্বেকার—অর্থাৎ ব্রিটিশ আমলের গভর্নর-শাসিত প্রদেশ। 'খ' শ্রেণীতে ছিল হায়দরাবাদ, জম্মু ও কাশ্মীর, মহীশূর প্রভৃতির ন্যায় বৃহৎ বৃহৎ পূর্বেকার দেশীয় রাজ্য (Native States) এবং মধ্যভারত ও রাজস্থানের ন্যায় দেশীয় রাজ্য সম্মেলন। 'গ' শ্রেণীর রাজ্যগুলি অংশত পূর্বের চীফ কমিশনার শাসিত প্রদেশ এবং অংশত দেশীয় রাজ্য লইয়া গঠিত হইয়াছিল।

অংগরাজ্যসমূহের পুনর্গঠন: ১৯৫৬ সালে রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে উক্ত রাজ্যগুলির মধ্যে শ্রেণীবিভাগ উঠিয়া গিয়াছে; ফলে **সকল অংগরাজ্য একই পর্যায়ভুক্ত** হইয়াছে। সকল রাজ্যেরই রাজ্যপ্রধান হইলেন রাজ্যপাল বা গভর্নর। অংগরাজ্যগুলি ছাড়া আছে **ইউনিয়ন অঞ্চল** (Union Territories)। উহারা কেন্দ্র বা রাষ্ট্রপতির নির্দেশে শাসিত হয় বলিয়া **কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল বলিয়াও অভিহিত**। কেন্দ্রশাসিত কোন অঞ্চল দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থার উপযোগী হইলে উহাকে অংগরাজ্যের পর্যায়ে উন্নীত করা হয়।

১৯৭০ সাল পর্যন্ত ভারতীয় রাজ্যসংঘ ১৭টি অংগরাজ্য এবং ১০টি কেন্দ্রশাসিত বা ইউনিয়ন অঞ্চল (Union Territories) লইয়া গঠিত ছিল।

বর্তমান গঠন: ইহার পর বিভিন্ন অংগরাজ্যের মধ্য হইতে নূতন অংগরাজ্য গঠন, কয়েকটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে অংগরাজ্যে উন্নীতকরণ এবং সিকিমকে ভারতের

অংগরাজ্যের মর্যাদা দেওয়ার ফলে ভারতীয় ইউনিয়নে অংগরাজ্যের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইয়া বর্তমানে ২৫-এ দাঁড়াইয়াছে।

অপরদিকে নূতন নূতন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গঠনের ফলে উহাদের সংখ্যা শেষ পর্যন্ত ৯-এ দাঁড়াইয়াছিল। এই ৯টির মধ্যে তিনটিকে—অরুণাচলপ্রদেশ, মিজোরাম এবং গোয়া দমন ও দিউ-এর মধ্যে মাত্র গোয়াকে অংগরাজ্যের মর্যাদা দান কিন্তু দমন ও দিউকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসাবেই রাখার দরুন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলসমূহের সংখ্যা (৯-২=) ৭-এ দাঁড়াইয়াছে। আবার পাঞ্জাব চুক্তিমত চণ্ডিগড় পাঞ্জাবের নিকট হস্তান্তরিত হইলে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সংখ্যা হ্রাস পাইয়া ৬-এ দাঁড়াইবে।

২৫টি অংগরাজ্য+৭টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল: অতএব, ভারতীয় রাজ্যসংঘ বর্তমানে (ডিসেম্বর, ১৯৮৭) ২৫টি অংগরাজ্য এবং ৭টি কেন্দ্রশাসিত (বা ইউনিয়ন) অঞ্চল লইয়া গঠিত।

বর্তমানে (১.১.'৮৮) ভারতীয় রাজ্যসংঘের গঠন সম্বন্ধে মোটামুটি সুস্পষ্ট ধারণা নিম্নের ছকটি হইতে করা যাইবে :

ভারতীয় রাজ্যসংঘের বর্তমান গঠন

ক। অংগরাজ্যসমূহ

১.	অন্ধ্রপ্রদেশ	৯.	ত্রিপুরা	১৭.	কর্ণাটক
২.	আসাম	১০.	নাগাভূমি	১৮.	মেঘালয়
৩.	উড়িষ্যা	১১.	পশ্চিমবংগ	১৯.	রাজস্থান
৪.	উত্তরপ্রদেশ	১২.	পাঞ্জাব	২০.	হরিয়ানা
৫.	কেরল	১৩.	বিহার	২১.	হিমাচলপ্রদেশ
৬.	গুজরাট	১৪.	মণিপুর	২২.	সিকিম
৭.	জম্মু ও কাশ্মীর	১৫.	মধ্যপ্রদেশ	২৩.	অরুণাচলপ্রদেশ
৮	তামিলনাড়ু	১৬.	মহারাষ্ট্র	২৪.	মিজোরাম
				২৫.	গোয়া

খ। কেন্দ্রশাসিত (ইউনিয়ন) অঞ্চলসমূহ

১.	আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	৪.	দাদরা ও নগর হাভেলি
২.	চণ্ডিগড়[1]	৫.	পণ্ডিচেরি
৩	দিল্লী	৬.	লাক্ষাদ্বীপ[2]
		৭.	দমন ও দিউ

১. ১৯৮৫ সালের পাঞ্জাব চুক্তি অনুসারে চণ্ডিগড় পাঞ্জাবের অন্তর্ভুক্ত হইলে উহা আর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থাকিবে না।

২. এক আইন পাস করিয়া লাক্ষাদ্বীপ, মিনিকয় ও আমীনদ্বীপ দ্বীপপুঞ্জের নামকরণ করা হইয়াছে লাক্ষাদ্বীপ (Lakshadweep)।

এখন ভারতে রাজ্য পুনর্গঠন, রাজ্যের সীমানার রদবদল ইত্যাদি ব্যাপার কিভাবে সংঘটিত হয় তাহার আলোচনা করা হইতেছে।

৩. রাজ্য পুনর্গঠন ইত্যাদি ব্যাপারে সংবিধানগত ব্যবস্থা (Constitutional Provisions regarding Reorganisation of States, etc.):

ভারতীয় সংবিধানে অংগরাজ্যগুলির পুনর্বিন্যাস করিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে।

সংসদের ক্ষমতা: সংবিধানের ২ অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে, (১) সংসদ বা পার্লামেন্ট আইন করিয়া যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেরূপ সর্তে নূতন রাজ্য গঠন বা ভারতের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারে। (ইহার জন্য সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন হয় না।)[১] (২) ইহা ব্যতীত সংবিধানের ৩ অনুচ্ছেদ অনুসারে সংসদ আইন দ্বারা কোন রাজ্যের রাষ্ট্রক্ষেত্র পৃথক করিয়া লইয়া অথবা দুই বা ততোধিক রাজ্যের অংশকে একত্র করিয়া অথবা কোন রাষ্ট্রক্ষেত্রকে কোন রাজ্যের অংশের সহিত মিলিত করিয়া নূতন রাজ্য গঠন করিতে পারে। (৩) আবার কোন রাজ্যের আয়তনের হ্রাসবৃদ্ধি অথবা কোন রাজ্যের সীমানা বা নামের পরিবর্তনও সংসদ আইন প্রণয়নের সাহায্যে করিতে পারে।[২] তবে রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত ঐ উদ্দেশ্যে কোন বিল সংসদে উত্থাপন করা যায় না। যেক্ষেত্রে কোন রাজ্যের আয়তন, সীমানা বা নামের পরিবর্তনের প্রশ্ন থাকিবে সেক্ষেত্রে সংসদে বিল উত্থাপনের পূর্বে রাষ্ট্রপতিকে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের বিধানমণ্ডলের নিকট নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মতামত দেওয়ার জন্য বিলটিকে প্রেরণ করিতে হয়।[৩] এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে রাজ্য বিধানমণ্ডলের মতামত গ্রহণ করা কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে বাধ্যতামূলক নয়। একমাত্র জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের বেলায় ঐ রাজ্যের বিধানমণ্ডলের সম্মতি ব্যতীত উপরি-উক্ত ধরনের বিল সংসদে উত্থাপন করা যায় না। এইরূপ আইন অংগরাজ্যের তালিকা (First Schedule), সংসদ ও রাজ্য আইনসভায় প্রতিনিধিত্ব প্রভৃতি সম্পর্কিত ব্যবস্থার পরিবর্তন করিতে পারিবে এবং উহা পাস হইবার জন্য সংবিধানের

১. তবে আনুষংগিক ব্যবস্থার জন্য সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন হইতে পারে। যেমন সংবিধানের ৫৫তম সংশোধন দ্বারা অরুণাচলপ্রদেশের ক্ষেত্রে রাজ্যপালের হস্তে বিশেষ দায়িত্ব ন্যস্ত করা হইয়াছে। অনুচ্ছেদ ৩৭১(জ)—Art. 371(H)

২. **Parliament may by law—**

(a) ***Form a new State*** **by separation of territory from any State or by uniting two or more States or parts of States or by uniting any territory to a part of any State :**

(b) ***increase the area of any State*** **;**

(c) ***diminish the area of any State*** **:**

(d) ***alter the boundaries of any State*** **;**

(e) ***alter the name of any State.***

Article 3 ***of the Constitution of India***

৩. **The Constitution (Fifth Amendment) Act, 1955**

সংশোধনের জটিল পদ্ধতি গ্রহণ করার প্রয়োজন হইবে না, সাধারণ আইন পাসের পদ্ধতিতেই সংসদে উহা পাস করা যাইবে।

অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের সহিত তুলনা : এই প্রসংগে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, সোবিয়েত ইউনিয়ন কোন যুক্তরাষ্ট্রেই সংশ্লিষ্ট অংগরাজ্য-সমূহের সম্মতি ব্যতীত উহাদের এলাকার পরিবর্তন সাধন করা যায় না।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু এই নিয়মের ব্যতিক্রম। জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য ব্যতীত অন্য যে-কোন অংগরাজ্যের সীমানা উহার সম্মতি ছাড়াই বা উহার মতামতের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় **সরকার এককভাবে** সাধারণ পদ্ধতিতে আইন পাস করিয়া পরিবর্তিত করিতে সমর্থ।

৩.১. ভারত ও অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্যের সুবিধা-অসুবিধা : ভারতীয় আইনের এই ব্যবস্থার সপক্ষে যুক্তি হইল, ভারতীয় ইউনিয়নের অংগরাজ্যগুলির সীমানা ব্রিটিশ আমলে শাসনকার্য পরিচালনার প্রয়োজনের ভিত্তিতে অপরিকল্পিতভাবে নির্দিষ্ট হইয়াছিল। গণপরিষদ ইহা উপলব্ধি করিয়াছিল যে অংগরাজ্যগুলির পুনর্গঠনের প্রয়োজন দেখা দিবে। এই পরিবর্তন যাহাতে সহজসাধ্য হয় তাহার জন্য অংগরাজ্যের সীমানা প্রভৃতি সম্বন্ধে সংবিধানে উপরি-উক্ত ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তবে এই ব্যবস্থার সুবিধা যেমন রহিয়াছে তেমনি ইহার ত্রুটিও রহিয়াছে। ইহার দরুন কেন্দ্রের পক্ষে রাজনৈতিক কারণে অংগরাজ্যগুলির অস্তিত্ব ও অধিকার ক্ষুণ্ণ করিবার সুযোগ সকল সময়ই মিলিবে।[১] অবশ্য অংগরাজ্যের আয়তন, সীমানা প্রভৃতি পরিবর্তন করিবার সময় কেন্দ্রীয় সরকার সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মতামত জানিয়া লইবে, কিন্তু এই মতামতের বিশেষ কোন গুরুত্ব আছে বলিয়া মনে হয় না। প্রথমত, অংগরাজ্যের মতামত কেন্দ্রীয় সরকারের উপর বাধ্যতামূলক নহে। দ্বিতীয়ত, মতামত অনুযায়ী বিল সংসদে পেশ করা হইলেও ঐ বিল সংশোধিত হইয়া অন্যরূপ ধারণ করিতে পারে, এক্ষেত্রে **পুনরায় মতামত গ্রহণ প্রয়োজন কি না** সে-বিষয়ে লোকসভার স্পীকার ১৯৫৬ সালে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, সংবিধান অনুযায়ী উহার কোন প্রয়োজন হয় না। ভারতীয় সুপ্রীম কোর্টও অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছে।[২]

৩.২. বহিঃরাষ্ট্রকে ভূখণ্ড হস্তান্তরে সংসদের অসামর্থ্য : প্রসংগত আরও একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। প্রশ্ন উঠিয়াছে : সংবিধানের ৩ অনুচ্ছেদে রাজ্যগুলির সীমানার বা আয়তনের হ্রাসবৃদ্ধি করিবার যে-আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সংসদকে দেওয়া হইয়াছে, সেই ক্ষমতাবলে সংসদ সাধারণ আইনের সাহায্যে অপর কোন দেশকে ভারতের ভূখণ্ডের কোন অংশ ছাড়িয়া দিতে পারে কি না? বেরুবাড়ি ইউনিয়ন হস্তান্তরের আলোচনা প্রসংগে সুপ্রীম কোর্ট স্পষ্টই অভিমত প্রকাশ করে যে, ঐ ক্ষমতা (অর্থাৎ সংবিধানের ৩ অনুচ্ছেদ-প্রদত্ত ক্ষমতা) অংগরাজ্যগুলির আয়তনের আভ্যন্তরীণ

---

১. "While a rearrangement of Indian territory based on linguistic and economic considerations might well be *advantageous*, a projected rearrangement for purely political reasons might raise the *question* whether the Constitution protected State rights." Alan Gledhill

২. *Babulal v. State of Bombay*] Maharastra] (1961)

পুনর্বিন্যাসের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, কোন বহিঃরাষ্ট্রের হস্তে ভারতের কোন অঞ্চল সমর্পণ (cession) ব্যাপারে নহে। অপর কোন দেশকে ভারতের কোন অঞ্চল ছাড়িয়া দিতে হইলে সংবিধানের সংশোধন করিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিতে হইবে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সংশ্লিষ্ট রাজ্যের সম্মতি ব্যতীতই কেন্দ্রীয় সরকার সংবিধানের সংশোধন করিয়া ঐ রাজ্যের কোন অংশকে বিদেশী রাষ্ট্রের হস্তে সমর্পণ করিতে সমর্থ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে সংশ্লিষ্ট অংগরাজ্যের অনুমোদন ব্যতীত উহার কোন অংশকে বিদেশী রাষ্ট্রের নিকট হস্তান্তরিত করা সম্ভবপর হয় না।[১]

> *"From the time of Vedas, to the withdrawal of the British, the political ideal of India has at all times been that of a* Samrajya, *a paramount State with subordinate territorial organisations under it"* K. M. Panikkar

স্মর্তব্য

১. বর্তমানে (১. ১. '৮৮) ভারতীয় ইউনিয়ন বা রাজ্যসংঘ ২৫টি অংগরাজ্য ও ৭টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লইয়া গঠিত।

২. অংগরাজ্যের সৃষ্টি, বিলোপ, সীমানার পরিবর্তন ইত্যাদি সংসদ একা আইন পাস করিয়াই করিতে পারে—এ ব্যাপারে সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন হয় না। এরূপ ব্যবস্থা অন্য কোন যুক্তরাষ্ট্রে দেখা যায় না।

৩. তবে রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের কোন অংশ বিদেশী রাষ্ট্রকে সমর্পণ করার জন্য সংবিধানের সংশোধন প্রয়োজন। কারণ, বর্তমান ব্যবস্থায় এ-ক্ষমতা সংসদের নাই।

অনুশীলনী

1. India has been described in the Constitution as 'a Union of States'. What, if any, is the implication of the word 'Union' in this context ?

[সংবিধানে ভারতকে 'রাজ্যসংঘ' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই প্রসংগে 'সংঘ' (ইউনিয়ন) শব্দটির কোন তাৎপর্য আছে কি না তাহা আলোচনা কর।] (২৬-২৭ পৃষ্ঠা)

2. Briefly describe the structure of the Indian Union.

[ভারতীয় রাজ্যসংঘের গঠন সংক্ষেপে বর্ণনা কর।] (২৭-২৮ পৃষ্ঠা)

3. Write a note on Parliamentary powers regarding reorganisation of States and modifications of their boundaries.

[ভারতের অংগরাজ্যসমূহের পুনর্গঠন ও তাহাদের সীমানার রদবদল ব্যাপারে সংসদের ক্ষমতার উপর টীকা রচনা কর।] (২৮-৩০ পৃষ্ঠা)

১. *Geofrey* v. *Riggs* (1890)

৪

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রকৃতি
(NATURE OF THE INDIAN FEDERALISM)

"In the class of quasi-federal constitutions it is probably proper to include the Constitution of India." K. C. Wheare

ভারতীয় সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনের শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত করিয়াছে। সুতরাং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্য কি তাহা সম্যকভাবে উপলব্ধির জন্য যুক্তরাষ্ট্র কাহাকে বলে, যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয় কেন এবং কি পদ্ধতিতে উহা প্রবর্তিত হয়—ইত্যাদি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা প্রয়োজন।

১. যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি (Nature of a Federation) : যুক্তরাষ্ট্রের সংজ্ঞা সম্পর্কে লেখকদের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ রহিয়াছে। যাহা হউক, অধ্যাপক হোয়ার (K. C. Wheare) প্রদত্ত সংজ্ঞাকে ভিত্তি করিয়া যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা যাইতে পারে।

১.২. বৈশিষ্ট্য : যে সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা অনুসারে যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানে সমগ্র দেশের সরকার এবং আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে শাসনক্ষমতা এমনভাবে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয় যে প্রত্যেক সরকার নিজস্ব ক্ষেত্রে সমান মর্যাদা ভোগ করে এবং আইনগত স্বাধীন থাকে[১]। এই ব্যাখ্যা হইতে সহজেই বুঝা যায়, কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনই হইল যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং ক্ষমতা বণ্টনের প্রকৃতি এমন হইবে যেন প্রত্যেক সরকার নিজ নিজ এলাকায় সমান মর্যাদা ভোগ করিতে সমর্থ হয়। কেন্দ্রীয় সরকার আঞ্চলিক সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন হইবে না, আবার আঞ্চলিক সরকার নিজস্ব ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিবে না।

১.৩. যুক্তরাষ্ট্রীয় ও এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে তুলনা : এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থায় সমগ্র শাসনক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ণ প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। আইন প্রণয়নের চরম ক্ষমতা কেন্দ্রীয় আইনসভার হস্তে ন্যস্ত থাকে। শাসনকার্য পরিচালনার সুবিধার জন্য আঞ্চলিক সরকারসমূহ প্রতিষ্ঠিত করা হয় এবং ক্ষমতাও প্রদত্ত হয়, কিন্তু ইহাদের অস্তিত্ব ও ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভর করে। ইচ্ছা করিলে কেন্দ্রীয় সরকার এই আঞ্চলিক সরকারসমূহকে পুনর্গঠিত করিতে পারে, উহাদের ক্ষমতার হ্রাসবৃদ্ধি করিতে পারে—এমনকি উহাদের অস্তিত্বের বিলোপসাধনও করিতে পারে। অতএব সংক্ষেপে বলিতে গেলে, এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থায় আঞ্চলিক সরকারসমূহ

১. "In a Federal Constitution the powers of Government are divided between a ***government for the whole country*** and ***governments for parts of the country*** in such a way that each government is ***legally*** independent within its own sphere." Wheare : ***Modern Constitutions***

কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন থাকে। এইরূপ শাসন-ব্যবস্থার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হইল গ্রেট ব্রিটেন ফ্রান্স ইতালী চীন প্রভৃতি দেশের শাসন-ব্যবস্থা।

তুলনা করিয়া বলা যায়, যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানে শাসনক্ষমতা কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়, অপরপক্ষে এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থায় শাসনক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে কেন্দ্রীভূত থাকে এবং আঞ্চলিক সরকার কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা (delegated powers) ভোগ করে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকার নিজ নিজ ক্ষেত্রে সমমর্যাদাসম্পন্ন (co-ordinate), কেহ কাহারও অধীন নয়। কিন্তু এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থায় আঞ্চলিক সরকারসমূহ আইনত কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পূর্ণ অধীন থাকে।

১.৪. **যুক্তরাষ্ট্রের আর দুইটি বৈশিষ্ট্য (Two Other Features of a Federation)** : দেখা গেল, যুক্তরাষ্ট্র একপ্রকার **দ্বৈত-শাসন-ব্যবস্থা** (a dual **polity**)—ইহাতে দুই ধরনের সরকার নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে নিজ নিজ কার্য সম্পাদন করিয়া যায়। এখন প্রশ্ন, এই দুই ধরনের সরকারের নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার উপায় কি ?

(ক) **সংবিধানের প্রাধান্য** : ইহার উত্তরে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা **সংবিধানকে চরম প্রাধান্য** (supremacy of the constitution) দিতে হইবে এবং উহাকে **লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয়** (written and rigid) করিতে হইবে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় যে ক্ষমতাবণ্টনের ব্যবস্থা করা হয় তাহা যাহাতে উভয় সরকারের উপর বাধ্যতামূলক হয় তাহার জন্য সংবিধানের প্রাধান্য থাকা প্রয়োজন। অন্যথায়, এক সরকার অপর সরকারের ক্ষমতায় সহজেই হস্তক্ষেপ করিতে সমর্থ হইবে। অন্যভাবে বলিতে গেলে, কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক উভয় শ্রেণীর সরকারকেই সংবিধানের অধীন থাকিয়া কার্য করিতে হইবে—কেহই ক্ষমতাবণ্টনের সর্তকে ভংগ করিতে পারিবে না।

আবার ক্ষমতাবণ্টনের ব্যবস্থা যাহাতে নির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট হয় তাহার জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান লিখিত হওয়াও প্রয়োজন। এই দুইটি বৈশিষ্ট্যের আলোচনার ভিত্তিতে ইহা সহজেই অনুমেয় যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানকে দুষ্পরিবর্তনীয় করিতে হইবে। অধ্যাপক হোয়ায়ারের মতে, সংবিধানের অন্যান্য অংশ সম্পর্কে যে-ব্যবস্থাই করা হোক না কেন, কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারের মর্যাদা ও ক্ষমতা (status and powers) সম্পর্কিত অংশগুলি যেন কেন্দ্রীয় সরকার কিংবা আঞ্চলিক সরকার এককভাবে পরিবর্তন করিতে সমর্থ না হয়।[১] এই সকল অংশের—**অন্তত ক্ষমতা বণ্টনসংক্রান্ত অংশের**—পরিবর্তনের জন্য কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক উভয় শ্রেণীর সরকারের

১. K. C. Wheare : *Federal Government*

অনুমোদন থাকা প্রয়োজন। অন্যথায়, দুই সরকারের স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা বজায় থাকিতে পারে না।

(খ) যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত : যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনের শাসন-ব্যবস্থার আর একটি বৈশিষ্ট্যেরও উল্লেখ করা হয়। বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের স্বরূপ বজায় রাখিবার জন্য একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালত থাকা প্রয়োজন। কারণ, যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে ক্ষমতাবণ্টন করিয়া দেওয়া হয় বলিয়া দুই সরকারের মধ্যে ক্ষমতা লইয়া বিবাদবিসংবাদ বাধা খুবই স্বাভাবিক। এই অবস্থায় দুই সরকারের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ এবং দুই সরকারের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য সংবিধানের ব্যাখ্যাকার হিসাবে উভয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত একটি সর্বোচ্চ আদালত প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অস্ট্রেলিয়া ও ক্যানাডায় সংবিধান ব্যাখ্যার দায়িত্ব আদালতের হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে। অপরদিকে অবশ্য এই ব্যবস্থা সুইজারল্যাণ্ড কিংবা সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষেত্রে দেখা যায় না।

১.৫ অভিমত : যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত অপরিহার্য নহে. অতএব, সকল দিক আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় সংবিধানের ব্যাখ্যাকার ও অভিভাবক রূপে আদালতকে অপরিহার্য ব্যবস্থা বলিয়া মনে করা যায় না। উভয় সরকারের স্বাতন্ত্র্য ও স্বার্থ রক্ষা করিতে সমর্থ এইরূপ যে-কোন-ব্যবস্থাই যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির সহিত সংগতিপূর্ণ।

২. কোন্ কোন্ অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কাম্য ? (When is Federalism Desirable ?) :

যুক্তরাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্দেশ করিবার সময় বলা হইয়াছে যে এইরূপ শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে ক্ষমতা এমনভাবে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয় যাহাতে উভয় সরকারই নিজস্ব ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা ভোগ করে (৩১ পৃষ্ঠা)। অতএব, যখন কতকগুলি জনসম্প্রদায় (communities) সম্পূর্ণভাবে এক না হইয়াও পরস্পরের সহিত মিলিত হয় তখনই যুক্তরাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়।[১]

মিলনের আকাংক্ষা কিন্তু স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার ইচ্ছা : ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে গেলে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের পিছনে দুইটি বিপরীতমুখী শক্তি একই সংগে কার্য করে—(ক) **মিলনের আকাংক্ষা** (desire for union) এবং (খ) **পৃথক থাকিবার ইচ্ছা** (desire for separateness)। এই দুইটি মনোভাবের সমন্বয় করিবার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সৃষ্টি করা হয়। অতএব, যখন কতকগুলি রাষ্ট্র বা জনসম্প্রদায় মিলন চাহিলেও সংগে সংগে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে আকাংক্ষা করে তখনই যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনের শাসন-ব্যবস্থা উপযোগী বলিয়া মনে হয়।[২] অর্থাৎ, বৈচিত্র্যের মধ্যে সংহতি (unity in diversity) হইল যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার লক্ষ্য।

১. "Federation is '*a union without unity*'." Dicey

২. "... federal government is appropriate for a group of states or communities if, at one and the same time, they desire to be united under a single independent government for some purposes and to be organised under independent regional government for others." K. C. Wheare

এই দুই বিপরীতমুখী আকাংক্ষার কারণ : এখন আবার প্রশ্ন উঠে যে, সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়গুলির মধ্যে ঐক্যের বা মিলনের মনোভাব উদ্ভূত হয় কেন, আবার সংগে সংগে স্বাতন্ত্র্য বা পৃথক সত্তা বজায় রাখিবার প্রেরণাই বা কি কারণে জাগে ? ভৌগোলিক সান্নিধ্য, বহিঃশক্তির আক্রমণের ভয়, বৈদেশিক শাসন হইতে স্বাধীনতা লাভের আকাংক্ষা, অর্থনৈতিক উন্নয়নের আশা, একই সাম্রাজ্যের অধীনে থাকার দরুন বা অন্যভাবে স্থাপিত সম্পর্ক, একই ঐতিহ্য প্রভৃতি কারণে সম্প্রদায়গুলির মধ্যে ঐক্যের মনোভাব গড়িয়া উঠে। কিন্তু এই ঐক্যের মনোভাব থাকিলেও ইহারা নানা কারণে পৃথক সত্তা বা স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে চায়। ভাষাগত উদ্ভবগত ও ধর্মগত পার্থক্য, ভৌগোলিক ব্যবধান, আর্থিক স্বার্থের সংঘাত প্রভৃতি কারণে **আঞ্চলিক মনোভাব** (regional consciousness) বা স্বাতন্ত্র্যের মনোভাব সৃষ্টি করিতে পারে। ইহা ছাড়া, যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পূর্বে সম্প্রদায়গুলি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে বা ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের অধীনে স্বাতন্ত্র্য ভোগ করিয়া থাকিলে নূতন অবস্থায় তাহারা পৃথক সত্তা সম্পূর্ণভাবে বিসর্জন দিতে চায় না।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, বিভিন্ন কারণে সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়গুলির মধ্যে স্বাতন্ত্র্যের মনোভাব থাকিতে পারে। অধ্যাপিকা **হিকসের** (Ursula K. Hicks) অনুসরণে বলা যায়, এই স্বাতন্ত্র্যের মনোভাবের জন্য ইহারা রাজনৈতিক জীবনে **মিলন চাহিলেও সম্পূর্ণভাবে মিলিত হইয়া যাইতে চাহে না।** সুতরাং ইহারা এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের পরিবর্তে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার দিকে ঝুঁকে।[১]

৩. ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা গ্রহণের কারণ (Reasons for adopting a Federal System in India) :

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা কোন্ অবস্থায় গ্রহণ করা প্রয়োজন তাহার আলোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, কোন সমাজে একদিকে আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের মনোভাব এবং অপরদিকে সমাজের বৃহত্তর ক্ষেত্রে ঐক্যের আকাংক্ষা থাকিলে যুক্তরাষ্ট্র গঠন করাই সমীচীন।

ক। স্বাতন্ত্র্য ও ঐক্যের মনোভাব—উভয়ই বর্তমান ছিল : ভারতের ক্ষেত্রে এই দুইটি মনোভাবের অস্তিত্ব নিশ্চয়ই ছিল। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যগুলির সমবায়ে এক **যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা** করা হয়। নানা কারণে দেশীয় রাজ্যগুলিকে এই যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানে রাজী করানো সম্ভব হয় নাই। তবে ১৯৩৭ সালের ১লা এপ্রিল হইতে প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য (Provincial Autonomy) প্রবর্তনের ফলে ব্রিটিশ ভারতের শাসন-ব্যবস্থা একপ্রকার **যুক্তরাষ্ট্রীয় রূপ ধারণ** করে। কেন্দ্র ও প্রদেশগুলির মধ্যে ক্ষমতা ভাগাভাগি করিয়া দেওয়া হয়। প্রদেশগুলি স্বাতন্ত্র্য ভোগ করিবার ফলে আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের মূল্য ও গুরুত্বের উপর বিশেষ জোর দেয়। ১৯৪৮-৪৯ সালে গণপরিষদ কর্তৃক সংবিধান প্রণয়নকালে **যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা একপ্রকার সহজেই অনুমোদিত হয়।**

খ। দেশীয় রাজ্যগুলির অন্তর্ভুক্তি সপক্ষে কাষ করিয়াছিল : দেশীয় রাজ্যগুলির অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নও আংশিকভাবে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের সপক্ষে কাষ করে। স্বাধীনতা লাভের পর সংশ্লিষ্ট দেশীয় রাজ্যগুলিকে ভারত-রাষ্ট্রের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার

---

১. "Federal constitutions are adopted in preference to unitary constitutions because of divergences between the social, ethnic, religious or cultural outlook, or between the economic interests, of people who would in other respects like to share their political life." Ursula K. Hicks : *Federalism and Economic Growth*

সমস্যা দেখা দেয়। এই সমস্যা জটিল হইয়া পড়িত যদি-না যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনের শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইত। যে কারণে ১৯৩৫ সালে যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্তনের ব্যবস্থা হয় ক্ষমতা হস্তান্তরের ফলে সেই কারণ সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয় নাই।

গ। দেশ বিরাট বলিয়াও এই ব্যবস্থা প্রয়োজন হইয়াছিল : আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের অন্যান্য কারণও ভারতে রহিয়াছে। বিস্তৃত অঞ্চল লইয়া গঠিত ভারত একটি বিরাট মহাদেশ। গমনাগমনের সুযোগসুবিধার ক্রমোন্নতি হইলেও এই মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ভৌগোলিক ব্যবধান সামান্য নয়। এমতাবস্থায় **আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ও আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের চেতনা** থাকা খুবই স্বাভাবিক। আঞ্চলিক মনোভাবের কথা ছাড়িয়া দিলেও এত বড় দেশে এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থার সাহায্যে দেশের শাসনকার্য সুপরিচালিত করা যায় না।[১] সর্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন কেন্দ্রীয় শক্তির পক্ষে বৃহৎ দেশের বিভিন্ন অংশের প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া কার্য করা অসম্ভব হয় এবং ইহাতে স্থানীয় জনগণেরও রাজনৈতিক জীবনে কোন উৎসাহ ও উদ্যোগ থাকিতে পারে না। বরং ইহার ফলে বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী লোকের মধ্যে কেন্দ্রীয় শক্তির প্রতি সন্দেহ ও বিরুদ্ধ মনোভাব দেখা দেওয়ার আশংকা থাকিয়া যায়।

ঘ। ভারতীয় জীবনের বৈচিত্র্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল : ভারত শুধু বিরাট দেশই নয়, ইহার জনগণের ভাষাগত সংস্কৃতিগত ধর্মগত ও উদ্ভবগত বৈচিত্র্যও উল্লেখযোগ্য এবং এই বৈচিত্র্য স্বাতন্ত্র্যভাব বা আঞ্চলিক চেতনার অন্যতম কারণ। ভাষা ও সাহিত্যকে ঘিরিয়াই ঐক্যভাব সংস্কৃতি ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়িয়া উঠে। বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকের মধ্যে এইজন্যই আচারব্যবহার প্রভৃতির পার্থক্য দেখা যায়। ইহার সহিত ধর্মগত ও উদ্ভবগত পার্থক্য যুক্ত হওয়ায় ভারতে আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যভাব বিশেষভাবে দেখা যায়। স্বাধীনতা অর্জনের পূর্বে এই আঞ্চলিক বিভিন্নতা রাজনৈতিক জীবনে ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই, কারণ বৈদেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রশ্ন অন্য সকল সমস্যাকে চাপা দিয়াছিল। কিন্তু স্বাধীনতা অর্জনের পর আঞ্চলিক মনোভাব ও স্বাতন্ত্র্যের প্রশ্ন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষভাবে মাথা চাড়া দিয়া উঠে। ভাষা-আন্দোলন ও রাজ্য-পুনর্গঠন ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

ঙ। অপরদিকে ঐক্যের আকাংক্ষাও প্রবল ছিল : তবে ভারতীয় জনগণের মধ্যে একদিকে যেমন বিভিন্নতা এবং আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যবোধ রহিয়াছে অপরদিকে তেমনি ঐক্যের আকাংক্ষাও আছে। অন্যভাবে বলা যায়, সম্পূর্ণভাবে মিলিত হইয়া যাইতে না চাহিলেও, ইহারা মিলন চাহে। এই ঐক্যভাবের পশ্চাতে নানা কারণ বর্তমান। ভৌগোলিক দিক দিয়া ভারত মহাদেশ হইলেও ইহাকে অখণ্ড ও অভিন্ন বলিয়াই মনে হয়। এই অখণ্ড ভারতে বহুদিন হইতে পাশাপাশি বসবাস করিবার ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের লোকের মধ্যে ভারতবাসী বলিয়া একটা ঐক্যবোধ গড়িয়া

১. "... the constitution makers of independent India were in no doubt that the country, owing to the vastness of its territory and the variety of its people, *could not be efficiently governed as a unitary state.*" C. H. Alexandrowicz

উঠিয়াছে। ব্যাপক দৃষ্টিভংগি লইয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে ধর্মগত, ভাষাগত বা উদ্ভবগত পার্থক্য থাকিলেও বিভিন্ন অঞ্চলের লোকের মধ্যে ভাব চিন্তা ও সংস্কৃতির মধ্যে অতি নিকট সাদৃশ্য দেখা যায়।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বৈদেশিক শাসনের অধীনে বহুদিন ধরিয়া বসবাস, স্বাধীনতার জন্য একই সঙ্গে সংগ্রাম এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একই আশা-আকাংক্ষা প্রভৃতির ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের লোকের মধ্যে ঐক্যের চেতনা বিস্তার করিতে সাহায্য করিয়াছে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরও বৈদেশিক আক্রমণের ভীতি ও সাম্রাজ্যবাদী শাসনের পুনঃহস্তক্ষেপের সম্ভাবনা প্রভৃতির দরুন জাতীয় ঐক্যের ভাব প্রসারিত হইয়াছে; **অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরিকল্পনার সাহায্যে** সমগ্র দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের আকাংক্ষা ঐক্যবোধ সৃষ্টি করিতে কতকটা সাহায্য করিয়াছে।[1]

তত্ত্বগত যুক্তির সংক্ষিপ্তসার: অতএব, ভারতের মত বৈচিত্র্যময় বিরাট দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা গ্রহণের সপক্ষে যুক্তি ছিল বিশেষ প্রবল: একদিকে ভাষাগত সংস্কৃতিগত ও উদ্ভবগত পার্থক্যের দরুন বিভিন্ন অঞ্চলের লোকের মধ্যে প্রভেদ ও স্বাতন্ত্র্যবোধ এবং অপরদিকে আবার নানা কারণে তাহাদের মধ্যে ঐক্যের মনোভাবও বর্তমান ছিল। এইরূপ দ্বৈত মনোভাবের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানের সম্যক উপায় হইল যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা গ্রহণ করা। সংবিধান-রচয়িতৃগণ এই তত্ত্বের বশবর্তী হইয়াই কাজ করিয়াছিলেন।

ব্যবহারিক যুক্তি: উপরন্তু, একবার যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে পরে উহাকে এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থায় পরিণত করা একপ্রকার অসম্ভব বলিলেই চলে, কারণ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল একবার স্বাতন্ত্র্যের আস্বাদ পাইলে পরে তাহাকে আর কোনমতেই পরিত্যাগ করিতে চায় না। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন দ্বারা পরিকল্পিত যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্তিত হয় নাই সত্যি, কিন্তু ১৯৩৬ সাল হইতে প্রদেশগুলি স্বাতন্ত্র্য ভোগ করিয়া আসিতেছিল। এই অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের পরিবর্তে এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব নানারূপ গোলযোগেরই সৃষ্টি করিত এবং যে-জাতীয় ঐক্য এতদিন গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা বিশেষভাবে ব্যাহত হইত। সুতরাং ব্যবহারিক দিক দিয়াও যুক্তরাষ্ট্রের প্রবর্তন সমীচীন হইয়াছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করা হয়।

৪. ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের গঠন-পদ্ধতি (Method of Formation of the Indian Federation):

ভারতে যুক্তরাষ্ট্রের গঠনই সমীচীন হইয়াছে, সিদ্ধান্তের পর আর একটি বিষয়ের আলোচনা করা প্রয়োজন।

৪.১. যুক্তরাষ্ট্র গঠনের জন্য সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তার প্রশ্ন: এমন অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আছেন যাঁহাদের মতে, যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানকারী অঞ্চলগুলিকে স্বাধীন

১. "... desire for union springs from the need for common defence, the desire to be free foreign interference, from the hopes of economic advantage and from political association prior to the federal union : all these are factors which can be recognised in India." Alan Gledhill : *The Republic of India*

রাষ্ট্র হইতে হইবে ; অর্থাৎ, যুক্তরাষ্ট্র গঠনের অন্যতম সর্ত হইল কতকগুলি সার্বভৌম রাষ্ট্রের অবস্থিতি। এই সাবভৌম রাষ্ট্রগুলি যখন তাহাদের স্বাধীনতা কতকটা বিসর্জন দিয়া স্বেচ্ছামূলকভাবে এক রাষ্ট্রে মিলিত হয় তখন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভব হয়।[১] যদিও ইহারা একটি রাষ্ট্র গঠন করে তবুও ইহারা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখিবার ব্যবস্থা করে। এইভাবে **জাতীয় ঐক্য ও শক্তির** (national unity and power) সহিত **অংগরাজ্যগুলির অধিকার** ('state rights') সমন্বয়সাধন করা হয়।[২] এই মতানুসারে যে-ক্ষেত্রে স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের অস্তিত্ব থাকে না, সে-ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভব বা গঠনের কোন যুক্তি দেখা যায় না, কারণ এরূপ অবস্থায় 'রাজ্যের অধিকার' ('state rights') সংরক্ষণের কোন তাগিদ বা সমস্যা থাকে না।

এই মতের ভিত্তি হইল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত প্রাচীন যুক্তরাষ্ট্রসমূহের উদ্ভবের পদ্ধতি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাষ্ট্রের মধ্যে স্বেচ্ছামূলকভাবে চুক্তির ফলে প্রবর্তিত হয়।

কিন্তু স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের মিলন ভিন্ন প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয় না, এই **যুক্তির বিশেষ সারবত্তা আছে বলিয়া মনে হয় না**। ক্যানাডার দৃষ্টান্ত হইতে সহজেই বলা যায় যে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের প্রদেশসমূহ লইয়া অনেক ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব। ক্যানাডার ক্ষেত্রে প্রদেশগুলির কোন স্বাধীন সত্তা ছিল না এবং উহারা কোন চুক্তির মাধ্যমেও যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত হয় নাই। আবার রাশিয়া ব্রেজিল মেক্সিকো প্রভৃতি দেশে পূর্বতন এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রকে ভাঙিয়া যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত করা হয়।

৪.২. গঠনের দুইটি পদ্ধতি : সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভব যেমন **একত্রীকরণ পদ্ধতিতে** (federation by aggregation or integration) হইতে পারে, তেমনি আবার **বিভক্তিকরণের পদ্ধতিতেও** যুক্তরাষ্ট্র (federation by disaggregation or disintegration) সংগঠিত হইতে পারে।

৪.৩ বিপরীতমুখী যুক্তরাষ্ট্র : এই দ্বিতীয় পদ্ধতিতে সংগঠিত যুক্তরাষ্ট্রকে অনেক সময় বিপরীতমুখী যুক্তরাষ্ট্র ('federation in reverse' বলিয়া অভিহিত করা হয়।

প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত—ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র : ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র এই **দ্বিতীয় শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত**। অর্থাৎ, এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের মধ্য হইতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে, অবশ্য নৃপতি-শাসিত দেশীয় রাজ্যগুলি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করায় অধ্যাপিকা হিক্সের ন্যায় অনেকে এই যুক্তরাষ্ট্রের প্রবর্তনে একত্রীকরণ পদ্ধতিও কতকাংশে কার্য করিয়াছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন।[৩] ভারতে কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র গঠনের

১. "The meaning of federal government is that a number of States come together and put certain of their powers into common custody ...". Lord Haldane in *A.-G. for Australia* v. *Colonial Sugar Refining Co., Ltd,*

২. "A federal state is a *political contrivance* intended to reconcile national unity and power with the maintenance of 'state rights'." Dicey

৩. "Through the inclusion of the former princely states, India is partly a federation by aggregation," Ursula K. Hicks : *Federalism and Economic Growth*

পদ্ধতির দিকে দৃষ্টি দিলেই দেখা যাইবে যে, উহা প্রধানত বিভক্তিকরণ পদ্ধতিতেই (process of disintegration) সংগঠিত হইয়াছে।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বিবর্তন : ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন প্রবর্তিত হওয়ার পূর্বে ভারত একটি শক্তিশালী **এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র** ছিল। শাসনকার্য পরিচালনার নিয়ন্ত্রণভার আইনত ভারত-সচিবের হস্তে ন্যস্ত ছিল। প্রদেশসমূহের গভনরগণ (Provincial Governors) যে-সকল ক্ষমতা ভোগ করিতেন তাহা কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে প্রদত্ত হইত। সুতরাং প্রদেশগুলির কোন নিজস্ব ক্ষমতা বা স্বাধীনতা ছিল না, ইহারা কেন্দ্রীয় সরকারের 'এজেন্ট' (Agents) হিসাবেই কার্য করিত। এই ছিল রাজশক্তি কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে শাসিত ব্রিটিশ ভারতের শাসন-ব্যবস্থা। অপরপক্ষে ছিল ৬০০-র মত নৃপতি-শাসিত ভারতীয় রাজ্য (Indian Native States)। এই সকল রাজ্য নৃপতিগণের ব্যক্তিগত শাসনাধীন ছিল; অবশ্য ইহারা সকল সময়েই ব্রিটিশ রাজশক্তির চরম ক্ষমতার অধীন ছিল।

ব্রিটিশ রাজশক্তির সহিত দেশীয় রাজ্যগুলির এই সম্পর্ক **প্যারামাউন্ট শক্তি** (Paramountcy) বলিয়া অভিহিত হইত। 'প্যারামাউন্ট শক্তি'র স্বরূপ কি তাহার কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞা ছিল না। একবার এক ভাইসরয় (Viceroy) প্যারামাউন্ট শক্তির সংজ্ঞা প্রদানে অসমর্থ হইয়া উক্তি করিয়াছিলেন, সংজ্ঞার কোন প্রয়োজন নাই—'প্যারামাউন্ট শক্তি' চিরকালই প্যারামাউন্ট বা চরম থাকিবে (Definition is unnecessary; but Paramount Power must always remain paramount)। যাহা হউক, মোটামুটিভাবে বলা যায়, বৈদেশিক সম্বন্ধের ক্ষেত্রে ও প্রতিরক্ষা ব্যাপারে দায়িত্ব ছিল ব্রিটিশ রাজশক্তির, আর আভ্যন্তরীণ শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষমতা ছিল নৃপতিদের। সাধারণত দেশীয় রাজ্যগুলির আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ব্রিটিশ রাজশক্তি কোন হস্তক্ষেপ করিতেন না, কিন্তু প্রয়োজন হইলে, যেমন শাসনকার্য পরিচালনায় দুর্নীতি বা বিশৃংখলার অজুহাতে, আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন। সুতরাং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে দেশীয় রাজ্যের কোন স্বাধীন অস্তিত্ব ছিল না এবং আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ইহারা ব্রিটিশ রাজশক্তির হস্তক্ষেপ হইতে মুক্ত ছিল না—ইহা সহজেই অনুধাবন করা যাইতে পারে। ইহা সত্ত্বেও বলা যায় যে দেশীয় রাজ্যগুলির রাজন্যবর্গ কতকগুলি ব্যক্তিগত অধিকার ও সুযোগসুবিধা ভোগ করিতেন।

৫.১. 'বৃহত্তর ভারতে'র জন্য যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনা : ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশগুলি ও নৃপতি-শাসিত দেশীয় রাজ্যগুলির সমবায়ে **'বৃহত্তর ভারতে'র জন্য এক যুক্তরাষ্ট্র** (*Greater Federation for India*) গঠনের পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশগুলি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের শাসন বিভাগ হওয়ার দরুন আইনত ইহাদের পৃথক অস্তিত্ব বা স্বাধীন ক্ষমতা ছিল না। সুতরাং কানাডার যুক্তরাষ্ট্র গঠন পদ্ধতির অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন হইল—একই আইনের দ্বারা প্রদেশগুলিকে স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন অংগরাজ্যে পরিণত করিয়া ঐগুলিকে যুক্তরাষ্ট্রে মিলিত করার ব্যবস্থা হইল।

৫.২. পরিকল্পিত যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি : ১৯৩৫ সালের আইনের মাধ্যমে ভারত সম্পর্কিত সমস্ত ক্ষমতা প্রথমে **রাজশক্তির** (Crown) হস্তে তুলিয়া লওয়া হয় এবং পরে উহা প্রদেশগুলি ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের মধ্যে সরাসরি বণ্টিত হয়। এইভাবে প্রদেশগুলি সরাসরি রাজশক্তির নিকট হইতে ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় এবং মোটামুটিভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত হইয়া নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে আইন ও শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী হয়। পরিকল্পিত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় দেশীয় নৃপতি-শাসিত রাজ্যগুলি সম্পর্কে ব্যবস্থা হয় যে, ইহারা স্বেচ্ছামূলকভাবে যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিবে। অর্থাৎ, যোগদান করা বা না-করার অধিকার ইহাদের থাকিবে। ইহা ব্যতীত কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা কোন্ কোন্ বিষয়ে দেশীয় রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবে তাহা যোগদানের চুক্তির (Instruments of Accession) দ্বারা স্থিরীকৃত হইবে।

৫.৩. পরিকল্পনার আংশিক রূপায়ণ : ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবে কার্যকর করা সম্ভব হয় নাই। মাত্র **প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য** (Provincial Autonomy) সম্পর্কিত অংশটুকু ১৯৩৭ সালের ১লা এপ্রিল হইতে প্রবর্তিত হয়।[১] ইহার ফলে ব্রিটিশ ভারতের শাসন-ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রীয় রূপ ধারণ করে। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রতিফলন হিসাবে কেন্দ্র ও গভর্নর-শাসিত প্রদেশগুলির মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রীয়, প্রাদেশিক ও যুগ্ম তালিকার সাহায্যে ক্ষমতা বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়।[২] অবশিষ্ট ক্ষমতা (residuary powers) গভর্নর-জেনারেলের হস্তে ন্যস্ত রাখা হয়। স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতাবলে তিনি উহা কেন্দ্র কিংবা প্রদেশগুলির হস্তে অর্পণ করিতে পারিতেন। ইহা সত্ত্বেও বলা যায় যে, প্রাদেশিক গভর্নরগণের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা ও নিজস্ব বিচার-বিবেচনা প্রয়োগের অধিকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ থাকায় প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য সীমাবদ্ধ ছিল।

৫.৪. যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী বিকাশ-পর্যায় : স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর ডোমিনিয়ন ভারতে দায়িত্বশীল সরকার ও প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণভাবে কাজ করিতে থাকে এবং **ভারতীয় শাসন-ব্যবস্থার যুক্তরাষ্ট্রীয় রূপ** আরও বিকশিত হয়। এই সম্বন্ধে পূর্বেই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইয়াছে।[৩] স্বাধীন ভারতের জন্য যে-যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান রচিত হয় তাহা ১৯৩৫ সালের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে ভিত্তি করিয়াই করা হয়। পূর্বতন গভর্নর-শাসিত প্রদেশগুলিকে ভারতীয় ইউনিয়নের অংগরাজ্য (Units) করা হয়। ইহার সংগে প্রাক্তন নৃপতি-শাসিত দেশীয় রাজ্যগুলিকে (The Native States) যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যে আনয়ন করা হয়।

বিপরীতমুখী যুক্তরাষ্ট্রের কাম্যতার প্রশ্ন : তাহা হইলে দেখা গেল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে যে পদ্ধতিতে যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে, তাহার বিপরীত পদ্ধতিতে—অর্থাৎ **এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রকে ভাঙিয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র** গঠন করা হইয়াছে। ইহা হইতে অবশ্য এ-সিদ্ধান্ত করা ভুল হইবে যে, এই বিপরীত পদ্ধতিতে যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা অযৌক্তিক বা অকাম্য। কোন দেশের অবস্থা যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনের শাসন-ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষে উপযোগী হইলে সে দেশ এককেন্দ্রিক শাসনের স্থলে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার প্রবর্তন করিলেই গণতন্ত্রের পথ প্রশস্ত হয়। ভারতের মত বিরাট দেশে, যেখানে বহু ভাষাভাষী, বিভিন্ন সংস্কৃতিসম্পন্ন জাতি-উপজাতি বসবাস করে সেখানে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থাকে সমর্থন না করিয়া পারা যায় না। স্বাধীনতার পর রাজ্য পুনর্গঠনের ইতিহাস হইতে ইহা প্রমাণিত হয় যে বিভিন্ন অঞ্চলের সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাষা, নিজস্ব কৃষ্টি প্রভৃতি ভিত্তিতে আঞ্চলিক চেতনা ও স্বাতন্ত্র্যভোগের আকাংক্ষা রহিয়াছে। এই অবস্থায় সামগ্রিকভাবে জাতীয় ঐক্য এবং সেই সংগে বিভিন্ন অঞ্চলের সম্প্রদায়ের আত্মনিয়ন্ত্রণ ও অধিকার-সংরক্ষণের ব্যবস্থা করার প্রকৃষ্ট উপায় হইল যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনের শাসন-ব্যবস্থা।

৬. ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি—কেন্দ্রপ্রবণতা (Nature of the Indian Federation—Its Centralising Tendency) :

ক্যানাডার সংবিধানের অনুসরণে সংবিধানে ভারতকে **রাজ্যসমূহের ইউনিয়ন** বা **রাজ্যসংঘ** (Union of States) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে (২৫ পৃষ্ঠা)। 'ইউনিয়ন' শব্দটি ব্যবহারের জন্য ভারতের শাসন-ব্যবস্থাকে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র

---

১. ১ম খণ্ডের ৭৫ পৃষ্ঠাও দেখ।

২. *Section 100 of the Government of India Act.* 1935

৩. ১ম খণ্ডের ৭৫ পৃষ্ঠাও দেখ।

বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যগুলি দিয়া বিচার করিলে ভারতকে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র বলিয়া অভিহিত করার পরিবর্তে যুক্তরাষ্ট্র বলিয়াই বর্ণনা করিতে হয়। কারণ, ভারতীয় সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার **তিনটি বৈশিষ্ট্যই স্বীকৃত** হইয়াছে। এখানে, শাসনক্ষমতা কেন্দ্র এবং অংগরাজ্যসমূহের মধ্যে সংবিধান দ্বারা বন্টিত হইয়াছে, ভারতীয় সংবিধানের অন্তত ক্ষমতাবণ্টনসংক্রান্ত অংশটুকু দুষ্পরিবর্তনীয় এবং ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের প্রাধান্য একরূপ স্বীকৃত হইয়াছে।

কিন্তু সংবিধানের বিভিন্ন ধারার বিশদ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, সংবিধানের কেন্দ্রিকতার ঝোঁক এতই প্রবল যে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের লক্ষণ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলিকে সম্পূর্ণ পরিস্ফুট হইতে দেয় নাই।

নিম্নে বিষয়টির সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ করিয়া দেখানো হইতেছে।

৬.১. **কেন্দ্রপ্রবণতার বিভিন্ন দিক**: (ক) ভারতীয় সংবিধানে ক্ষমতাবণ্টন একটু স্বতন্ত্র ধরনের। যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণত দুই পদ্ধতিতে শাসনক্ষমতার বণ্টন করা হয়: (ক) সংবিধানে কতকগুলি নির্দিষ্ট ক্ষমতা কেন্দ্রকে সমর্পণ করিয়া অবশিষ্টাংশকে (residuary powers) অংগরাজ্যগুলির জন্য সংরক্ষিত করা হয়, অথবা (খ) কতকগুলি নির্দিষ্ট ক্ষমতা অংগরাজ্যগুলির হস্তে সমর্পণ করিয়া অবশিষ্টাংশকে কেন্দ্রের জন্য সংরক্ষিত করিয়া রাখিতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়ায় প্রথম পদ্ধতিতে এবং ক্যানাডায় দ্বিতীয় পদ্ধতিতে ক্ষমতা বণ্টন করা হইয়াছে।

ক। ক্ষমতা বণ্টনে কেন্দ্রের প্রাধান্য: ভারতীয় সংবিধানে ক্ষমতাবণ্টন-ব্যবস্থা কিন্তু উপরি-উক্ত দুইটি পদ্ধতির কোনটিতেই পড়ে না। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ব্যবস্থাকে অনুসরণ করিয়া বর্তমান সংবিধান সকল প্রকার বিষয় তিনটি বিস্তৃত তালিকার—ইউনিয়ন তালিকা, রাজ্য তালিকা এবং যুগ্ম তালিকা—মাধ্যমে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিয়া দিয়াছে।' এই তিনটি তালিকার বহির্ভূত **অবশিষ্ট ক্ষমতা** (residuary or enumerated powers) ক্যানাডার মত কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে। আবার ভারতে কেন্দ্রের হস্তে এক ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, যাহা আর কোন যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় দেখা যায় না। ৯৭টি বিষয়ে এককভাবে[১] এবং ৭৪টি বিষয়ে রাজ্যসমূহের সহিত যুগ্মভাবে ক্ষমতা কেন্দ্রের হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে।

এখানে উল্লেখ্য যে সংবিধানের ৪২তম সংশোধনের দ্বারা শিক্ষা ও বনসম্পদকে রাজ্য তালিকা হইতে সরাইয়া যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

অপরদিকে রাজ্যসমূহের সম্পূর্ণ অনন্য ক্ষমতা (exclusive powers) হইল মাত্র ৬৫টি বিষয়ে।[২] মাত্র বিষয়গুলির সংখ্যা ও গুরুত্বের দিক দিয়া ইউনিয়ন সরকারের

১. প্রকৃতপক্ষে বিষয় হইল সংখ্যায় ৯৮, কারণ সংবিধানের ষষ্ঠ সংশোধন দ্বারা ৯২ক (92A) (সংবাদপত্র ছাড়া আন্তঃরাজ্য ক্রয়বিক্রয় বা বাণিজ্য) বিষয়টি যোগ করা হইয়াছে।

২. পূর্বে ক্ষমতা ছিল ৬৬। সংবিধানের সপ্তম সংশোধন দ্বারা একটি ক্ষমতা (৩৬নং ক্ষমতা) বাদ দেওয়া হইয়াছে।

হস্তে ব্যাপক ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয় নাই, সংবিধানের বিবিধ ধারায় বিভিন্ন সময়ে রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কেও সংসদকে আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে—যথা, (ক) আন্তর্জাতিক চুক্তিকে কার্যকর করার জন্য সংসদ যে-কোন বিষয় সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করিতে সমর্থ। (খ) যখন রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন তখন সংসদ রাজ্য তালিকার উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারে। (গ) আবার দুই বা ততোধিক রাজ্য প্রস্তাব পাস করিয়া রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয় সংসদের হাতে তুলিয়া দিতে পারে। অবশ্য এইরূপ আইন সম্মতি-প্রদানকারী রাজ্যগুলি সম্পর্কেই প্রযুক্ত হইবে এবং যেহেতু সংসদের আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা রাজ্যগুলি কর্তৃক প্রদত্ত হয় সেইহেতু ইহাকে রাজ্য তালিকার উপর হস্তক্ষেপ বলিয়া ধরা যায় না।

উপরি-উক্তভাবে ছাড়াও আরও একভাবে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলির ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করিতে পারে। সংবিধানের ২৪৯ অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে সংসদের উচ্চতর কক্ষ রাজ্যসভা যদি উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে এরূপ প্রস্তাব পাস করে যে জাতীয় স্বার্থে রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে পার্লামেন্টের পক্ষে আইন করা প্রয়োজন বা সমীচীন তাহা হইলে পার্লামেন্ট ঐ বিষয়ে আইন করিতে পারে।

খ। রাজ্যগুলির উপর নানারূপ কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব : সাধারণতান্ত্রিক ভারতে সংবিধানের দ্বারা শুধু যে কেন্দ্রের হস্তে ব্যাপক ক্ষমতাই অর্পণ করা হইয়াছে তাহা নহে, অন্যান্যভাবেও অংগরাজ্যগুলির উপর কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। ভারতের মত কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা অংগরাজ্যগুলির এত ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ আর কোন যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় দেখা যায় না।

৬.২. কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের বিভিন্ন সূচক : কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের সূচক হিসাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে :

(১) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক রাজ্যপাল নিয়োগ ও অপসারণ. রাজ্যপালগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং যতদিন রাষ্ট্রপতি খুশি থাকেন ততদিন তাঁহারা স্ব স্ব পদে অধিষ্ঠিত থাকেন।[১] রাষ্ট্রপতি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন বিভাগের নামসর্বস্ব প্রধান (Titular Head)—তিনি নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা মাত্র এবং মন্ত্রি-পরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিবেন। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে রাজ্যপালকে নিয়োগ ও অপসারণ করিয়া থাকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রি-পরিষদ। এই অবস্থায় রাজ্যপাল কতদূর রাজ্যের নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা হিসাবে কার্য করিবেন সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে, কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রভাব হইতে মুক্ত থাকা তাঁহার পক্ষে কঠিন। অস্ট্রেলিয়া বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকারের এইরূপ কোন ক্ষমতা নাই। এই বিষয়ে একমাত্র ক্যানাডাতে ভারতের অনুরূপ ব্যবস্থার সন্ধান পাওয়া যায়।

১. *Arts. 155 & 156 of the Constitution of India*

(২) রাজ্যের আইন প্রণয়ন ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির কর্তৃত্ব : ক্যানাডাকে অনুসরণ করিয়া আবার রাজ্যের আইনসভা কর্তৃক পাস করা বিলকে রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য তাঁহার নিকট প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। রাজ্যের আইনসভা কর্তৃক পাস হইলে রাজ্যপাল বিলকে রাষ্ট্রপতির সমিতির জন্য তাঁহার নিকট প্রেরণ করিতে পারেন। কতিপয় ক্ষেত্রে এইরূপ প্রেরণ রাজ্যপালের পক্ষে বাধ্যতামূলক বলা চলে। এইভাবে প্রেরিত বিলে অসম্মতি জ্ঞাপন করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির আছে। বিলকে বাতিল করিবার রাষ্ট্রপতির এই ক্ষমতা রাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্যের পথে বিরাট বাধাস্বরূপ, কারণ স্মরণ রাখিতে হইবে যে রাজ্যপাল কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক মাত্র মনোনীতই হন না, তিনি **কেন্দ্রীয় সরকারের 'এজেন্ট'** হিসাবেও কার্য করেন। সুতরাং বিলে রাজ্যপালের সম্মতি বা অসম্মতি প্রদানের অর্থ দাঁড়ায় কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতি বা অসম্মতি প্রদান।[১]

(৩) শাসনকার্য পরিচালনাসংক্রান্ত সম্বন্ধ : ইউনিয়ন ও রাজ্যগুলির মধ্যে শাসনকার্য পরিচালনাসংক্রান্ত সম্বন্ধের ব্যাপারে সংবিধানে বলা হইয়াছে যে, রাজ্য সরকারগুলি পার্লামেণ্ট প্রণীত আইনসমূহের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াই শাসনকার্য পরিচালনা করিবে। এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগকে রাজ্য সরকারের প্রতি নির্দেশ দিবার ক্ষমতাও দেওয়া হইয়াছে। জাতীয় স্বার্থ বা সামরিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া ঘোষিত রেলপথ, রাজপথ প্রভৃতি সংরক্ষণের জন্যও কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের নিকট নির্দেশ প্রেরণ করিতে পারে। রাজ্য সরকারের সম্মতিক্রমে রাষ্ট্রপতি রাজ্যের শাসন বিভাগ বা রাজ্যের কর্মচারীদের উপর কর্তব্যভারও অর্পণ করিতে পারেন। প্রয়োজনবোধ করিলে সংসদও আইন করিয়া রাজ্য সরকার বা রাজ্যের কর্মচারিগণের উপর কর্তব্য ও ক্ষমতা ন্যস্ত করিতে পারে। কোন রাজ্য কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশপালনে অবহেলা করিলে রাষ্ট্রপতি সমস্ত ক্ষমতা নিজ হস্তে তুলিয়া লইতে পারেন এবং ঐ রাজ্যের আইনসভার সমস্ত ক্ষমতা সংসদ দ্বারা ব্যবহৃত হইবে বলিয়া ঘোষণা করিতে পারেন। ভারতের ন্যায় কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক এরূপ নিজ হস্তে ক্ষমতা গ্রহণের দৃষ্টান্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায় না।

(৪) রাষ্ট্রপতির জরুরী অবস্থাদি ঘোষণার ক্ষমতা : **৩৫৬ অনুচ্ছেদ** বলে রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা (Breakdown of the Constitutional Machinery in a State) অথবা **৩৫২ অনুচ্ছেদ** বলে জরুরী বা আপৎকালীন অবস্থা (state of emergency) ঘোষণা দ্বারা ইউনিয়ন সরকার কর্তৃক রাজ্যের শাসনভার গ্রহণকে অংগরাজ্যগুলির উপর কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণের একটি স্বতন্ত্র সূচক হিসাবে নির্দেশ করা যাইতে পারে। এই দিক দিয়াও ভারতীয় সংবিধান অনন্যসাধারণ—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্রে তুলনীয় দৃষ্টান্তের সন্ধান পাওয়া যায় না।[২]

---

১. "The Governor himself is *not only a nominee* of the Central Government but its agent. So the approval of the Governor for legislative measures is in effect an approval of the Central Government." K. M. Panikkar : *The Foundations of New India*

২. ৫৫-৫৬ পৃষ্ঠায় দেখ।

৬.৩. **প্রাধান্যের অন্যান্য দিক : (১) একই নির্বাচন কমিশন প্রভৃতি :** সমগ্র ভারতের জন্য একটিমাত্র নির্বাচন কমিশন, কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির ঊর্ধ্বতন সরকারী পদসমূহের জন্য একটিমাত্র রাষ্ট্রকৃত্যক নিয়োগ কমিশন (Public Service Commission) এবং নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা-পরীক্ষকের (Comptroller and Auditor-General) ,রাষ্ট্রপতি ও সংসদের একরূপ নিয়ন্ত্রণাধীনতা অংগরাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্য বিশেষভাবে ব্যাহত করে।

(২) ভারতে দ্বৈত-নাগরিকতা বা দ্বৈত-বিচারালয়ের অনস্তিত্ব : যুক্তরাষ্ট্রকে দ্বৈত-শাসন-ব্যবস্থা (dual polity) বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই দ্বৈত-শাসন-ব্যবস্থার প্রতিফলন হিসাবে **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দ্বৈত-নাগরিকতা** এবং **দ্বৈত-বিচারালয়ের** ব্যবস্থা রহিয়াছে। মার্কিন দেশে নাগরিকরা একদিকে অংগরাজ্যের নাগরিক এবং অপরদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। ভারতে এইরূপ দ্বৈত-নাগরিক নাই; সকল নাগরিকই ভারতীয় নাগরিক, রাজ্যের কোন পৃথক নাগরিকতা নাই। এই বিষয়ে ভারতের ব্যবস্থা ক্যানাডার ব্যবস্থার অনুরূপ।

আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিচার-ব্যবস্থাকে **দুই শ্রেণীতে বিভক্ত** করা হইয়াছে : (ক) কেন্দ্রীয় আইন ও বিষয়গুলি সংক্রান্ত মামলাদির বিচার করিবার জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচার-ব্যবস্থা, এবং (খ) অংগরাজ্যগুলির আইনকানুনগুলিকে প্রয়োগ করিবার জন্য অংগরাজ্যের বিচার-ব্যবস্থা। বিচারকার্যের ক্ষেত্রে ভারতে এরূপ কোন ভাগাভাগি করা হয় নাই—সকল বিচারালয়ই একই বিচার-ব্যবস্থার অংগীভূত। এই একত্রীভূত বিচার-ব্যবস্থার শীর্ষে থাকিয়া কেন্দ্রীয় বিচারালয় সুপ্রীম কোর্ট চরম আপিল আদালত (the court of final appeal) হিসাবে কার্য করে। ইহা ছাড়া হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের নিয়োগ ও অপসারণের ক্ষমতা কেন্দ্রের হস্তে ন্যস্ত।

(৩) পার্লামেণ্টের গঠন : যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার আর একটি নীতির কথা উল্লেখ করিয়া বলা হয় যে জনসংখ্যা ও আয়তন নির্বিশেষে সকল অংগরাজ্যই সমান মর্যাদা (equal status) ভোগ করিবে। এই সমমর্যাদাকে রূপ দেওয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভাকে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট করা হয়। এই দুই কক্ষের নিম্নতর কক্ষ গঠিত হয় জনসংখ্যার ভিত্তিতে; অপরদিকে উচ্চতর কক্ষে অংগরাজ্যের সমমর্যাদার নীতিকে প্রয়োগ করা হয় এবং জনসংখ্যা ও আয়তন নির্বিশেষে প্রত্যেক অংগরাজ্য হইতে সমান সংখ্যক সদস্য লইয়া ঐ কক্ষ গঠন করার ব্যবস্থা হয়।

ভারতীয় সংবিধানে কিন্তু কেন্দ্রীয় আইনসভার উচ্চতর কক্ষ গঠনে **এই সমপ্রতিনিধিত্বের নীতি গৃহীত হয় নাই**—ভারতীয় পার্লামেণ্টের উচ্চতর কক্ষ রাজ্যসভা প্রত্যেকটি রাজ্য হইতে সমসংখ্যক প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হয় না। জনসংখ্যা ও আয়তনের ভিত্তিতে রাজ্যসভার আসনগুলি বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া রাষ্ট্রপতি ১২ জন সদস্য মনোনীত করেন। সুতরাং আশংকা প্রকাশ করা হয় যে অপেক্ষাকৃত **ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির স্বার্থকে বৃহত্তর রাজ্যগুলির হস্তক্ষেপ হইতে সংরক্ষিত করিবার ব্যবস্থা ভারতীয় সংবিধানে নাই।** এই

কারণে অনেকে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে রাজ্যসভাকে অধিকতর কার্যকর সংস্থা হিসাবে গড়িয়া তুলিতে হইলে ইহাকে রাজ্যগুলি হইতে সমপ্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে পুনর্গঠিত করা প্রয়োজন।[১] সম্প্রতি, পশ্চিমবংগের বামফ্রণ্ট সরকার এই দাবিই তুলিয়াছে।

(৪) অংগরাজ্যগুলির নিজেদের সংবিধান-নির্ধারণের সমস্যা : ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে অংগরাজ্যগুলির নিজেদের সংবিধান কি হইবে বা না-হইবে, তাহা নির্ধারণের ক্ষমতা নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অংগরাজ্যগুলির নিজস্ব সংবিধান রহিয়াছে এবং উহাকে পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করিবার অধিকার অংগরাজ্যগুলির রহিয়াছে। আবার যেক্ষেত্রে নূতন নূতন রাজ্য গঠিত হয় সেক্ষেত্রে রাজ্যগুলি নিজেদের সংবিধান প্রণয়ন করে। সোবিয়েত ইউনিয়নেও অংগরাজ্যগুলির নিজেদের সংবিধান গ্রহণ ও পরিবর্তন করিবার অধিকার রহিয়াছে।[২] ভারতে একই সংবিধানে কেন্দ্র ও অংগরাজ্যগুলির শাসন-ব্যবস্থা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে (ইহার একমাত্র ব্যতিক্রম হইল জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য)। ভারতীয় ইউনিয়নের অংগরাজ্যগুলি নিজেদের শাসন-ব্যবস্থার রদবদল করিতে সমর্থ হয় না।

(৫) রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালের অর্ডিন্যান্স জারির ক্ষমতা : ১২৩ ও ২১৩ অনুচ্ছেদ বলে যথাক্রমে রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালের অর্ডিন্যান্স বা অস্থায়ী জরুরী আইন জারি করিবার ক্ষমতাকে ভারত ও অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আর একটি পার্থক্য হিসাবে নির্দেশ করা যাইতে পারে। **মার্কিন রাষ্ট্রপতি** অথবা **অস্ট্রেলিয়া ও ক্যানাডার গভর্নর-জেনারেলের এই ক্ষমতা নাই।**

(৬) সংবিধানের আংশিক দুষ্পরিবর্তনীয়তা : যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি অনুসারে সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় হইবে, ভারতীয় সংবিধান কিন্তু সমগ্রভাবে দুষ্পরিবর্তনীয় নহে। ইহা ক্ষমতাবন্টনসংক্রান্ত, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনসংক্রান্ত, পার্লামেন্টে রাজ্যসমূহের প্রতিনিধিত্ব-সংক্রান্ত প্রভৃতি বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে একরূপ সুপরিবর্তনীয়। এমনকি **রাজ্যসীমার পরিবর্তন, রাজ্যের নামের পরিবর্তন** প্রভৃতিও সংসদ এককভাবে সম্পাদন করিতে পারে। তবে এই সম্পর্কে বিল উত্থাপন করিবার পূর্বে রাষ্ট্রপতিকে সংশ্লিষ্ট রাজ্যসমূহের মতামত জানিতে হয়। কিন্তু এই মতামত অনুসারে তাঁহাকে কার্য করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। মতামতকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াই রাজ্যের সীমানার পরিবর্তন ইত্যাদি কার্য সম্পাদন করা যাইতে পারে (৪ অনুচ্ছেদ)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অস্ট্রেলিয়া সোবিয়েত ইউনিয়ন প্রভৃতি দেশে অংগরাজ্যের সম্মতি ব্যতীত উহাদের সীমানার পরিবর্তন করা যায় না। বলা হয়, এইরূপ ব্যবস্থা ছাড়া অংগরাজ্যের সংহতি ও অস্তিত্ব সংরক্ষিত হয় না।।

(৭) বিচারালয়ের প্রাধান্যের সীমাবদ্ধতা : ভারতীয় সংবিধান বহুলাংশে সুপরিবর্তনীয় হওয়ায় প্রয়োজনমত ইহার পরিবর্তনসাধন করিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের

১. "It seems desirable .. to limit the size of the Upper House by giving the states equal representation thus making it more compact, effective and useful instrument in the shaping of policies." Asok Chanda : *Federalism in India*

২. *Arts. 76 & 97 of the Constitution of the USSR*

কার্যকে একরূপ মাকচ করা যাইতে পারে। সংবিধানে সম্পত্তির অধিকারসংক্রান্ত ধারার বারবার পরিবর্তন হইল এই বিষয়ে শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। আবার ১৯৬৭ সালে গোলকনাথের মামলায় সুপ্রীম কোর্ট রায় দিয়াছিল যে সংসদ সংবিধানের সাহায্যে মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করিতে পারিবে না, কিন্তু ১৯৭১ সালে সংবিধানের ২৪-তম সংশোধন দ্বারা সংসদকে সর্তবিহীনভাবে এই ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে। পরিশেষে, ১৯৭১ সালের সংবিধানের ২৫-তম সংশোধন দ্বারা এই ব্যবস্থা করা হয় যে, সংবিধানের ৩৯ (খ) ও (গ) অনুচ্ছেদে উল্লিখিত নির্দেশমূলক নীতি কার্যকর করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র কোন আইন পাস করিলে কোন আদালত ঐ আইনের বৈধতা বিচার কবিতে পারিবে না। ইহার পর মৌলিক অধিকারসংক্রান্ত মামলায় ১৯৭৩ সালে সুপ্রীম কোর্ট আদালতের প্রক্রিয়ার বন্ধকরণ সম্পর্কিত সংশোধনকে অবৈধ ও অশাসনতান্ত্রিক বলিয়া ঘোষণা করে।[১] অতএব দেখা যাইতেছে যে ভাবতীয় সংবিধানে বিচারালয়ের প্রাধান্যকে ক্ষুণ্ণ কবার দিকে প্রবল ঝোঁক বহিয়াছে। বলা হয় যে ইহা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাব সহিত সংগতিপূর্ণ নহে।

অবশ্য ১৯৮০ সালের মিনাভা মিলস্ মামলায় সুপ্রীম কোর্ট এই মর্মে রায় দিয়াছে যে ৪২তম সংশোধনের ৪ ও ৫৫ ধাবা অবৈধ। সংশোধনের ৪ ধারায় বলা হইয়াছে, নির্দেশমূলক নীতিসমূহ কার্যকর করার জন্য আইন পাস করা হইলে ঐ আইন মৌলিক অধিকারভুক্ত সাম্যের অধিকার (Right to Equality) ও স্বাধীনতার অধিকার (Right to Freedom) ভংগ করিলেও অবৈধ হইবে না এবং এ-বিষয সম্পর্কে আদালতের বিচারের ক্ষমতা থাকিবে না। সংশোধনের ৫৫ ধারায বলা হইযাছে যে পার্লামেন্ট সংবিধানেব যে-কোন অংশের সংশোধন করিতে পারিবে এবং এরূপ সংশোধনের বৈধতা বিচারের এক্তিযার আদালতের থাকিবে না। সুপ্রীম কোর্ট উভয় ধারাকেই অবৈধ ঘোষণা করিয়া রায দিযাছে, কারণ কোর্টের মতে ঐ দুইটি সংশোধন সংবিধানের মৌল বৈশিষ্ট্য (basic features) মৌলিক কাঠামোকে (basic structure) ক্ষুণ্ণ করিযাছে।[২]

(৮) জরুরী অবস্থার ঘোষণার ক্ষমতা পরিশেষে পুনরুল্লেখ কবা যাইতে পারে, রাষ্ট্রপতির জরুরী অবস্থা প্রভৃতি ঘোষণাব ক্ষমতা হইল ভারতকে যুক্তরাষ্ট্র বলিয়া অভিহিত করার বিরুদ্ধে সর্বপ্রধান যুক্তি।[৩] শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা বা জরুরী অবস্থা ঘোষণার দ্বারা রাষ্ট্রপতি ভারত ইউনিযনকে সরাসরি এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থায় পরিবর্তিত করিতে পারেন। শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা সাধারণত দুই-একটি রাজ্য সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইলেও জরুরী অবস্থা সমগ্র ভারতীয় ইউনিয়ন বা রাজ্যক্ষেত্র (territory) সম্বন্ধে ঘোষণা করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিংবা অস্ট্রেলিয়ায় জরুরী অবস্থা দেখা দিলেও

১. *Kesavanand v State of Kerala* (1973)

২. *Minerva Mills v. Union of India*···পৃষ্ঠাও দেখ।

৩. ৪২ পৃষ্ঠা দেখ।

কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষমতাবণ্টন-ব্যবস্থা স্থগিত রাখার বা অংগরাজ্যের ক্ষমতা নিজের হস্তে সরাসরি তুলিয়া লইবার ক্ষমতা ভোগ করে না। তবেএই সকল দেশে যুদ্ধের মত জরুরী অবস্থায় দেশের নিরাপত্তা বা যুদ্ধ পরিচালনার স্বার্থে প্রয়োজনমত কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা সম্প্রসারিত করা হয়। এইভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে অধিক ক্ষমতা দেওয়া হইলেও কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থাকে ক্ষুণ্ণ বা উহার পরিবর্তিত রূপদান করিতে পারে না। অতএব, **ভারতের মত অন্য কোন যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক রাজ্য সরকারের ক্ষমতা নিজ হাতে তুলিয়া লইবার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।**[১]

গ। **আর্থিক ক্ষেত্রে কেন্দ্রপ্রবণতা (Centralism in Financial Matters):** সংবিধানের কেন্দ্রপ্রবণতা রাজস্ববণ্টন-ব্যবস্থার মধ্যেও সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বলা হয়, **যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি** হইল যে কেন্দ্র ও অংগরাজ্যগুলি দায়িত্ব ও কার্যাবলীর পরিমাণ এবং প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া দুই সরকারের মধ্যে অর্থ-সংগ্রহের ক্ষমতা এমনভাবে বণ্টিত করিতে হইবে যেন প্রত্যেক সরকার সম্যকভাবে দায়িত্ব পালন করিতে সমর্থ হয়। অন্যথায়—যেমন অংগরাজ্যগুলি অর্থের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভরশীল হইলে—অংগরাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্য কোনপ্রকারেই সংরক্ষিত হইতে পারে না।

ভারতীয় সংবিধানে প্রথমে কেন্দ্র ও অংগরাজ্যগুলির মধ্যে কর ধার্য, আদায় ও ভোগের ক্ষমতা ভাগাভাগি করা হইয়াছে এবং করধার্যের অবশিষ্ট ক্ষমতা পার্লামেন্টের হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত কতকগুলি ক্ষেত্রে আদায়ীকৃত রাজস্ব কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে ভাগ করিয়া লওয়ার ব্যবস্থাও আছে।

পরিশেষে, সংবিধানের ২৭৫ অনুচ্ছেদ অনুসারে পার্লামেণ্ট যদি স্থির করে রাজ্য-গুলিকে সাহায্যদানের প্রয়োজন আছে তাহা হইলে কেন্দ্র সাহায্যস্বরূপ অনুদান (grants-in-aid) দিতে পারে। এখন দেখা যায় যে অংগরাজ্যগুলির কার্য বা দায়িত্ব হইল সমাজকল্যাণমূলক বা জাতি-গঠনমূলক এবং এই উদ্দেশ্যে অর্থের প্রয়োজনও ক্রমবর্ধমান। অপরদিকে অংগরাজ্যগুলির অধিকারভুক্ত করগুলি **স্থিতিশীল** (inelastic) কিন্তু কেন্দ্রের ক্ষমতাভুক্ত করগুলি অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও **সম্প্রসারণশীল** (elastic)। যদিও অংগরাজ্যগুলি কতকগুলি করের ক্ষেত্রে (যেমন, আয়কর) কিছু অংশ ভোগ করে তাহা হইলেও কেন্দ্রের অনুদানের (grants) উপর নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু এই অনুদান দেওয়া বা না-দেওয়া আইনত কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভরশীল। কেন্দ্রের এই অনুদান ব্যতীত সংবিধানের ২৮৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার সাধারণের উদ্দেশ্যে (public purposes) যে-কোন বিষয় সম্পর্কে সরাসরি অর্থব্যয় বা অর্থসাহায্য করিতে পারে। অর্থাৎ, কোন বিষয় সম্পর্কে আইন প্রণয়ন-ক্ষমতা থাকুক বা না থাকুক, কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছা করিলে ঐ বিষয়ের উপর অর্থব্যয়

---

১ "There is, however no precedent for the express grant of power to invade the legislative sphere of the States in the event of an emergency." Sirdar D. K. Sen: *A Comparative Study of the Indian Constitution*

করিতে সমর্থ। কেন্দ্রীয় সরকার এই ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া রাজ্যের এলাকাধীন বিষয়ের উপর পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ বিস্তার করিতে প্রয়াস পাইয়াছে, কারণ রাজ্য সরকারগুলিকে অর্থসাহায্যের প্রলোভন দেখাইয়া কেন্দ্রীয় সরকারের সর্তাদি ও নিয়ন্ত্রণ মানিয়া লইতে বাধ্য করিয়াছে।

আবার ভারতীয় সংবিধানে প্রত্যেক পাঁচ বৎসর অন্তর বা তৎপূর্বে অনুদান প্রদান একদিকে কেন্দ্র এবং অপরদিকে রাজ্যসমূহের মধ্যে কতকগুলি কর হইতে আদায়ীকৃত রাজস্বের বণ্টন ইত্যাদি সম্পর্কে সুপারিশ করিবার জন্য **অর্থ বা ফিনান্স কমিশন** (a Finance Commission) নিয়োগের ব্যবস্থা আছে। এই কমিশনের গঠন ও নিয়োগ অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত, এই ব্যাপারে রাজ্য সরকার কোন অংশগ্রহণ করে না। ইহা ছাড়া ফিনান্স কমিশনের সুপারিশগুলিও কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট বাধ্যতামূলক নয়।

৬৪ **পরিকল্পনা কমিশনের মাধ্যমে অর্থবণ্টন** উপরন্তু, পরিকল্পনা কমিশনের (Planning Commission) মাধ্যমে রাজ্যগুলিকে **পরিকল্পনাসংক্রান্ত ব্যয়বহনের** জন্য অর্থবণ্টন করা হয়। বর্তমানে পরিকল্পনা খাতে রাজস্ববণ্টনের পরিমাণ ও গুরুত্ব বাড়িয়া গিয়াছে। এই বণ্টনের ভার কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত। মূলত পরিকল্পনা কমিশন একটি কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক সংস্থা বলিয়া ইহার দরুন কেন্দ্রিকতার দিকে বিশেষ ঝোঁক প্রবল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা হইতে সহজেই বুঝা যায় যে রাজ্যগুলি অর্থের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট নির্ভরশীল। স্বতই উহাদের নীতি ও কার্য বিশেষভাবে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রভাবান্বিত ও নির্দিষ্ট হইতে বাধ্য।

৬৫ **আর্থিক জরুরী অবস্থা** ইহা ব্যতীত রাষ্ট্রপতি যখন জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন তখন তিনি সংবিধানের রাজস্ব বণ্টন সম্পর্কিত ব্যবস্থা অকার্যকর বা স্থগিত রাখিতে পারেন। আবার যখন তিনি **আর্থিক জরুরী অবস্থা** (Financial Emergency) ঘোষণা করেন তখন কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলিকে নির্দিষ্ট আর্থিক নীতি অনুযায়ী কার্য করিতে আদেশ দিতে পারে।

উপসংহার **উপরের আলোচনা হইতে সুস্পষ্টভাবেই দেখা যাইতেছে যে, রাজস্ব বণ্টনের দিক হইতেও ভারতীয় সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয় অপেক্ষা অধিকতর এককেন্দ্রিক।**

---

৭ **'ইউনিয়ন' শব্দটি ব্যবহারের তাৎপর্য** এই প্রসংগে আবার 'ইউনিয়ন' শব্দটির তাৎপর্য সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতে পারে। অনেকের ধারণা যে 'ইউনিয়ন' শব্দটি দ্বারা ভারতীয় সংবিধানের কেন্দ্রপ্রবণতার ইংগিত দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই ধারণা মূলত যৌক্তিকতাবিহীন, কারণ **ইউনিয়ন শব্দটির কোন নির্দিষ্ট শাসনতান্ত্রিক তাৎপর্য নাই**। ভারতীয় সংবিধান অত্যন্ত কেন্দ্রপ্রবণ সন্দেহ নাই, কিন্তু এই কেন্দ্রপ্রবণতা মাত্র 'ইউনিয়ন' শব্দের ব্যবহার দ্বারা বুঝা যায় না। তাহা হইলে ইউনিয়ন শব্দটি ব্যবহারের উদ্দেশ্য কি? ডক্টর আম্বেদকারের ব্যাখ্যা অনুসারে, ইহার দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে, ভারতের অংগরাজসমূহ পরস্পরের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত—কাহারও এই রাজ্যসংঘ (Union of States)

হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকার নাই।[১] এখানেও বলিতে হয় যে সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রও ইউনিয়ন (Union of the Soviet Socialist Republics) বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও ঐ দেশে অংগরাজ্যগুলির ইউনিয়ন বা অংগরাজ্যগুলি হইতে স্বেচ্ছায় **বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকার** (right to secede) রহিয়াছে। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পরম্পরাগত অর্থে যাহাদের যুক্তরাষ্ট্র বলিয়া অভিহিত করা হয় তাহাদের কেহই অংগরাজ্যসমূহের বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকার স্বীকার করে নাই। সংবিধানে লিখিত না থাকিলেও ইহাকে অন্যতম স্বীকৃত নীতি বলিয়া ধরা হয়।

ভারতীয় সংবিধানে ভারতকে একটি রাজ্যসংঘ (a Union of States) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, কিন্তু কোথাযও ইহা বলা হয় নাই যে এই রাজ্যসংঘ অবিচ্ছেদ্য বা অভংগনীয়। অপরদিকে আবার প্রচ্ছন্ন বা প্রত্যক্ষ ভাবে একথাও বলা হয় নাই যে, অংগরাজ্যের বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকার রহিয়াছে। অবশ্য বলা হয় যে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র অংগরাজ্যগুলির মধ্যে চুক্তির মাধ্যমে প্রবর্তিত হয় নাই। **সুতরাং অংগরাজ্যের বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকার থাকিতে পারে না।**

৭১. **সংবিধানের ১৬শ সংশোধন** তবুও যাহাতে বিচ্ছিন্ন হইবার দাবি না উঠে তাহার জন্য আঞ্চলিকতার উপর জাতীয় সংহতি কমিটির (National Integration Committee on Regionalism) সুপারিশ অনুসারে সংবিধানের ষোড়শ সংশোধন পাস করা হয়। এই সংশোধন অনুসারে সকল নির্বাচনপ্রার্থী এবং সরকারী নিয়োগপ্রার্থীকে ভারতের সার্বভৌমিকতার প্রতি আনুগত্য স্বীকার ও ভূখণ্ডের সংহতি রক্ষার জন্য শপথ গ্রহণ করিতে হয়।

কিন্তু ভারতীয় ইউনিয়ন অবিচ্ছেদ্য হইলেও অংগরাজ্যগুলি অপরিবর্তনীয় নয়, কারণ সংবিধানের ৩ অনুচ্ছেদ অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলির সম্মতি ব্যতীতই উহাদের ভূখণ্ডের রদবদল করিতে পারে।[২] সুতরাং অংগরাজ্যের অস্তিত্বের কোন নিশ্চয়তা নাই এবং ইউনিয়ন সংসদ সাধারণভাবে আইন পাস করিয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি পরিবর্তন করিতে সমর্থ। এই ব্যবস্থা হইতে ভারতীয় **সংবিধানের এককেন্দ্রিক রূপ** সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায়।

ভারতীয় সংবিধান 'কতক পরিমাণে যুক্তরাষ্ট্রীয়' : **উপরি-উক্ত সকল দিক বিচার করিয়া অধ্যাপক হোয়ারার (Prof. K. C. Wheare) ভারতীয় সংবিধানকে 'কতক পরিমাণে যুক্তরাষ্ট্রীয়' (quasi-federal) বা যুক্তরাষ্ট্রীয় ধাঁচের বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।[৩] ডক্টর আম্বেদকারও ভারতীয় সংবিধানকে 'যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনে'র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন।**

১. "The Federation is a Union because it is indestructible" Dr. Ambedkar ৭ পৃষ্ঠার পাদটীকা দেখ।

২ " . it is worth underlining the fact that the Indian Union is far from being composed of indestructible States'." W. H. Morris-Jones এবং ১৮-২৯ পৃষ্ঠাও দেখ।

৩. "In the class of quasi-federal constitutions it is probably proper to include the Constitution of India."

৮. ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রপ্রবণতার কারণ (Reasons behind the Centralising Tendency in the Indian Federation): ভারতের শাসন-ব্যবস্থাকে অন্যতম 'কেন্দ্রপ্রবণ' ও 'যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনে'র বলিয়া বর্ণনা করার পর স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে, এই কেন্দ্রপ্রবণতা বা কেন্দ্রকে শক্তিশালী করিবার কারণ কি? ইহার সম্যক উত্তর পাইতে হইলে আমাদের প্রথমেই মনে রাখা প্রয়োজন যে **প্রত্যেক শাসন-ব্যবস্থার রূপ ও গঠন স্থান কাল ও সামাজিক অবস্থার আপেক্ষিক**।

৮১. দ্বৈত ও সমবায়িক যুক্তরাষ্ট্র: বর্তমানে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তনের ফলে সকল যুক্তরাষ্ট্রেই কেন্দ্রিকতার দিকে ঝোঁক এত প্রবল হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা এবং এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে সীমারেখা অতি ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনের চিরাচরিত তত্ত্ব (classical theory of federation) এবং কার্যক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অস্ট্রেলিয়া ক্যানাডা সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্রের কার্যকলাপের মধ্যে বিরাট ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়াছে। আকারে ইহারা যুক্তরাষ্ট্রীয় হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহারা এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের রূপ গ্রহণ করিতেছে। ইহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই অনেকে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে **প্রাচীন দ্বৈত-যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার** (dualistic federalism) স্থানাধিকার করিয়াছে আজিকার দিনের **সমবায়িক যুক্তরাষ্ট্র-ব্যবস্থা** (co-operative federalism)।[১]

যেভাবেই বর্তমান যুক্তরাষ্ট্রগুলিকে অভিহিত করা হউক না কেন, আজিকার দিনে সকল যুক্তরাষ্ট্রেই কেন্দ্রীয় সরকারের শক্তি বৃদ্ধি এবং অংগরাজ্যের উপর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের ব্যাপকতা সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। পৃথিবীব্যাপী কেন্দ্রিকতার দিকে এই সাধারণ গতি হইতে ভারত স্বভাবতই মুক্ত থাকিতে পারে না। সুতরাং ভারতীয় সংবিধানেও কেন্দ্রীয় সরকারকে যথোপযুক্তভাবে শক্তিশালী করিবার প্রচেষ্টা করা হইয়াছে।

৮.২ কেন্দ্রিকতাসাধক শক্তিসমূহ ক। ব্যাখ্যা করিয়া বলা যায়, যুদ্ধ বা যুদ্ধের ভীতি, আর্থিক সংকট, পরিবহণ-ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নয়ন, বৃহদায়তনে উৎপাদন ও বৃহদাকার শিল্পের আবির্ভাব, আর্থিক পরিকল্পনা ও সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রের ধারণা প্রভৃতি সকল যুক্তরাষ্ট্রেই কেন্দ্রীয় সরকারের প্রভাব ও শক্তি বৃদ্ধি করিতে সহায়তা করিয়াছে। ভারতে কেন্দ্রিকতার এই কারণগুলি অবিস্তর বর্তমান। ভারতে বহিরাক্রমণ বা যুদ্ধের ভীতি স্বাধীনতার সময় হইতেই বর্তমান রহিয়াছে, এবং ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যাপক হইতে ব্যাপকতর হইতেছে। ইহা ব্যতীত সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, প্রাদেশিক মনোমালিন্য প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ গোলযোগের ভীতিও সংবিধান-প্রণেতৃবর্গকে কেন্দ্রীয়

---

[১] "In all classical federations there is a notable divergence between the original theory, embodied in their constitutions and current practices Everywhere, in varying degrees, the old dualistic federalism has given way to co-operative federalism." F. G. Carnell

সরকারকে শক্তিশালী করিবার কার্যে উৎসাহিত করিয়াছে।[১] দেশবিভাগের পর পুনর্বাসন-সমস্যা, খাদ্য-সমস্যা, স্বাস্থ্য-সমস্যা, জনগণের আর্থিক দৈন্য, বেকারাবস্থা প্রভৃতি বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন ভারতকে হইতে হয়। এই সকল সমস্যার সমাধান এককভাবে করা রাজ্য সরকারগুলির আর্থিক শক্তি ও সামর্থ্যের বাহিরে। স্বাভাবিকভাবেই অংগরাজ্যগুলিকে তাহাদের আর্থিক দায়িত্ব পালনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভরশীল হইতে হয়। ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষমতা প্রসারলাভ করে।[২] বর্তমানে সকল দেশেই জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের নীতি গৃহীত হইয়াছে। বিশেষ করিয়া ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রসারের আকাংক্ষা বিশেষ তীব্র। সকলেই স্বীকার করেন যে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার (national economic planning) মাধ্যমে রাষ্ট্রকে সক্রিয়ভাবে জনসাধারণের কল্যাণসাধন করিতে হইবে—অন্তত সকলের জন্য ন্যূনতম জীবনযাত্রার মান নিশ্চিত করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু পরিকল্পনার সাহায্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লব ঘটাইতে হইলে দেশের সকল প্রকার সম্পদকে কেন্দ্রীয় পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পরিকল্পনার কার্যে লাগাইতে হয়। স্বাভাবিকভাবেই ভারতের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার যে অধিক শক্তিশালী হইবে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়

খ। এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা এবং একটিমাত্র দলের প্রাধান্য ভারতীয় সংবিধান কেন্দ্রাভিমুখী হওয়ার অন্যান্য কারণও রহিয়াছে। ভারতে যুক্তরাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করা হয় এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রকে ভাঙিয়া। সুতরাং ভারতের অতীত ঐতিহ্য হইল এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের। অন্যান্য কারণের সহিত এই অতীত অভিজ্ঞতার প্রভাবও ভারতীয় সংবিধানকে কেন্দ্রাভিমুখী করিতে সাহায্য করিয়াছে।[৩] ভারতীয় সংবিধানে কেন্দ্রকে অধিক শক্তিশালী করিয়া তুলিবার মূলে ভারতীয় দলীয় ব্যবস্থারও কিছুটা ভূমিকা রহিয়াছে। স্বাধীনতার পূর্ব হইতে **কংগ্রেস দলই** ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়া আসিতেছিল। গণপরিষদেও এই দলের প্রাধান্য থাকে। সুতরাং কংগ্রেস-নেতৃবর্গের ধ্যানধারণাই প্রধানত সংবিধানকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। ইঁহারা আগাগোড়াই শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষপাতী ছিলেন এবং যখন দেশবিভাগের ফলে পাকিস্তান গঠনের সকল সমস্যার অবসান ঘটে তখন ইঁহারা বিনা দ্বিধায় এক শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের দিকে অগ্রসর হন।

---

১ "Since independence, unity has been stressed mainly *to counter centrifugal forces*" W. H. Morris-Jones

২ ". the States, in view of their limited resources, must always look to the centre for financial aid and thus will be following the dictation of the Union in all important financial and political matters" B. R. Misra. *Economic Aspects of the Indian Constitution*

৩. "The governmental tradition of the East India Company and the British Crown in India was to centralise authority and weaken provincial governments. Though the federal act elevated these provinces to states, they were in fact only provinces ... ." K. M. Panikkar

৯. কেন্দ্রিকতার সম্প্রসারণ (Expansion of Centralisation) সংবিধান প্রবর্তনের পর হইতে গত কয়েক বৎসরের শাসনকার্য পরিচালনার অভিজ্ঞতা হইতে বলা যায় যে কেন্দ্রীকরণের ঝোঁক প্রবলতর হইয়াছে এবং প্রায় সকল ক্ষেত্রেই বা বিভিন্নভাবে রাজ্যগুলির ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষমতা সম্প্রসারিত হইয়াছে।[১]

(ক) শান্তিশৃংখলা প্রথমেই শান্তিশৃংখলা রক্ষার উল্লেখ করা যায়। শান্তি-শৃংখলা রক্ষা রাজ্যের ক্ষমতাধীন বিষয় হইলেও সাম্প্রদায়িক এবং অন্যান্য দাংগাহাংগামার সময় শান্তি ও নিরাপত্তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা, বৈদেশিক গুপ্তচরের কার্যাদি নিয়ন্ত্রণ এবং আন্তঃ-রাজ্য সমস্যা সমাধান ইত্যাদির জন্য কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণও প্রসারলাভ করিয়াছে।

(খ) শিক্ষা শিক্ষাক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (University Grants Commission) কেন্দ্রীকরণের আর একটি সহায়ক কারণ হিসাবে কার্য করিয়াছে। অর্থসাহায্যের দরুনই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নীতি ও পরিচালনা বহুলাংশে কেন্দ্রের পরিচালনাধীন হইয়া পড়িয়াছে। উপরন্তু, শিক্ষাকে রাজ্য তালিকা (State List) হইতে যুগ্ম তালিকায় (Concurrent List) স্থানান্তরিত করিয়া কেন্দ্রীয় আধিপত্যের পথ সুগম করা হইয়াছে। এবং রাজীব গান্ধী সরকার-কল্পিত **মানবিক সম্পদ উন্নয়নের** (human resources development) নামে শিক্ষার কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের সম্ভাবনাও বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

(গ) উন্নয়ন আর্থিক ক্ষেত্রেও কেন্দ্রের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রাজ্যগুলির হস্তে যে-রাজস্ব দেওয়া হইয়াছে তাহাতে স্বাভাবিক শাসনকার্য পরিচালনার ব্যয় বহন করাই উহাদের পক্ষে কষ্টকর। ইহার পর আছে উন্নয়নমূলক কার্যাদি। সুতরাং অর্থের জন্য সকল রাজ্যকেই এখন কেন্দ্রের দ্বারে প্রার্থী হইতে হয়।[২] কেন্দ্রীকরণ ব্যাপারে **পরিকল্পনা কমিশনের** (The Planning Commission) ভূমিকাও উপেক্ষণীয় নয়। পরিকল্পনা কমিশন সর্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে বিভিন্ন পরিকল্পনা নির্ধারণ করে। যদিও **জাতীয় উন্নয়ন পরিষদে** (The National Development Council—NDC) বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা থাকেন, তবুও ইহাদের বিভিন্ন সমস্যাকে রাজ্যের পরিপ্রেক্ষিতে না দেখিয়া সর্ব-ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে বিচারবিবেচনা করিতে হয়। ইহা ছাড়া জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ যেভাবে মাঝে মাঝে মিলিত হইয়া **অল্প সময়ের মধ্যে** পরিকল্পনার বিচারবিবেচনা করে তাহাতে পরিষদের যে বিশেষ কোন ভূমিকা আছে

---

১. "Broadly, it may be said that the political experience of the last fifteen years has disclosed a marked tendency towards growth of federal power at the expense of the states in practically every sphere." K. M. Panikkar: *The Foundations of New India*

২. "Every State has become a petitioner at the doorstep of the Central Government." K. M. Panikkar

বলিয়া মনে হয় না। ইহার একমাত্র কাজ হইল পরিকল্পনা কমিশনের সিদ্ধান্তকে অনুমোদন করা। দু'তিন দিনে সর্বসমেত সাত-আট ঘণ্টার অধিবেশনে ইহা অপেক্ষা কীই বা বেশী আশা করা যায়? উপরন্তু, পরিকল্পনা কমিশনের গঠনের দিকে দৃষ্টি দিলে ইহা সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে পরিকল্পনা কমিশন একটি রাজনৈতিক কেন্দ্রীয় সংস্থা।[১] রাজ্যগুলিতে যে-সকল বৃহৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যকর করা হয় তাহাও কেন্দ্রীয় অর্থে পরিচালিত এবং কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন। সুতরাং শিল্পক্ষেত্রেও কেন্দ্রের কাজকর্ম রাজ্যের কাজকর্মকে ছাপাইয়া গিয়াছে। শিল্প নীতি নির্ধারণ, বৃহৎ শিল্পগুলির জন্য লাইসেন্সের ব্যবস্থা ইত্যাদি সব ভাবেই কেন্দ্রের হস্তে।

(ঘ) প্রশাসন আবার শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রেও কেন্দ্রের ক্ষমতা বিস্তারের প্রাবল্য পরিলক্ষিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আঞ্চলিক পরিষদ (Zonal Councils) গঠনের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই পরিষদগুলি কোন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে মিলিত হয় এবং সন্নিহিত রাজ্যসমূহের সাধারণ সমস্যাসমূহের বিচারবিবেচনা করে। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে সংবিধান অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার কতকগুলি অবস্থায়—যেমন, রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থার অচলাবস্থা ইত্যাদি—রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন (The President's Rules) প্রবর্তন করিতে পারে। সংবিধান চালু হইবার পর এ-পর্যন্ত বহুবার এই ক্ষমতা প্রয়োগ করা হইয়াছে।

(ঙ) আর একটি কারণ—একটিমাত্র দলের প্রাধান্য কেন্দ্রপ্রবণতার আর একটি প্রধান কারণের পুনরুল্লেখ (প্রথম উল্লেখ ৫০ পৃষ্ঠা) করা যাইতে পারে। ইহা হইল যে স্বাধীনতার পর হইতে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলিতে একটিমাত্র রাজনৈতিক দল প্রাধান্য ভোগ করিয়া আসিতেছিল। ইহার ফলে কেন্দ্র কর্তৃক প্রবর্তিত নীতি বিভিন্ন রাজ্যে চালু করিতে বিশেষ অসুবিধা হয় নাই।

সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কেন্দ্রীকরণের এই সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ অবশ্য ধীরে ধীরে দানা বাঁধিতেছিল এবং উহা প্রকাশ পায় চতুর্থ সাধারণ (১৯৬৭ সাল) নির্বাচনে। এই নির্বাচনে বিশেষ করিয়া মাদ্রাজ (তামিলনাড়ু) রাজ্যে দেখা যায় কেন্দ্রিকতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ। মোটামুটি প্রাদেশিকতার ভিত্তিতে রচিত কর্মসূচী লইয়া মাদ্রাজ রাজ্যের দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজাগাম (DMK) দল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অসামান্য সাফল্য লাভ করে এবং প্রমাণ করে যে সমগ্র দেশ কেন্দ্রিকতার সম্প্রসারণ মানিয়া লইবে না।

১ " the Planning Commission is a political creation by the Central Government." K Mathew Kurian's article entitled "*Financial Relations in Federal Set-up*" in *Centre-State Relations* (Edited by K. Mathew Kurian and P. N, Varughese, 1981) ৪৭ পৃষ্ঠাও দেখ।

২. অতি সাম্প্রতিক দাবি হইল রাজ্যের জন্য অধিকতর অর্থবরাদ্দের ব্যবস্থার। এই দাবিতে অনেক রাজ্যই পরস্পরের সহিত হাত মিলাইয়াছে।

ইহার পর নবগঠিত পাঞ্জাব রাজ্যে সান্ত সিং-এর অকালী দলের বহুলাংশে সফল আন্দোলন এই প্রমাণেরই আর একটি নিদর্শন। পরবর্তী সময়ে আসামে ভোট-বর্জন ও অভূতপূর্ব পরিস্থিতিতে নির্বাচন (১৯৮৩ সাল), অন্ধ্রে তেলেগু দেশমের ক্ষমতা অধিকার (১৯৮৩ সাল), কর্ণাটকে জনতা-ক্রান্তি বংগ জোট কর্তৃক ক্ষমতা অধিকার (১৯৮৩ সাল) হইল আরও জোরালো দৃষ্টান্ত। পশ্চিমবংগ ও ত্রিপুরার সি পি এম-এর নেতৃত্বাধীনে পর পর দুইবার স্থায়ী বামফ্রন্ট সরকার গঠন এবং মেঘালয় প্রভৃতি রাজ্যে পার্বত্য জনজাতির নির্বাচন সাফল্যও কেন্দ্রিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের বেশ কিছুটা প্রতিফলন। ইহার পর আসামে অসম গণপরিষদ কর্তৃক সরকার গঠন, খালিস্তান সম্পর্কিত দাবির ভিত্তিতে পাঞ্জাবে বিশৃংখলা ইত্যাদি এই প্রতিবাদেরই সম্প্রসারণের পরিচয়।

মোটকথা, কংগ্রেস বা ইন্দিরা কংগ্রেসের **সর্বাত্মক প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ হওয়ায় আঞ্চলিকতার দিকে গতি প্রবল হইয়া উঠিতেছে।** এমনকি ইন্দিরা কংগ্রেস-শাসিত রাজ্যগুলিতে স্বাতন্ত্র্যের দিকে প্রবল ঝোঁক পরিলক্ষিত হয়। সকলে আর নয়া দিল্লী বা ইন্দিরা কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব মানিয়া লইতে রাজী নয়। দেখা যায়, বর্তমানে (আগস্ট, ১৯৮৩) ভারতের ২টি রাজ্যের মধ্যে ৮টি রাজ্যে অ-কংগ্রেসী সরকার প্রতিষ্ঠিত, এবং ২।৩টিতে কংগ্রেস (ই) কোনমতে টিকিয়া আছে। আবার যেখানেই নূতন করিয়া বিধানসভার নির্বাচন হইতেছে সেখানেই কংগ্রেস শাসন ক্ষমতাচ্যুত হইতেছে। আরও একটি বিষয় লক্ষণীয় হইল যে সাধারণত লোকসভার জন্য লোকে ইন্দিরা কংগ্রেসকে চাইলেও বিধানসভার বেলায় আঞ্চলিক দলের পক্ষপাতী হইতে দেখা যায়।

সারকারিয়া কমিশন আঞ্চলিকতার এইরূপ প্রসারে কেন্দ্র বা কংগ্রেস (ই) দলও উদ্বিগ্ন। আন্দোলন যাহাতে আরও দানা বাঁধিয়া জাতীয় সংহতি ক্ষুণ্ণ না করে এবং রাষ্ট্র-ব্যবস্থার কাঠামোকে আঘাত না হানে তাহার জন্য একটি কমিশন নিয়োগ করা হয় (২৫ ৩ ৮৩)। কমিশনটি একজন সদস্যের (one-man commission এবং নাম **সারকারিয়া কমিশন**। ক্রমাগত মেয়াদ বৃদ্ধি করিয়া কমিশনের সুপারিশ প্রকাশের সময় ১৯৮৬ সালের শেষ পর্যন্ত লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

প্রকাশিত হইলে আঞ্চলিকতা বা কেন্দ্রিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কোন্ পথে মোড় লইবে বা উহার গতি কি হইবে সে-সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করা কঠিন।

"The theory of co-ordinate powers of the Centre and the units, for a long time the favourite theme of constitutional lawyers, would hardly apply to the Indian Federation where the Centre is invested with such extraordinary powers and the 'Provinces' reduced frankly to a position of subordination"
Panikkar

স্মর্তব্য

১. ব্রিটিশ আমলেই ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ও মনোভাব গড়িয়া উঠিয়াছিল বলিয়াই ভারতীয় সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

২ গঠন-পদ্ধতিতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র বিপরীতমুখী।

৩ কেন্দ্রপ্রবণতাই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য।

৪. আইন-প্রণয়ন, শাসন-পরিচালনা, নাগরিকতা, বিচার-ব্যবস্থা, নির্বাচন-পদ্ধতি প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যাপারে কেন্দ্রপ্রবণতার সুস্পষ্টসূচক লক্ষ্য করা যায়।

৫ অতএব, ভারত-রাষ্ট্র 'কতক পরিমাণে যুক্তরাষ্ট্র' বা যুক্তরাষ্ট্রীয় ধাঁচের।

৬ এই কেন্দ্রপ্রবণতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও আন্দোলন দিন দিন প্রবল হইয়া উঠিতেছে।

অনুশীলনী

1 "Indian Constitution is federal in form but unitary in substance" Discuss. (C U. 1965)

[ভারতীয় সংবিধান আকারে যুক্তরাষ্ট্রীয় হইলেও প্রকৃতিতে এককেন্দ্রিক।" উক্তিটির পর্যালোচনা কর।]
(৫-৭ অথবা ৩৯-৪৭ পৃষ্ঠা এবং বিশেষ অনুশীলনী)

2 Discuss the nature of the federal system of government existing in India (C U 1977)

[ভারতে প্রবর্তিত যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার পর্যালোচনা কর।] (পূর্ববর্তী প্রশ্নের উত্তর)

3. It is stated that the Government of India is quasi-federal Justify this view (C U. 1969)

[বলা হয়, ভারত সরকার ঠিক যুক্তরাষ্ট্রীয় নয়—যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনের। এই অভিমতের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর।] (৫-৭ অথবা ৩৯-৪৭ ও ৪৮ পৃষ্ঠা)

4. "India's Constitution is federal in form with pronounced unitary bias" Discuss

["ভারতীয় সংবিধান আকারে যুক্তরাষ্ট্রীয় হইলেও এককেন্দ্রিকতার দিকে উহার ঝোঁক অতি প্রবল। উক্তিটির পর্যালোচনা কর।] (প্রথম প্রশ্নের উত্তর)

5 Discuss the reasons for adopting a federal system for India

[ভারতের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা কর।] (৩৪-৩৭ পৃষ্ঠা)

6. Examine the reasons for the growing centralisation of powers in India and comment on the recent development in this regard

[ভারতে রাষ্ট্রশক্তির উত্তরোত্তর কেন্দ্রীকরণের কারণ বিশ্লেষণ কর এবং এই বিষয়ে বর্তমানে যে-গতি লক্ষ্য করা যাইতেছে তাহার উপর মন্তব্য প্রকাশ কর।] (৫১-৫৩ পৃষ্ঠা)

৫

ভারতীয় সংবিধানে ইউনিয়ন ও রাজ্যগুলির মধ্যে সম্পর্ক

(RELATIONS BETWEEN THE UNION AND THE STATES UNDER THE INDIAN CONSTITUTION)

"*A dispersion of powers is incompatible with the troubled politics of a world that is scarred by past wars and scared of new ones*" L Lipson *The Great Issues of Politics*

১ **আইন, শাসন ও রাজস্ব সংক্রান্ত ক্ষমতা বণ্টন** যে-কোন যুক্তরাষ্ট্রে বা যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনের শাসন-ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল কেন্দ্র ও অংগরাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন। এই **ক্ষমতা বণ্টনের তিনটি দিক** হইল আইন, শাসন ও রাজস্ব সংক্রান্ত ক্ষমতার (Legislative, Executive and Financial Powers) বণ্টন। ভারতীয় সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনের। সুতরাং ভারতের বর্তমান শাসন-ব্যবস্থার পর্যালোচনায় ইউনিয়ন ও অংগরাজ্যসমূহের মধ্যে উপরি-উক্ত তিন প্রকার সম্বন্ধের আলোচনা করিতে হয়।

২ যুক্তরাষ্ট্রে আইনবিষয়ক ক্ষমতার বণ্টন এবং কেন্দ্র ও অংগরাজ্যগুলির মধ্যে সম্বন্ধ (Distribution of *Legislative Powers* and Relations between the Centre and the Component States in a Federation)

ক্ষমতা বণ্টন যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার শুধু অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য **নহে** অন্যতম **সমস্যাও** বটে। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে এই সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা করা হইয়াছে। অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায়, কোথাও ক্ষমতা বণ্টন কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা হইয়াছে আবার কোথাও বা ক্ষমতা বণ্টন-পদ্ধতিকে (mode of distribution of legislative powers) এত জটিল করা হইয়াছে যে, উহার ফলে বিবাদবিসংবাদ লাগিয়াই

২.১ **ক্ষমতা বণ্টনের দুইটি মৌল পদ্ধতি** ক্ষমতা বণ্টনের পদ্ধতি মোটামুটি দুই প্রকার।

ক। প্রথম পদ্ধতিতে সংবিধান কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা নির্দিষ্টভাবে বলিয়া দিয়া অবশিষ্ট ক্ষমতা (residuary powres) অংগরাজ্যগুলির হস্তে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ফলে এই ব্যবস্থায় কেন্দ্রের ক্ষমতা সুস্পষ্ট ও নির্দিষ্টভাবে সংবিধানে বর্ণিত (expressly and specifically enumerated) থাকে এবং অংগরাজ্যগুলির হস্তে অবর্ণিত বা অবশিষ্ট ক্ষমতা (unenumerated or residuary powers) ন্যস্ত করা হয়। মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্র অস্ট্রেলিয়া সুইজারল্যাণ্ড সোবিয়েত ইউনিয়ন প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্রে প্রধানত এই পদ্ধতিতেই ক্ষমতা বণ্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

(খ) ক্ষমতা বণ্টনের দ্বিতীয় পদ্ধতির দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ক্যানাডার সংবিধানের ব্যবস্থায়। এই ব্যবস্থায় কতকগুলি নির্দিষ্ট বিষয়ে অনন্য ক্ষমতা (exclusive powers) প্রদেশগুলিকে দেওয়া হইয়াছে এবং অন্যান্য বিষয়ে আইন করিবার সাধারণ ক্ষমতা (general authority) ন্যস্ত করা হইয়াছে কেন্দ্রের হস্তে। কেন্দ্রের এই সাধারণ ক্ষমতা ছাড়াও কতকগুলি নির্দিষ্ট বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে যাহাদের সম্পর্কে অনন্যভাবে আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা হইল কেন্দ্রীয় সরকারের। ইহা ব্যতীত কৃষি ও অভিবাসন (agriculture and immigration)—এই দুইটি বিষয় হইল যুগ্ম ক্ষমতাধীন বিষয় (concurrent subjects) এবং ইহাদের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের আইনের সংগে প্রাদেশিক আইনের অসংগতি দেখা দিলে কেন্দ্রীয় আইনই বলবৎ হয়।

২২. ক্ষমতা বণ্টনের প্রকৃতি কোন্ কোন্ বিষয় দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় (Factors influencing the Nature of Distribution of Legislative Powers) কোন যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার ক্ষমতা বণ্টনের প্রকৃতি কি হইবে না-হইবে, তাহা সংশ্লিষ্ট দেশের যুক্তরাষ্ট্র গঠনের সময়কার পারিপার্শ্বিক—অর্থাৎ সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক—অবস্থার উপর অনেকখানি নির্ভর করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্যানাডা অস্ট্রেলিয়া—যে-কোন যুক্তরাষ্ট্রের ঐতিহাসিক পটভূমিকার পর্যালোচনা করিলে ইহা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়।

বর্তমান ভারতীয় সংবিধানের ক্ষমতা বণ্টন-ব্যবস্থা ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অনুকরণে করা হইয়াছে। ইহাতে একটি বা দুইটি তালিকার পরিবর্তে তিন-তিনটি বিস্তৃত তালিকা রহিয়াছে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা যথাসম্ভব ব্যাপক করার ব্যবস্থা হইয়াছে।

কেন্দ্রিকতার এই কারণ সম্পর্কে ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে (৫১-৫২ পৃষ্ঠা) সংক্ষেপে পুনরুল্লেখ করিয়া বলা যায়, সাম্প্রদায়িক বিবাদ, প্রাদেশিকতার আশংকা, ১৯৩৫ সালের আইনের দৃষ্টান্ত, কংগ্রেস দলের সকল অঞ্চলে প্রাধান্য, পৃথক মুসলিম রাষ্ট্রের গঠন, বহিরাক্রমণের ভীতি এবং কমিউনিস্ট মতবাদের প্রসারের আশংকা, কেন্দ্রীভূত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রভৃতি বিষয় কেন্দ্রীয় সরকারকে শক্তিশালী করিবার প্রেরণা যোগাইয়াছে। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে বর্তমান পৃথিবীতে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার ভিন্ন উপায় নাই, কিন্তু এই কেন্দ্রিকতা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুষ্ট না হইলে স্বৈরাচারিতার সম্ভাবনা থাকিয়া যায়।

একাধিক তালিকার সপক্ষে যুক্তি : এখন প্রশ্ন করা যাইতে পারে, যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানে একাধিক তালিকা সংযুক্ত করা উচিত কি না? ইহার উত্তরে বলা হয়, সর্বাপেক্ষা কাম্য ব্যবস্থা হইল একটি তালিকার সাহায্যে কেন্দ্র কিংবা অংগরাজ্যের ক্ষমতা নির্দিষ্ট করিয়া অপর সরকারের হস্তে অবশিষ্ট ক্ষমতা ন্যস্ত করা। ইহার ফলে জটিলতা ও

বিবাদ সংবাদের সম্ভাবনা হ্রাস পায়। কিন্তু অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে, অনেক ক্ষেত্রেই এরূপ সহজ উপায়ে ক্ষমতা বণ্টনের সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এমন কতকগুলি বিষয় আছে যাহা কখনই সম্পূর্ণ এককভাবে কেন্দ্র অথবা অংগরাজ্যের হস্তে সমর্পণ করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করা হয় না এবং এগুলি সম্পর্কে রাজ্য সরকারের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা বাঞ্ছনীয় হইলেও শাসনকার্য পরিচালনার দক্ষতা ও দেশের সর্বত্র আইনকানুনগুলির সমতা (efficient administration and uniform legislation) নিশ্চিত করিবার জন্য কেন্দ্রকেও ক্ষমতা প্রদান করা উচিত। সুতরাং **যুগ্ম ক্ষমতার** (concurrent powers) **সপক্ষে** যথেষ্ট **যুক্তি** রহিয়াছে।

২.৩ ভারতীয় সংবিধানে ত্রিবিধ তালিকার অন্তর্ভুক্তির সমালোচনা

যদিও যুগ্ম ক্ষমতার ব্যবস্থার ফলে সংবিধানের জটিলতা ও বিবাদের সম্ভাবনা বাড়িয়া যাইতে পারে, তবুও কিন্তু যুগ্ম ক্ষমতার ব্যবস্থা করা অবস্থাবিশেষে অপরিহার্য হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় সংবিধানে কেন্দ্র কিংবা অংগরাজ্যের অনন্য ক্ষমতা সমন্বিত একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা এবং যুগ্ম ক্ষমতা সমন্বিত আর একটি তালিকার ব্যবস্থা করিয়া অবশিষ্ট ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের অপরাংশ—অংগরাজ্য কিংবা কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত করা সমীচীন। কিন্তু তাহা না করিয়া যদি দুই সরকারের ক্ষমতা দুইটি তালিকা দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয় এবং যুগ্ম ক্ষমতার জন্যে আর একটি তৃতীয় তালিকা থাকে তাহা হইলে সংবিধানের ব্যাখ্যার প্রশ্ন অকাম্যভাবে জটিল হইয়া পড়ে, কারণ বিভিন্ন তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়ের কোনটির কি অর্থ, কোনটি কোন্ সরকারের এলাকাভুক্ত ইত্যাদি সমস্যার সমাধান সহজসাধ্য হয় না। এই অসুবিধা যে সামান্য নয় তাহা ১৯৩৪ সালের ভারতীয় সংবিধান এবং ক্যানাডার সংবিধানের ব্যাখ্যা লইয়া আদালতে মামলার অভিজ্ঞতা হইতে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়।

অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও বর্তমান ভারতীয় সংবিধানে তিন-তিনটি বৃহৎ তালিকা সংযুক্ত করা হইয়াছে। অধ্যাপক হোয়ায়ারের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলা যায়, ইহা পরিতাপের বিষয় যে ক্ষমতা বণ্টন ব্যাপারে গণপরিষদ সহজ ও সংক্ষিপ্ততর পদ্ধতি অবলম্বন করিতে সমর্থ হয় নাই।[১]

---

৩ ভারতীয় সংবিধানে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা বণ্টন (Distribution of Legislative Powers under the Indian Constitution)

ভারতীয় সংবিধানের ক্ষমতা বণ্টন-ব্যবস্থা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের বণ্টন-পদ্ধতি কিংবা ক্যানাডার পদ্ধতি এই দুইটির কোনটিকেই সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করে নাই—**উভয় পদ্ধতির সংমিশ্রণ** হিসাবেই ভারতীয় সংবিধানের বণ্টন-ব্যবস্থাকে গণ্য করা যাইতে পারে।

১ "It is unfortunate, however, the (Constituent) Assembly could not have adopted a much simpler and shorter method of dividing the powers." K. C. Wheare

তবে বলা যায়, ক্ষমতা বণ্টন ব্যাপারে ভারতীয় সংবিধান ক্যানাডার সংবিধানের সহিতই অধিক তুলনীয়।

৩.১. ক্যানেডীয় পদ্ধতির সহিত তুলনা: ক্যানাডার সংবিধানের মত ভারতীয় সংবিধানে **অংগরাজ্যগুলির অনন্য ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলিকে** নির্দিষ্টভাবে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। আবার ক্যানাডায় যেমন যে-সকল বিষয় সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার অনন্য ক্ষমতা ভোগ করে তাহার উল্লেখ আছে, তেমনি ভারতীয় সংবিধানেও কেন্দ্রীয় সরকারের অনন্য ক্ষমতাসমূহ নির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। ক্যানাডার সংবিধানের মত ভারতীয় সংবিধান **অবশিষ্ট ক্ষমতা** (residuary powers) কেন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করিয়াছে। অবশ্য যুগ্ম ক্ষমতা (concurrent powers) সম্পর্কে ভারতীয় সংবিধানের সহিত ক্যানাডার সংবিধানের মিল খুব বেশী নাই। বর্তমানে ক্যানাডায় যে-যুগ্ম তালিকা আছে তাহাতে মাত্র কৃষি, অভিবাসন ও বার্ধক্যে পেন্সনের ব্যবস্থা এই তিনটি বিষয়ের উল্লেখ থাকিলেও ভারতীয় সংবিধানে যুগ্ম তালিকা অতি দীর্ঘ।

ক্যানাডার সংবিধানের সংগে ভারতীয় সংবিধানের আর একদিক দিয়াও সাদৃশ্য রহিয়াছে। এই সাদৃশ্য হইল **আনুষংগিক ও পরিপূরক ক্ষমতার নীতির** (the doctrine of incidental and ancillary powers) প্রয়োগ লইয়া। নির্দিষ্টভাবে ব্যক্ত ও লিখিত কোন ক্ষমতাকে কার্যকরভাবে প্রয়োগের জন্য যে-অন্যান্য ক্ষমতার প্রয়োজন হয় তাহাদিগকে আনুষংগিক ও পরিপূরক ক্ষমতা বলা হয়। ক্যানাডা কিংবা ভারতের সংবিধানে এই আনুষংগিক ও পরিপূরক ক্ষমতার কোন উল্লেখ না থাকিলেও ক্যানাডায় আদালত সংবিধানের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বলিয়াছে যে, কেন্দ্র ও প্রদেশগুলির আনুষংগিক ক্ষমতা রহিয়াছে।[১] আমাদের দেশে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ব্যাখ্যা প্রসংগে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত (Federal Court) অনুরূপ মত প্রকাশ করে।[২] **ভারতীয় সুপ্রীম কোর্টও** বর্তমান সংবিধানের বেলায় আনুষংগিক ক্ষমতার নীতি প্রয়োগ করিয়াছে। সুতরাং কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলি তাহাদের নির্দিষ্ট ক্ষমতাকে কার্যকর করার জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় আনুষংগিক ক্ষমতা ভোগ করিয়া থাকে।[৩]

আবার ক্যানাডায় যেমন কেন্দ্রীয় সরকার প্রদেশগুলি কর্তৃক রচিত আইনকে বাতিল করিয়া দিতে পারে তেমনি বর্তমান ভারতীয় সংবিধানে রাষ্ট্রপতি রাজ্যপাল কর্তৃক সংরক্ষিত **রাজ্যের বিলকে বাতিল** করিয়া দিতে পারেন।

৩.২. ক্যানেডীয় পদ্ধতি হইতে পার্থক্য: কিন্তু ক্যানাডার ক্ষমতা বণ্টন-পদ্ধতির সহিত ভারতীয় সংবিধানের ক্ষমতা বণ্টন-ব্যবস্থার মোটামুটি সাদৃশ্য দেখানো হইলেও **একদিক দিয়া** ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা হইতে সম্পূর্ণভাবে পৃথক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অস্ট্রেলিয়া ক্যানাডা সুইজারল্যাণ্ড ও সোবিয়েত ইউনিয়ন —কোন যুক্তরাষ্ট্রেই এই দেশগুলির কোনটিতেই দুই সরকারের ক্ষমতা বিস্তৃতভাবে সংবিধানে লিপিবদ্ধ করিবার প্রচেষ্টা করা হয় নাই।

ভারতীয় সংবিধানে কিন্তু সকল ক্ষমতাই সংবিধানে লিপিবদ্ধ করিবার প্রচেষ্টা করা হইয়াছে।

১. *A-G for Ontario* v. *A.-G. for Canada* (1896)

২. *United Provinces* v. *Atiqa Begum* (1941)

৩. "It is the fundamental principle of constitutional law that everything necessary to the exercise of a power is included in the grant of the power." *Edward Mills* v. *State of Ajmer* (1955)

৩.৩. **সমালোচনা (Criticism) :** বলা হয়, সংবিধান-রচয়িতৃগণ ক্ষমতা সম্পর্কে কোনপ্রকার সন্দেহের অবকাশ রাখিতে চাহেন নাই বলিয়াই এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায়, তালিকা এবং তালিকাভুক্ত ক্ষমতাসমূহের সংখ্যা যত অধিক হয় বিবাদবিসংবাদ বাড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনা তত অধিক হয়।[১]

(ক) অবশিষ্ট ক্ষমতা সম্পর্কে ব্যবস্থা ও কেন্দ্রিকতা : উপরন্তু, যেভাবেই প্রচেষ্টা করা হউক না কেন, **আইন প্রণয়নসংক্রান্ত সকল প্রকার বিষয়কে কখনই তালিকাভুক্ত করা সম্ভব নয়।** বর্তমান গতিশীল সমাজে নূতন নূতন প্রয়োজন নিত্যনিয়ত উদ্ভূত হইতেছে। ইহার ফলে আজ যে ক্ষমতার তালিকাকে সম্পূর্ণ বলিয়াই মনে হয় কাল তাহা অসম্পূর্ণ বলিয়াই পরিগণিত হয়। সুতরাং আইন প্রণয়ন ব্যাপারে অবশিষ্ট ক্ষমতার (residuary powers) ব্যবস্থা সকল সময়ই রাখিতে হয়। ১৯৩৫ সালের আইনে এই ব্যবস্থা গভর্নর-জেনারেলের হস্তে ন্যস্ত ছিল—অর্থাৎ তিনি তালিকাভুক্ত নহে এরূপ ক্ষমতাকে কেন্দ্র অথবা প্রদেশসমূহ যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে সমর্পণ করিতে পারিতেন।

(খ) কেন্দ্রিকতার সূচক : বর্তমান সংবিধানের **অবশিষ্ট ক্ষমতাকে সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত** করা হইয়াছে। ইহা কেন্দ্রীয়করণ-প্রবণতার অন্যতম সূচক, সন্দেহ নাই।[২] দ্বিতীয়ত, দেখা যায় যে. বর্তমান সংবিধানে এরূপ অনেক বিষয়কে যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে যাহা ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে ছিল প্রাদেশিক তালিকার অন্তর্গত। তৃতীয়ত, অনেক নূতন নূতন বিষয়ও কেন্দ্রীয় তালিকায় স্থান পাইয়াছে। কয়েকটি ক্ষমতাকে আবার রাজ্য তালিকা হইতে যুগ্ম তালিকায় স্থানান্তরিত করা হইয়াছে—যেমন সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্ট ছাড়া অন্য বিচারালয় গঠন, বনসম্পদ, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদি।

৩.৪. **কেন্দ্রীয় ও রাজ্য আইনের পরিধি :** আইনের পরিধি সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে সংবিধানের অন্যান্য ব্যবস্থা ক্ষুণ্ণ না করিয়া সংসদ সমগ্র ভারত বা উহার যে-কোন অংশের জন্য আইন করিতে সমর্থ এবং অপরদিকে রাজ্যগুলি নিজ নিজ রাজ্য বা উহার কোন অংশের জন্য আইন প্রণয়ন করিতে সমর্থ। তবে সংসদের কোন আইন অঞ্চল-বহির্ভূত (extra-territorial)—অর্থাৎ ভারতীয় ভূখণ্ডের বাহিরে প্রযোজ্য বলিয়া উহাকে বাতিল করা যাইবে না। **সংবিধান-নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে** সংসদ এবং রাজ্য আইনসভাগুলির ক্ষমতা হইল পূর্ণ ক্ষমতা (plenary powers), কারণ উভয় ক্ষমতাই সংবিধান হইতে প্রাপ্ত। এই কারণেই আবার কেন্দ্র বা কোন অংগরাজ্য

১. "It is, indeed, difficult enough to interpret one list of subjects consistently. When a second or even a third is added the task of the courts becomes most *complicated* and *confused*." K. C. Wheare : *Modern Constitutions*

২. The makers of the Indian Constitution "wanted a strong Centre, and, naturally vested the residuary power in the Centre." M. C. Setalvad : *Union and State Relations under the Indian Constitution* (Tagore Law Lectures)

উহার আইন প্রণয়নের নিজস্ব ও অনন্য ক্ষমতা অপরের নিকট হস্তান্তরিত করিতে পারে না।[১]

৪. **তালিকা তিনটির বিবরণ** : দেখা গিয়াছে, কেন্দ্র ও অংগরাজ্যগুলির ক্ষমতাগুলিকে প্রথমে তিনটি তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে (৪০ পৃষ্ঠা)। প্রথম তালিকা হইল **ইউনিয়ন তালিকা** (Union List)। ইহাতে প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ, যুদ্ধ ও শান্তি, নাগরিকতা, রেলপথ, বিমানপথ, মুদ্রা-ব্যবস্থা, ব্যাংক-ব্যবসায় প্রভৃতি **৯৭টি বিষয়ের** উল্লেখ রহিয়াছে। দ্বিতীয় তালিকা হইল রাজ্য তালিকা (State List)। বর্তমানে উহা শান্তিশৃংখলা, পুলিস, কতিপয় শিল্প, কৃষি, সমবায় আন্দোলন, জনস্বাস্থ্য ইত্যাদি ৬২টি বিষয় লইয়া এই তালিকা গঠিত (ক্রমিক-সংখ্যা কিন্তু ৬৬—মধ্যের ৪টি বিষয় যুগ্ম তালিকায় স্থানান্তরিত হইয়াছে।)। তৃতীয় তালিকা হইল যুগ্ম তালিকা (Concurrent List)। বিবাহ, চুক্তি, সামাজিক বীমা, অর্থ নৈতিক ও সামাজিক পরিকল্পনা ইত্যাদি ৫১টি বিষয় ইহার অন্তর্ভুক্ত (ক্রমিকসংখ্যা কিন্তু ৪৭—A.B. করিয়া ৫১-তে দাঁড়াইয়াছে। যেমন বনসম্পদের ক্রমিকসংখ্যা হইল 17A।)।

৪.১. **অনন্য ক্ষমতা ও যুগ্ম বিষয়** : সংবিধানের ব্যবস্থা হইল, রাজ্য তালিকা ও যুগ্ম তালিকা সম্পর্কে রাজ্যের আইনসভার যে-ক্ষমতাই থাকুক না কেন, ইউনিয়ন তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করিবার অনন্য ক্ষমতা (exclusive power) হইল সংসদের [২৪৬ (১) অনুচ্ছেদ]। রাজ্য তালিকা সম্পর্কে আইন করার অনন্য ক্ষমতা ন্যস্ত করা হইয়াছে রাজ্যগুলির আইনসভার হস্তে; তবে রাজ্যের এই ক্ষমতা ইউনিয়ন তালিকা ও যুগ্ম তালিকা সম্পর্কে পার্লামেন্টের যে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা রহিয়াছে তাহার দ্বারা সীমাবদ্ধ [২৪৬ (৩) অনুচ্ছেদ]। যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয় সম্পর্কে পার্লামেন্ট এবং রাজ্য আইনসভা উভয়েরই আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা রহিয়াছে। সংবিধানে বলা হইয়াছে, রাজ্য তালিকায় যাহাই থাকুক না কেন, যুগ্ম তালিকার অন্তর্গত যে-কোন বিষয় সম্পর্কে সংসদ আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে। রাজ্য আইনসভাও যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়ের উপর আইন করিতে সমর্থ তবে এই ক্ষমতা ইউনিয়ন তালিকা সম্পর্কে পার্লামেন্টের যে-ক্ষমতা রহিয়াছে তাহার দ্বারা সীমাবদ্ধ [২৪৬ (২) অনুচ্ছেদ]।

ইহা ব্যতীত যুগ্ম ক্ষমতার ক্ষেত্রে পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রণীত আইনের সংগে রাজ্য আইনসভা কর্তৃক রচিত কোন আইনের অসংগতি (repugnancy) দেখা দিলে পার্লামেন্টের আইনই বলবৎ হইবে এবং রাজ্যের আইন যতদূর অসংগতিপূর্ণ ততদূর পর্যন্ত বাতিল হইয়া যাইবে।

১. "It is implicit in the demarcation of legislative subjects that one legislature cannot by delegation of subjects that are exclusively within its field clothe the other with legislative capacity to make laws on that subject as it will amount to an infringement of the Constitution itself." In re *Delhi Laws Act 1912* (1950-51)

তবে সংশ্লিষ্ট অসংগতিপূর্ণ রাজ্যের আইন রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য প্রেরণ করা যায় এবং রাষ্ট্রপতি উহাকে সম্মতি প্রদান করিলে পার্লামেণ্টের আইনের সহিত অসংগতিপূর্ণ হইলেও রাজ্যের আইনটি বলবৎ হইবে। সংসদ অবশ্য যে-কোন সময় আইন করিয়া রাজ্যের আইনের রদবদল করিতে সমর্থ।

৪.২. **অবশিষ্ট ক্ষমতা** : তিনটি তালিকার বহির্ভূত সকল অবশিষ্ট ক্ষমতাকে কেন্দ্রের হস্তে সরাসরি অর্পণ করিয়া বলা হইয়াছে যে এ-ব্যাপারে কেন্দ্র যে-কোন আইন প্রণয়ন করিতে পারে (২৪৮ অনুচ্ছেদ)।

৪.৩. **আইন প্রণয়ন বিষয়ে কেন্দ্রীয় প্রাধান্য** : তালিকা তিনটি সম্পর্কে আইন প্রণয়নের ক্ষমতার উপরি-উক্ত বর্ণনা এবং অবশিষ্ট ক্ষমতা সম্পর্কে ব্যবস্থা হইতে কেন্দ্রীয় প্রাধান্য (Union Supremacy) সহজেই ধরা পড়ে। এই কেন্দ্রীয় প্রাধান্যকে সংক্ষেপে এইভাবে দেখানো যায় : (১) কোন বিষয় ইউনিয়ন ও রাজ্য—উভয় তালিকা-ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইলে, উহা সংসদের ক্ষমতাধীন বলিয়াই ধরা হয় এবং ঐ বিষয় সম্পর্কে রাজ্যের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা থাকে না। আবার কোন বিষয় ইউনিয়ন তালিকা ও যুগ্ম তালিকার মধ্যে পড়িলে ঐ বিষয়টি ইউনিয়ন তালিকায় অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। সুতরাং ঐ বিষয় সম্পর্কে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রাজ্যের থাকে না। (৩) কোন বিষয় যুগ্ম তালিকা এবং রাজ্য তালিকার মধ্যে পড়িলে বিষয়টিকে যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরিতে হইবে। ফলে ঐ বিষয় সম্পর্কে ইউনিয়ন সংসদও আইন প্রণয়ন করিতে সমর্থ।

৪.৪. **আদালতের ব্যাখ্যা—'প্রকৃত বিষয়বস্তুর নীতি'** : তবে আদালতের ব্যাখ্যা অনুসরণ করিয়া বলা যায় যে, তালিকাগুলির মধ্যে সহজেই অসংগতি আছে বলিয়া ধরিয়া লইয়া কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টের প্রাধান্য স্বীকার এবং রাজ্য আইনসভার ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ করা যায় না। যখনই কোন অসংগতির প্রশ্ন উঠিবে তখনই প্রথমে চেষ্টা করিতে হইবে তালিকাগুলির মধ্যে সংগতিসাধনের। এই উদ্দেশ্যে তালিকাগুলির একসংগে বিচার করিতে হইবে এবং একটি তালিকার ভাষা অপর তালিকার ভাষার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিতে হইবে। সংগতিসাধনের প্রচেষ্টায় যাহাকে বলা হয় **প্রকৃত বিষয়বস্তুর নীতি** ('the doctrine of pith and substance') তাহা প্রয়োগ করিতে হইবে।

এইরূপ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যদি একটি তালিকার সহিত অন্য তালিকার অসংগতির সামঞ্জস্যবিধান সম্ভব না হয় (irreconcilable conflict) তবে তখনই কেন্দ্রীয় আইনসভার (সংসদের) প্রাধান্য স্বীকার করিয়া সংশ্লিষ্ট বিষয়টিকে কেন্দ্রীয় আইনসভার অনন্য ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইবে।[১]

৪.৫. **যুগ্ম ক্ষমতার ক্ষেত্রে সংঘর্ষ** : পরিশেষে, যুগ্ম ক্ষমতার ক্ষেত্রে সংসদ প্রণীত আইনের সংগে কোন রাজ্যের আইনের সংঘর্ষ বাধিলে শেষোক্ত আইনের অসংগতি-পূর্ণ অংশটুকু যে বাতিল হইয়া যায়, তাহাকেও কেন্দ্রীয় প্রাধান্যের সূচক হিসাবে ধরা যাইতে পারে। অবশ্য বলা যাইতে পারে যে, অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রে অনুরূপ ব্যবস্থা

১. *State of Bombay v. Balsara (1951)*

রহিয়াছে। তবে **রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ** করিয়া রাজ্যের আইনের অসংগতিপূর্ণ অংশটুকু বলবৎ হইলেও সংসদের পক্ষে যে-কোন সময় উহার রদবদলের ক্ষমতা যে কেন্দ্রীয় প্রাধান্যের নির্দেশক, তাহা বোধ হয় সমালোচনার ঊর্ধ্বে।

৪.৬. **বিশেষ অবস্থায় রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয় সম্পর্কে সংসদের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা (Law-Making by Parliament on State Subjects under Certain Circumstances) :** সংসদের এই প্রাধান্য ব্যতীত কেন্দ্রীয় সরকার যে অন্যভাবেও রাজ্য আইনসভার এলাকায় প্রবেশ ও হস্তক্ষেপ করিতে সমর্থ, সে-সম্পর্কে পূর্বেই কিছুটা আলোচনা করা হইলেও সংক্ষেপে তাহার পুনরুল্লেখ করা যাইতে পারে। দেখা যায়, রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতাকে রাজ্যগুলির সম্পূর্ণ **নিজস্ব** বা **অনন্য** (exclusive) বলিয়া সংবিধানে বর্ণনা করা হইয়াছে। বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে **এই বর্ণনা ভুল** বলিয়াই মনে হইবে। রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয় সম্পর্কে সংসদ কতকগুলি অবস্থায় আইন প্রণয়ন করিতে সমর্থ।

ক। **রাজ্যসভার প্রস্তাবক্রমে রাজ্য তালিকার উপর কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ :** প্রথমত, সংবিধানে ২৪৯ অনুচ্ছেদে[১] ব্যবস্থা রহিয়াছে যে রাজ্যসভা যদি উপস্থিত ও ভোটপ্রদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে এই প্রস্তাব গ্রহণ করে যে, রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয় সম্পর্কে পার্লামেণ্ট কর্তৃক আইন প্রণয়ন **জাতীয় স্বার্থেই** প্রয়োজন (necessary or expedient in the national interest), তবে সংসদ ঐ বিষয় সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করিতে পারে। রাজ্যসভার এই ধরনের প্রস্তাবের **মেয়াদ** হইল **১ বৎসর** ; তবে রাজ্যসভা প্রস্তাব পাস করিয়া এক বৎসর করিয়া পূর্বের **প্রস্তাবের মেয়াদ বাড়াইয়া** লইতে পারে। যতদিন প্রস্তাবটি কার্যকর থাকে তাহার **ছয় মাস** অধিককাল পর্যন্ত সংসদের আইন বলবৎ থাকে। সাধারণত অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অংগরাজ্যের ক্ষমতার উপর এই ধরনের সরাসরি হস্তক্ষেপ দেখিতে পাওয়া যায় না।

ক.১. **কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের সপক্ষে যুক্তি :** জাতীয় স্বার্থে রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয় সম্পর্কে সংসদের আইন প্রণয়নের এই ক্ষমতার সপক্ষে বলা হয় যে, আভ্যন্তরীণ বিশৃংখলা ও বৈদেশিক আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিতে হইলে এবং অব্যাহতভাবে দেশের সর্বাংগীণ উন্নয়নসাধন করিতে হইলে কেন্দ্রীয় শক্তিকে শক্তিশালী করিতে হইবে। সুতরাং জাতীয় স্বার্থে রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ের উপর অনতিবিলম্বে কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের প্রয়োজন দেখা দিলে কেন্দ্রীয় সরকার যাহাতে উহা করিতে সমর্থ হয় তাহার ব্যবস্থা সংবিধানে রহিয়াছে। উপরন্তু, বলা হয় যে **এই কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ সাময়িক—স্থায়ী নয়**, এবং যেহেতু রাজ্যসভা অংগরাজ্যগুলির প্রতিনিধি লইয়া গঠিত সেই হেতু বলা যায় যে **অংগরাজ্যগুলির সম্মতিক্রমেই** সংসদ রাজ্য তালিকার উপর হস্তক্ষেপ করিয়া থাকে।

---

১ পাঞ্জাব ও অন্যান্য সীমান্ত রাজ্যের ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদটি প্রয়োগ ব্যাপারে ব্যাপারটি বিশেষ বিতর্কমূলক হইয়া উঠিয়াছে।

এই যুক্তি দুইটি খুব প্রবল বলিয়া মনে হয় না। প্রথমত, রাজ্যসভা একাধিক প্রস্তাবের সাহায্যে সংসদকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য ক্ষমতা প্রদান করিতে পারে। দ্বিতীয়ত, রাজ্যসভা রাজ্যগুলি হইতে সমপ্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে গঠিত হয় না—গঠিত হয় রাজ্যগুলির জনসংখ্যার ভিত্তিতে। সুতরাং প্রস্তাব পাস করার ব্যাপারে **বৃহৎ রাজ্যগুলির** ভোটাধিক্য ও **প্রাধান্য** থাকিবে এবং উহাদের ইচ্ছায় সংসদ রাজ্য এলাকায় প্রবেশ করিবার সুযোগ পাইবে।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে একথা বলা যায় যে, জাতীয় স্বার্থে হয়ত কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ সমীচীন, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক **এককভাবে ক্ষমতা বণ্টন-ব্যবস্থার পরিবর্তনের সহিত যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির সংগতি আছে বলিয়া মনে হয় না।**

খ। জরুরী অবস্থা প্রবর্তিত থাকাকালীন রাজ্য তালিকার উপর কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ: সংসদ কর্তৃক রাজ্য তালিকার উপর হস্তক্ষেপের দ্বিতীয় কারণ হইল জরুরী বা আপৎকালীন অবস্থার উদ্ভব। ২৫০ অনুচ্ছেদবলে যখন রাষ্ট্রপতির আপৎকালীন অবস্থার ঘোষণা চালু থাকে তখন সংসদ রাজ্য তালিকাভুক্ত যে-কোন বিষয় সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করিতে সমর্থ। এরূপ আইন যতদিন পর্যন্ত জরুরী অবস্থার ঘোষণা চলিতে থাকে তাহার **ছয় মাসের** অধিককাল পর্যন্ত বলবৎ থাকে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই ক্ষমতা হইতে সহজেই বুঝা যায় যে রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থার ঘোষণা করিলে **ভারতীয় সংবিধান এককেন্দ্রিক হইয়া দাঁড়াইবে**, কারণ সংসদ মাত্র ইউনিয়ন তালিকা ও যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কেই আইন করিবে না, রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত সকল বিষয়ই উহার আয়ত্তাধীন হইবে। সংসদের এই ক্ষমতা সম্পর্কে বলা হয় যে, যুদ্ধ, বহিরাক্রমণ বা আভ্যন্তরীণ গোলযোগের দরুন দেশ যখন সংকটের সম্মুখীন হয় তখন উহার নিরাপত্তা ও স্বার্থরক্ষার জন্য তড়িৎগতিতে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। সুতরাং জরুরী অবস্থা দেখা দিলে কেন্দ্রীয় সরকার যাহাতে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে সমর্থ হয় সেই উদ্দেশ্যে সংবিধানে জরুরী অবস্থা চলাকালীন সংসদকে রাজ্য তালিকা সম্পর্কে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

এই সম্পর্কে অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থা: অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রেও যুদ্ধের মত জরুরী অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা সম্প্রসারিত করা হয়। কিন্তু এ-বিষয়ে ভারত এবং অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে। ভারতীয় সংবিধানে যেমন কেন্দ্রীয় সরকার সরাসরি রাজ্যগুলির ক্ষমতা নিজের হস্তে তুলিয়া লইতে সমর্থ, অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রে তাহা সম্ভব নয়। সংকটাবস্থা দেখা দিলে **আদালত** কেন্দ্রীয় সরকারের আইন প্রণয়ন-ক্ষমতার ব্যাপক ব্যাখ্যা দিয়া কেন্দ্রীয় সরকারকে দেশের নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতা প্রদান করে। কেন্দ্রীয় সরকার কতদূর তাহার ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে তাহা নির্ধারণের ক্ষমতা আদালতের হস্তেই ন্যস্ত থাকে।

ভারতীয় সংবিধান অনুসারে **রাষ্ট্রপতি** (অর্থাৎ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রি-পরিষদ) যদি নিশ্চিত হন যে জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে বা অদূর ভবিষ্যতে উহার আশংকা আছে তাহা হইলেই তিনি জরুরী অবস্থার ঘোষণা করিতে পারেন। এ-সম্পর্কে আদালতের বিচারবিবেচনার কোন এক্তিয়ার নাই।

৪.৭. উক্ত দুই অবস্থায় সংসদ ও রাজ্য আইনের মধ্যে বিরোধের মীমাংসা: উপরি-উক্ত দুই অবস্থা—অর্থাৎ (ক) জাতীয় স্বার্থে সংসদ রাজ্য তালিকায়

হস্তক্ষেপ করিলে এবং (খ) আপৎকালীন অবস্থায়—সংসদের সংগে সংগে রাজ্য আইন-সভাগুলিও তাহাদের এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়সমূহ সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করিয়া চলিতে পারে। অন্যভাবে বলিতে গেলে, এই অবস্থায় রাজ্য আইনসভার আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অন্তর্হিত হয় না, কিন্তু ২৪৯ ও ২৫০ অনুচ্ছেদবলে সংসদ-প্রণীত আইনের সংগে কোন রাজ্যের আইনের সংঘর্ষ বাধিলে সংসদের সংশ্লিষ্ট আইন যতদিন বলবৎ থাকে রাজ্যের আইন ততদিন অকার্যকরই থাকে।[১]

গ। রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থার অচলাবস্থা ঘোষিত হইলে রাজ্য তালিকায় হস্তক্ষেপ : তৃতীয়ত, আপৎকালীন অবস্থা ছাড়া অন্য আর একভাবেও কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য তালিকার উপর হস্তক্ষেপ এবং অংগরাজ্যের স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ করিতে পারে। রাষ্ট্রপতি যদি কোন রাজ্যের রাজ্যপালের নিকট হইতে সংবাদ পাইয়া বা অন্যভাবে নিশ্চিত হন যে এমন অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে যাহার ফলে সংবিধানের বিধান অনুযায়ী ঐ রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালিত হওয়া সম্ভব নয়, তাহা হইলে তিনি শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থার ঘোষণা দ্বারা ঐ রাজ্যের শাসনভার নিজের হাতে তুলিয়া লইতে পারেন এবং রাজ্যের আইনসভার ক্ষমতা সংসদকে অর্পণ করিতে পারেন। এই ক্ষমতা যে যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির বিরোধী সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।[২]

ঘ। আন্তর্জাতিক চুক্তি-সন্ধি ইত্যাদির সর্ত পালনের জন্য রাজ্যের ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ : চতুর্থত, আন্তর্জাতিক চুক্তি-সন্ধি ইত্যাদি এবং আন্তর্জাতিক সভাসমিতি প্রভৃতিতে গৃহীত সিদ্ধান্তকে কার্যকর করিবার জন্য সংসদ ভারত বা ভারতের যে-কোন অংশের জন্য যে-কোন প্রকারের আইন প্রণয়ন করিবার অধিকারী (২৫৩ অনুচ্ছেদ)। অন্যভাবে বলা যায়, আন্তর্জাতিক চুক্তি-সন্ধি ইত্যাদির দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজন হইলে সংসদ রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত যে-কোন বিষয় সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করিতে সমর্থ। তবে আন্তর্জাতিক চুক্তি-সন্ধি ইত্যাদি কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে প্রণীত এই প্রকার আইন রাজ্য তালিকা ভিন্ন সংবিধানের অন্যান্য বিধানকে ক্ষুণ্ণ করিতে পারে না। যেমন, উপরি-উক্ত ক্ষমতাবলে সংসদ মৌলিক অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। আবার কেন্দ্রীয় সরকার ভারতের কোন অঞ্চল অন্য রাষ্ট্রের হস্তে সমর্পণ করিবার চুক্তি করিলে ঐ চুক্তিকে কার্যকর করার জন্য প্রয়োজন হয় সংবিধানের সংশোধন; সংবিধানের ২৫৩ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সংসদ আইন পাস করিয়া উহা করিতে পারে না।[৩]

চুক্তি-সন্ধি প্রভৃতি বৈদেশিক বিষয় সম্পর্কিত কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা সম্পর্কে বলা হয় যে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতীয় ইউনিয়নের **আন্তর্জাতিক সত্তা** (international personality) রহিয়াছে। সুতরাং আন্তর্জাতিক অধিকার ও দায়িত্ব হইল

১. **Article 251**

২. **Our Constitution-makers were emphatic on the fact that they are creating a federal constitution of some sort. If this is so, then article 356 is an unfederal one." Dr. K. V. Rao**

৩. **In re *Berubari Union* (1960)**

ইউনিয়নের। স্বাভাবিকভাবেই এই দায়িত্ব পালনের জন্য সকল ক্ষমতাই ইউনিয়ন বা কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে দিতে হইবে। প্রসংগত উল্লেখ করা যাইতে পারে যে মার্কিন **যুক্তরাষ্ট্র** ও **অস্ট্রেলিয়ার** আদালতের ব্যাখ্যা অনুসারে চুক্তি পালনের জন্য কেন্দ্রীয় আইনসভা অংগরাজ্যের ক্ষমতাভুক্ত বিষয়ের উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারে।

৬। রাজ্যের অনুরোধক্রমে পার্লামেণ্ট কর্তৃক রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয় সম্পর্কে আইন প্রণয়ন: পরিশেষে, সংবিধানের ২৫২ **অনুচ্ছেদে** বলা হইয়াছে যে দুই বা ততোধিক রাজ্যের আইনসভা যদি মনে করে রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত এবং ঐ মর্মে উহারা যদি প্রস্তাব পাস করে তাহা হইলে রাজ্যের অধিকারভুক্ত ঐ বিষয় সম্পর্কে সংসদ আইন পাস করিতে সমর্থ হয়।

প্রযোজ্যতা: যে-সকল রাজ্য প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া সংসদকে আইন করার এরূপ ক্ষমতা দেয়, তাহাদের ক্ষেত্রেই সংসদের এই আইন প্রযোজ্য হয়।

সংসদ ব্যতীত সংশ্লিষ্ট কোন রাজ্য এরূপ আইনের রদবদল করিতে সমর্থ নহে।

৪.৮. উপসংহার: সুতরাং দেখা যাইতেছে, রাজ্যের অনুরোধক্রমে সংসদ একবার রাজ্য তালিকাভুক্ত কোন বিষয় অধিকার করিয়া লইলে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির ঐ বিষয় সম্পর্কে কোন ক্ষমতা থাকে না। ইহার দ্বারা সংবিধানের কেন্দ্রপ্রবণতাই সূচিত হয়।

৫. শাসন বিভাগীয় ক্ষমতার বণ্টন এবং ইউনিয়ন ও অংগরাজ্যসমূহের মধ্যে প্রশাসনিক সম্পর্ক: (Distribution of Executive Powers and Administrative Relations between the Union and the States)

কেন্দ্র ও অংগরাজ্যসমূহের মধ্যে প্রশাসনের দিক দিয়াও সম্বন্ধ নির্ধারণ যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম সমস্যা। বস্তুত, সংবিধান দ্বারা ক্ষমতা বণ্টনের ফলেই এই সমস্যার উদ্ভব হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান আইন প্রণয়নসংক্রান্ত ক্ষমতার বণ্টন করিয়া কেন্দ্র ও অংগরাজ্যগুলিকে পরস্পর হইতে পৃথক রাখিতে চেষ্টা করে এবং এই সংগে দুই সরকারের মধ্যে শাসনক্ষমতাও বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। সাধারণত যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রের শাসনক্ষমতা সেই সকল বিষয় সম্পর্কেই থাকে যে-সকল বিষয়ের উপর কেন্দ্র আইন প্রণয়ন করিতে সমর্থ, আর যে-সকল বিষয়ের উপর অংগরাজ্যগুলি আইন প্রণয়ন করিবার অধিকারী সেই সকল বিষয় সম্পর্কেই অংগরাজ্যগুলি শাসনক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে। কিন্তু এইভাবে কেন্দ্র ও অংগরাজ্যগুলির এক্তিয়ার পৃথক করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইলেও তাহাদের পক্ষে পৃথক থাকা সম্ভব নহে এবং **সংবিধান দ্বারাই আবার তাহাদের মধ্যে সহযোগিতার সূত্র রচনার ব্যবস্থা করিতে হয়।**

এই সহযোগিতার সূত্র হইল শাসনকার্য প্রশাসনিক দিক দিয়া।

সহযোগিতা ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা: প্রসংগত স্মর্তব্য যে, সুশাসনের জন্য বিভিন্ন সরকারের মধ্যে সহযোগিতা এবং উহাদের কার্যের মধ্যে সমন্বয়ের

প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করার ফলে যদি অংগরাজ্যের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তিত হয় তাহা হইলে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার স্বরূপ বজায় থাকে না। ভারতীয় সংবিধানে ইহাই ঘটিয়াছে। সহযোগিতা ও সমন্বয়ের অজুহাতে অংগরাজ্যগুলির উপর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ এমন ব্যাপকভাবে প্রবর্তিত করা হইয়াছে যে যাহার ফলে রাজ্যগুলি প্রকৃতপক্ষে **এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের আঞ্চলিক শাসন বিভাগে** (administrative divisions) পরিণত হইয়াছে।

৫.১. **কেন্দ্র ও অংগরাজ্যের মধ্যে শাসনক্ষমতার বণ্টন** : শাসন বিভাগীয় ক্ষমতা বণ্টন এবং ইউনিয়ন ও অংগরাজ্যগুলির মধ্যে প্রশাসনিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারতীয় সংবিধানের প্রকৃতি কি তাহার আলোচনা এখন করা যাইতে পারে। প্রথমেই কেন্দ্র এবং অংগরাজ্যগুলির প্রশাসনিক ক্ষমতা কি হইবে না-হইবে তাহা সুস্পষ্টভাবে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। সংবিধানে বলা হইয়াছে : সংসদ যে-সকল বিষয়ের উপর আইন প্রণয়ন করিতে সমর্থ সেই সকল বিষয় সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসনিক ক্ষমতা থাকিবে। ইহা ছাড়া **চুক্তি বা সন্ধির ব্যাপারে** ভারত সরকারের যে-সকল অধিকার ও ক্ষমতা থাকে সেই সকল বিষয়েও কেন্দ্রীয় সরকার প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে (৭৩ অনুচ্ছেদ)। অপরদিকে যে-সকল বিষয় সম্পর্কে রাজ্যগুলির আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রহিয়াছে সেই সকল বিষয়ের ক্ষেত্রেই রাজ্যগুলির প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রযুক্ত হইবে। (১৬২ অনুচ্ছেদ)।

যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়ের প্রশ্ন : এখন প্রশ্ন, যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়গুলির ক্ষেত্রে কোন্ সরকার প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে ? কারণ, যুগ্ম বিষয়গুলি সম্পর্কে কেন্দ্র এবং রাজ্যসমূহ—উভয়েরই আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রহিয়াছে

সংবিধানের নির্দেশ হইল যে সাধারণত যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রশাসনিক ক্ষমতা রাজ্যগুলির হস্তেই থাকিবে, তবে সংসদ আইন করিয়া বিশেষ ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত করিতে পারে। ইহা ব্যতীত যে-সকল ক্ষেত্রে সংবিধান কেন্দ্রের হস্তে স্পষ্টই প্রশাসনিক ক্ষমতা ন্যস্ত করিয়াছে সেই সকল ক্ষেত্রেও রাজ্যের প্রশাসনিক ক্ষমতা থাকিবে না।

৫.২. **অধস্তন সহযোগিতা** : প্রশাসনিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাজ্যগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি অনুযায়ী যাহাতে কার্য করে তাহার জন্য কেন্দ্রের হস্তে এমন **ব্যাপক নিয়ন্ত্রণক্ষমতা** ন্যস্ত করা হইয়াছে যাহা অন্য কোন যুক্তরাষ্ট্রে দেখা যায় না।

বস্তুত, সংবিধানে অংগরাজ্যগুলিকে আদেশনির্দেশ দিবার যে ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারকে দেওয়া হইয়াছে তাহা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে। মাত্র যে জরুরী অবস্থায় ভারতীয় রাষ্ট্র এককেন্দ্রিক রূপ ধারণ করিতে পারে তাহা নহে, স্বাভাবিক অবস্থাতেও কেন্দ্রীয় সরকার আদেশনির্দেশের মাধ্যমে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করিতে সমর্থ।

কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নির্দেশ প্রদান সম্পর্কে ভারতীয় সংবিধানে যে অনুচ্ছেদগুলি

সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহাতে **প্রথমেই** বলা হইয়াছে যে, রাজ্যের শাসনক্ষমতা (Executive Power) এমনভাবে পরিচালিত হইবে যাহাতে সংসদ-প্রণীত বা অন্যান্য প্রচলিত আইনসমূহের সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য বজায় থাকে ; এবং এই দিক দিয়া প্রয়োজন হইলে কেন্দ্র রাজ্য সরকারকে যে-কোন নির্দেশ প্রেরণ করিতে পারে (২৫৬ অনুচ্ছেদ)। দ্বিতীয়ত, রাজ্য সরকারের শাসনক্ষমতা এমনভাবে পরিচালিত হইবে যেন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসনকার্যে কোন ব্যাঘাত না ঘটে। এই উদ্দেশ্যেও প্রয়োজন হইলে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলির প্রতি নির্দেশ প্রেরণ করিতে পারে [২৫৭ (১) অনুচ্ছেদ]।

প্রশাসনিক সম্পর্কের এই দ্বিতীয় ব্যবস্থাটি ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ১২৬ ধারা অনুকরণ করিয়াই রচিত হইয়াছে। **প্রথমটির** ন্যায় ইহারও উদ্দেশ্য হইল অংগরাজ্যগুলিকে **অধস্তন সহযোগিতার** (subordinate co-operation) **বন্ধনে** আবদ্ধ করা। ভারতীয় সংবিধানের ৩৬৫ অনুচ্ছেদে পরিষ্কারভাবেই বলা আছে যে, কোন অংগরাজ্য কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অমান্য করিলে রাষ্ট্রপতি ঐ রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা ঘোষণা করিতে পারেন।

৫.৩. **অধস্তন সহযোগিতার অন্যান্য প্রকাশ** : এই অধস্তন সহযোগিতার ব্যবস্থা আরও নানাভাবে করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগ নিম্নলিখিত বিষয়েও রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দান করিতে পারে

(ক) জাতীয় স্বার্থ বা সামরিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত এইরূপ যোগাযোগ-ব্যবস্থা সংরক্ষণের জন্য,

(খ) রাজ্যের অভ্যন্তরে রেলপথের সংরক্ষণের জন্য

এই সকল নির্দেশ পালনের জন্য রাজ্য সরকারের যদি কোন **অতিরিক্ত ব্যয়** হয় তাহা অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকার বহন করিবে।

৬. ওয়েমার শাসনতন্ত্র অনুসরণ করিয়া আর একটি ব্যবস্থা : একরূপ জার্মেনীর ভূতপূর্ব ওয়েমার সংবিধানকে (Weimer Constitution) অনুসরণ করিয়া শাসনকার্য পরিচালন ব্যাপারে কেন্দ্র ও অংগরাজ্যগুলির মধ্যে সহযোগিতার আর একটি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। ইহা হইল, কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনার জন্য কতকগুলি **নিজস্ব কার্যভার** রাজ্য সরকার অথবা রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের উপর অর্পণ করিতে পারে অবশ্য এই প্রকার কর্তব্যভার অর্পণ বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের সম্মতি পূর্বেই গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু সংসদ-প্রণীত কোন আইন যদি কোন রাজ্য সম্পর্কে প্রযোজ্য হয় তবে বিষয়টি রাজ্যের আইনসভার এলাকা-বহির্ভূত হইলেও এই আইন দ্বারা সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার অথবা রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের উপর কর্তব্যভার ন্যস্ত করা যায় বা কর্তব্যভার ন্যস্ত করিবার ক্ষমতা অর্জন করা যায়। তবে এই সম্পর্কে রাজ্য সরকারের কোন অতিরিক্ত ব্যয় হইলে তাহা কেন্দ্রকে বহন করিতে হইবে। অপরপক্ষে, কোন রাজ্যের রাজ্যপাল কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতিক্রমে কেন্দ্রীয় সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের হস্তে রাজ্যের প্রশাসন-সংক্রান্ত কোন কোন কর্তব্যভার অর্পণ করিতে পারেন।

ইহা ব্যতীত আন্তঃরাজ্য নদী এবং নদী-উপত্যকাগুলি সম্বন্ধে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে বিবাদবিসংবাদের মীমাংসাকল্পে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সংসদের আছে। এই ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতেরই থাকা উচিত। কিন্তু সংবিধানে ইহাও সুস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে, আইন প্রণয়ন দ্বারা সংসদ, সুপ্রীম কোর্ট বা অন্য কোন আদালতের এই বিষয়ে বিচারক্ষমতা ব্যবহারের পথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ করিতে পারে।

৭. **আন্তঃরাজ্য পরিষদ (Inter-State Council) :** বিভিন্ন রাজ্যের শাসনকার্যের মধ্যে সংহতিসাধনের ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। রাষ্ট্রপতি প্রয়োজনীয় মনে করিলে এই উদ্দেশ্যে একটি আন্তঃরাজ্য পরিষদ (Inter-State Council) গঠন করিতে পারেন। এরূপ পরিষদ বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে বিরোধের কারণ অনুসন্ধান করিবে, তাহাদের সাধারণ স্বার্থ বিশ্লেষণ করিবে এবং সংহতিসাধনের পন্থাসমূহ নির্দেশ করিয়া গ্রহণের জন্য সুপারিশ করিবে।

অন্তঃরাজ্য পরিষদ এখনও গঠিত হয় নাই—কাগজেকলমেই লিপিবদ্ধ হইয়া আছে।[১]

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে এই ধারণা সহজেই করা যাইবে যে, প্রশাসনিক সম্পর্কের ধারাগুলি কেন্দ্রীকরণের উদ্দেশ্যসাধন করিবার জন্যই বিশেষভাবে রচিত হইয়াছে।

"However much one may deny powers to the Centre, it is difficult to prevent the Centre from becoming strong. Conditions in modern world are such that centralisation of powers is inevitable."

Ambedkar

স্মর্তব্য

১. যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্র ও অংগরাজ্যসমূহের মধ্যে সম্পর্কের প্রশ্ন উঠে সংবিধান দ্বারা ক্ষমতা বণ্টনের জন্য।

২. আইন প্রণয়নের ক্ষমতা বণ্টন পদ্ধতি মোটামুটি দুই প্রকারের :

(ক) মার্কিন বা অস্ট্রেলীয় ধরনের এবং (খ) ক্যানাডীয় ধরনের।

৩. এ-ব্যাপারে ভারতীয় সংবিধান এই দুই-এর মিশ্র পদ্ধতিই অবলম্বন করিয়াছে।

৪. তবে কেন্দ্রকে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে।

৫. অবশিষ্ট—অর্থাৎ তালিকাভুক্ত নহে এরূপ সকল ক্ষমতাই কেন্দ্রের।

৬. যুগ্ম বিষয়ে কেন্দ্র-প্রণীত আইনের সংগে রাজ্যের আইনের সংঘর্ষ বাধিলে কেন্দ্রীয় আইনই বলবৎ হয়।

৭. শাসনক্ষমতার বণ্টন ব্যাপারে রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রের সহিত একরূপ অধস্তন সহযোগিতার সূত্রে আবদ্ধ করা হইয়াছে।

১. **N. A. Palkhivala :** ***Redesigning India for the Twentieth Century***

অনুশীলনী

1. Describe the scheme of Division of Powers between the Union and the States in India. (C. U. 1972)

[ভারতে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতাবণ্টন-ব্যবস্থা বর্ণনা কর।] (৫৭-৬১ পৃষ্ঠা)

2. Describe and comment on the legislative relationship between the Union on the one hand and the States on the other. (C. U. 1965)

[ভারতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে আইন প্রণয়নসংক্রান্ত সম্বন্ধের বর্ণনা করিয়া উহার উপর মন্তব্য প্রকাশ কর।

[ইংগিত : ৫৭-৬১ পৃষ্ঠা এবং ইহার উপর ৬১-৬৫ পৃষ্ঠা হইতে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে পার্লামেণ্ট রাজ্য তালিকার হস্তক্ষেপ করিতে পারে তাহার উল্লেখ করিলে উত্তর পূর্ণাংগ হয়। উত্তরের কাঠামোর জন্য বিশেষ অনুশীলনী দেখ।]

3. Under what circumstances is Parliament enabled to make laws on State subjects ?

[কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে পার্লামেণ্ট রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ের উপর আইন প্রণয়ন করিতে সমর্থ ?]

(৬১-৬৫ পৃষ্ঠা)

4. Explain the administrative relations between the Union and the States under the Indian Constitution. (1970, '74, '85 : B. U. 1985)

[ভারতীয় সংবিধানে ইউনিয়ন সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে শাসনকার্য পরিচালনাসংক্রান্ত বা প্রশাসনিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর।] (৬৫-৬৮ পৃষ্ঠা)

5. Indicate which law shall prevail in case of a conflict between a Union law and a State law on any Concurrent subject. (C. U. 1982)

[যুগ্ম তালিকাভুক্ত কোন বিষয় সম্পর্কে কেন্দ্রীয় আইন ও রাজ্য আইন পরস্পর বিরোধী হইলে কোন আইন বলবৎ হইবে ?] (৬০-৬১ পৃষ্ঠা)

৬ ইউনিয়ন ও রাজ্যগুলির মধ্যে রাজস্বসংক্রান্ত ক্ষমতার বণ্টন
(DISTRIBUTION OF FINANCIAL POWERS BETWEEN THE UNION AND THE STATES)

"It is as necessary that the state governments, should be able to command the means of supplying their wants, as the national governmnet should possess the like faculty in respect to the wants of the union." The Federalist

১. যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজস্ব-ব্যবস্থার কয়েকটি সাধারণ নীতি (General Principles of Federal Finance) : যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে কেন্দ্র ও অংগরাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতা এমনভাবে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয় যাহাতে নিজ নিজ ক্ষেত্রে একে অপরের নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত থাকে। অর্থাৎ, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্র এবং অংগরাজ্য—উভয়ই নিজ নিজ এলাকায় হইল স্বতন্ত্র। এই স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে হইলে উভয় সরকারের নিজ নিজ কর্তব্য পালনের জন্য **পর্যাপ্ত আয়ের ব্যবস্থা** এবং ঐ **আয়ের উপর সংশ্লিষ্ট সরকারের স্বাধীন নিয়ন্ত্রণক্ষমতা** থাকা চাই। যেখানে আঞ্চলিক সরকারগুলিকে অর্থের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হাত পাতিতে হয় সেখানেই কেন্দ্রীয় সরকার অংগরাজ্যগুলির আর্থিক রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে প্রয়াস পায়। অতএব, সমস্যা সমাধানের উপায় হইল দায়িত্ব পালনের পক্ষে পর্যাপ্ত হয় এমনভাবে প্রত্যেক সরকারের জন্য রাজস্বপ্রাপ্তির পৃথক সূত্র নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া। কিন্তু এইভাবে রাজস্ব-প্রাপ্তির সূত্র ও কর্তব্যের মধ্যে সমতা ও সামঞ্জস্য বিধান করা বাস্তব ক্ষেত্রে অসম্ভব। ইহা ব্যতীত প্রশাসনিক সুবিধার (administrative expediency) প্রশ্নও রহিয়াছে। যাহাতে সাধারণ করদাতার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ না হয়, যাহাতে কর আদায়ে ব্যয়সংক্ষেপ হয় এবং যাহাতে করধার্যে সমতা রক্ষিত হয় তাহার জন্য আয়করের মত কতকগুলি কর আদায়ের ভার দেওয়া হয় কেন্দ্রীয় সরকারের উপর। কিন্তু কর হইতে প্রাপ্ত অর্থ হয় দুই সরকারের মধ্যে বণ্টিত হয়, না-হয় উহাকে আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়।

স্বাতন্ত্র্যনীতির সহিত পর্যাপ্তি ও প্রশাসনিক সুবিধার নীতির সামঞ্জস্যবিধান : সুতরাং দেখা যাইতেছে, যুক্তরাষ্ট্রীয় আয়ব্যয়-ব্যবস্থার মৌল নীতি হইল তিনটি : (১) স্বাতন্ত্র্য, (২) পর্যাপ্তি ও (৩) প্রশাসনিক সুবিধা। এবং পর্যাপ্তি (adequacy) এবং প্রশাসনিক সুবিধার (administrative expediency)

স্বার্থে যুক্তরাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্যনীতিকে (principle of independence) কতকটা ক্ষুন্ন করিয়া চলিতে হয়।

অনুদান-ব্যবস্থা : অতএব, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় যাহা করা হয় তাহা হইল এইরূপ : (১) রাজস্বপ্রাপ্তির কতকগুলি সূত্রকে দুই সরকারের মধ্যে পৃথকভাবে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। (২) কতকগুলি সূত্রকে যুগ্ম কর্তৃত্বাধীন রাখা হয়। (৩) ইহা ছাড়া রাজস্ব ভাগাভাগি এবং অর্থসাহায্যের (grants) ব্যবস্থাও করা হয়। অবশ্য এইরূপ বন্দোবস্ত করার সময় যুক্তরাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্যনীতিকে যতদূর সম্ভব অক্ষুন্ন রাখিবার চেষ্টা করা প্রয়োজন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, অর্থসাহায্যের (grants) কথা উল্লেখ করা যায়। ক্যানাডা সুইজারল্যাণ্ড অস্ট্রেলিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি প্রায় **সকল যুক্তরাষ্ট্রেই কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক আঞ্চলিক সরকারগুলিকে অনুদানের (grants) ব্যবস্থা রহিয়াছে।**

যেক্ষেত্রে এই অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক (obligatory) নয়—কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, সেখানে আঞ্চলিক সরকারের স্বাতন্ত্র্য ক্ষুন্ন হইবার যথেষ্ট আশংকা থাকে।[১]

২. ভারতীয় সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজস্ব-ব্যবস্থা (Federal Finance under the Constitution of India):

যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজস্ব-ব্যবস্থায় সাধারণ নীতির আলোচনার পর দেখা যাক বর্তমান ভারতীয় সংবিধানের বণ্টন-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য কি। ভারতের বর্তমান সংবিধান ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ব্যবস্থাকেই মোটামুটিভাবে বজায় রাখিয়াছে।

২.১. রাজস্বসংক্রান্ত ক্ষমতার তালিকা : রাজস্বসংক্রান্ত বিষয়গুলিকে **ইউনিয়ন** (কেন্দ্রীয়) **তালিকা** (Union List) এবং **রাজ্য তালিকার** (State List) অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। ইউনিয়ন তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে করধার্যের জন্য আইন প্রণয়নক্ষমতা হইল সংসদের, আর রাজ্যের করধার্যের ক্ষমতাসমূহ রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। রাজস্বসংক্রান্ত অবশিষ্ট ক্ষমতা (residuary powers) কেন্দ্রের হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে। কিন্তু এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, সকল সময় যে-সরকার করধার্য করে সেই সরকারই উহা হইতে যে-রাজস্ব আদায় হয় তাহা ভোগ করে না। যেমন, ইউনিয়ন তালিকার অন্তর্ভুক্ত স্ট্যাম্পকর এবং ঔষধপত্র ও প্রসাধনসামগ্রীর উপর উৎপাদন-শুল্ক সম্পর্কে করধার্যের ক্ষমতা হইল কেন্দ্রের, কিন্তু ইহা হইতে যে রাজস্ব আসে তাহা যে রাজ্যগুলি হইতে আদায় করা হয় তাহারা ভোগ করে। এখন সংক্ষেপে রাজস্ব বণ্টন-ব্যবস্থার বর্ণনা করা যাইতে পারে।

ক। কেন্দ্রীয় রাজস্বের অনন্য সূত্র : প্রথমতঃ কতকগুলি কর-রাজস্ব আছে যাহা কেন্দ্র ধার্য, সংগ্রহ ও অনন্যভাবে (exclusively) ভোগ করে। এই ধরনের

---

১. **"Grants, if they are to rank as independent sources of revenue, must not depend, of course, upon the good will of the contributing government." K. C. Wheare**

রাজস্বের মধ্যে আছে **বাণিজ্য-শুল্ক, কোম্পানী আয়কর** (Corporation Tax), ব্যক্তিসমূহের পরিসম্পদের মূলধন-মূল্যের উপর কর (সংক্ষেপে সম্পদকর), ইত্যাদি।

খ। **রাজ্যের রাজস্বপ্রাপ্তির সূত্র**: দ্বিতীয়ত, কতকগুলি কর-রাজস্ব আছে যাহা রাজ্যগুলি অনন্যভাবে ভোগ করে। এই ধরনের রাজস্বপ্রাপ্তির প্রধান সূত্রগুলি হইল **ভূমিরাজস্ব, কৃষিআয়ের উপর কর, কৃষিজমির উপর উত্তরাধিকার কর,** কৃষিজমি সম্পর্কিত সম্পত্তিকর (Estate Duty), জমিবাড়ির উপর কর, খনিজ অধিকারসমূহের উপর কর, রাজ্যে নির্মিত বা উৎপাদিত কয়েকটি দ্রব্যের উপর অন্তঃশুল্ক (Excise Duties) এবং অনুরূপ দ্রব্যসমূহ ভারতের অন্যত্র নির্মিত বা উৎপাদিত হইলে উহাদের উপর প্রতিশুল্ক—যথা, মানুষের উপভোগার্থ কোহল পানীয় এবং অহিফেন গঞ্জিকা ও অন্যান্য নিদ্রাবহ পদার্থ; কোন স্থানীয় অঞ্চলে দ্রব্য প্রবেশের উপর কর, বিদ্যুৎ-কর, সংবাদপত্র ভিন্ন অন্যান্য দ্রব্যের ক্রয় বা বিক্রয়ের উপর কর; সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন ভিন্ন অন্যান্য বিজ্ঞাপনের উপর কর, রাজপথ বা অন্তর্দেশীয় জলপথে বাহিত দ্রব্য ও যাত্রীদের উপর কর, রাজপথে ব্যবহারযোগ্য যানবাহনের উপর কর, পশু ও নৌকার উপর কর; পথকর (tolls); বৃত্তি ব্যবসায় পেশা ও চাকরির উপর কর, বিলাস-দ্রব্যের উপর কর (আমোদপ্রমোদ পণক্রীড়া ও জুয়াখেলার উপর কর ইহার অন্তর্ভুক্ত)।

২.২. **রাজ্যের করধার্যের উপর বাধানিষেধ**: রাজ্যের অধিকারভুক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে করধার্যের ক্ষমতার উপর আবার কতগুলি বাধানিষেধ রহিয়াছে: (ক) বৃত্তি ব্যবসায় পেশা ও চাকরির উপর রাজ্যের-করধার্যের অধিকার থাকিলেও করের পরিমাণ কোন এক ব্যক্তির ক্ষেত্রে **বৎসরে ২৫০ টাকার উপর হইতে পারিবে না**। (খ) রাজ্যের বাহিরে বা আমদানি-রপ্তানির উদ্দেশ্যে ক্রয়বিক্রয়ের উপর কোন রাজ্য বিক্রয়কর ধার্য করিতে পারে না। (গ) সংবাদপত্র ভিন্ন যে-সকল দ্রব্য আন্তঃরাজ্য ব্যবসাবাণিজ্য-ব্যপদেশে বিক্রয় হয় তাহার উপর কর ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা হইল কেন্দ্রীয় সরকারের। এমনকি যে-সকল দ্রব্যকে সংসদ আইন দ্বারা আন্তঃরাজ্য বাণিজ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া ঘোষণা করে তাহাদের ক্ষেত্রে কোন বিক্রয়কর ধার্য করিতে হইলে রাজ্যসমূহকে সংসদ কর্তৃক নির্দিষ্ট বাধানিষেধ মানিয়া চলিতে হয়। (ঘ) যে-ক্ষেত্রে ভারত সরকার বিদ্যুৎ ব্যবহার করে অথবা যে-ক্ষেত্রে কোন রেলপথের জন্য বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয় সে-ক্ষেত্রে সংসদের অনুমোদন ছাড়া রাজ্য সরকার কোন বিদ্যুৎ-কর বসাইতে পারে না।

২.৩. **ঋণসংগ্রহের সীমাবদ্ধ ক্ষমতা**: করধার্য ছাড়া ঋণ করার ব্যাপারেও রাজ্যের ক্ষমতার উপর বাধানিষেধ রহিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার অনিয়ন্ত্রিতভাবে ভারত এবং ভারতের বাহির হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে সমর্থ, কিন্তু কোন রাজ্য সরকার ভারতের বাহির হইতে ঋণ সংগ্রহ করিতে পারে না। আভ্যন্তরীণ ঋণের ক্ষেত্রেও রাজ্যগুলিকে বাধানিষেধ মানিয়া চলিতে হয়। যেমন, ভারত সরকার রাজ্যগুলিকে ঋণ দিয়া থাকিলে ঐ ঋণ পরিশোধ না

হওয়া পর্যন্ত ভারত সরকারের অনুমতি ব্যতীত রাজ্য সরকার নূতন ঋণ করিতে সমর্থ হয় না।

গ। **ইউনিয়ন কর্তৃক ধার্য কিন্তু রাজ্য কর্তৃক সংগৃহীত ও ভোগ্য কর :** রাজ্যগুলির আর্থিক সম্বল তাহাদের দায়িত্ব পালনের পক্ষে যে পর্যাপ্ত হইবে না তাহা বুঝিয়াই ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অনুসরণে বর্তমান সংবিধানেও পর্যাপ্তি ও প্রশাসনিক সুবিধার স্বার্থে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি করা হইয়াছে : (১) কতকগুলি শুল্ক আছে যাহা **কেন্দ্র ধার্য করে** কিন্তু উহা **সংগ্রহ** ও **ভোগ করে রাজ্যসমূহ।** ইউনিয়ন তালিকার অন্তর্ভুক্ত স্ট্যাম্পকর এবং ঔষধপত্র ও প্রসাধনসামগ্রীর উপর অন্তঃশুল্ক এই পর্যায়ে পড়ে। (২) অ-কৃষি সম্পত্তির উপর উত্তরাধিকার কর ও সম্পত্তিকর, সীমাকর (terminal taxes), রেলপথে যাত্রীরা এবং বস্তুর ভাড়ার উপর কর প্রভৃতি কতকগুলি কর আছে যাহা কেন্দ্র ধার্য ও সংগ্রহ করে, কিন্তু সংগৃহীত রাজস্ব রাজ্যসমূহকে সমর্পণ করা হয়। (৩) কৃষি-আয় ব্যতীত অন্যান্য আয়ের উপর কর ভারত সরকার কর্তৃক ধার্য ও সংগৃহীত হয় কিন্তু উহা কেন্দ্র ও রাজ্যসমূহের মধ্যে বণ্টিত (বর্তমানে ৮৫ শতাংশ) হয়। স্মর্তব্য যে **কোম্পানী আয়কর** (Corporation Tax) **বণ্টিত হয় না।**

ঘ। **ইউনিয়ন কর্তৃক ধার্য ও সংগৃহীত কিন্তু রাজ্যের মধ্যে বণ্টিত কর :** ইহা ছাড়া ইউনিয়ন (কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলসমূহ (Union Territories) হইতে সংগৃহীত আয়কর এবং কেন্দ্রীয় সরকার-প্রদত্ত বেতনাদির উপর দেয় করও বণ্টনযোগ্য আয়করের মধ্যে পড়ে। এই সকল কর বাবদ সংগৃহীত অর্থ বাদ দিয়া প্রতি আর্থিক বৎসরে আয়কর হইতে যে নীট অর্থ পাওয়া যায় তাহার একটা অংশ রাজ্যসমূহের মধ্যে নির্দিষ্ট হারে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়।

ঙ। **ইউনিয়ন ও রাজ্যের মধ্যে বণ্টিত কর :** মোট আয়করের শতকরা কত ভাগ রাজ্যগুলি পাইবে এবং রাজ্যগুলির মোট অংশ কিভাবে বণ্টিত হইবে তাহা রাষ্ট্রপতি—অর্থাৎ কার্যক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার—অর্থ কমিশনের (Finance Commission) সুপারিশ অনুসারে নির্ধারণ করিয়া থাকেন। সুতরাং আয়কর হইতে রাজ্যের আয় অনেকাংশে কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনার উপর নির্ভর করে। (৪) কেন্দ্রীয় উৎপাদনশুল্ক (ঔষধপত্র ও প্রসাধনসামগ্রীর উপর উৎপাদনশুল্ক ব্যতীত) ধার্য ও আদায় করে কেন্দ্রীয় সরকার কিন্তু কেন্দ্র উহা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতে পারে। বর্তমানে ৪০ শতাংশ রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টিত হয়।

চ। **অনুদান-ব্যবস্থা :** পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সকল যুক্তরাষ্ট্রেই কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক আঞ্চলিক সরকারগুলিকে অর্থসাহায্য করার ব্যবস্থা থাকে (৭১ পৃষ্ঠা)। ভারতীয় সংবিধানেও অনুরূপ ব্যবস্থা রহিয়াছে। এই অর্থসাহায্য দুই প্রকারের : (ক) নির্দিষ্ট অর্থসাহায্য (specific grants) এবং (খ) সাধারণ অর্থসাহায্য (general grants)। নির্দিষ্ট অর্থসাহায্য সম্পর্কে সংবিধানের ব্যবস্থা হইল যে, প্রতি বৎসর পাট বা পাটজাত দ্রব্যের উপর রপ্তানি-শুল্ক হইতে আসাম বিহার উড়িষ্যা এবং পশ্চিমবংগ রাজ্যকে অংশ সমর্পণের পরিবর্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থসাহায্য করা হয়। যতদিন পর্যন্ত পাট বা

পাটজাত শিল্পের উপর শুল্ক ধার্য ছিল ততদিন পর্যন্ত এই অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা চালু ছিল; তবে দশ বৎসরের অধিককাল—অর্থাৎ ১৯৬০-৬১ সালের পর ঐ ব্যবস্থা রহিতকরা হইয়াছে।

অর্থ কমিশনের সুপারিশ বিচারবিবেচনার পর রাষ্ট্রপতি অর্থসাহায্যের পরিমাণ নির্ধারণ করেন।[১] নির্দিষ্ট ধরনের অর্থসাহায্য করিবার অন্যান্য ব্যবস্থা আছে। **তপশীলী উপজাতি** (Scheduled Tribes) ও **তপশীলভুক্ত অঞ্চলের** শাসন-ব্যবস্থার উন্নয়নসাধনের জন্য গৃহীত পরিকল্পনার ব্যয় মিটাইবার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট রাজ্যকে অর্থসাহায্য করা যাইতে পারে, তবে এইরূপ পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন।

সাধারণ অনুদান: সাধারণ অর্থসাহায্য সম্পর্কে সংবিধানে বলা হইয়াছে যে, সংসদ যে-সকল রাজ্যের সাহায্যের প্রয়োজন আছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবে সেই সকল রাজ্যকে সংসদ কর্তৃক নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থসাহায্য করা হইবে এবং ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ অর্থ নির্দিষ্ট হইতে পারে।

ভারতীয় সংবিধানে রাজস্ব বণ্টন সংক্রান্ত উপরের আলোচনা হইতে বুঝা যায় যে, কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সামর্থ্য ও সংগতিই অধিক এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে শক্তিশালী করিবার সকল ব্যবস্থাই করা হইয়াছে। স্বতই রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর অর্থের জন্য নির্ভরশীল হইতে হইবে।

---

৩. অর্থ কমিশন ও পরিকল্পনা কমিশন (The Finance Commission and The Planning Commission):

ইউনিয়ন ও রাজ্যগুলির মধ্যে রাজস্ব সংক্রান্ত ক্ষমতা-বণ্টন এবং রাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্যের ক্ষেত্রে অর্থকমিশন ও পরিকল্পনা কমিশনের ভূমিকা কি তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে।

৩.১. অর্থ কমিশন: অর্থ কমিশনের গঠন ও কার্য সম্পর্কে সংবিধানে (২৮০ অনুচ্ছেদ) নির্দেশ রহিয়াছে যে রাষ্ট্রপতি প্রথমে সংবিধান চালু হওয়ার দুই বৎসরের মধ্যে অর্থ কমিশন গঠন করিবেন। ইহার পর **৫ বৎসর** অন্তর অথবা তৎপূর্বেই অর্থ কমিশন গঠন করিতে হইবে।

৩.২. গঠন ও সদস্যদের যোগ্যতা: এই কমিশনে একজন চেয়ারম্যান এবং ৪ জন অন্য (সাধারণ) সদস্য থাকিবেন। কমিশনের সদস্যদের যোগ্যতা কি হইবে না হইবে তাহা সংসদ আইন করিয়া ঠিক করিয়া দিতে পারিবে। এই ক্ষমতাবলে সংসদ ১৯৫১ সালে অর্থ কমিশন সংক্রান্ত আইন (The Finance Commission Act, 1951) পাস করে। ইহাতে অর্থ কমিশনের সদস্যদের যোগ্যতা সম্পর্কে নিম্নলিখিত নির্দেশ

---

১. ১৯৬০-৬১ সাল হইতে এই অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা রহিত করিয়া পাট-উৎপাদনকারী রাজ্যগুলিকে দেয় সাধারণ অর্থসাহায্য বা অনুদানের (general grants-in-aid) পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয় এবং পরে তৃতীয় অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুসারে ১৯৬২-৬৩ সাল হইতে এই অনুদানেরও বিলোপসাধন করা হইয়াছে।

রহিয়াছে : জনসাধারণের কার্যে অভিজ্ঞতা আছে এমন সব লোকেদের মধ্য হইতে চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইবেন। অন্যান্য সদস্যরা মনোনীত হইবেন এমন সকল ব্যক্তিদের মধ্য হইতে যাঁহারা হাইকোর্টে বিচারক রহিয়াছেন বা ছিলেন বা বিচারক হওয়ার যোগ্যতা রাখেন; অথবা যাহাদের সরকারী রাজস্ব ও হিসাব সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান রহিয়াছে; অথবা যাহাদের প্রশাসন এবং রাজস্ব সম্পর্কে বিশেষ অভিজ্ঞতা রহিয়াছে, অথবা যাহাদের অর্থনীতি সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান রহিয়াছে।

ভূমিকা ও কার্যাবলী : এখন দেখা যাক, এই অর্থ কমিশনের ভূমিকা ও কার্যাবলী কি। সংবিধানে (২৮০ অনুচ্ছেদ) বলা হইয়াছে যে-সকল কর কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টনযোগ্য (যেমন, আয়কর—Income Tax, কেন্দ্রীয় উৎপাদন-শুল্ক) সেগুলির বণ্টন এবং রাজ্যগুলির মধ্যে ঐ করগুলি ভাগাভাগির ব্যাপারে অর্থ কমিশন রাষ্ট্রপতির নিকট সুপারিশ উপস্থাপিত করিবে। ইহা ছাড়া সংবিধানে রহিয়াছে, সংসদ রাজ্যের রাজস্ব ক্ষেত্রে প্রয়োজনমাফিক অনুদান (grants-in aid to the revenues of the States) দিতে পারে যদি সংসদ মনে করে যে নির্দিষ্ট রাজ্যগুলির সাহায্যের প্রয়োজন আছে। এই অনুদান সম্পর্কে নীতি নির্ধারিত করা এবং রাষ্ট্রপতির নিকট সুপারিশ করা অর্থ কমিশনের অন্যতম কার্য। রাষ্ট্রপতিকে এই সকল সুপারিশ সংসদের নিকট উপস্থাপিত করিতে হয়। তবে উল্লেখ্য যে, আয়করের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্তই কার্যকর হয়, কিন্তু উৎপাদনশুল্কের বণ্টন সংসদের আইন দ্বারাই স্থিরীকৃত হয়। ইহা ছাড়া রাজস্ব খাতে অনুদান সম্পর্কিত অর্থ কমিশনের সুপারিশ কার্যকর ব্যাপারে সংসদ আইন দ্বারা স্থির করিবে। তবে যে-পর্যন্ত না সংসদ এ-বিষয়ে আইন প্রণয়ন করে সে-পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি আদেশ দ্বারা এই অনুদান দেওয়ার ব্যবস্থা করিবেন।

৩.৩ গঠন ও কার্যাবলী সম্পর্কে মতামত : অর্থ কমিশনের গঠন ও কার্যাবলী সম্পর্কে বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন মন্তব্য করিয়াছেন। **এই কমিশনের দরুন রাজ্য-সমূহের স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণ ব্যাপারে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন।** যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় অর্থ কমিশনের মত সংস্থার প্রয়োজন আছে। কিন্তু এই প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এই কারণে যে সম্প্রসারণশীল করগুলি (elastic taxes) ভোগ করে কেন্দ্র এবং ফলে উহার আর্থিক সচ্ছলতা অধিক ; অপরদিকে অসম্প্রসারণশীল করগুলি ভোগ করে রাজ্যগুলি অথচ রাজ্যগুলিকে ক্রমবর্ধমান সমাজকল্যাণকর কার্যাদি (যেমন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি) সম্পাদন করিতে হয়। সুতরাং এই অবস্থায় কেন্দ্র হইতে রাজ্যগুলির হাতে অর্থ হস্তান্তরিত করার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। কিন্তু এই হস্তান্তরের জন্য গঠন করিতে হইবে বিশেষজ্ঞ লইয়া গঠিত স্থায়ী ও স্বাধীন সংস্থা। ইহা ব্যতীত এইরূপ **সংস্থার সুপারিশগুলি কেন্দ্রকে বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ করিতে হইবে।**[১]

---

১. "...if grants are to be a permanent feature of federal finance,...*their amount should not depend upon the good will of the granting government.* for if they do so depend, the federal principle is thereby modified. From this point of view while its seems right that an expert body should recommend the amount of grants, it does not seem in accordance with federalism that the central government should decide whether it will accept the recommendation." K. C. Wheare

অর্থ কমিশনের দুর্বলতা : এই নিরিখে বিচার করা হইলে দেখা যাইবে যে **ভারতীয় অর্থ কমিশন ক্রটিবিহীন নয়।** প্রথমত, অর্থ কমিশন সম্পূর্ণভাবে বিশেষজ্ঞদের লইয়া গঠিত হয় না। অনেক সময়ই কমিশনের চেয়ারম্যান বিশেষজ্ঞদের মধ্য হইতে নির্বাচিত না হইয়া রাজনৈতিক ক্ষেত্র হইতে নিযুক্ত হন। ইহার ফলে কমিশনে রাজনীতির প্রভাব পড়ে। ইহা ব্যতীত অন্যান্য সদস্যরা রাজনীতির সহিত অল্পবিস্তর সংশ্লিষ্ট।[১]

অতএব, অভিযোগ করা হয় যে **কমিশনের পক্ষে নিরপেক্ষতা রক্ষা করা কঠিন।** দ্বিতীয়ত, কমিশনের সুপারিশ কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। অর্থাৎ, কমিশনের সুপারিশ গ্রহণ করা বা না-করা কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভরশীল। তৃতীয়ত, কমিশন কোন **স্থায়ী কমিশন নয়।** ইহার ফলে কমিশনের পক্ষে অব্যাহতভাবে বছরের পর বছরের রাজ্যের চাহিদা বিচার করা সম্ভব হয় না এবং সদস্যরাও অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে পারে না।[২] অধ্যাপক ভার্গব (R. N. Bhargava), লাকডাওয়ালা (D. T. Lakdawala), (সুখময়) চক্রবর্তী কমিশন প্রভৃতির মতে ভারতীয় অর্থ কমিশন স্থায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয়। তুলনামূলক ভাবে পরীক্ষা করা হইলে দেখা যায় যে অস্ট্রেলিয়ার কমনওয়েলথ্ গ্র্যাণ্টস কমিশন (The Commonwealth Grants Commission) একটি স্থায়ী নিরপেক্ষ এবং বিশেষজ্ঞ লইয়া গঠিত কমিশন। ইহার সুপারিশ সরকার বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করিয়া থাকে।

৪. পরিকল্পনা কমিশন (The Planning Commission) : এখন দেখা যাক যে ভারতীয় পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হওয়ার ফলে অর্থ কমিশনের কার্যের পরিধি ও অর্থসাহায্যের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা কিভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে।

৪.১. কমিশনের প্রকৃতি ও গঠন : পরিকল্পনা কমিশন ক্যাবিনেটের এক প্রস্তাব অনুসারে গঠিত হয়। ইহার সদস্যসংখ্যা কি হইবে এবং সদস্যদের যোগ্যতা কি হইবে সে-সম্পর্কে কোন বাঁধাধরা নিয়মকানুন নাই। ফলে পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য-সংখ্যা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন হইতে দেখা যায়। সাধারণত দেখা যায় যে প্রধান মন্ত্রী কমিশনের চেয়ারম্যান হন এবং ক্যাবিনেটের একাধিক মন্ত্রী ইহার সদস্যভুক্ত হইয়া থাকেন।

১. "The qualifications prescribed for Chairman have been used to bring in political leaders for an expert Commission like the Finance Commission." G. Thimmaiah's article entitled '*Some Neglected Aspects of the Finance Commission*' in *Journal of Constitutional and Parliamentary Studies* (Vol. VIII No. 4. October-December 1974).

২. "...the Commission is regularly *ad hoc* in the sense that as soon as it submits its report it ceases to exist till the next Commission is appointed. This means the Commission will not get the benefit of continuous service of the expert members." G. Thimmaiah

ইহা ছাড়া আরও দু'একজন সদস্য থাকেন। এই কারণে বলা হয় যে পরিকল্পনা কমিশন হইল একটি **রাজনৈতিক ও কেন্দ্রাধীন সংস্থা।**[১]

৪.২. পরিকল্পনা কমিশন ও রাজ্যগুলি কেন্দ্রীয় নির্ভরশীলতা: এই কমিশন পরিকল্পনার বিভিন্ন কর্মসূচী নির্ধারণ এবং রাজ্যগুলিকে অর্থপ্রদানের ব্যবস্থা করে। বস্তুত, আর্থিক ক্ষমতার দিক হইতে পরিকল্পনা কমিশন প্রাধান্য ভোগ করিয়া থাকে। আর্থিক সচ্ছলতা ও সম্বল কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন। সুতরাং রাজ্যের স্বাতন্ত্র্য বেশ কিছুটা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। কেন্দ্রের অর্থনৈতিক সচ্ছলতার কারণ হইল যে, সম্প্রসারণশীল করগুলি কেন্দ্রের হস্তে ন্যস্ত। ইহা ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার ঘাটতি বাজেটে বাজেট (deficit financing) বাজার হইতে ঋণ, বৈদেশিক সাহায্যের মাধ্যমে বেশ কিছু পরিমাণ অর্থসংগ্রহ করিতে সমর্থ। এই সকল অর্থ কেন্দ্র পরিকল্পনা কমিশনের মাধ্যমে রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টন করিয়া থাকে। এ-সম্পর্কে **অর্থ কমিশনের কোন এক্তিয়ার নাই।**

৪.৩. অর্থ কমিশন ও পরিকল্পনা কমিশনের এলাকা: সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বিভিন্ন রাজ্যকে পরিকল্পনা সংক্রান্ত অর্থ বণ্টন পরিকল্পনা কমিশন করিয়া থাকে। এই অর্থ বণ্টন করা হয় সংবিধানের ২৮২ অনুচ্ছেদ বলে। এই অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে ইউনিয়ন বা রাজ্যের আইন করিবার এক্তিয়ার থাকুক না না থাকুক ইউনিয়ন কিংবা রাজ্য যে-কোন সামাজিক উদ্দেশ্যে অনুদান দিতে ব্যয় করিতে পারিবে। অনুচ্ছেদটির ব্যাখ্যা করিয়া বলা হয় যে পরিকল্পনা সংক্রান্ত ব্যয়ই এই অনুচ্ছেদের বিষয়বস্তু। **অনুচ্ছেদটি অর্থ কমিশনের আওতার বাহিরে**—অর্থাৎ অর্থ কমিশন এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ব্যয়বণ্টনের সুপারিশ করিতে পারে না। অথচ এই অনুচ্ছেদ অনুসারে অনুদান প্রদানের পরিমাণ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশ অনুসারে এই অনুদান বণ্টিত হয়। অপরপক্ষে অর্থ কমিশন সংবিধানের ২৭৫ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাজ্যগুলির রাজস্বখাতে ঘাটতি পূরণের জন্য মাত্র প্রয়োজনমাফিক অনুদান প্রদান সম্পর্ক সুপারিশ করিতে পারে। ইহা হইতে সহজে বুঝা যায় যে, বেশীর ভাগ অনুদান পরিকল্পনা কমিশনের আয়ত্তাধীন, আর অর্থ কমিশনের অনুদান প্রদানের ক্ষমতা বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ। ফলে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলির উপর আধিপত্য বিস্তারের সুবিধা পায়। এ-প্রসংগে একথাও মনে রাখিতে হইবে যে পরিকল্পনা কমিশন প্রত্যক্ষভাবে কেন্দ্রাধীন রাজনৈতিক সংস্থা। বলা হয় যে এই কারণেই রাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছে।[২] শুধু রাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্যই ক্ষুণ্ণ হয় নাই, অর্থ বণ্টনের ক্ষেত্রে **দুইটি পৃথক সংস্থা** থাকায় অর্থ কমিশন ও পরিকল্পনা কমিশনের মধ্যে সমন্বয়সাধনের ব্যাপারেও বিশৃংখলার সৃষ্টি হইয়াছে।

৪.৪. জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের কার্যের প্রকৃতি: বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় গণতন্ত্রসম্মত পরিকল্পনায় রাজ্যগুলির পরামর্শ ও অনুমোদন থাকা প্রয়োজন।

---

১. Asok Chandra: *Federal Finance in India*

২. "The overwhelming predominance of article 282 in the scheme of transference is bound to lead to increasing centralisation and is likely to impair the autonomy of the States." A. J. Sahai and S. N. Sinha

এখন ভারতীয় পরিকল্পনা কমিশনের সহিত রাজ্যগুলিকে সংশ্লিষ্ট করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে, কারণ পরিকল্পনা কমিশন সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রাধীন সংস্থা। এই সকল অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে **১৯৫২ সালে** জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের (National Development Council) সৃষ্টি করা হয়। ভারতের প্রধান মন্ত্রী, রাজ্যগুলির মুখ্য মন্ত্রী ও পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যগণ লইয়া গঠিত। পরিষদের উদ্দেশ্য হইল পরিকল্পনাকে সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে রাজ্যগুলির সহযোগিতা নিশ্চিত করা। কিন্তু **পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এই পরিষদের খুব একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নাই** বলিয়াই অনেকে অভিযোগ করে। কারণ, পরিষদের সভা ক্ষণকালের জন্য হইয়া থাকে। ফলে ইহা পরিকল্পনার পরিধি ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিশেষ কোন পরিবর্তন আনিতে পারে না।[১]

এই আলোচনা হইতে ইহাও উপলব্ধি করা সহজ যে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে অর্থ বণ্টনের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা কমিশনই প্রাধান্য ভোগ করে। আবার পরিকল্পনা কমিশন সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রাধীন সংস্থা। সুতরাং কেন্দ্রই অর্থবণ্টনের ক্ষেত্রে প্রাধান্য ভোগ করে এবং রাজ্যগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। এই অবস্থার দরুন কেন্দ্রে যে দল ক্ষমতায় থাকে এবং যে-রাজ্যগুলির ক্ষমতাপ্রাপ্ত দল ভিন্ন মতাবলম্বীয় হয়—এই দুয়ের মধ্যে বিবাদ-বিরোধের সৃষ্টি না হইয়া পারে না। রাজস্বপ্রাপ্তির প্রচেষ্টায় রাজ্যগুলি কেন্দ্রের নিকট নতি স্বীকার করিতে বাধ্য হয়।

৪.৫. পরিকল্পনা কমিশনকে নিরপেক্ষ করিবার সুপারিশ : এখন রাজ্যের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা, আর্থিক সচ্ছলতা নিশ্চিত করা এবং কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে সমন্বয়সাধন করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ এবং বহু রাজ্য বিভিন্ন ধরনের সুপারিশ করিয়াছে। বলা হয়, পরিকল্পনা কমিশনকে নিরপেক্ষ ও স্বাধীন করিতে হইবে। পরিকল্পনা কমিশনকে রাজ্যের প্রতিনিধি ও কেন্দ্রের প্রতিনিধি লইয়া গঠন করিতে হইবে। ইহা ছাড়া পরিকল্পনা কমিশন বিশেষজ্ঞদের লইয়া গঠিত হওয়া প্রয়োজন। আবার আর একটি সুপারিশ হইল যে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত সুপারিশসমূহকে কেন্দ্রকে গ্রহণ করিতে হইবে। ইহা ছাড়া পরিকল্পনা কমিশন জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ কর্তৃক গঠিত হইবে। এই মর্মে সংবিধানে সুস্পষ্ট পৃথক অনুচ্ছেদ সংযোগ করিতে হইবে।[১] অনুরূপভাবে অন্যতম লেখক কুরিয়ান (K. Mathew Kurian) বলিয়াছেন

১. '...it is difficult to appreciate how the (National Development) Council meeting only occasionally and at sessions lasting at best only for a couple of days can make any contribution to the scope or contents of the plan···the Council is no more than a registering body, to give *imprimatur* to the plan without nature consideration, before it is placed before Parliament for normal ratification." Asok Chandra : *Federalism in India*

১. "In the matter of planning and economic coordination, however, the Centre will have to conform to the general guideline, laid down by the National Development Council, in which the States will have representation along with the Centre. At the moment, neither the Council nor the Planning Commission is specifically mentioned in the Constitution. This lacuna may be closed by a separate Article, which should also state clearly that the composition of the Planning Commission will be determined by the National Development Council." A *Memorandum on Centre-State Relations* (Government of West Bengal, 1977)

যে পরিকল্পনা কমিশনের উপর প্রধান মন্ত্রী ও কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণের অবসান ঘটাইতে হইবে। রাজ্য ও কেন্দ্রের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত পরিকল্পনা কমিশনকে পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সমন্বয়-সাধনের সংস্থা হিসাবে কাজ করিবে।[১]

রাজস্ববণ্টন এবং রাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্য ও স্বচ্ছলতা নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মহল আরও কতকগুলি সুপারিশ করিয়াছে। প্রথমত, বলা হইয়াছে যে, কতকগুলি করকে যেমন, কোম্পানী আয়কর (Corportion Tax), কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টনযোগ্য করিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, রাজ্যগুলির ঋণ গ্রহণের উপর বাধানিষেধ দূর করিতে হইবে। তৃতীয়ত, পেশার উপর করধার্যের সীমাবদ্ধতা দূর করিতে হইবে। চতুর্থত, স্বেচ্ছামূলক অর্থপ্রদান (discretionary transfers) (২৮২ ও ২৯৩ অনুচ্ছেদ) অর্থ কমিশনের ব্যবস্থাকে পংগু করিয়াছে। মাত্র ইহা নয়, এরূপ অর্থপ্রদানের ফলে রাজ্যগুলির মধ্যে পক্ষপাতিত্ব দেখা দেয় এবং রাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে।[২] সুতরাং এরূপ অর্থপ্রদানের ব্যবস্থার অবসান করিতে হইবে ; এক্ষেত্রে অর্থ কমিশনের হস্তে ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন এবং অর্থ কমিশনের সুপারিশ বাধ্যতামূলক করিতে হইবে।

উপসংহার—আর্থিক কেন্দ্রপ্রবণতার বিরুদ্ধে আন্দোলন : যাই হোক, বর্তমানে আর্থিক কেন্দ্রপ্রবণতার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হইয়াছে বলা হয়। দক্ষিণ ও উত্তর ভারতের বিভিন্ন অংগরাজ্য এই আন্দোলনের সামিল হইয়াছে। এ-বিষয়ে নেতৃত্ব প্রদান করিয়াছে পশ্চিমবংগের বর্তমান বামফ্রণ্ট সরকার। অংগরাজ্যগুলির দাবি এবং কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির ক্ষমতার সমন্বয়সাধন না করা হইলে বিভিন্নতার আন্দোলনের আশংকা রহিয়াছে। মনে রাখিতে হইবে যে কেন্দ্রীকরণ তখনই ফলপ্রসূ হয় যখন সামাজিক সম্পর্ককে সাম্য ও গণতন্ত্রের ভিত্তিতে উপস্থাপিত করা হয়।

"... *the process of centralisation of the sources of revenue in the Indian federation is expected to gather momentum in future Five Year Plans.*" Essays on Indian Federalism

স্মর্তব্য

১. রাজস্ববণ্টন ব্যাপারেও দেখা যায় যে সংবিধানে কেন্দ্রের জন্য অধিক রাজস্বের সংগতির ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

২. এই আর্থিক কেন্দ্রপ্রবণতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদও উঠিয়াছে।

১. "It is obvious that if the federal principles enshrined in the Constitution are to be maintained, the overriding powers of the prime minister and the virtual control of the commission by the Central Government should be ended. On the contrary, Planning Commission should become a coordinating agency for planning." *K. Mathew Kurian's article in Central-State Relations (Edited by K. M. Kurian and P. N. Varughese)*

২. "Discretionary transfers cut at the roots of state autonomy by enabling the Central Government to enter into the fields assigned to the states via backdoor." K. Mathew Kurian

অনুশীলনী

1. Analyse the nature of financial relations between the Union and the States under the Constitutions of India. (N.B.U. 1985)

[ভারতের সংবিধান অনুসারে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে অর্থনৈতিক (রাজস্বসংক্রান্ত সম্পর্কের) প্রকৃতি আলোচনা কর। (৭১-৭৪ পৃষ্ঠা)

2. Briefly describe the scheme of federal finance under the Constitution of India.

[ভারতীয় সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রীয় আয়ব্যয়-ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান কর।] (৭১-৭৪ পৃষ্ঠা)

3. Show how the Planning Commission and the Finance Commission have contribution to centralization in India.

[ভারতে কিভাবে পরিকল্পনা কমিশন ও অর্থ কমিশন কেন্দ্রিকতাসাধনে সহায়তা করিয়াছে তাহা দেখাও।] (৭৪-৭৮ পৃষ্ঠা)

4. Comment on the respective roles of (a) Finance Commission, (b) Planning Commission and (c) National Development Council in our federal finance

[আমাদের যুক্তরাষ্ট্রীয় আয়ব্যয়-ব্যবস্থায় (ক) অর্থ কমিশন, (খ) পরিকল্পনা কমিশন ও (গ) জাতীয় উন্নয়ন কমিশনের ভূমিকার উপর মন্তব্য কর।] (৭৪-৭৮ পৃষ্ঠা)

৭

ভারতীয় নাগরিকতা
(INDIAN CITIZENSHIP)

"*The Indian Constitution provides for* common citizenship. *It rejects the double citizenship characteristic of a federal structure," India's Constitution* (Government of India)

"*Two classes of citizens have been created by Assam Foreigners Act.*" Jyoth Bwsu

১. তুইটি বৈশিষ্ট্য : (ক) বিস্তৃত নিয়মাবলী সংবিধানভুক্ত নহে : ভারতীয় নাগরিকতার আলোচনা প্রসংগে প্রথমেই তুই-একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্ট আকর্ষণ করা প্রয়োজন। প্রথমত, ভারতীয় সংবিধানে নাগরিকতা সম্পর্কে বিস্তৃত বা স্থায়ী নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ করা হয় নাই। এই বিষয়ে **সংবিধান** (১১ অনুচ্ছেদ) **সম্পূর্ণ ক্ষমতা ন্যস্ত** করিয়াছে সংসদের হস্তে। সংবিধানে যাই থাকুক না কেন, পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করিয়া নাগরিক-অধিকার অর্জন, অবসান এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে যে-কোন ব্যবস্থা করিতে পারে। সংবিধানে মাত্র সংবিধান প্রবর্তিত হইবার তারিখে কোন কোন্ সর্তে কোন্ কোন্ শ্রেণীর লোক ভারতীয় নাগরিক-অধিকার অর্জন করিতে পারিবে তাহার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য সংবিধানে (১০ অনুচ্ছেদ) বলা হইয়াছে যে সংবিধানের নিয়ম অনুসারে যাহারা প্রথমে নাগরিক-অধিকার পাইবে তাহারা পার্লামেণ্ট প্রণীত আইনসাপেক্ষে ভবিষ্যতেও অধিকার ভোগ করিতে থাকিবে।

(খ) ভারতে দ্বৈত নাগরিকতার কোন ব্যবস্থা নাই : দ্বিতীয়ত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোবিয়েত ইউনিয়ন প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্রের যেরূপ দ্বৈতনাগরিকতার ব্যবস্থা আছে, সাধারণতান্ত্রিক ভারতে সেরূপ কোন ব্যবস্থা নাই। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সকল নাগরিকই ভারতীয় নাগরিক এবং এক পর্যায়ভুক্ত। অংগরাজ্যগুলিতে পৃথক নাগরিকতার ব্যবস্থা নাই। তবে আসামের ক্ষেত্রে বহিরাগত বাছাই আইন দ্বারা **কার্যত দ্বৈত নাগরিকতার ব্যবস্থা** করা হইয়াছে।

২. সংবিধান অনুসারে নাগরিকতার ভিত্তি বা বিধান : বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী নিম্নলিখিত ভিত্তিতে বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিকে ভারতীয় নাগরিক-অধিকার প্রদান করা হইয়াছে :

ক। নিজ জন্মস্থান অথবা পিতা বা **মাতার জন্মস্থান** অথবা বসবাস **এবং স্থায়ী বসবাসের ভিত্তিতে নাগরিকতা অর্জন** : (সংবিধান চালু হইবার সময় বর্তমান—অর্থাৎ সাধারণতন্ত্রী ভারতে স্থায়ী বসবাসকারী (Domicile) এবং জন্মগ্রহণকারী সমস্ত ব্যক্তিই ভারতের নাগরিকতা অর্জন করিয়াছে। (২) সংবিধান প্রবর্তনের সময় বর্তমান ভারতে স্থায়ী বসবাসকারীর এইরূপ ব্যক্তি নিজে এই ভারতে জন্মগ্রহণ না করিলেও পিতামাতার মধ্যে যে-কোন একজন এই স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিলেই সে

ভারতীয় নাগরিক-অধিকার পাইয়াছে। (৩) ইহা ছাড়া ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারীর অব্যবহিত পূর্বে যাহারা অন্তত **৫ বৎসর** ধরিয়া বর্তমান ভারতে সাধারণভাবে বসবাস করিয়া আসিতেছে তাহারা যদি এই ভারতের স্থায়ী বাসিন্দা হইয়া থাকে, তবে তাহারাও সংবিধান প্রবর্তিত হইবার সময় ভারতীয় নাগরিক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করা প্রয়োজন। কোন ব্যক্তি কেবল নিজে অথবা তাহার পিতা বা মাতা ভারতে জন্মগ্রহণ অথবা ঐ ব্যক্তি সংবিধান প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে অন্যূন পাঁচ বৎসরকাল ধরিয়া ভারতে বসবাস করিয়া থাকিলেই চলিবে না; নাগরিকতা অর্জনের জন্য এই সর্তগুলির যে কোন একটির সহিত থাকা চাই ভারতে স্থায়ী বসবাস।

● **স্থায়ী বসবাসের সর্তের পর্যালোচনা**: স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে, **'স্থায়ী বসবাস'** বলিতে কি বুঝায় এবং বসবাসের সহিত স্থায়ী বসবাসের পার্থক্য কোথায়? প্রথমেই বলিতে হয় যে, স্থায়ী বসবাস কথাটি অত্যন্ত অস্পষ্ট। সংবিধানও এই কথাটির কি অর্থ হইবে তাহা নির্দিষ্ট করিয়া দেয় নাই। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, কোন লোকের স্থায়ী আবাস হইল সেই দেশে, যে-দেশে অনির্দিষ্টকালের জন্য বসবাস করিবার সাম্প্রতিক অভিপ্রায় আছে।[১] স্থায়ী বসবাসের মধ্যে দুইটি উপাদানের সন্ধান পাওয়া যায়: (১) **বসবাস** এবং (২) **স্থায়ীভাবে বসবাস করিবার অভিপ্রায়।** কোন ব্যক্তির বাসস্থানের স্থান নির্ণয় করা সহজ কিন্তু তাহার ঐ স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করিবার অভিপ্রায় আছে কি না, এই প্রশ্নের মীমাংসা করা অত্যন্ত কঠিন। বহুদিন ধরিয়া একস্থানে বসবাস অথবা মৌখিক বা লিখিতভাবে স্থায়ী বসবাসের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেই সেই স্থানের স্থায়ী বাসিন্দা হওয়া যায় না। এমন নজির আছে যে, দীর্ঘকাল ধরিয়া একস্থানে বসবাস করিবার পরও সেই স্থানের স্থায়ী বাসিন্দা বলিয়া পরিগণিত হওয়া যায় নাই। অপরপক্ষে তাহার তুলনায় অল্প সময় কোন স্থানে বসবাস করিয়াও ঐ স্থানে স্থায়ী বসবাসকারী বলিয়া পরিগণিত হওয়া সম্ভব হইয়াছে। কোন ব্যক্তির স্থায়ী বসবাস (domicile) স্থির করিতে হইলে প্রথমে তাহার বাস কোথায় তাহা স্থির করা বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু আসল প্রশ্ন হইল, তাহার অভিপ্রায় কি? এই অভিপ্রায় নির্ণয় করিতে হইবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির গতিবিধি, ব্যবহার ও কাজকর্মের উপর দৃষ্টি রাখিয়া।

খ। পাকিস্তান হইতে আগতদের নাগরিক-অধিকার: পাকিস্তান পরিত্যাগ করিয়া যাহারা বর্তমান ভারতে চলিয়া আসিয়াছে, নাগরিক-অধিকার প্রদান বিষয়ে সংবিধান তাহাদের দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছে। প্রথমত, যাহারা ১৯৪৮ সালের ১৯শে জুলাই-এর পূর্বে ভারতে আসিয়াছে এবং দ্বিতীয়ত, যাহারা ঐ তারিখে অথবা ঐ তারিখের পর ভারতে চলিয়া আসিয়াছে।

খ.১. **ইহাদের শ্রেণীবিভাগ**: (১) প্রথমোক্ত তারিখের পূর্বে যাহারা ভারতে আসিয়াছে তাহারা নিজে অথবা তাহাদের পিতা বা মাতা অথবা পিতামহ, পিতামহী, মাতামহ বা মাতামহীর মধ্যে কেহ যদি অবিভক্ত ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন এবং তাহারা যদি বর্তমান ভারতে আসিবার পর হইতে এদেশে সাধারণত বসবাস করিয়া

১. **Domicile is "the country which is taken to be a man's permanent home for the purpose of determining his civil status."**

থাকে তবে তাহারা সংবিধানের প্রারম্ভে—অর্থাৎ ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে ভারতের নাগরিক-অধিকার অর্জন করিয়াছে।

(২) যে স্থলে উপরি-উক্ত ধরনের ব্যক্তিগণ (অর্থাৎ, যাহারা নিজে অথবা যাহাদের পিতা বা মাতা অথবা পিতামহ/পিতামহী মাতামহ বা মাতামহীর মধ্যে কেহ অবিভক্ত ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন) ১৯৪৮ সালের ১৯শে জুলাই বা তাহার পর পাকিস্তান ছাড়িয়া ভারতে আসিয়াছে তাহারা যদি সংবিধান প্রবর্তিত হইবার পূর্বে তদানীন্তন 'ভারত ডোমিনিয়ন'[১] সরকারের নিযুক্ত কর্মচারীর নিকট আবেদন করিবার পর উক্ত কর্মচারী কর্তৃক ভারতের নাগরিক হিসাবে নিবন্ধভুক্ত হইয়া থাকে তবেই সংবিধান প্রবর্তনের তারিখে তাহারা ভারতের নাগরিক-অধিকার অর্জন করিয়াছে।

খ.২. **১৯৫৫ সালের নাগরিকতা আইন**: এইভাবে নাগরিক-অধিকার অর্জনের জন্য আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সর্ত পূরণ করার প্রয়োজন হইত। আবেদন করিবার অব্যবহিত পূর্বে ভারতে **ছয় মাস ধরিয়া বসবাস** করিয়া না থাকিলে কেহ ভারতের নাগরিক হিসাবে রেজিস্ট্রীভুক্ত বা নিবন্ধভুক্ত হইতে পারিত না। এই সর্তের অর্থ দাঁড়ায় যে, যাহারা ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারীর ছয় মাস পূর্বে—অর্থাৎ ১৯৪৯ সালের ২৫শে জুলাই বা তাহার পূর্বে পাকিস্তান পরিত্যাগ করিয়া আসে নাই তাহারা ভারতের নাগরিক-অধিকার লাভ করিতে পারিত না। বহু লোক ১৯৪৯ সালের ২৫শে জুলাই-এর পরে পাকিস্তান, বিশেষত পূর্ববংগ (অধুনা বাংলাদেশ) হইতে ভারতে আসিয়াছে।

শরণার্থী, আসাম ও নাগরিকতা আইন. ১৯৫৫ সালের নাগরিকতা আইনে (The Citizenship Act, 1955) এইরূপ সকল ব্যক্তিকে ভারতে নাগরিকতা অর্জনের সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল।

আসামের ক্ষেত্রে কিন্তু ১৯৮৫ **সালের** (নভেম্বর মাসে) **নাগরিকতা আইনের সংশোধন দ্বারা শরণার্থীদের** (**বহিরাগত** বা **অনুপ্রবেশকারী বলিয়া** অভিহিত) **জন্য কিছুটা অন্যরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ব্যবস্থাটি হইল এইরূপ**: বাংলাদেশ **হইতে যে-সকল ব্যক্তি ১৯৬৬ সালের ১লা জানুয়ারী এবং ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের মধ্যে আসামে আসিয়াছে তাহারা 'বিদেশীয়' বা 'বহিরাগত'** (foreigners) **বলিয়া চিহ্নিত হইয়াছে।** বর্তমানে তাহারা ভোটাধিকার ব্যতীত অন্য **সকল নাগরিক-অধিকারই** ভোগ করিবে, **এবং** ভোটাধিকার পাইবে ১০ **বৎসর পর। এই ব্যবস্থার ফলে ভারতীয় নাগরিকতা প্রদান ব্যবস্থার সর্বজনীনতা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে এবং ভারতে দুই শ্রেণীর নাগরিকের সৃষ্টি হইয়াছে।**

---

(৩) ১৯৫৫ সালের নাগরিকতা আইন কার্যকর হইবার পূর্বে যাহারা ১৯৪৭ সালের ১লা মার্চের পর বর্তমান ভারত ত্যাগ করিয়া পাকিস্তানে বসবাসের জন্য চলিয়া গিয়াছিল, তাহারা ভারতের নাগরিক-অধিকার পাইতে সমর্থ ছিল না। তবে সংবিধানে ব্যবস্থা ছিল

---

১. স্বাধীনতা প্রাপ্তি হইতে বর্তমান সংবিধান প্রবর্তিত হওয়া পর্যন্ত (১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট হইতে ১৯৫০ সালের ২৫শে জানুয়ারী) ভারত অন্যতম ডোমিনিয়নই ছিল।

যে, এই সকল ব্যক্তি যদি পাকিস্তানে [illegible] পরে আবার পুনর্বাসন বা স্থায়ী প্রত্যাবর্তনের জন্য বিধিসংগত অনুজ্ঞাবলে ভারতে ফিরিয়া আসিয়া থাকে তাহা হইলে সংবিধান অনুসারেই ধরিয়া লওয়া হয় যে, তাহারা '৯৪৮ সালের ১৯শে জুলাই-এর পর ভারতে অসিয়াছে। সুতরাং নাগরিক হিসাবে নিবন্ধভুক্ত হইবার পদ্ধতির মাধ্যমে তাহারা ভারতের নাগরিক অধিকার অর্জনে সমর্থ।

গ। অন্যান্য দেশে অবস্থানকারী ভারতীয়দের সম্পর্কে নাগরিক বিধান : বর্তমান ভারত ও পাকিস্তানের বাহিরে সাধারণভাবে বসবাসকারী ভারতীয়দের নাগরিক-অধিকার : যে-সমস্ত ব্যক্তি নিজে অথবা যাহাদের পিতা বা মাতা অথবা পিতামহ, পিতামহী, মাতামহ বা মাতামহীর মধ্যে কেহ অবিভক্ত ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং যাঁহারা সাধারণত বর্তমান ভারত ও (বাংলাদেশ সহ) পাকিস্তানের বাইরে অন্য কোন দেশে বসবাস করিতেছেন, যদি তাঁহারা যে-দেশে বসবাস করিতেছেন সেই দেশস্থ ভারতের রাজনৈতিক প্রতিনিধির নিকট ঐ উদ্দেশ্যে আবেদন করিবার পর উক্ত প্রতিনিধি কর্তৃক ভারতের নাগরিক বলিয়া নিবন্ধভুক্ত হইয়া থাকেন তবে তাঁহারা ভারতীয় নাগরিক হিসাবে পরিগণিত হইবেন।

২. সংবিধানের নবম অনুচ্ছেদের একটি ব্যবস্থা : পরিশেষে, সংবিধানের ৯ অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে, যাহারা **স্বেচ্ছামূলকভাবে কোন বিদেশী রাষ্ট্রের** নাগরিকত্ব অর্জন করিয়াছে, তাহারা উপরি-উক্ত কোন পদ্ধতির মাধ্যমে ভারতীয় নাগরিক-অধিকার পাইবে না।

এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে যেখানে বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিক-অধিকার স্বেচ্ছামূলক ভাবে অর্জিত হয় নাই সেখানে এই ধারা প্রযোজ্য নহে।

৩. ১৯৫৫ সালের নাগরিকতা আইন (The Citizenship Act, 1955) : ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে নাগরিকতা অর্জন, অবসান ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে সংসদ আইন পাস করিয়া যে-কোন ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে পারে। ইহাও বলা হইয়াছে, ১৯৫৫ সালে সংসদ এক বিস্তৃত নাগরিকতা আইন (The Citizenship Act, 1955) পাস করিয়াছে। পরে **আসাম-চুক্তি** (The Assam Accord) কার্যকরকরণ ও অন্যান্য কারণে এই আইনটির কিছু কিছু সংশোধনও করা হইয়াছে।[১] ভারতীয় নাগরিকতার পুরাপুরি চিত্র পাইতে হইলে সংবিধানের সংশ্লিষ্ট ধারার সহিত সংশোধন-সহ এই আইনটির বিভিন্ন ব্যবস্থার উল্লেখ করা প্রয়োজন। মোটামুটিভাবে আইনটি নাগরিকতা অর্জন ও নাগরিকতার অবসান সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা প্রবর্তিত করিয়াছে।

৩.১. নাগরিকতা অর্জন (Acquisition of Citizenship) : বর্তমান আইন অনুসারে জন্মগতভাবে (by birth), রক্তের সম্পর্কগত সূত্রে (by descent), রেজিস্ট্রীকরণের সাহায্যে (by registration), দেশীয়করণের মারফত (by naturalisation) এবং কোন অঞ্চল ভারতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলে (by incorporation of territory) নাগরিকতা অর্জন করা যাইতে পারে।

---

১. পূর্ববর্তী পৃষ্ঠা দেখ।

১.ক. জন্মগত সূত্রে নাগরিকতা : ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে বা তৎপরবর্তী সময়ে ভারতে যাহাদের জন্ম হইয়াছে তাহারা সকলেই জন্মগত সূত্রে ভারতের নাগরিকতা পাইবে (৩ ধারা)।

তবে এই নিয়মের **দুইটি ব্যতিক্রম** আছে। প্রথমত, কোন ব্যক্তি ভারতে জন্মগ্রহণ করিলেও তাহার পক্ষে নাগরিকতা প্রাপ্তির জন্য প্রমাণ করিতে হইবে যে (ক) তাহার পিতা তাহার জন্মের সময় ভারতের নাগরিক ছিলেন এবং (খ) পিতা ঐ সময় পররাষ্ট্রদূতের ন্যায় কোন অব্যাহতি (immunity) ভোগ করিতেন না।

দ্বিতীয়ত, যে ব্যক্তির পিতা শত্রুভাবাপন্ন বিদেশীয় (enemy alien) এবং যাহার জন্ম শত্রু-অধিকৃত অঞ্চলে হইয়াছে সে জন্মগত সূত্রে ভারতীয় নাগরিকতা পাইবে না।

১.খ. রক্তের সম্পর্কগত সূত্রে নাগরিকতা : ১৯৫০ সালের ২৫শে জানুয়ারী বা তৎপরবর্তী সময়ে যে-সকল ব্যক্তি ভারতের বাহিরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহাদের পিতা ভারতীয় নাগরিক হইলে তাহারা রক্তের সম্পর্কগত সূত্রে ভারতীয় নাগরিকতা অর্জন করিবে (৪ ধারা)।

১.গ. রেজিস্ট্রীকরণের মাধ্যমে নাগরিকতা : বর্তমান আইনটিতে রেজিস্ট্রীকরণের দ্বারা ভারতীয় নাগরিকতা প্রদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে (৫ ধারা)। ভারতীয় নাগরিকতা পাইবার জন্য আবেদন করিলে কতিপয় নির্দিষ্ট শ্রেণীর ব্যক্তিকে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ভারতীয় নাগরিক বলিয়া রেজিস্ট্রীভুক্ত করিতে পারেন। এইভাবে যাহারা ভারতীয় নাগরিকতা অর্জন করিতে সমর্থ তাহারা হইল : (ক) অবিভক্ত ভারতের বাহিরে সাধারণভাবে বসবাসকারী (ordinarily resident) ভারতীয়গণ, (খ) যে-সকল ভারতীয় ভারতে সাধারণভাবে বসবাস করে এবং রেজিস্ট্রীভুক্ত হইবার আবেদন করিবার অব্যবহিত পূর্বে **ছয় মাস ধরিয়া** সাধারণভাবে বসবাস করিয়াছে, (গ) যে-সকল স্ত্রীলোক ভারতীয় নাগরিকদের বিবাহ করিয়াছে; (ঘ) ভারতীয় নাগরিকদের অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানসন্ততি এবং (ঙ) যুক্তরাজ্য (UK) ক্যানাডা অস্ট্রেলিয়া নিউ জিল্যাণ্ড শ্রীলংকা প্রভৃতি কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থমস্তিষ্ক নাগরিকগণ।

ভারত সরকার অবশ্য রেজিস্ট্রীকরণের মারফত ভারতীয় **নাগরিকতা অর্জন সম্পর্কে অন্যান্য বাধানিষেধ ও সর্ত** আরোপ করিতে পারে এ-বিষয়ে উপরি-উক্ত দেশগুলিতে রেজিস্ট্রীকরণের মাধ্যমে নাগরিকতা পাইতে হইলে ভারতীয় নাগরিকগণকে যে-সমস্ত সর্ত পালন করিতে হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই (on the basis of reciprocity) ভারত সরকার বাধানিষেধ ও সর্ত স্থির করিবে। রেজিস্ট্রীকরণের মারফত নাগরিক হইবার সময় প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে ভারতীয় সংবিধানের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিতে হয়।

১.ঘ. দেশীয়করণের মাধ্যমে নাগরিকতা : বিদেশীয়দের দেশীয়করণ-পদ্ধতির মাধ্যমে ভারতীয় নাগরিকতা অর্জনের সুবিধাও নূতন আইনটিতে দেওয়া হইয়াছে।[১]

১. Sec. 6

এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে দেশীয়করণ-পদ্ধতি কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত কোন দেশে নাগরিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে।

যে-কোন প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থমস্তিষ্ক ব্যক্তি নির্ধারিত পন্থায় দেশীয়করণের জন্য সরকারের নিকট আবেদনপত্র দাখিল করিতে পারে এবং ভারত সরকার **দেশীয়করণের কতকগুলি সর্ত পূরণ** সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইলে তাহাকে দেশীয়করণের প্রমাণপত্র (certificate) প্রদান করিয়া ভারতীয় নাগরিক বলিয়া স্বীকার করিয়া লইবে। তবে বিজ্ঞান দর্শন সাহিত্য বিশ্বশান্তি প্রভৃতির ক্ষেত্রে যাঁহাদের বিশেষ অবদান রহিয়াছে তাঁহাদের বেলায় দেশীয়করণের বিভিন্ন সর্ত পূরণ সম্পর্কে বিশেষ কড়াকড়ি না করিয়া ভারতীয় নাগরিক অধিকার প্রদান করা যাইতে পারে। যেমন, মাদার টেরেজার নাগরিকত্ব প্রাপ্তির বেলায় কোনই কড়াকড়ি করা হয় নাই।

১.ঙ. কোন অঞ্চলের অন্তর্ভুক্তির ফলে নাগরিকতা : কোন অঞ্চল ভারতের অন্তর্ভুক্ত হইলে ভারত সরকার ঐ দেশের লোকদের ভারতীয় নাগরিকতা প্রদান করিতে পারে। যেমন, চন্দননগর গোয়া দমন দিউ প্রভৃতি ভারতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় সেখানকার অধিবাসীরা ভারতীয় নাগরিকতা অর্জন করিয়াছে।

১.চ. আসামের জন্য সংশোধিত ব্যবস্থা : আসামের ক্ষেত্রে নাগরিকতা আইনের সংশোধন দ্বারা বহিরাগতদের ক্ষেত্রে আংশিক নাগরিত্বের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ১৯৬৬ সালের ১লা জানুয়ারী ও ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের মধ্যে যাহারা ভারতে আসিয়াছে তাহারা ভোটাধিকার ছাড়া অন্য সকল নাগরিক অধিকারই ভোগ করিবে, **ভোটাধিকার পাইবে ১০ বৎসর পর।**

৪. নাগরিকতার অবসান (Termination of Citizenship) : যে-সকল কারণে ভারতীয় নাগরিকতার অবসান হইবে তাহার উল্লেখও নূতন আইনটিতে করা হইয়াছে।

৪.ক. নাগরিকতা পরিত্যাগ : প্রথমত, যে-ব্যক্তি একই সময় ভারত ও অন্য কোন দেশের নাগরিক রহিয়াছেন সেই ব্যক্তি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ভারতীয় নাগরিক-অধিকার পরিত্যাগ করিতে পারেন (৮ ধারা)।

৪.খ. অন্য দেশের নাগরিকতা গ্রহণের দরুন নাগরিকতার অবসান। দ্বিতীয়ত, কোন ভারতীয় নাগরিক দেশীয়করণ, রেজিষ্ট্রীকরণ বা অন্য কোন পন্থায় স্বেচ্ছায় (voluntarily) অন্য কোন দেশের নাগরিকতা গ্রহণ করিলে সে ভারতীয় নাগরিকতা হারাইবে (৯ ধারা)।

৪.গ. ভারত সরকারের আদেশে নাগরিকতার অবসান : তৃতীয়ত, কতকগুলি কারণে ভারত সরকার আদেশ প্রদান করিয়া নাগরিকতার অবসান ঘটাইতে পারে (১০ ধারা)। কতিপয় ক্ষেত্র ব্যতীত যাহারা দেশীয়করণ বা রেজিষ্ট্রীকরণ পদ্ধতির সাহায্যে ভারতীয় নাগরিকতা পাইয়াছে অথবা যাহারা সংবিধান চালু হইবার অব্যবহিত পাঁচ বৎসর পূর্ব হইতে সাধারণভাবে ভারতে বসবাসকারী ও ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে ভারতের স্থায়ী বসবাসকারী ছিল বলিয়া ভারতের নাগরিকতা পাইয়াছে তাহাদের ক্ষেত্রেই এই ক্ষমতা ভারত সরকার প্রয়োগ করিতে পারিবে। যে-সমস্ত

কারণে নাগরিকতা হইতে বঞ্চিত করা [illegible] সংক্ষেপে হইল : (ক) অসদুপায়ে নাগরিকতা লাভ করা হইলে; (খ) **সংবিধানের প্রতি আনুগত্যের অভাব বা অসন্তুষ্টি** (disloyalty or disaffection towards the Constitution) অনুভূত হইলে ; (গ) যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষীয় দেশের সংগে ব্যবসায়ে লিপ্ত হইলে ; (ঘ) দেশীয়করণ বা রেজিষ্ট্রীকরণ হইবার পর **পাঁচ বৎসর** সময়ের মধ্যে কোন দেশে **দুই বৎসর** বা **ততোধিক সময়ের জন্য** কারাদণ্ড ভোগ করিলে।

৪.ঘ. ইহা ব্যতীত ভারতের বাহিরে কোন শিক্ষায়তনের ছাত্র নয় অথবা ভারত সরকারের অধীনে চাকরি করে না অথবা ভারত যাহার সদস্য এমন কোন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের অধীনে চাকরি করে না অথবা ভারতীয় বৈদেশিক প্রতিনিধির অফিসে ভারতীয় নাগরিকতা রক্ষা করিবার সংকল্প প্রতি বৎসর জানায় নাই—এমন কোন ভারতীয় নাগরিক একাদিক্রমে সাত বৎসর ভারতের বাহিরে সাধারণভাবে বসবাস করিলে ভারত সরকার তাহার নাগরিকতার অবসান করিতে সমর্থ।

মন্তব্য এখানে দেখা যাইতেছে যে ভারতীয় আইন নাগরিকতার অবসান বিষয়ে নাগরিকদের মধ্যে বিভেদাচরণ করিয়াছে। গণতান্ত্রিক ভারতে এরূপ বিভেদাচরণ করার সংগত যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। সংবিধানের প্রতি আনুগত্যের অভাব বা অসন্তুষ্টির কারণে নাগরিকতার অবসান ঘটাইবার অবাধ ক্ষমতা সরকারের হস্তে ছাড়িয়া দেওয়া সমীচীন হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না, কারণ আদালতের কোন এক্তিয়ার না থাকায় সরকারের স্বেচ্ছানুযায়ী কার্য করিবার যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে।

৫. ভারতীয় নাগরিকতা প্রদান-ব্যবস্থার উৎকর্ষ (Merits of the Provisions regarding Grant of Indian Citizenship) :

ভারতীয় সংবিধান ও উহার ভিত্তিতে প্রণীত ১৯৫৫ সালের নাগরিকতা আইন মোটামুটি '**বিশ্বজনীন নীতি'তে নাগরিকতা** (principle of universal citizenship) প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছে বলা যায়। ভারতীয় নাগরিকতা প্রদান-ব্যবস্থাকে ধর্মীয়, জাতিগত বা অনুরূপ কোন সর্তের দ্বারা সংকুচিত করা হয় নাই। সাধারণ লোকের নাগরিক-অধিকারই যে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার ভিত্তি, এই মৌলিক নীতি অনুসারেই ভারতীয় সংবিধান নাগরিকতা প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছে। বহুদিন পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কৃষ্ণকায় ব্যক্তিদের এবং ইয়োরোপের অনেক দেশ নারীদের পূর্ণ নাগরিক-মর্যাদা প্রদান করে নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিক (naturalised citizen) রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হইতে পারে না। এই সকল দিক দিয়াই ভারতীয় নাগরিকতা আইনের শ্রেষ্ঠত্ব সর্বনাদিস্বীকৃত। ভারতের রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় এমন কোন পদ নাই যাহা কোন নাগরিকের অধিকার-বহির্ভূত। উপরন্তু, ভারত দ্বিখণ্ডনের ফলে অনেক ভারতীয় যে ভারতের নাগরিকতা হারাইবে, অনেক ভারতীয় যে বিশেষ কারণে বিদেশে বসবাস করিতে বাধ্য হইতেছে—এই সকল বিষয় বিচার করিয়াই নাগরিকতা প্রদানের ব্যাপক ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

৫.১. **আদর্শের প্রতিবিম্বনে** [illegible] এইভাবে ভারতের নাগরিক গ্রহণের ব্যবস্থা রাজনৈতিক আদর্শের অনুগামী হইলেও সংকীর্ণ আঞ্চলিকতা এবং বিকৃত ভাষাভিত্তিক আন্দোলন ভারতীয় নাগরিক-মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করিতেছে। অন্যভাবে বলা যায়, অখণ্ড ও ব্যাপক নাগরিকতার ভিত্তিতে ভারতীয়গণকে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করিবার প্রচেষ্টা করা হইলেও ভাষাগত সংকীর্ণতার জন্য উহা বিশেষ ব্যাহত হইতেছে। নাগরিকগণ প্রথমে নিজেদের আসামী পাঞ্জাবী মাদ্রাজী বাঙালী বিহারী ইত্যাদি বলিয়া ভাবে, পরে ভাবে ভারতীয় বলিয়া। কয়েকটি রাজনৈতিক দলের জন্য এই আঞ্চলিক দৃষ্টিভংগি ভারতের কোন কোন স্থানে বিশেষ প্রকট হইয়া উঠিয়াছে।

আবার আসামের ক্ষেত্রে কার্যত দ্বৈত নাগরিকত্বের ব্যবস্থা করিয়া নাগরিকতা-প্রদানের বিশ্বজনীন নীতিকে বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

> *"Every person entrusted with a vote, that is, with a share, however small, in the government of his community, must cultivate the faculty of hearing all sides of a question and coming to decisions based on common sense and without reference to passion or self-interest."* Srinivasa Satris

স্মর্তব্য

১. সংবিধান নাগরিকতা প্রদান ব্যবস্থা কাঠামো মাত্র স্থির করিয়া দিয়াছে।

২. ফাঁক পূরণ করিয়া বিস্তারিত ব্যবস্থা করা হইয়াছে ১৯৫৬ সালের নাগরিকতা আইন দ্বারা।

৩. ভারতীয় নাগরিকতা প্রদান বিশ্বজনীন নীতিভিত্তিক।

৪ তবে আসাম চুক্তি কার্যকর করিবার জন্য এই বিশ্বজনীনতাকে ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছে।

৫ নাগরিকতা প্রদান ছাড়া নাগরিকতার অবসানের ব্যবস্থাও আছে।

অনুশীলনী

1. **Discuss the provisions of the Constitution of India regarding citizenship.** (C. U. 1966)

[নাগরিকতা সম্বন্ধে ভারতীয় সংবিধানের ব্যবস্থার পর্যালোচনা কর।] (৮১-৮৩ পৃষ্ঠা)

2. **Give in brief the provisions regarding acquisition of Indian Citizenship.**

[কিভাবে ভারতীয় নাগরিকতা অর্জন করা যায় তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।] [৮১-৮৬ পৃষ্ঠা]

3. **Write a short note on (i) Citizenship Act, 1955. (C. U. 1974); (ii) Citizenship in India.** (C. U. 1977)

[সংক্ষিপ্ত টীকা রচনা কর: (ক) ভারতীয় নাগরিকতা আইন; (খ) ভারতে নাগরিকতা।]

(৮৪-৮৬, ৮৭-৮৮ পৃষ্ঠা)

৬

ধিকার
AL RIGHTS)

"*The* ... *exhortations as to how government* ... *or its agencies will operate. They are precepts of the law of the land backed by the power of the courts to refuse to give effect to legislative or executive acts in derogation thereof.*" Dean Roscoe Pound

১. অধিকারের প্রকৃতি (Nature of Rights) : নাগরিকদের জন্য সুন্দর ও পূর্ণাংগ জীবন সম্ভব করার মধ্যেই রাষ্ট্রের অস্তিত্বের সার্থকতা। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন সর্ত হইল যে রাষ্ট্র নাগরিকদের ব্যক্তিত্ববিকাশ ও সুখসমৃদ্ধির সহায়ক হইবে। প্রত্যেকটি ব্যক্তি তাহার সুপ্ত দক্ষতাকে বিকশিত করিয়া পরিপূর্ণ সুখময় জীবনলাভ করিবার জন্য আকাংক্ষিত। কিন্তু ইচ্ছা করিলেই সুখী হওয়া যায় না বা ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ সম্ভব হয় না। ইহার জন্য প্রয়োজন হয় অনুকূল পরিবেশ ও সুযোগসুবিধার। যেমন, মানুষের প্রথমেই জীবনের নিরাপত্তার প্রয়োজন হয় বলিয়া প্রত্যেককে অন্যের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে এবং প্রত্যেককে জীবনধারণের জন্য অন্নবস্ত্র ও আশ্রয়ের সংস্থান করিতে হইবে। আবার শিক্ষা ব্যতীত কোন ব্যক্তি নিজেকে গড়িয়া তুলিতে পারে না—জগতের ঘটনাবলীর গতিপ্রকৃতি উপলব্ধি করিতেও পারে না। শিক্ষাই যথেষ্ট নয়, ইহার সহিত মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, সংঘবদ্ধ হইবার অধিকার ইত্যাদি থাকা প্রয়োজন। কারণ, এগুলি ছাড়া ব্যক্তি তাহার চিন্তাধারাকে সমাজের কার্যে নিয়োজিত করিতে সমর্থ হয় না এবং ফলে সরকারও স্বাধীন জনমত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নির্বাচন করিবার এবং নির্বাচিত হইবার অধিকার প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কের থাকা প্রয়োজন। কারণ, ইহা ব্যতীত নাগরিকগণ রাজনৈতিক জীবনে অংশগ্রহণ বা রাজনৈতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না ; ফলে শাসকশ্রেণীর হস্তে ক্রীড়নক হইয়া পড়ে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে কাম্য জীবনযাত্রার অনুপন্থী এবং ব্যক্তিত্ব উপলব্ধির সহায়ক এই সকল সুযোগসুবিধাকেই অধিকার আখ্যা দেওয়া হয়।

সংজ্ঞা : উপরের আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে **জীবনযাত্রার সেই সকল সর্ত বা অবস্থা যাহা ব্যতীত মানুষ মনুষ্যত্বকে উপলব্ধি করিতে পারে না, তাহার ব্যক্তিত্বের সকল দিকের উন্মেষ হয় না এবং সমাজজীবনের উন্নতি বিধানকল্পে সচেষ্ট হইতে পারে না—সেই সকল সুযোগসুবিধা বা অবস্থাব্যবস্থাই হইল মানুষের অধিকার।**[১]

১. *UNESCO Committee of Experts on Human Rights* (1947)

অধ্যাপক ল্যাস্কি (Prof. H. J. Laski) প্রদত্ত সংজ্ঞাটি হইল এইরূপ : "Rights are those *conditions of social life* without which no can seek, in general, to be himself at his best."

১.৯. রাষ্ট্র ও নাগরিক-অধিকার ([illegible] Rights of Citizens): মানুষের অধিকার রাষ্ট্রের মধ্যেই [illegible] বলিয়া এবং [illegible] হিসাবে রাষ্ট্র নাগরিকদেরই সংঘ বলিয়া অধিকার সম্বন্ধে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রহিয়াছে। ল্যাস্কির ভাষায় বলা যায়, রাষ্ট্রের পরিচয় লেখা থাকে রাষ্ট্র-সংরক্ষিত অধিকারে ('Every State is known by the rights it maintains')।

২. অধিকার-সংরক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতি (Different Modes of Safeguarding Citizens' Rights): স্বাধীনতা ও অধিকার সংরক্ষণের জন্য সাধারণত যে-সকল পন্থা নির্দেশ করা হয় তাহার মধ্যে আছে আইনের অনুশাসন (Rule of Law), ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা (Separation of Powers and Independence of Judiciary), সংবিধানে অধিকারের ঘোষণা (Declaration of a Bill of Rights in the Constitution), ইত্যাদি।

২ক. **আইনের অনুশাসন** আইনের অনুশাসন বলিতে মূলত দুইটি জিনিস বুঝায়: (১) **আইনের প্রাধান্য** (Supremacy of Law) এবং (২) **আইনের দৃষ্টিতে সমতা** (Equality in the Eye of Law)। আইনের প্রাধান্য থাকায় শাসন বিভাগ স্বৈরাচারী ক্ষমতা (arbitrary power) প্রয়োগ করিবার সুযোগ পায় না—সাধারণ আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত না হইলে কোন ব্যক্তির স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা যায় না। উপরন্তু, আইনের দৃষ্টিতে সমতা প্রবর্তিত থাকায় কেহই আইনের ঊর্ধ্বে যাইতে পারে না এবং সকলেই সাধারণ আদালত কর্তৃক প্রযুক্ত আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সুতরাং **আইনের অনুশাসনকে স্বাধীনতা** ও অন্যতম রক্ষাকবচ এবং অধিকারের অন্যতম সংরক্ষক বলিয়াই ধরা হয়।

২খ. **বিচার বিভাগের স্বাধীনতা** (লক, মন্টেস্কু, ম্যাডিসন প্রভৃতি রাষ্ট্র-বিজ্ঞানী **ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের নীতিকে** স্বাধীনতা ও অধিকারের ভিত্তিরূপে গণ্য করিলেও বর্তমানের ধারণা হইল যে পূর্ণ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ কার্যত সম্ভব এবং কাম্য—কোনটাই নয়। তবে বলা হয়, বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত রাখা প্রয়োজন। নচেৎ, বিচারকদের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ণ হইবে এবং নাগরিক-অধিকারও হইবে ব্যাহত।

২গ. **সংবিধানে অধিকারের ঘোষণা** ইহা ছাড়া দেশের সংবিধান লিখিত হইলে ঐ সংবিধানে মৌলিক অধিকারগুলি বিধিবদ্ধ করা প্রয়োজন বলিয়া অভিমত প্রদান করা হয়।

ভারতের লিখিত সংবিধানে মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ বলিয়া এ-সম্পর্কে কিছুটা বিস্তৃত আলোচনা করা যাইতে পারে।

৩. সংবিধানে অধি[illegible]ঘোষণা করার প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা (Need for and Utility of a Declaration of a Bill of Rights in a Constitution):

অধিকার সম্পর্কে ধারণা প্রাচীন হইলেও অধিকার ঘোষণার ইতিহাস অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক।

প্রেরণার উৎস প্রকৃতপক্ষে আঠার শতকে ফ্রান্সে মানব অধিকারের ঘোষণা (The French Declaration of Rights of Man) এবং মার্কিন দেশের স্বাধীনতার ঘোষণা ও মার্কিন দেশের সংবিধানে কতকগুলি অধিকারের ঘোষণার পর হইতেই অন্যান্য দেশের **সংবিধানে অধিকারের সনদ** জুড়িয়া দেওয়া এক প্রকার রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

৩.১ অধিকার সংবিধানভুক্ত করার বিপক্ষে যুক্তি: রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সংবিধানবিদদের মধ্যে অনেকেই অধিকারকে সংবিধানভুক্ত করার যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। **ডাইসির মতে,** নাগরিকের স্বাধীনতা সাধারণ আইন দ্বারাই সংরক্ষিত হইতে পারে—উহার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে অধিকারের সনদের [illegible] জন হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান গ্রহণের সময় **হ্যামিলটনও** (Alexander Hamilton) সংবিধানে অধিকার লিপিবদ্ধ করার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়া বলেন যে, অধিকার-সংরক্ষণের জন্য জনমত ও জনসাধারণ ও সরকারের বিবেচনার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিলেই চলে। অধিকার [illegible] উৎপত্তি হয় রাজা ও প্রজার চুক্তির মাধ্যমে। সুতরাং যেখানে সংবিধান জনগণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং জনসাধারণের প্রতিনিধি সরকারী ক্ষমতা প্রযুক্ত হয় সেখানে সংবিধান কর্তৃক অধিকার-সংরক্ষণের কোন প্রয়োজনই দেখা যায় না, কারণ সকল ক্ষমতাই জনগণের হস্তে ন্যস্ত থাকে।

৩.২. সপক্ষে যুক্তি এই সকল যুক্তি সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য দেশে কতকগুলি অধিকারকে সংবিধানভুক্ত করা হইয়াছে।[1] সপক্ষে প্রধান যুক্তি হইল নিম্নলিখিত রূপ **কতকগুলি অধিকার এত গুরুত্বপূর্ণ যে শাসন-কর্তৃপক্ষ ও আইনসভা—উভয়েরই হস্তক্ষেপ হইতে উহাদের সংরক্ষিত করা প্রয়োজন।** প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রে শাসনকার্য পরিচালনায় মাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত কার্যকর হয়। এই অবস্থায় সরকার গঠনকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের পক্ষে সংখ্যালঘুদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করা অসম্ভব নয়। উপরন্তু, জনমত-পরিচালিত গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় মত প্রকাশ, সভাসমিতির সংগঠন ইত্যাদির স্বাধীনতা অপরিহার্য, অথচ এই সমস্ত অধিকারই ক্ষুণ্ণ

১. এমনকি সোবিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের মত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতেও অধিকার সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। ১৯৭৮ সালে গৃহীত চীনের সংবিধানে বাক-স্বাধীনতা, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, সমবেত হওয়ার অধিকার, মিছিল বাহির করার অধিকার, কৃষকদের ব্যক্তিগত জমির অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রভৃতি স্বীকার করিয়া লওয়া হয় এবং ১৯৮২ সালের পরিমার্জিত সংবিধানে উহাদিগকে বজায়ই রাখা হইয়াছে।

হইবার আশংকা সর্বাধিক, কারণ নির্বাচনে জয়লাভ করিয়া শাসনক্ষমতায় আসীন থাকিবার জন্য সরকারী দল সমালোচনার পথ রুদ্ধ করিতে উদ্যত হয়।

সুতরাং বলা হয়, অধিকারসমূহকে সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করিয়া সরকার এবং আইনসভা উভয়কেই সীমাবদ্ধ করিয়া রাখা সমীচীন। সংবিধানের পরিবর্তন সহজসাধ্য না হইলে ঐ সকল অধিকারের উপর আঘাত হানা সহজে সম্ভবপর হয় না। কোন অধিকারকে ভংগ করা হইলে সংবিধানের ভিত্তিতে সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করা সহজসাধ্য হয়। সংবিধান আবার জনসাধারণকে তাহাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন রাখিতেও সাহায্য করে।[১]

ভারতীয় সংবিধানে অধিকার সন্নিবিষ্ট করার সপেক্ষে উপরি-উক্ত যুক্তিগুলি প্রদর্শিত হয়।

এই প্রসংগে আমাদের একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, কেবল সংবিধানে অধিকারসমূহ স্বীকৃতিলাভ করিলে বা লিপিবদ্ধ হইলেই যে সর্বসাধারণের জীবনে ঐগুলি বাস্তব হইয়া উঠিবে এমন কোন কথা নাই।[২]

একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। ভারতীয় সংবিধানে (১৬ অনুচ্ছেদ) বলা হইয়াছে, সরকারী চাকরি সম্পর্কে সমস্ত নাগরিকের সমান সুযোগ থাকিবে। বর্তমান অবস্থায় অধিকাংশ ভারতীয় নাগরিকদের নিকট এই অধিকারের মূল্য অতি সামান্যই। কারণ, শিক্ষাগত যোগ্যতা ভিন্ন সরকারী চাকরির সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব নয়। সংস্থান ও সুযোগের অভাবে ভারতে জনসংখ্যার অধিকাংশই (প্রায় ৬৫ শতাংশ) নিরক্ষর।[৩] অতএব **প্রয়োজন হইল সাম্যভিত্তিক অর্থ-ব্যবস্থাসহ সমাজ-ব্যবস্থা ও সামাজিক সম্পর্ক প্রবর্তনের**—অধিকার সংবিধানভুক্ত করাই যথেষ্ট নয়।

ইহা করা সম্ভব হয় নাই বলিয়া সমালোচকগণ ভারতীয় সংবিধানে সন্নিবিষ্ট মৌলিক অধিকারসমূহকে 'শূন্যগর্ভ' ও 'স্বাদহীন' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।[৪]

৪. ভারতীয় সংবিধানের অংগীভূত অধিকারসমূহের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of the Rights incorporated in the Constitution of India): ভারতীয় সংবিধানভুক্ত

১. "It is always useful to attack the executive in terms of law it has clearly offended, and the written enactment serves to remind the people that they have to fight for the preservation of their liberty." Laski

২. "It is true that to offer political rights or safeguards against intervention by the state, to men who are half-naked, illiterate underfed, and diseased is to mock their condition; they need medical help or education before they can understand, or make use of, an increase in freedom." Isaiah Berlin; *Two Concepts of Liberty*

৩. ১৯৮১ সালের জনগণনা।

৪. সুপ্রীম কোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি ভি. আর. কৃষ্ণস্বামী আয়ারের বর্ণনা ... ৯. ৫. ৮৩ তারিখে কলিকাতায় মুসলিম ইন্সটিটিউটে প্রদত্ত ভাষণ।

অধিকারসমূহকে প্রথমত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে : (ক) **মৌলিক অধিকার** (Fundamental Rights) এবং (খ) **রাষ্ট্র-পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি** (Directive Principles of State Policy)।

৪.১ দুই শ্রেণীর অধিকারের মধ্যে পার্থক্য : এই দুই শ্রেণীর মধ্যে মূল পার্থক্য হইল যে, মৌলিক অধিকারগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য কিন্তু নির্দেশমূলক নীতিসমূহকে বলবৎ করিবার ক্ষমতা কোন আদালতের নাই।

সুতরাং শাসন-কর্তৃপক্ষ মৌলিক অধিকারগুলি মানিয়া চলিতে বাধ্য, কিন্তু নির্দেশমূলক নীতিসমূহ অনুসরণ করিতে আইনত বাধ্য নহেন। এ-বিষয়ে ভারতীয় সংবিধান **আয়ারল্যাণ্ডের সংবিধানকে অনুসরণ** করিয়াছে। প্রসংগত উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, অর্থনৈতিক অধিকার—যেমন, **কর্মের অধিকার,** পীড়িতাবস্থায় ও বার্ধক্যে সরকারী সাহায্য পাইবার অধিকার, ইত্যাদি—এই **নির্দেশমূলক নীতিসমূহের অন্তর্ভুক্ত**।

৪.২. **অধিকারভোগে পার্থক্য** : দ্বিতীয়ত, মৌলিক অধিকারগুলির মধ্যে কতকগুলি—যেমন, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা—মাত্র ভারতীয় নাগরিকগণই ভোগ করিতে পারে। কতকগুলি অধিকার আবার—যেমন শাসনতান্ত্রিক প্রতিকারের অধিকার—নাগরিক ও অ-নাগরিক উভয়ই সমভাবে ভোগ করিতে সমর্থ।

৪.৩. **উদ্দেশ্যের প্রকারভেদ** : তৃতীয়ত, কতিপয় ক্ষেত্রে অধিকারের উদ্দেশ্য হইল শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করা, আবার কতিপয় ক্ষেত্রে সাধারণ নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তিত করাই অধিকারের উদ্দেশ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সরকারী চাকরিতে নাগরিকদের সমান সুযোগ থাকিবে—এই অধিকার রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রযোজ্য। কিন্তু যেখানে বলা হইয়াছে, কোন নাগরিক বংশ জাতি জন্মস্থানের দরুন অথবা নারী বা পুরুষ বলিয়া দোকান, সর্বসাধারণের ব্যবহার্য রেস্তোরাঁ, হোটেল ও সাধারণের প্রমোদস্থানে প্রবেশাধিকার লাভে অসমর্থ হইবে না অথবা বাধা পাইবে না—সেখানে অধিকারটি রাষ্ট্র বা অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রযোজ্য।

৪.৪. **বাধানিষেধ আরোপ ব্যাপারে আদালতের সীমিত ক্ষমতা** : চতুর্থত, বিভিন্ন অধিকারের উপর কি কি বাধানিষেধ থাকিবে উক্ত সংবিধান বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়া দিয়াছে। সুতরাং আদালতের বাধানিষেধ নির্দেশ করিবার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। এ-বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের সহিত ভারতীয় সংবিধানের পার্থক্য রহিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অধিকারের সীমা নির্দেশ করিবার ক্ষমতা হইল আদালতের হস্তে, সংবিধান এ-বিষয়ে কোন ব্যবস্থা করে নাই।

৪.৫. **বাধানিষেধের ব্যাপকতা** : আবার ভারতীয় সংবিধানে অধিকারের উপর যে-সকল বাধানিষেধের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা অনেক ক্ষেত্রে এতই ব্যাপক যে উহার তুলনা অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, নিবর্তনমূলক আটকের (preventive detention) কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। **এ. কে. গোপালন বনাম মাদ্রাজ** (অধুনা তামিলনাড়ু) **রাজ্য** মামলায় সুপ্রীম কোর্টের

বিচারক দাশ বিষয়টি সম্পর্কে মন্তব্য করেন: "আমাদের সংবিধানে নিবর্তনমূলক আটক মাত্র জরুরী অবস্থাজনিত আইনের বিষয়বস্তু বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই, স্বাভাবিক শান্তিপূর্ণ অবস্থায়ও আইনের বিষয়বস্তু হইতে পারে। **নিবর্তনমূলক আটক-ব্যবস্থা সংবিধানভুক্ত** করা এক নূতন বৈশিষ্ট্য। অন্যান্য দেশের সংবিধানের কথা যতদূর আমি জানি এই ব্যবস্থা সেখানে স্থান পায় নাই।"[১]

৪.৬. **পার্লামেণ্টের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করার ক্ষমতা**: আবার শুধু বাধানিষেধের কথা নয়, ১৯৭১ সালে সংবিধানের ২৪তম সংশোধন (24th Amendment, 1971) দ্বারা পার্লামেণ্টকে মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করিয়াও সংবিধানের সংশোধন করার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। অনেকের মতে, ইহার ফলে মৌলিক অধিকারের সংরক্ষণ-ব্যবস্থার তাৎপর্য ও গুরুত্ব বিশেষ আর থাকিবে না। কারণ, ক্ষমতাপ্রাপ্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের খেয়ালখুশির উপরই অধিকার নির্ভর করিবে এবং সংবিধানের অভিভাবক ও সংরক্ষক হিসাবে সুপ্রীম কোর্টের ভূমিকা বিশেষ থাকিবে না। অবশ্য সম্প্রতি সুপ্রীম কোর্ট দুইটি পৃথক পৃথক মামলায় এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছে যে পার্লামেণ্ট সংশোধন দ্বারা সংবিধানের মৌল বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ করিতে পারিবে না।[২]

৪.৭. **অধিকার স্থগিত রাখার ব্যবস্থা**: উপরন্তু, জরুরী অবস্থার ঘোষণা প্রবর্তিত থাকাকালীন রাষ্ট্রপতি আদেশ দ্বারা অধিকারসমূহকে বলবৎ করিবার জন্য আদালতের হস্তে যে প্রতিকারের অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে তাহা রহিত করিয়া রাখিতে পারেন।

৪.৮. **অধিকার কার্যকরকরণ ব্যবস্থার অনস্তিত্ব**: সপ্তমত, ভারতীয় সংবিধানে মৌলিক অধিকার বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু উহাদের কার্যকর করার জন্য যে-সমস্ত ব্যবস্থার প্রয়োজন সোবিয়েত ইউনিয়নের মত তাহার উল্লেখ করা হয় নাই।[৩]

৪.৯. **সম্পত্তির অধিকার ব্যবস্থাও সংবিধানভুক্ত**: অষ্টমত, ভারতীয় সংবিধানের সম্পত্তির অধিকার (property rights) সংক্রান্ত ব্যবস্থা এখনও—অর্থাৎ মৌলিক অধিকারের অধ্যায় হইতে সরাইয়া মাত্র বিধিবদ্ধ আইনে পরিণত করার পরও—ইংল্যাণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থার অনুরূপ, সমাজতন্ত্রী সমাজ-ব্যবস্থার দ্যোতক নহে।

৯.ক. **ব্যক্তিগত মালিকানার ধারণা**: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের সংবিধান প্রধানত এই ধারণার উপর ভিত্তিশীল যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি এমনকি উৎপাদনের উপায়সমূহের উপর ব্যক্তিগত মালিকানাস্বত্বকে যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। অবশ্য বর্তমান সময়ে 'জনকল্যাণমূলক' রাষ্ট্রের (Welfare or Social Service State) ধারণা চালু হওয়ার ফলে ব্যক্তিগত মালিকানা পূর্বের তুলনায় অধিক মাত্রায় নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। তৎসত্ত্বেও কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তির স্বার্থ যতটা সম্ভব সংরক্ষিত করার ব্যবস্থা রহিয়াছে।

---

১. *A. K. Gopalan v. State of Madras* **(1950)**

২. *Keshavananda v. State of Kerala* **(1973)**; *Minerva Mills v. Union of India* **(1980).**

৩. সোবিয়েত ইউনিয়নে সংবিধানভুক্ত অধিকারসমূহকে কার্যকর করার জন্য সংবাদপত্র, মুদ্রাযন্ত্র, সভাসমিতির স্থান ইত্যাদি জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য দেওয়া হইয়াছে।

যে-ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে রাষ্ট্রের পক্ষে হস্তক্ষেপ করা অপরিহার্য হইয়া পড়ে সে-ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। সেদিন পর্যন্ত ভারতীয় সংবিধানও এই একই ধারণার উপর ভিত্তিশীল ছিল। সংবিধানের ৩১(২) অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছিল যে কোন সম্পত্তি জনসাধারণের স্বার্থে রাষ্ট্র কর্তৃক গ্রহণ করা হইলে উহার জন্য আইনে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। অবশ্য কতকগুলি ক্ষেত্রে—যেমন ভূ-সম্পত্তির অধিকার অর্জন—ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক ছিল না। তবে সাধারণত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

১৯৭১ সালের ২৫তম সংশোধন ৩১(২) অনুচ্ছেদ হইতে অবশ্য ক্ষতিপূরণ (compensation) শব্দটি বাদ দিয়া কিছু অর্থ প্রদান (for an amount) বাক্যাংশটি বসান হয়। ফলে সম্পত্তি অধিগ্রহণ করিলে ক্ষতিপূরণ প্রদানের প্রশ্ন আর থাকে না, তবে কিছু পরিমাণ অর্থপ্রদান করিতে হইত। উপরন্তু, ৩১ অনুচ্ছেদের সহিত ৩১(গ) অনুচ্ছেদ [Art. 31 (c)] যোগ করিয়া বলা হয় যে রাষ্ট্র নির্দেশমূলক নীতি কার্যকর করিতে গিয়া কোন সাম্যের অধিকার, [সম্পত্তির অধিকার] ও স্বাধীনতার অধিকার ক্ষুণ্ণ করিয়া আইন পাস করিলে ঐ আইন অবৈধ হইবে না।

৪৪তম সংশোধন (১৯৭৮) দ্বারা সম্পত্তির অধিকারকে মৌলিক অধিকারের অধ্যায় হইতে সরাইয়া লইয়া মাত্র বিধিবদ্ধ অধিকারে পরিণত (statutory right) করা হইয়াছে। বলা হয়, ইহার ফলে রাষ্ট্রের পক্ষে ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তিকে নিয়ন্ত্রিত ও সামাজিক কল্যাণে নিয়োজিত করার পথে বাধা দূর হইয়াছে।

অবশ্য ইহা যেন মনে করা না হয় যে ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটানো হইয়াছে।

৪.১০. সেদিন পর্যন্ত নাগরিকের মৌল কর্তব্যের অনুল্লেখ: পরিশেষে আরও একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য. সোবিয়েত ইউনিয়নের মত দেশে একদিকে যেমন অধিকারের কথা উল্লিখিত হইয়াছে অপরদিকে নাগরিকের কর্তব্য ও দায়িত্ব সংবিধানে নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মূল ভারতীয় সংবিধানে নাগরিকদের কর্তব্যের কথা উল্লিখিত হয় নাই।

অবশ্য ১৯৭৬ সালে সংবিধানের ৪২তম সংশোধন দ্বারা নাগরিকদের কর্তব্যও সংবিধানভুক্ত করিয়া এই ত্রুটি দূর বা ফাঁক পূরণ করা হইয়াছে।

৫. ভারতীয় সংবিধানে সংরক্ষিত মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights guaranteed in the Constitution of India): ভারতীয় সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত মৌলিক অধিকারসমূহ বর্তমানে ছয়[1] শ্রেণীতে বিভক্ত. (১) সাম্যের অধিকার, (২) স্বাধীনতার অধিকার, (৩) শোষণের

১. ৪৪তম সংশোধন ('৭৮) সম্পত্তির অধিকার মৌলিক অধিকারের অধ্যায় হইতে সরাইয়া আনায় মৌলিক অধিকার বর্তমানে ছয় শ্রেণীর হইয়াছে। ইহা পূর্বে ছিল সাত শ্রেণীর।

বিরুদ্ধে অধিকার, (৪) ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার, (৫) সংস্কৃতি ও শিক্ষাবিষয়ক অধিকার, এবং (৬) শাসনতান্ত্রিক প্রতিকারের অধিকার।

৫.ক. আইনের মাধ্যমে মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করা সম্ভব নহে : এই অধিকারগুলি যাহাতে অব্যাহত থাকে সেই উদ্দেশ্যে সংবিধানে (১৩ অনুচ্ছেদ) বলা হইয়াছে যে অধিকারগুলির সহিত সামঞ্জস্যবিহীন সকল প্রচলিত আইনই বাতিল হইয়া যাইবে। সংবিধানের ১৩(১) অনুচ্ছেদে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে সংবিধানের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে ভারতে যে-সকল আইনকানুন প্রবর্তিত ছিল তাহা মৌলিক অধিকারের সহিত অসংগতিপূর্ণ হইলে বাতিল হইয়া যাইবে। ইহা ব্যতীত সংবিধানে নির্দেশ রহিয়াছে যে রাষ্ট্র মৌলিক অধিকারসমূহকে ক্ষুণ্ণ করিয়া কোন আইন পাস করিতে পারিবে না এবং পাস করা হইলেও ঐ আইন বাতিল হইয়া যাইবে [অনুচ্ছেদ ১৩(২)]।

৫.খ. সংশোধনের মাধ্যমে মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করার প্রশ্ন : এখন প্রশ্ন : পার্লামেণ্ট সংবিধানের সংশোধন (৩৬৮ অনুচ্ছেদ অনুসারে) করিয়া মৌলিক অধিকারের রদবদল করিতে পারে কি না? প্রথমে সুপ্রীম কোর্টের অভিমত ছিল যে রাষ্ট্র সাধারণ আইন পাস করিয়া মৌলিক অধিকারসমূহ ক্ষুণ্ণ করিতে পারে না, কিন্তু সংবিধানের সংশোধন করিয়া মৌলিক অধিকারসমূহের উপর হস্তক্ষেপ করিতে সমর্থ।[১]

খ.১. গোলকনাথের মামলা ৬৭ : ১৯৬৭ সালে গোলকনাথের মামলায় (Golaknath's case) সুপ্রীম কোর্ট উপরি-উক্ত সিদ্ধান্তকে বাতিল করিয়া দিয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের রায় দেয় যে সংবিধানের সংশোধনের সাহায্যে সংবিধান কর্তৃক সংরক্ষিত মৌলিক অধিকারসমূহকে হরণ বা ক্ষুণ্ণ করিবার কোন ক্ষমতাই পার্লামেণ্টের নাই।[২]

সুপ্রীম কোর্টের এই রায় বিভিন্ন মহলে বিতর্কের সৃষ্টি করে। আশংকা প্রকাশ করা হইয়াছিল যে ইহার ফলে সরকারের পক্ষে প্রগতিশীল নিয়মকানুন প্রবর্তন করা কঠিন হইয়া পড়িবে। একদিকে যেমন একথা ঠিক যে মৌলিক অধিকারের উপর যখন তখন হস্তক্ষেপ করা অনুচিত, অপরদিকে তেমনি আবার মৌলিক অধিকার সম্পূর্ণভাবে অপরিবর্তনীয় হইলে সরকার সময়োপযোগী ব্যবস্থাদি অবলম্বন করিতে সমর্থ হইবে না। যাহা হউক, গোলকনাথ মামলার প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিবার উদ্দেশ্যে ১৯৭১ সালে ২৪তম ও ২৫তম সংশোধন পাস করা হয়। ২৪তম সংশোধনে বলা হইয়াছে যে সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত মৌলিক অধিকার এবং অন্যান্য যে-কোন অংশের সংশোধন পার্লামেণ্ট করিতে পারিবে। এরূপ সংশোধনের ক্ষেত্রে ১৩ অনুচ্ছেদ প্রযুক্ত হইবে না—অর্থাৎ ১৩ অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে রাষ্ট্র মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করিয়া কোন আইন প্রবর্তন করিতে পারিবে না তাহা সংবিধানের সংশোধনের বেলায় প্রযোজ্য হইবে

---

১. ***Sankari Prasad* v. *Union of India* (1952)**

২. **"... Parliament will have no power from the date of this decision to amend any of the provisions of Part III of the Constitution so as *to take away* or *abridge* the Fundamental Rights." *Golaknath's Case* (1967)**

না। অন্যভাবে বলা যায়, উপরি-উক্ত সংশোধন অনুসারে পার্লামেন্ট সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করিতে সমর্থ। ২৫তম সংশোধনের দ্বারা সংবিধানে ৩১(গ) [31c)] অনুচ্ছেদ সংযুক্ত করা হয়। এই অনুচ্ছেদে ব্যবস্থা করা হয় যে সংবিধানের ৩৯(খ) ও ৩৯(গ) অনুচ্ছেদে বর্ণিত নির্দেশমূলক নীতি দুইটিকে কার্যকর করার জন্য আইন পাশ করা হইলে ঐ আইন সাম্যের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার এবং [সম্পত্তির অধিকার] ক্ষুণ্ণ করিয়াছে বলিয়া অবৈধ হইবে না এবং আদালতে ঐ আইন সম্পর্কে কোন আদালতে বৈধতার প্রশ্ন তোলা যাইবে না। উপরি-উক্ত দুইটি নির্দেশমূলক নীতি হইল : রাষ্ট্র এমনভাবে তাহার নীতি পরিচালিত করিবে যেন—(১) সর্বসাধারণের হিতার্থে দেশের সম্পদের মালিকানা ও কর্তৃত্ব বণ্টিত হয় ; এবং (২) দেশের অর্থ-ব্যবস্থার পরিচালনার ফলে সম্পদ ও উৎপন্ন উপায়সমূহ মুষ্টিমেয় লোকের হাতে পুঞ্জীভূত হইয়া জনসাধারণের স্বার্থের হানি না করে।

খ.২. কেশবানন্দের মামলা '৭৩: ১৯৭৩ সালে সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের সংশোধনসংক্রান্ত এক মামলায় (Kesavanada v. State of Kerala [1973]) অভিমত প্রকাশ করে যে ২৪তম ও ২৫তম সংশোধন বৈধ এবং মৌলিক অধিকার পরিবর্তিত করার ক্ষমতা পার্লামেন্টের রহিয়াছে। তবে **সংবিধানের মৌল প্রকৃতি বা কাঠামো পরিবর্তন এবং আদালতের এক্তিয়ার রহিত করা চলিবে না।** কারণ আদালতের আইনের বৈধতা বিচারের এক্তিয়ার সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।[১]

খ.৩. সংবিধানের ৪২তম সংশোধন: ইহার পর ১৯৭৬ সালে সংবিধানের ৪২তম সংশোধন পাস করা হয়। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সংশোধনে ৪ ও ৫৫ ধারা সংযুক্ত করা হয়। ৪ ধারা দ্বারা সংবিধানের ৩১(গ) [31 (c)] অনুচ্ছেদের সংশোধনের ফলে ৩১(গ) অনুচ্ছেদটি দাঁড়ায় এইরূপ : ১৩ অনুচ্ছেদে যাই বলা হোক না কেন, রাষ্ট্র যদি সকল কিংবা যে কোন নির্দেশমূলক নীতিকে কার্যকর করার জন্য আইন পাস করে তাহা হইলে ঐ আইন ১৪ (সাম্যের অধিকার) এবং ১৯ অনুচ্ছেদকে (স্বাধীনতার অধিকার) ভংগ করিলেও উহা অবৈধ হইবে না। এ সম্পর্কে আদালতে আইনের বৈধতার প্রশ্ন তোলা যাইবে না। ৪২তম সংশোধনের ৫৫ ধারা দ্বারা সংবিধানের সংশোধন সংক্রান্ত ৩৬৮ অনুচ্ছেদে দুইটি উপ-অনুচ্ছেদ [৩৬৮(৪) ও ৩৬৮(৫)—subsections 368 4) and 368(5)] যোগ করা। ৩৬৮(৪) অনুচ্ছেদে বলা হয় যে মৌলিক অধিকারসহ সংবিধানের যে-কোন সংশোধন করা হইলে কোন অজুহাতে উহার বৈধতা বিচারের প্রশ্ন কোন আদালতে তোলা যাইবে না। অর্থাৎ, কোন সংশোধনেরই বৈধতা আদালত করিতে পারিবে না।

---

১. বর্তমানে মৌল প্রকৃতি বা বিষয় চারিটি বলিয়া ধরা হয় : (১) গণতান্ত্রিকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতা, (২) সম্পত্তির অধিকার ছাড়া অন্যান্য মৌলিক অধিকার, (৩) সার্বিক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অবাধ ও স্বাধীন নির্বাচন, এবং (৪) বিচার বিভাগের বৈধতা বিচারের ক্ষমতা (courts' right to judicial review)। এই চারিটিকেই সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিবার ব্যবস্থা ৪৪তম সংশোধনে করা হইয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উহা পাস হয় নাই।

সংশোধিত ৩৬৮(৫) অনুচ্ছেদে বলা হয় যে পার্লামেন্টের সংশোধনের ক্ষমতার উপর কোন প্রকারের বাধানিষেধ থাকিবে না। অর্থাৎ, পার্লামেন্টের সংশোধন ক্ষমতা অসীম ও নিয়ন্ত্রণবিহীন।

খ.৪. মিনার্ভা মিলসের মামলা '৮০ : ১৯৮০ সালে ৪২তম সংশোধনের উপরি-উক্ত দুইটি ধারা মিনার্ভা মিলস বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন [Minerva Mills v. Union of India (1980)] মামলা প্রসংগে সুপ্রীম কোর্টের নিকট বিচারের জন্য আসে। এই মামলায় ৪২তম সংশোধনে সন্নিবিষ্ট ৪ এবং ৫৫ ধারা দুইটি অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করে অর্থাৎ সংবিধানের ৩১(গ) এবং ৩৬৮(৪) ও ৩৬৮(৫) অনুচ্ছেদকে বাতিল করিয়া দেওয়া হয়। কারণ, উভয় সংশোধনই সংবিধানের মৌল বৈশিষ্ট্যকে ক্ষুন্ন করিয়াছে বলিয়া মনে করা হয় এবং আইন বা সংশোধন বিচারের ক্ষমতা হইতে সুপ্রীম কোর্টকে বঞ্চিত করার অর্থ সংবিধানের মৌলিক কাঠামোকে পরিবর্তন করা। এই রায়ের ফলাফল দাঁড়ায় (১) মৌলিক অধিকারের উপর নির্দেশমূলক নীতিসমূহের প্রাধান্য থাকিবে না, (২) পার্লামেন্টের সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা অনিয়ন্ত্রিত বা অসীম নয় ; (৩) সংশোধন কিংবা সাধারণ আইনের বৈধতা বিচারে আদালতের ক্ষমতা ক্ষুন্ন করা যাইবে না ; (৪) এই রায়ের ফলে সংবিধানের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে।

এখন এই মামলাটির রায় বিভিন্ন মহলে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছে। এক মহল ইহাকে স্বাগত জানাইয়াছে।[২] অপরপক্ষে অনেকে মনে করেন যে এই রায় নাগরিকদের সামাজিক-অর্থনৈতিক অধিকার কার্যকর করার জন্য আইন প্রণয়নের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিবে।

এখন উপরি বর্ণিত পটভূমিকায় সংবিধান-স্বীকৃত বিভিন্ন মৌলিক অধিকারের বর্ণনা করা হইতেছে।

৩.১. সাম্যের অধিকার (Rights to Equality). সাম্যের অধিকার সম্পর্কে সংবিধানে (১৪ অনুচ্ছেদ) প্রথমেই বলা হইয়াছে যে ভারতের রাষ্ট্রক্ষেত্রের ভিতর কোন ব্যক্তির 'আইনের সমক্ষে সমতার অধিকার' (equality before the law) অথবা 'আইনসমূহ কর্তৃক সমভাবে সংরক্ষিত হইবার অধিকার' (equal protection of the laws) রাষ্ট্র অস্বীকার করিতে পারিবে না।

১.ক. প্রস্তাবনা অনুসরণ : সুপ্রীম কোর্টের ব্যাখ্যা হইল মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধার সমতা (equality of status and opportunity) প্রতিষ্ঠা করিবার যে মহান আদর্শ প্রস্তাবনায় ঘোষিত হইয়াছে সাম্যের অধিকার তাহাই কার্যকর করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে।[১]

---

১. 'The underlying object of this article (Art 14) is undoubtedly to secure to *all persons*, citizens or non-citizens the *equality of status* and *of opportunity* referred to in the glorious preamble of the Constitution. Das C. J in *Basheshar Nath v. Commr. of Income Tax* (1959)

২. "... the judgement of the Suprem Court striking down sections 4 and 55 of the Constitution (Forty-Second Amendment) Act, 1976, replenished the faith of those who understand the Supreme Court's role as *the watchdog of the Constitution*... ." N. A Palkhivala

রুজু বা পরিচালনা করা যায় না এবং তাঁহাকে গ্রেপ্তার বা কারাবাসের জন্য কোন আদালত পরোয়ানা বাহির করিতে পারে না। পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে বা পরে অনুষ্ঠিত ব্যক্তিগত কার্যের জন্য রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপাল যতক্ষণ পর্যন্ত পদে বহাল থাকিবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আদালতের কোন প্রকার দেওয়ানী মামলা রুজু করা যাইবে না যদি-না দুই মাসের নোটিস দেওয়া হয়।

(৩) আন্তর্জাতিক আইনের নিয়ম অনুসারে বিদেশী শাসক বা রাষ্ট্রদূত এই নীতির প্রয়োগ হইতে অব্যাহতি পাইয়া থাকেন—অর্থাৎ ইঁহারা ভারতীয় আদালতের এলাকাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন হন না।

(৪) ডাইসি-প্রদত্ত ব্যাখ্যা যে 'আইনের দৃষ্টিতে সমতা'র নীতি অনুসারে সকলেই সাধারণ আইন এবং সাধারণ আদালত কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইবে তাহা বর্তমান সক্রিয় গতিশীল কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য হইতে পারে না। ভারত এবং অন্যান্য সকল দেশেই এখন আইনসভা-প্রণীত সাধারণ আইন ছাড়াও **শাসন বিভাগ কর্তৃক রচিত** ও প্রবর্তিত বহু প্রকারের **নিয়মকানুন** রহিয়াছে। এই সকল শাসন বিভাগীয় আইন 'আইনের সমক্ষে সমতা'র নীতিকে ক্ষুণ্ণ করে কিনা তাহা নিশ্চয়ই বিচার্য বিষয়।

(খ) ২. দ্বিতীয় দিকটির—'আইন কর্তৃক সমভাবে সংরক্ষিত হইবার অধিকারের' তাৎপর্য: 'আইন কর্তৃক সমভাবে সংরক্ষিত হইবার অধিকার'—১৪ অনুচ্ছেদের এই দ্বিতীয় অংশটির ব্যাখ্যা হইল এইরূপ : 'আইন কর্তৃক সমভাবে সংরক্ষিত হইবার অধিকার' দ্বারা ইহা বুঝায় না যে লোকের অবস্থা বা প্রকৃতির বিভিন্নতা বিচার না করিয়া প্রত্যেক আইনকেই সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রে সমভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে, ইহা দ্বারা বুঝায় **আইন সমাবস্থায় অবস্থিত ব্যক্তিদের প্রতি সমাচরণ করিবে**।[১] রাষ্ট্র **যুক্তিসংগত ভিত্তিতে** বিভিন্ন ব্যক্তিকে শ্রেণীবিভক্ত করিয়া ঐ সকল শ্রেণীর আইনের প্রয়োগ ব্যাপারে **পৃথকীকরণ** করিতে পারে, কারণ বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের সমস্যা বিভিন্ন এবং ঐ সকল পৃথক পৃথক সমস্যা সমাধানের জন্য পৃথকভাবে নির্দিষ্ট আইন প্রয়োগ করিতে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আয়করের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। আয়কর নির্ধারণের জন্য রাষ্ট্র ব্যক্তিসমূহকে আয়ের পরিমাণ অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া বিভিন্ন হারে বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে আয়কর আদায় করিতে পারে। সুতরাং আইনসভা যদি যুক্তিযুক্তভাবে ব্যক্তিদের শ্রেণীবিভাগ করে এবং নির্দিষ্ট শ্রেণীভুক্ত সকল ব্যক্তির প্রতি সমাচরণ করে তাহা হইলে কোন আইন অন্যান্য শ্রেণীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হইলেও আইনের দ্বারা সমভাবে সংরক্ষিত হইবার অধিকার ক্ষুণ্ণ হয় না।[২]

এখন প্রশ্ন : শ্রেণীবিভাগ যুক্তিসংগত কি না, তাহার বিচারের মাপকাঠি কি? এ-ব্যাপারে সুপ্রীম কোর্টের অভিমত হইল, শ্রেণীবিভাগের ভিত্তি **প্রকৃত ও সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন** এবং যে

১. "...all persons *similarly circumstanced shall be treated alike* both in privileges and liabilities imposed." *State of West Bengal* v. *Anwar Ali* (1952)

২. *State of Bombay* v. *Balsara* (1959)

উদ্দেশ্যে আইন করা হইয়াছে তাহার সহিত যথোপযুক্ত সম্পর্ক থাকা চাই। অর্থাৎ, শ্রেণীবিভাগ যুক্তিসংগত হওয়ার জন্য শ্রেণীবিভাগকে **দুইটি সর্ত** পূরণ করিতে হইবে: (১) যে বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে একশ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিকে অন্যান্য শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তি হইতে পৃথক করা হয় তাহা সহজবোধ্য হওয়া চাই, এবং (২) ঐ বৈশিষ্ট্যের সহিত আইনের উদ্দেশ্যের যুক্তিসংগত সম্পর্ক থাকা চাই।[১] আবার সাম্যের অধিকার দ্বারা মাত্র অযৌক্তিক বিভেদমূলক আইনকেই নিষিদ্ধ করা হয় নাই, আইনের অন্যায় ও বিভেদমূলক প্রয়োগকেও নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। কোন আইন হয়ত ন্যায়সংগত ও নিরপেক্ষ হইতে পারে কিন্তু সরকার উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া ঐ আইনকে সমপর্যায়ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে বিভেদমূলকভাবে প্রয়োগ করিতে পারে। এক্ষেত্রে সরকারী বিভাগের কার্য অবৈধ বলিয়াই পরিগণিত হইবে। যাহা হউক, কোন আইন বা কোন আইনের প্রয়োগ সমভাবে সংরক্ষিত হইবার অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করিতেছে কি না তাহার চূড়ান্ত বিচারের ভার আদালতের হস্তে ন্যস্ত। এই দিক হইতে বলা যায় যে 'সাম্য' বলিতে কি বুঝাইবে না-বুঝাইবে, তাহা প্রধানত নির্ভর করে বিচারালয়ের বিচারবিবেচনার উপর।

১ গ. কয়েকটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে পৃথকাচরণ রহিতকরণ : ইহার পর সাম্যের অধিকার সম্পর্কে সংবিধানে বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্র কোন নাগরিকের প্রতি কেবল ধর্ম মূলবংশ বর্ণ জন্মস্থান বা স্ত্রী-পুরুষ ভেদে পৃথক আচরণ করিতে পারিবে না। কোন নাগরিক আবার মাত্র উপরি-উক্ত কারণগুলির জন্য দোকান, সর্বসাধারণের ব্যবহার্য রেস্তোরাঁ, হোটেল ও প্রমোদস্থানে প্রবেশ বিষয়ে এবং রাষ্ট্র কর্তৃক পোষিত কূপ জলাশয় স্নানঘাট পথ ও সমাগমস্থান ব্যবহার ব্যাপারে অসমর্থ বা সর্তাধীন হইবে না। অবশ্য স্ত্রীলোক, শিশু, শিক্ষায় ও সামাজিকভাবে অনুন্নত শ্রেণীসমূহ,[২] তপশীলী বর্ণ ও তপশীলী উপজাতিদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইবে।

১.ঘ. সরকারী চাকরিতে সকল নাগরিকের সুযোগের সমতা : সরকারী চাকরি সম্পর্কেও সংবিধানে সমানাধিকারের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। ১৬(১) ও (২) অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, সরকারের অধীনে চাকরি কিংবা পদে নিয়োগ ব্যাপারে সকল নাগরিকের সমান সুযোগ থাকিবে—কেবল ধর্ম মূলবংশ বর্ণ জন্মস্থান বাসস্থান এবং বংশের দরুন অথবা নারী বা পুরুষ বলিয়া কোন সরকারী চাকরি বা পদে নিযুক্ত হইবার জন্য কোন নাগরিক অযোগ্য বিবেচিত হইবে না অথবা ঐ সম্পর্কে তাহার প্রতি কোন বিভেদ করা যাইবে না। বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত অনুসারে এই সমানাধিকার মাত্র নিয়োগের সময়ই

১. "The classification *must not be arbitray* but must be *rational* .... In order to pass the test, two conditions must be fulfilled ... (1) that the classification must be founded on an intelligible differentia ... (2) that the differentia must have a rational relation to the object ... ." Das, J. in *State of West Bengal* v. *Anwar Ali* (1952)।

২. অনুন্নত শ্রেণী কথাটি অস্পষ্ট। তবে মোটামুটিভাবে বলা যায় যে তপশীলী বর্ণ, তপশীলী উপজাতি এবং অন্যান্য শ্রেণী প্রভৃতি লইয়াই অনুন্নত শ্রেণী গঠিত।

"... The Backward Classes are a large and mixed category of persons with boundaries that are both unclear and elastic. They are made of three principal components, the Scheduled Tribes, the Scheduled Castes and the Other Backward Classes." Andre Beteille: *The Backward Classes and the New Social Order*

প্রযুক্ত হইবে না; চাকরি বা নিয়োগসংক্রান্ত সকল ব্যাপারে—যেমন, বেতন বেতনবৃদ্ধি ছুটি পেনশন পদোন্নতি প্রভৃতি সম্পর্কেও উহা প্রযোজ্য।[১]

তবে এই সমানাধিকারের কতকগুলি ব্যতিক্রম নির্দেশ করা হইয়াছে।

সমানাধিকারের ব্যতিক্রম: প্রথমত, ইউনিয়ন সরকারের অধীনে চাকরি বা নিয়োগের ব্যাপারে বসবাসগত কোন যোগ্যতার প্রশ্ন না থাকিলেও, কোন অংগরাজ্যের অধীনে চাকরি কিংবা নিয়োগের ক্ষেত্রে সংসদ ঐ রাজ্যে **বসবাসগত যোগ্যতা** স্থির করিয়া দিতে পারে। বসবাসগত যোগ্যতা ধার্য করা সম্পর্কে ডক্টর আম্বেদকার বলিয়াছিলেন, যদিও ইহা ভারতীয় ঐক্য ও এক নাগরিকত্বের (single citizenship) ধারণার সংগে অসামঞ্জস্যপূর্ণ, তবুও দক্ষতা নিশ্চিত করিবার জন্য বসবাসগত যোগ্যতা স্থির করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। কারণ, তাহা না হইলে লোকে মাত্র চাকরির লোভে এক রাজ্য হইতে অন্য রাজ্যে ঘুরিয়া বেড়াইবে। ইহার ফলে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবে। রাজ্যের পরিবর্তে সংসদ বা **কেন্দ্রীয় আইনসভার হস্তে বসবাসগত যোগ্যতা নির্ধারণ করার ক্ষমতা** ন্যস্ত করার সপক্ষে যুক্তি হইল, সকল রাজ্যের ক্ষেত্রেই একপ্রকারের আইন প্রযুক্ত হইবে—অর্থাৎ বিভিন্ন রাজ্য বিভিন্নরকম বসবাসগত যোগ্যতা স্থির করিতে পারিবে না। চাকরির বা নিয়োগের সমান সুযোগের অধিকারের দ্বিতীয় ব্যতিক্রম হইল, রাষ্ট্র যদি মনে করে যে অনুন্নত শ্রেণীর নাগরিকরা (backward class of citizens) সরকারী চাকরিতে যথেষ্ট স্থান পায় নাই, তাহা হইলে রাষ্ট্র ঐ শ্রেণীর নাগরিকদের জন্য নিয়োগ বা পদ সংরক্ষিত করিতে পারে। কিন্তু অনুন্নত শ্রেণীর নাগরিক বলিতে কি বুঝায় তাহা সংবিধানে কোথাও ব্যাখ্যা করা হয় নাই। সুতরাং সামাজিক ক্ষেত্রে বা শিক্ষার ক্ষেত্রে বা অন্য যে-কোন দিক দিয়াই হউক না কেন, সকল প্রকার অনুন্নত শ্রেণীই উপরি-উক্ত সুবিধা ভোগ করিবে। কোন শ্রেণী অনুন্নত কি না, তাহা রাষ্ট্রই নির্ধারণ করিয়া দিবে।

১.ঙ. অস্পৃশ্যতাচরণকে নিষিদ্ধকরণ: অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য সংবিধান অস্পৃশ্যতাচরণকে নিষিদ্ধ করিয়াছে। অস্পৃশ্যতার দরুন যদি কোনরূপ অপারগতার উদ্ভব হয় তবে তাহা আইনানুসারে দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য।

এই উদ্দেশ্যে ১৯৫৫ সালে অস্পৃশ্যতাসংক্রান্ত অপরাধ আইন [The Untouchability (Offences) Act, 1955] পাস করা হইয়াছে।

১.চ. খেতাবের বিলুপ্তিসাধন: খেতাব সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্র সামরিক বা বিদ্যাবিষয়ক গুণের পরিচায়ক নহে এমন কোন খেতাব প্রদান করিতে পারিবে না। ভারতীয় নাগরিকগণ বৈদেশিক রাষ্ট্রের নিকট হইতে কোন খেতাব গ্রহণ করিবে না। লাভ বা বিশ্বাসমূলক সরকারী পদে অধিষ্ঠিত অ-নাগরিকগণও রাষ্ট্রপতির সম্মতি ব্যতীত বৈদেশিক রাষ্ট্রের নিকট হইতে উপাধি গ্রহণ করিতে পারিবে না।

প্রসংগত উল্লেখ্য যে, ১৯৫৪ সাল হইতে ভারত সরকার যে ভারতরত্ন, পদ্মবিভূষণ, পদ্মভূষণ প্রভৃতি সম্মান (honours) প্রদান করিয়া আসিতেছিল, জনতা সরকারের আমলে তাহা বন্ধ রাখা হয়।[২] ক্ষমতায় পুনরধিষ্ঠিত হইয়া কংগ্রেস (ই) সরকার (ইন্দিরা গান্ধীর সময়) আবার উহা চালু করে।

১. *General Manager, S. Rly.* v. *Rangachari* (1961)

২. *Year of Change* published by the Ministry of Information and Broadcasting, Government of India.

উপসংহার : প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কার্য হইল সকলের জন্য আত্মোপলব্ধির উপযোগ পরিবেশ সৃষ্টি করা। এই পরিবেশ সৃষ্টি সম্ভবপর করিতে হইলে সকলের সমান অধিকার স্বীকার ও সংরক্ষণ এবং সকল প্রকার বিশেষ সুবিধার বিলোপসাধনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ভারতীয় সংবিধান এই উদ্দেশ্যেই সাম্যের অধিকারকে মৌলিক অধিকারের মর্যাদা দিয়াছে। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে, সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত আইনগত সাম্যের এই অধিকার কখনই বাস্তবে পূর্ণ রূপায়িত হইতে পারিবে না। যে-পর্যন্ত না মোটামুটিভাবে আর্থিক ও সামাজিক সাম্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যথায় আইন থাকিবে কিন্তু উহা সকলের আত্মোপলব্ধির সহায়ক হইবে না।

আন্দ্রে বিটাইলের (Andre Beteille) উক্তি এখানে স্মরণ করা যাইতে পারে : **যতই সাম্যের কথা বলা হউক না কেন প্রকৃত ক্ষেত্রে সমাজের সমস্ত স্তরে বৈষম্য বিশেষভাবে প্রকট। গ্রাম ও শহরের মধ্যে, বিভিন্ন বর্ণের (castes) মধ্যে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর (classes) মধ্যে অনতিক্রম ব্যবধান এখনও বর্তমান।**[১]

এই প্রসংগে ফরাসী লেখক আনাতোল ফ্রাঁস (Anatole France) বিখ্যাত ব্যাংগোক্তিটির উল্লেখ করা যাইতে পারে : "আইন এতই উদার ও সমদৃষ্টিসম্পন্ন যে উহা ধনী ও নির্ধন উভয়েরই ক্ষেত্রে পুলের নিচে আশ্রয় গ্রহণ বা অন্নসংস্থানের উদ্দেশ্যে ভিক্ষা বা চৌর্য বৃত্তি অবলম্বন নিষিদ্ধ করে।" (The law in its majestic impartiality forbids the rich as well as the poor to sleep under bridges, to steal purses and to beg for bread.) সুতরাং ভারতে আইনকে কার্যত সমদৃষ্টিসম্পন্ন করিতে হইলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সংগে সংগে ধনবৈষম্যকেও হ্রাস করিতে হইবে। ইহা বর্তমান মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থায় সম্ভবপর নয়, একমাত্র সামাজিক মালিকানাভিত্তিক উৎপাদন ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণভিত্তিক বণ্টন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত করিতে পারিলেই সাম্য তাৎপর্যপূর্ণ হইয়া উঠিতে পারে।

৩.২. স্বাধীনতার অধিকার (Right to Freedom) :

সংবিধানে সংরক্ষিত অধিকারগুলির মধ্যে স্বাধীনতার অধিকারটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ইহাই হইল ব্যক্তি-স্বাধীনতা (personal liberty) এবং **গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার মূলভিত্তি।** ভারতীয় সংবিধানে এই অধিকারটি বিশেষভাবে প্রদান করা হইয়াছে সংবিধানের **১৯ অনুচ্ছেদের মাধ্যমে।**

(২)ক. ছয় প্রকারের স্বাধীনতা (Six Freedoms) : প্রকৃতপক্ষে অনুচ্ছেদটিতে যে স্বাধীনতার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে ছয়

১. "... A very *striking feature* of our Constitution is its *stress on equality.* It is present in the Preamble; it is present in the part embodying the Fundamental Rights; and it is present in the part laying down the Directive Principles of State Policy. ... Jurists have pointed out how we have gone further than most Constitutions, including the American, in inscribing the commitment to equality into ours. Despite all this, our practice continues to be permeated by inequality in every sphere. The *marks of inequality are visible in every form of collective life.*" **Andre Beteille :** *The Backward Classes and the New Social Order*

প্রকারের অধিকার বা স্বাধীনতা : (ক) বাক্য ও মতামত প্রকাশের অধিকার (the right to freedom of speech and expression); (খ) শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্র-ভাবে সমবেত হইবার অধিকার (the right to assemble peaceably and without arms); (গ) সমিতি বা ইউনিয়ন গঠনের অধিকার (the right to form association or unions); (ঘ) ভারতের রাজ্যক্ষেত্রে সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিবার অধিকার (the right to move freely throughout the territory of India); (ঙ) ভারতের সর্বত্র বসবাস করিবার অধিকার (the right to reside and settle in any part of the territory of India); এবং (চ) যে-কোন বৃত্তি অবলম্বন করিবার অথবা যে-কোন উপজীবিকা বা ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইবার অধিকার (the right to practise any profession, or to carry on any occupation, trade or business) ।

সম্পত্তির অধিকার এখন আর মৌলিক অধিকারের পর্যায়ে পড়ে না।[১]

(২)খ. অধিকারগুলির গুরুত্ব ও তাৎপর্য : সামাজিক, রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত যে-কোন দিক হইতেই দেখা যাক না কেন, এই অধিকারগুলি যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তাহা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। যেমন, চিন্তা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, সভা-সমিতিতে সংঘবদ্ধ হইবার অধিকার ইত্যাদি না থাকিলে ভাবের আদানপ্রদান সম্ভব হইত না এবং সমাজ ও ব্যক্তি উন্নয়নের পথে অগ্রসর হইতে পারিত না। গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার মূলভিত্তি হইল জনমত। মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা না থাকিলে জনমতের উপর ভিত্তিশীল শাসন-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিতে পারে না।[২]

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হইল যে, ভারতীয় সংবিধানে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা (freedom of the press) পৃথকভাবে উল্লিখিত হয় নাই।

সংবিধান-রচয়িতৃগণের বক্তব্য অনুসারে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা পৃথকভাবে উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন নাই, কারণ **মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার** (freedom of expre-ssion) **মধ্যেই মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা রহিয়া গিয়াছে।** আবার মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার সহিত অংগাংগিভাবে সম্পর্কিত হইল সমিতি বা সংঘ গঠন করার এবং সভাসমিতিতে মিলিত হওয়ার অধিকার। এই অধিকার দুইটি ব্যতীত মানুষ ভাবের আদানপ্রদান করিতে পারে না, দল গঠন করিয়া বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে জনমত গঠন ও অভিযোগ জ্ঞাপন করিতে পারে না। বর্তমান বৃহদায়তন রাষ্ট্রে সংঘবদ্ধভাবে ছাড়া ব্যক্তির পক্ষে মতামত প্রতিষ্ঠিত করা এবং অন্যায়ের প্রতিকার করা সম্ভব হয় না।

১. সম্পত্তির অধিকার ৪৪তম সংশোধন (১৯৭৮) দ্বারা মৌলিক অধিকারের অধ্যায় হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। সংবিধানের অন্যত্র [৩০০ (ক) অনুচ্ছেদ] বলা হইয়াছে যে আইন ব্যতীত কাহাকেও তাহার সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না।

২. "... freedom of speech and of the press lay at the foundation of all democratic organisations, for without free political discussion no public education ... is possible." Patanjali Shastri, J. in *Ramesh Thappar v. State of Madras* (1950)

(২) গ. অভিন্ন নাগরিকতার প্রতিফলন : আবার ভারতীয় সংবিধানে সকলের জন্য **এক অভিন্ন সর্ব-ভারতীয় নাগরিকতার ব্যবস্থা** করা হইয়াছে।[১] বিভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত করা হইলেও সংবিধানে ভারতের ঐক্যবদ্ধতা ও অভিন্নতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। সুতরাং ভারতের সবত্র সমভাবে চলাফেরা বসবাস ব্যবসাবাণিজ্য ইত্যাদি করার সুযোগসুবিধা ও অধিকার নাগরিকদের দেওয়া হইয়াছে।[২]

২. (ঘ) সম্পত্তি অর্জন ইত্যাদি অধিকার সম্বন্ধে মতবিরোধ : মূল সংবিধানে যে সম্পত্তি ভোগদখল ও বিক্রয় করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছিল সে-সম্পর্কে বলা হইত যে ব্যক্তিত্ববিকাশ ও সমাজবন্ধনের অন্যতম সর্ত হইল সম্পত্তির অধিকার। এ-সম্পর্কে ভিন্নমতও বিশেষ প্রবল ছিল। বর্তমানে সেই বিরোধী মতই প্রবলতর হইয়া উঠিয়াছে। তাই সম্পত্তির 'পবিত্র ও অলংঘনীয় অধিকার'কে (sacred and inviolable right to property) মৌলিক অধিকারের অধ্যায় হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে।

(জনতা আমলে) ১৯৭৮ সালের ৪৪তম সংশোধনের **ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।**

পরিশেষে **বৃত্তি, উপজীবিকা** বা **ব্যবসাবাণিজ্য সংক্রান্ত অধিকারটি** সম্পর্কে বলা যায় যে ভারতের সমাজ-ব্যবস্থায় ইহার বিশেষ উপযোগিতা রহিয়াছে। ভারতীয় সমাজে বর্ণ (caste) বা ধর্মের প্রাধান্য এখনও বর্তমান এবং অনেক স্থানেই লোকের বৃত্তি বা উপজীবিকা পছন্দ বা যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্ধারিত না হইয়া, ধর্ম বা বর্ণের ভিত্তিতে উত্তরাধিকারসূত্রে নির্ধারিত হয়। সুতরাং বৃত্তি, উপজীবিকা বা ব্যবসাবাণিজ্য সংক্রান্ত এই মৌলিক অধিকারটি ধর্ম বা বর্ণের বাধা অপসারিত করিয়া গতিশীল গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা গঠনে কতকটা সাহায্য করিবে বলিয়া আশা করা হয়।

(২) ঙ. স্বাধীনতার অধিকারসমূহের সীমাবদ্ধতা (Limitations of the Rights to Liberty) : স্বাধীনতার অধিকারের অন্তর্ভুক্ত এই যে ছয়টি অধিকারের কথা আলোচনা করা হইল তাহারা **নিরংকুশ** বা **অবাধ** (absolute) **নহে।** প্রকৃতপক্ষে কোন অধিকার বা স্বাধীনতাই অবাধ হইতে পারে না, কারণ অনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তি-স্বাধীনতার ফলে সামাজিক জীবন বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে এবং অরাজকতার ফলে কেহই স্বাধীনতা ভোগ করিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং যাহাতে সকলেই সমভাবে স্বাধীনতা ভোগ করিতে সমর্থ হয়, যাহাতে সুশৃংখল সমাজজীবন সম্ভব হয় এবং সমাজের বৃহত্তর স্বার্থ সংরক্ষিত হয় তাহার জন্য সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (social control) থাকা প্রয়োজন। কিন্তু একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, সরকারের হস্তে ব্যক্তি-স্বাধীনতার উপর বাধানিষেধ আরোপ করার অপরিমিত বা অত্যধিক ক্ষমতা দেওয়া হইলে সরকারী অত্যাচারের পথ প্রশস্ত হয় এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আদর্শ ক্ষুন্ন হয়।

১. আসাম চুক্তির ফলে এই ব্যবস্থা কিছুটা ব্যাহত হইয়াছে। ৮৮ পৃষ্ঠা দেখ।

২. "What the Constitution emphasises upon by guaranteeing these rights is that the whole of India in spite of its being divided into a number of States is really one unit so far as the citizens ... are concerned." Mukherjee, J. in *Gopalan* v. *State of Madras* (1950)

অতএব প্রয়োজন হইল সামাজিক নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যক্তির অধিকার বা স্বাধীনতার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা এবং ভারসাম্য বজায় রাখা।[১]

এখন দেখা যাক, ভারতীয় সংবিধান কর্তৃক নির্দিষ্ট বাধানিষেধগুলির প্রকৃতি কি?

(২) চ. স্বাধীনতার অধিকারের উপর বিভিন্ন বাধানিষেধ : সংবিধানের ১৯ অনুচ্ছেদ অনুসারে বর্তমানে নিম্নলিখিত কারণে আইন দ্বারা স্বাধীনতার বিভিন্ন অধিকারের উপর **যুক্তিসংগত বাধানিষেধ** (reasonable restrictions) আরোপ করা যাইতে পারে।

(২) ছ. বাক্য ও মতামত প্রকাশের অধিকারের উপর বাধানিষেধ : বাক্য ও মতামত প্রকাশ সম্পর্কে সংবিধান কর্তৃক নির্দিষ্ট বাধানিষেধের কারণগুলি হইল : (১) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, (২) ভারতের সার্বভৌমিকতা ও সংহতি রক্ষা, (৩) বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত মৈত্রীবন্ধন, (৪) জনশৃংখলা, (৫) শ্লীলতা বা সদাচার, (৬) বিচারালয়ের অবমাননা, (৭) মানহানি, এবং (৮) অপরাধ অনুষ্ঠানে প্ররোচিত করা। [১৯(২) অনুচ্ছেদ][২]

সংবিধান প্রবর্তনের সময় বাধানিষেধগুলি এত ব্যাপক ছিল না। বাধানিষেধের কারণগুলির মধ্যে ছিল **অপমান-লেখ** (libel), **অপমান-বচন** (slander), মানহানি, বিচারালয়ের অবমাননা, শ্লীলতা বা সদাচার এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ব্যাহত হয় বা রাষ্ট্রের উচ্ছেদ হইতে পারে এমন বিষয়।

(২) জ. বাধানিষেধের সম্প্রসারণ : সংবিধান প্রবর্তিত হওয়ার কিছুদিন পরেই সুপ্রীম কোর্ট **রমেশ থাপ্পর** বনাম **মাদ্রাজ রাজ্য** [Ramesh Thappar v. State of Madras (1950)] এবং **ব্রিজভূষণ বনাম দিল্লী রাজ্য** [Brij Bhushan and another v. State of Delhi (1950)] এই দুইটি মামলায় অভিমত প্রকাশ করে যে, সংবাদপত্রের বিষয়াদির প্রকাশের পূর্বে পরীক্ষার ব্যবস্থা (pre-censorship) মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করে এবং সংবিধান অনুযায়ী কোন বিষয় রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ব্যাহত বা রাষ্ট্রের উচ্ছেদ করিতে পারে এমন না হইলে, মাত্র জনশৃংখলা (public order) বা জনসাধারণের নিরাপত্তার (public safety) অজুহাতে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করা যায় না।

সুপ্রীম কোর্টের এই অভিমতকে অতিক্রম করিবার জন্য ১৯৫১ সালে সংবিধানের প্রথম সংশোধনের মারফত 'জনশৃংখলা', 'বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত মৈত্রীবন্ধন' এবং 'অপরাধ অনুষ্ঠানে প্ররোচিত করা' এই বাধানিষেধগুলি সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

---

১. **"What the Constitution, therefore, attempts to do in declaring the rights of the people is to strike a balance between individual liberty and social security." Mukherjee, J. in *Gopalan* v. *State of Madras* (1950)**

২. **ইহা ছাড়া ১৯৭৬ সালের ৪২তম সংশোধনে বলা হইয়াছিল যে জাতীয় স্বার্থবিরোধী কার্য বা সংঘ দমনের উদ্দেশ্যে কোন আইন পাস করা হইলে উহা স্বাধীনতার অধিকার ইত্যাদির বিরোধী বলিয়া অবৈধ হইবে না। ১৯৭৭ সালে ৪৩তম সংশোধন দ্বারা এই ব্যবস্থা আবার প্রত্যাহার করা হইয়াছে।**

ইহার পর আবার **১৯৬৩ সালে ১৬তম সংশোধন** (16th Amendment Act, 1963) দ্বারা ব্যবস্থা করা হয় যে রাষ্ট্র 'ভারতের সার্বভৌমিকতা' এবং 'ভারতের অখণ্ডতা'র (the integrity of India) স্বার্থে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার উপর যুক্তিসংগত বাধানিষেধ আরোপ করিতে পারিবে।

গণতন্ত্রবিরোধী প্রবণতা : এই আলোচনা হইতে দেখা যাইতেছে, সংবিধানের প্রথমাবস্থার তুলনায় বর্তমানে বাক্য ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার উপর বাধানিষেধ বসাইবার সরকারী ক্ষমতাকে ব্যাপকতর করা হইয়াছে। অনেকেই ইহাকে গণতন্ত্র-বিরোধী প্রবণতা (illiberal trend) বলিয়া সমালোচনা করিয়াছেন।

আবার 'বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত মৈত্রীবন্ধন' এবং 'অপরাধ অনুষ্ঠানে প্ররোচিত করা' ইত্যাদি কথার অর্থ অতি ব্যাপক। ইহা বাক্য ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতার ব্যাপকতার নির্দেশক।

(২) ঝ. সমবেত হইবার অধিকারের উপর বাধানিষেধ : সমবেত হইবার স্বাধীনতার (Freedom of Assembly) মধ্যে আছে সভা ও শোভাযাত্রার অধিকার। মূল সংবিধান অনুসারে সমবেত হইবার স্বাধীনতা তিনভাবে সীমাবদ্ধ ছিল : (ক) সভা বা জনসমাবেশ শান্তিপূর্ণ হইবে। (খ) নাগরিকগণকে নিরস্ত্রভাবে সমবেত হইতে হইবে। (গ) জনশৃংখলার স্বার্থে (in the interests of public order) রাষ্ট্র যে-কোন যুক্তিসংগত বাধানিষেধ আরোপ করিতে পারিত। **১৬তম সংশোধন** (১৯৬৩) দ্বারা রাষ্ট্রকে **আরও দুইটি কারণে** যুক্তিসংগত বাধানিষেধ আরোপ করিবার **ক্ষমতা** প্রদান করে : (১) উপরিল্লিখিত 'ভারতের সার্বভৌমিকতার স্বার্থ' এবং (২) 'ভারতের অখণ্ডতার স্বার্থ'।[১]

(২) ঞ. সমিতি বা ইউনিয়ন গঠনের অধিকারের উপর বাধানিষেধ : সমিতি বা ইউনিয়ন গঠনের অধিকার সম্পর্কে রাষ্ট্র **জনশৃংখলা বা সদাচারের স্বার্থে** (in the interests of public order or morality) যুক্তিসংগত বাধানিষেধের ব্যবস্থা করিতে পারে। সুতরাং নাগরিকগণ কোন অপরাধ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে মিলিত হইলে বা জনশৃংখলাকে ক্ষুণ্ণ করিয়া সমিতি গঠন করিলে অথবা কোন ইউনিয়ন বেআইনীভাবে ধর্মঘট করিলে তাহা নিষিদ্ধ করা যাইবে।

(২) ট. আসাম ও এসমা : দৃষ্টান্তস্বরূপ, আসামে অত্যাবশ্যকীয় সেবামূলক কার্যাদি সংরক্ষণ এবং স্বাভাবিক জীবন অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে ১৯৮০ সালে পার্লামেন্ট এক আইন (The Essential Services Maintenance (ASSAM) Act 1980 (ESMA) পাস করে। এই এসমা (ESMA) দ্বারা অত্যাবশ্যকীয় কার্যাদির ক্ষেত্রে ধর্মঘট নিষিদ্ধ করা হয় এবং যাহারা এইরূপ কার্যে অংশগ্রহণ করিবে বা উসকানি দিবে তাহাদের শাস্তি প্রদান করার ব্যবস্থা থাকে।

১. উপরে দেখ।

তবে বাধানিষেধ যুক্তিসংগত কি না তাহা বিচার করিবার ক্ষমতা হইল আদালতের

উপরি-উক্ত ১৬তম সংশোধনের ফলে রাষ্ট্র ভারতের 'সার্বভৌমিকতা' ও 'অখণ্ডতা' স্বার্থেও সমিতি বা ইউনিয়ন গঠনের অধিকারের উপর যুক্তিসংগত বাধানিষেধ আরোপ করিতে সমর্থ।[২]

(২) ঠ. চলাফেরা, বসবাস ইত্যাদির অধিকারের উপর বাধানিষেধ : চলাফেরা, বসবাস [ও সম্পত্তির] অধিকারসমূহ সম্পর্কে বাধানিষেধ আরোপ করিবার ভিত্তি হইল **জনস্বার্থ** (interests of the general public) এবং যে কোন **তপশীলী উপজাতির স্বার্থসংরক্ষণ** (Protection of the interests of any Scheduled Tribe)। যেমন, জনস্বার্থে সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিদের চলাফেরার স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত করা যায়। আবার তপশীলভুক্ত অনুন্নত উপজাতির (Tribal People) স্বার্থ যাহাতে স্বার্থান্বেষী চতুর ব্যক্তিরা ক্ষুণ্ণ না করে, তাহার জন্য এই সকল উপজাতির সম্পত্তি হস্তান্তর নিয়ন্ত্রিত করা যাইতে পারে।

(২) ড. বৃত্তি, উপজীবিকা ইত্যাদির অধিকারের উপর বাধানিষেধ : জনস্বার্থের খাতিরে বৃত্তি, উপজীবিকা ও ব্যবসাবাণিজ্যের অধিকার সম্পর্কেও রাষ্ট্র যুক্তিসংগত বাধানিষেধের ব্যবস্থা করিতে পারে। রাষ্ট্র আইন দ্বারা **বৃত্তিবিষয়ক বা প্রযুক্তিগত যোগ্যতা** (professional or technical qualification) নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারে, আবার নাগরিক বা অপর কাহারও পরিবর্তে রাষ্ট্র কর্তৃক অথবা রাষ্ট্রের আয়ত্তাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যে-কোন ব্যবসাবাণিজ্য প্রভৃতির পরিচালনার ব্যবস্থা আইনের দ্বারা করা যাইতে পারে। এই বাধানিষেধের পশ্চাতে যে যুক্তি রহিয়াছে তাহা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। যেমন, অনেক পেশা সম্পর্কেই জনসাধারণের স্বার্থে যোগ্যতা স্থির করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন না হইলে কোন ব্যক্তিকে চিকিৎসা করিতে দেওয়া নিশ্চয়ই বিপজ্জনক।

(২) ঢ. স্বাধীনতার অধিকারের আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য (A Few Other Characteristics of the Rights to Liberty) স্বাধীনতার অধিকারসংক্রান্ত সংবিধানের এই ১৯ অনুচ্ছেদটি সম্পর্কে আরও দুই-একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে।

ক। রাষ্ট্রের অবৈধ হস্তক্ষেপ হইতে ব্যক্তি-স্বাধীনতার সংরক্ষণ : প্রথমত, এই অনুচ্ছেদটিতে যে-সকল অধিকারের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার দ্বারা রাষ্ট্রের অবৈধ হস্তক্ষেপ হইতে ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে (civil liberty) সংরক্ষিত করা হইয়াছে। **ব্যক্তিবিশেষ অধিকারগুলিকে ভংগ করিলে তাহার প্রতিকার** এই ধারায় **পাওয়া যাইবে না,** প্রতিকারের জন্য সাধারণ আইনের আশ্রয়গ্রহণ করিতে হইবে।[৩]

১. *State of Madras* v. *Row* (1952)

২. The Constitution (Sixteenth Amendment) Act, 1963

৩. *Samdasani* v. *Central Bank of India* (1952)

খ। **যুক্তিসংগত বাধানিষেধ :** দ্বিতীয়ত, দেখা গিয়াছে যে আইন-প্রবর্তিত বাধানিষেধগুলি 'যুক্তিসংগত' হওয়া প্রয়োজন। আইনসভা যুক্তিসংগত বলিলেই চলিবে না, বাধানিষেধ যুক্তিসংগত কি না তাহার বিচার করিবার চূড়ান্ত **ক্ষমতা হইল** আদালতের। বাধানিষেধ যুক্তিসংগত কি না তাহা বিচারের সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য এমন কোন **ধরাবাঁধা** মাপকাঠি নির্ণয় করা যায় না। তবে বাধানিষেধগুলি **বিষয়গত** এবং **পদ্ধতিগত—উভয় দিক** (substantive and procedural aspects) **হইতে যুক্তি বা ন্যায়সংগত হওয়া প্রয়োজন**। বিষয়গত দিক হইতে বাধানিষেধ যেন স্বেচ্ছাচারমূলক বা প্রয়োজনের অধিক না হয়, তাহা দেখিতে হয়।[১] পদ্ধতিগত দিক হইতে বলা হয় যে বাধানিষেধ আরোপ করার পদ্ধতি (the procedure or manner of imposition of restrictions) ন্যায়সংগত হইতে হইবে। স্বাভাবিক ন্যায়ের (principles of natural jusrice) লংঘন করা চলিবে না।

গ। **১৯ অনুচ্ছেদ সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে :** তৃতীয়ত, সংবিধান প্রবর্তনের পর বহুদিন পর্যন্ত সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্ত ছিল যে কোন আইন সংবিধানের **১৯ অনুচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তুর সহিত প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত হইলে তবেই ঐ অনুচ্ছেদ** প্রযোজ্য হইবে। তাহার মুখ্য বিষয়বস্তু ১৯ অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়বস্তু নয়, এমন কোন আইনের ফলে কাহারও উক্ত অনুচ্ছেদের অন্তর্গত অধিকার ক্ষুণ্ণ হইলে ঐ অনুচ্ছেদ প্রযুক্ত হইবে না।

অধিকারসংক্রান্ত বিভিন্ন অনুচ্ছেদ—যেমন, ২১ ২২ এবং ১৯ অনুচ্ছেদ—স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সম্পর্কবিহীন।

যেমন, নিবর্তনমূলক আটকসংক্রান্ত সংবিধানের ২২ অনুচ্ছেদের ভিত্তিতে কাহাকেও আটক করা হইলে স্বাভাবিকভাবেই ঐ ব্যক্তির ১৯ অনুচ্ছেদে বর্ণিত স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার, বাক্‌ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা ইত্যাদি ক্ষুণ্ণ হয়, কিন্তু তৎসত্ত্বেও উক্ত অনুচ্ছেদের ভিত্তিতে কোন প্রতিকার পাওয়া যাইবে না। আবার সংবিধানের ৩১(২) অনুচ্ছেদ অনুসারে কোন ব্যক্তির সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে রাষ্ট্র গ্রহণ করিলে তাহা ১৯ অনুচ্ছেদের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা যাইবে না।[২]

১৯৭০ সালে কুপার বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন (R. C. Cooper *v.* Union of India) **মামলায়[৩] সুপ্রীম কোর্ট এই রায় প্রদান করে যে অধিকারসংক্রান্ত বিভিন্ন ধারা পরস্পর সম্পর্কবিহীন নয়, একটি অনুচ্ছেদ অন্যান্য অনুচ্ছেদের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিতে হইবে।**

১. "Legislation which arbitrarily or excessively invades the right cannot be said to contain the quality of *reasonableness.*" *Chintaman Rao* v. *State of M. P.* (1952)

২. বর্তমানে সম্পত্তির অধিকার আর মৌলিক অধিকার নয়।

৩. এই মামলায় ১৯৬৯ সালের ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্তকরণ আইনের বৈধতা বিচার করা হয়।

সুতরাং সংবিধানের ৩১ অনুচ্ছেদে যে সম্পত্তির অধিকারের ব্যবস্থা ছিল এবং ১৯ অনুচ্ছেদে যে সম্পত্তির অধিকারের উল্লেখ ছিল, ঐ দুইটি অনুচ্ছেদ একসংগে বিচার করিয়া সংশ্লিষ্ট আইনের বৈধতা স্থির করিতে হইবে।[১]

১৯৭১ সালের ২৫তম সংশোধনের দ্বারা এই রায় নাকচ করার ব্যবস্থা হয়। উহাতে বলা হয়, সম্পত্তির অধিকারসংক্রান্ত আইনের ক্ষেত্রে ১৯ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত সম্পত্তি-সংক্রান্ত ব্যবস্থা প্রযুক্ত হইবে না।

এখানে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতে পারে যে ৪৪তম সংশোধন (১৯৭৮) অনুসারে সম্পত্তির অধিকার এখন আর মৌলিক অধিকারের পর্যায়ে পড়ে না।

(২) গ. স্বাধীনতার অধিকারের অন্যান্য ব্যবস্থা (Other Provisions for Right to Freedom): ১৯ অনুচ্ছেদের পরবর্তী তিনটি পূর্ণ অনুচ্ছেদের বিষয়বস্তু হইল স্বাধীনতার অধিকার।

১। **অপরাধী সাব্যস্ত সম্পর্কে সংরক্ষণ:** ইহার মধ্যে ২০(১) অনুচ্ছেদে অপরাধী সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে বলা হইয়াছে যে, **বিশেষ সময়ের** কার্যকে প্রচলিত আইন-ভংগের জন্য অপরাধজনক বলিয়া বিবেচিত না হইলে কাহাকেও অপরাধী সাব্যস্ত করা যাইবে না,[২] এবং অপরাধ যে সময় করা হয় **সেই সময়ের আইনে যে দণ্ড দেওয়া যাইত তাহার অধিক দণ্ডও দেওয়া যাইবে না।**

২। **একই অপরাধের জন্য একাধিকবার দণ্ড প্রধান রহিত:** ২০(২) অনুচ্ছেদে আরও বলা হইয়াছে, একই অপরাধের জন্য একাধিকবার অভিযুক্ত ও দণ্ডপ্রদান করা যায় না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানেও অনুরূপ ব্যবস্থা রহিয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তিকে একই অপরাধের জন্য দ্বিতীয়বার বিপদের (*double jeopardy*) **সম্মুখীন করা যাইবে না।**

ব্রিটেনের আইন হইতেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান এই অধিকারটি গ্রহণ করিয়াছে।

একই অপরাধের জন্য একাধিকবার অভিযুক্ত ও দণ্ডপ্রদান করা সম্পর্কে ভারতীয় সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্ত হইল যে, অধিকারটি আদালত বা বিচারসংক্রান্ত কোন ট্রাইব্যুন্যালের সমক্ষে বিচারের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য; অন্য কোন বিচারের ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য নয়। যেমন, কোন সরকারী কর্মচারী অপরাধের জন্য আদালতে দণ্ডিত হইতে পারে; আবার

১. "We are unable to agree that Articles 19(1)(*f*) and 31(2) are mutually exclusive. A law affecting property must, therefore, be tested by reference to both Articles 19 and 31 of the Constitution." *R. C. Cooper* v. *Union of India* (1970)

২. যেমন, হিন্দু সংহিতা (The Hindu Code) পাস হইবার আগে যে হিন্দু দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়াছে সে দ্বিবিবাহের (bigamy) জন্য অভিযুক্ত হইবে না।

সেই সংগে সরকারী বিভাগ তাহার কার্যের তদন্ত করিয়া শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে।[১]

৩। **নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যপ্রদান নিষিদ্ধকরণ :** অপরাধের জন্য দোষসিদ্ধি সম্পর্কে ২০(৩) অনুচ্ছেদে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যাইবে না।

(২) ত. জীবনের নিরাপত্তা ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার সংরক্ষণ (Protection of Life and Personal Liberty) : সংবিধানে জীবনের নিরাপত্তা ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সম্পর্কে যে অধিকার দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইল এইরূপ :

আইনবিহিত পদ্ধতি ব্যতীত কাহাকেও তাহার জীবন বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না (২১ অনুচ্ছেদ)।

---

(২) থ. সুপ্রীম কোর্ট-কর্তৃক এই স্বাধীনতার ব্যাখ্যা : ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট **গোপালন বনাম মাদ্রাজ রাজ্য** (Gopalan *v.* State of Madras) এবং অন্যান্য কয়েকটি মামলায় এই অধিকারটির বিভিন্ন অংশের যে ব্যাখ্যা প্রদান করে তাহাতে অধিকারটির গুরুত্ব ও কার্যকারিতা খুবই সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। অধিকারটির বিশ্লেষণে দুইটি প্রশ্ন বিশেষভাবে প্রাসংগিক। প্রথমত, অধিকারটিতে 'ব্যক্তি-স্বাধীনতা'র (personal liberty) কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং দেখা প্রয়োজন যে, **'ব্যক্তি-স্বাধীনতা' কথাটির অর্থ** কি। দ্বিতীয়ত, অধিকারটিতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে **'আইনবিহিত পদ্ধতি'** (procedure established by law) ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে তাহার জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না।

এখানে প্রশ্ন হইল, 'আইনবিহিত পদ্ধতি' বলিতে কি বুঝায় এবং এই অধিকার-সংরক্ষণের ব্যাপারে আদালতের ক্ষমতা বা ভূমিকা কি?

(২) দ. ব্যক্তি-স্বাধীনতার তাৎপর্য : ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কথাটি ব্যাপক এবং সংকীর্ণ উভয় অর্থেই ব্যবহার করা যায়। ব্যাপক অর্থে ব্যাখ্যা করিয়া ইংল্যাণ্ডের বিচারক **অ্যালফ্রেড ডেনিং** (Lord Justice Alfred Denning) এই উক্তি করিয়াছেন : ব্যক্তি-স্বাধীনতা বলিতে আমি বুঝি যে প্রত্যেক আইন-শৃংখলানুগকারী নাগরিকের স্বাধীনভাবে চিন্তা করা, স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করা এবং স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার রহিয়াছে, এবং এই অধিকারের পথে অন্য কেহ বাধাবিপত্তি সৃষ্টি করিতে পারিবে না।[২]

ভারতের সুপ্রীম কোর্ট কিন্তু **প্রথম দিকে** 'ব্যক্তি-স্বাধীনতা' ধারণাটির **সংকীর্ণ অর্থ** প্রদান করে, পরবর্তী কালে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিবার দিকে ঝুঁকে। ১৯ অনুচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত সকল প্রকার স্বাধীনতার অধিকার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা দ্বারা বুঝায়।

---

১. *Venkataraman* v. *Union of India* (1954)

২. "By personal freedom I mean the freedom of every law-abiding citizen to think what he will, to say what he will, and to go where he will on his lawful occasions without let or hindrance from any other persons." **Sir Alfred Denning** : ***Freedom under the Law* (*Hamlyn Lectures* of 1949)**

(২) থ. সুপ্রীম কোর্টের সর্বশেষ ব্যাখ্যা : সুতরাং ১৯ অনুচ্ছেদে বর্ণিত অধিকারসমূহ এবং ২১ অনুচ্ছেদে সংরক্ষিত ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে সংযুক্তভাবে দেখিতে হইবে। কোনটিই অন্য-নিরপেক্ষ নহে।[১]

বিষয়টির আর একটু বিস্তৃততর আলোচনা করা যাইতে পারে। ১৯ অনুচ্ছেদে যে সকল অধিকার দেওয়া হইয়াছে—বিশেষত ভারতের সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিবার অধিকার (the right to move freely throughout the territory of India)—তাহার সংগে ২১ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত ব্যক্তি-স্বাধীনতার সম্পর্ক কি হইবে? এ-বিষয়ে এতদিন পর্যন্ত সুপ্রীম কোর্টের অভিমত ছিল যে, কোন আইন ১৯ অনুচ্ছেদের সহিত প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত না হইলে ঐ অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হইবে না। যেমন, শাস্তিমূলক আটক বা নিরাপত্তামূলক আটকসংক্রান্ত আইনের (punitive or preventive detention) ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদ প্রযুক্ত হইবে না এবং ফলে আদালত এরূপ আইনের যৌক্তিকতা বিচার করিতে পারিবে না। আবার বলা হইয়াছিল, **১৯ অনুচ্ছেদে বর্ণিত চলাফেরার স্বাধীনতার সহিত ২১ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত ব্যক্তিগত স্বাধীনতার কোন সম্পর্ক নাই**—দুইটি অনুচ্ছেদ স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পৃথক। সুতরাং ১৯ অনুচ্ছেদ ২১ অনুচ্ছেদ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। পরিশেষে বলা হয়, **মাত্র স্বাধীন নাগরিকই** (free citizen) **১৯ অনুচ্ছেদে সংরক্ষিত** চলাফেরার স্বাধীনতা, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা ইত্যাদি বিভিন্ন অধিকার ভোগ করিতে পারে। যে-নাগরিক শাস্তিমূলক বা নিবর্তনমূলক আটক আইনে ব্যক্তি-স্বাধীনতা হইতে আইন-সংগতভাবে বঞ্চিত হইয়াছে, তাহার ক্ষেত্রে ১৯ অনুচ্ছেদ প্রয়োগের কোন প্রশ্নই নাই। সুতরাং এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আদালতেরও যৌক্তিকতা (reasonableness) বিচারের এক্তিয়ার নাই। সম্প্রতি অবশ্য সুপ্রীম কোর্ট এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছে যে ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার ১৯ অনুচ্ছেদে বর্ণিত অধিকার হইতে বিচ্ছিন্ন নয়।

সুতরাং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হরণের ক্ষেত্রে আইন-নির্দিষ্ট পদ্ধতি যুক্তিসংগত কিনা তাহা আদালত বিচার করিতে পারিবে।[২] **যুক্তিসংগত কিনা তাহা বিচারের মাপকাঠি হইল সংশ্লিষ্ট বাধানিষেধকারী আইনটি ন্যায়নীতি অনুসরণ করিয়াছে কিনা।**

(২) ন. 'আইনবিহিত পদ্ধতি' কথাটির ব্যাখ্যা : সংবিধানে বলা হইয়াছে যে, 'আইনবিহিত পদ্ধতি ব্যতীত' (except according to procedure established by law) কাহারও ব্যক্তি-স্বাধীনতা হরণ করা যাইবে না। এক্ষেত্রেও আদালত প্রথমে কথাটির সংকীর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান করে। **গোপালন বনাম মাদ্রাজ রাজ্য** এবং অন্যান্য আরও কয়েকটি মামলায় সুপ্রীম কোর্ট এই অভিমত প্রকাশ করে যে, আদালত মাত্র দেখিবে, আইন কর্তৃক নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে জীবন বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করা হইতেছে কি না ; **আইনটি যুক্তিসংগত কিনা** অথবা **আইন-নির্ধারিত**

১. *Maneka Gandhi v. Union of India* (1978)

২. একই মামলা

পদ্ধতি যুক্তিযুক্ত কিনা, তাহা বিচার করিবার ক্ষমতা বা এক্তিয়ার আদালতের নাই। এখানে 'আইন' বলিতে বৈধ ও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক আইনকে (positive law) বুঝায় ; কোন স্বাভাবিক ন্যায়ের নীতির (principles of natural justice) প্রশ্ন এখানে উঠে না। ন্যায়বিচারের দিক হইতে আইন যতই অযৌক্তিক হোক না কেন, উহাতে আদালতের বলিবার কিছু নাই। সুতরাং বলা হয়, এই অধিকার দ্বারা **শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রিত করিবার ব্যবস্থা** করা হইয়াছে, কারণ শাসন-কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দিষ্ট আইন-নির্ধারিত পদ্ধতি ছাড়া কোন ব্যক্তিকে তাহার জীবন বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবে না। **আইনসভা কিন্তু ইহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে না** এবং আইনসভা স্বেরাচারী হইলেও উহার বিরুদ্ধে আদালতের কোন প্রতিকার পাওয়া যাইবে না। আইনসভা যে-আইন যেভাবে প্রণয়ন করিবে, তাহার যৌক্তিকতা আদালত বিচার করিতে সমর্থ হইবে না।

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে বর্তমানে 'আইন' এবং 'আইনবিহিত পদ্ধতি'কে যুক্তিসংগত (reasonable) হইতে হইবে বলিয়া আদালত মত প্রকাশ করিয়াছে।[১]

(২) প. গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কিত অধিকার : গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কে ভারতীয় সংবিধানে বলা হইয়াছে যে, কাহাকেও যথাশীঘ্র কারণ না জানাইয়া গ্রেপ্তার করিয়া আটক রাখা যাইবে না, পছন্দমত আইন-ব্যবসায়ীর সহিত পরামর্শ করিবার ও আইন-ব্যবসায়ী দ্বারা আত্মসমর্থনের অধিকার ধৃত ব্যক্তির থাকিবে, গ্রেপ্তার ও আটক করা হইলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে উপস্থিত করিতে হইবে এবং কোন ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি ব্যতীত কাহাকেও উক্ত সময়ের বেশী আটক রাখা যাইবে না [২২(১) ও (২) অনুচ্ছেদ]।

(২) ফ. এই অধিকার কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে অপ্রযোজ্য নয় : গ্রেপ্তার করা ও আটক রাখা সম্পর্কিত এই অধিকার শত্রুভাবাপন্ন বিদেশীয় (enemy aliens) এবং **নিবর্তনমূলক আটক** (preventive detention) আইনে গ্রেপ্তার করা বা আটক হইয়াছে এমন ব্যক্তিদের বেলা প্রযোজ্য নয় [২২(৩) অনুচ্ছেদ]। এখন এই 'নিবর্তনমূলক আটক' সম্বন্ধে কিছুটা বিশদ আলোচনা করা প্রয়োজন।

(২) ব. নিবর্তনমূলক আটক ও স্বাধীনতার অধিকার (Preventive Detention and Right to Freedom) : সংবিধান অনুসারে সংসদ দেশরক্ষা, বৈদেশিক বিষয়সমূহ ও ভারতের নিরাপত্তা সম্পর্কিত কারণের জন্য এবং পার্লামেণ্ট ও রাজ্য বিধানমণ্ডল কোন অংগরাজ্যের নিরাপত্তা, জনশৃংখলা অক্ষুণ্ণ রাখা বা সমাজের পক্ষে অত্যাবশ্যক সংভরণসমূহ (supplies) ও সেবাসমূহ (services) অক্ষুণ্ণ রাখা সম্পর্কিত কারণের জন্য নিবর্তনমূলক আটক আইন প্রণয়ন করিতে পারে।

১. *Maneka Gandhi* v. *Union of India*

৪৪তম সংশোধন (১৯৭৮)[১] অনুসারে 'নিবর্তনমূলক আটক' আইনে এককালীন দুই মাসের (পূর্বে ছিল ৩ মাস) অধিককাল আটক রাখা যায় না। **দুই মাসের অধিককাল** আটক রাখিতে হইলে সংশ্লিষ্ট মহাধর্মাধিকরণের (High Court) কার্যরত বিচারক এমন একজন সভাপতি ও যে-কোন হাইকোর্টের অন্যূন ২ জন কার্যরত বা অবসরপ্রাপ্ত বিচারক লইয়া গঠিত উপদেষ্টা পর্ষদের (Advisory Board) অভিমত প্রয়োজন।[২]

(২) ভ. 'নিবর্তনমূলক আটক' সম্পর্কে সংসদের ক্ষমতা: তবে ৪৪তম সংশোধন ('৭৮) অনুসারে সংসদ আইন করিয়া পর্ষদের অভিমত ব্যতিরেকেও দুই মাসের (পূর্বে ছিল তিন মাস) অধিককাল আটক রাখার ব্যবস্থা করিতে পারে। আটকের সর্বাধিক মেয়াদ কতকাল হইবে, তাহাও নির্ধারণ করিবার ক্ষমতা সংসদের আছে। অবরুদ্ধ ব্যক্তির স্বার্থসংরক্ষণের ব্যবস্থা হইল যে, আটকের আদেশপ্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে যথাসম্ভব শীঘ্র অবরুদ্ধ ব্যক্তিকে আটকের কারণ জানাইতে হইবে এবং আটকের বিরুদ্ধে নিবেদনের সুযোগ প্রদান করিতে হইবে। তবে ঐ কর্তৃপক্ষ যে-সকল তথ্য প্রকাশ জনস্বার্থবিরোধী বলিয়া মনে করিবে, তাহা প্রকাশ করিতে বাধ্য নয়।

'নিবর্তনমূলক আটক' কথাটির অর্থ: এখানে প্রশ্ন করা স্বাভাবিক যে 'নিবর্তনমূলক আটক' বলিতে কি বুঝায়? কোন অপরাধ করিয়াছে এই কারণে নয়, ভবিষ্যতে কোন অপরাধ করিতে পারে এই কারণে যখন কোন ব্যক্তিকে বিনা বিচারে আটক রাখা হয় তখন তাহাকে 'নিবর্তনমূলক আটক' বলা হয়।

সুতরাং নিবর্তনমূলক আটকের বেলায় আদালতের সমক্ষে কোন অপরাধ প্রমাণ করিবার প্রয়োজন হয় না, সন্দেহই হইল ইহার ভিত্তি।

অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা: অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশে, যুদ্ধের মত সংকটাবস্থা ব্যতীত শান্তিপূর্ণ সময়ে নিবর্তনমূলক আটকের ব্যবস্থা থাকে না।[৩]

---

১. বর্তমান সময় পর্যন্ত সংশোধনের এই অংশটুকু চালু করা হয় নাই, পূর্বের ব্যবস্থাকেই অব্যাহত রাখা হইয়াছে। পূর্বের ব্যবস্থা অনুসারে নিবর্তনমূলক আটক আইনে এককালীন তিন মাসের অধিককাল কোন ব্যক্তিকে আটক রাখা যাইত না। তিন মাসের অধিককাল আটক রাখিতে হইলে মহাধর্মাধিকরণের (High Court) বিচারক হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত উপদেষ্টা বোর্ডের (Advisory Board) অভিমত প্রয়োজন।

জাতীয় নিরাপত্তা আইনসংক্রান্ত মামলায় (The National Security Act Case, 1981) আবেদনকারীরা দাবি জানান যে সুপ্রীম কোর্ট নূতন সংশোধনটিকে চালু করার জন্য সরকারকে নির্দেশ প্রদান করুক। সুপ্রীম কোর্ট এই দাবিকে অগ্রাহ্য করিয়া নির্দেশ দানে অস্বীকার করিয়াছে।

২. ১৯৭৮ সালের ৪৪তম সংশোধনে বলা হইয়াছে যে, পরামর্শদাতা বোর্ডের সদস্যদের নিয়োগ করিবেন সংশ্লিষ্ট হাইকোর্টের প্রধান বিচারক।

৩. "In England, it would shock one to be told that a man can be deprived of his personal liberty without a fair trial or hearing." Fajal Ali, J. in *Gopalan v. State of Madras*

(২) ম. প্রয়োগ : ভারতীয় সংবিধান অনুসারে এইরূপ সংকটাবস্থার উদ্ভব হোক বা না-হোক, সকল সময়েই 'নিবর্তনমূলক আটক' আইন প্রবর্তনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ভারত সরকার **১৯৫০ সালে প্রথম 'নিবর্তনমূলক আটক'** আইন প্রণয়ন করে এবং পরবর্তী সময়ে একাধিকবার সংশোধন করিয়া উহাকে চালু রাখে। ১৯৭৮ সালের এক আইনের **দ্বারা আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষা আইনের** (MISA) **বিলুপ্তি** সাধন করা হয়।[১] সম্প্রতি (১৯৮০ সাল) আবার **জাতীয় নিরাপত্তা আইন** (National Security Act—NSA) পাস করা হইয়াছে। এই আইন অনুসারে সমাজবিরোধী ও জাতীয় স্বার্থবিরোধী ব্যক্তিদের বিনা বিচারে আটক করিতে পারে। ইহা ছাড়া রহিয়াছে ১৯৭৪ সালের বিদেশী মুদ্রা সংরক্ষণ এবং বিনা শুল্কে গোপনে মাল আমদানি বা পাচার করা বন্ধকরণসংক্রান্ত আইন [the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (COFEPOSA)]। কয়েকটি রাজ্যও নিবর্তনমূলক আটক আইন প্রবর্তন করিয়াছে।

'নিবর্তনমূলক আটক' বা উহার পরিবর্তিত কোনরূপের ব্যাপারে আদালতের বিশেষ ভূমিকা নাই। সুতরাং আইনটি যুক্তিসংগত কি না, ইত্যাদির বিচারে শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের সুবিবেচনার উপর নির্ভর করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। বস্তুত, **মৌলিক অধিকারের সংগে বিনা বিচারে আটকের ব্যবস্থা অসংগত বলিয়াই বোধ হয়।** গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার সহিত ইহার কোন সংগতি দেখা যায় না।[২] এই কারণে ইহার বিলোপসাধনের সপক্ষে দাবি বিশেষ প্রবল ও সোচ্চার।

৩. শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার (Right against Exploitation) : ২৩ অনুচ্ছেদ দ্বারা মানুষ ক্রয়বিক্রয়, বেগার খাটানো ও অন্যান্য অনুরূপ উপায়ে বলপূর্বক শ্রম করানো দণ্ডনীয় অপরাধ হিসাবে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে, অবশ্য রাষ্ট্র জনসাধারণের প্রয়োজনে সকলকেই কার্য করিতে বাধ্য করিতে পারে। পরবর্তী **২৪ অনুচ্ছেদ** অনুসারে কম বয়স্ক শিশুদের কোন কারখানা, খনি অথবা অন্য কোন বিপজ্জনক কার্যে নিয়োগ করা যায় না।

৪. ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার (Right to Freedom of Religion) : ভারতীয় সংবিধানে ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের (Secular State) আদর্শ গ্রহণ করা হইয়াছে। ধর্ম-নিরপেক্ষ বলিতে কিন্তু ইহা বুঝায় না যে রাষ্ট্র ধর্মবিরোধী (anti-religious) হইবে অথবা রাষ্ট্রের মধ্যে কোন ধর্মের স্থান থাকিবে না। ইহার দ্বারা বুঝায় যে ভারতীয় রাষ্ট্র বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে নিরপেক্ষতা বজায় রাখিয়া চলিবে।[৩]

১. The Maintenance of Internal Security (Repeal) Act, 1978 (Act No. 2706, 1978)

২. *"Preventive detention laws are repugnant to democratic constitutions and they cannot be found to exist in any of the democratic countries of the world."* Mahajan, J. in *Gopalan* v. *State of Madras*

৩. "The Indian State by becoming secular has not become irreligious. Its secularism is negative in the sense of not permitting religious considerations to enter into the principles of state action ... ." K. M. Panikkar : *The Foundations of New India*

রাষ্ট্রের কাজকারবার হইল মানুষের সামাজিক সম্পর্ক (social relations) লইয়া, মানুষের ধর্ম বা বিশ্বাস লইয়া নয়। ধর্ম বা বিশ্বাস মানুষের সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেকের ব্যাপার। সুতরাং ধর্ম-নিরপেক্ষ গণতন্ত্রে সকলকেই সমানভাবে ধর্ম ও বিবেকের স্বাধীনতা দিতে হইবে। যাহাতে ভারতের সকল ধর্মাবলম্বী লোক সমানভাবে এই স্বাধীনতা ভোগ করিতে সমর্থ হয় এবং যাহাতে ধর্মের ব্যাপারে রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা অক্ষুণ্ণ থাকে তাহার জন্য সংবিধানে বিস্তৃত ব্যবস্থা রহিয়াছে।

(৪)ক. ব্যবস্থার বিশ্লেষণ: প্রথমত, সংবিধানে (২৫ অনুচ্ছেদ) নির্দেশ রহিয়াছে যে, সকল ব্যক্তিই সমভাবে বিবেকের স্বাধীনতা (freedom of conscience), ধর্মস্বীকার ধর্মাচরণ ও ধর্মপ্রচারের স্বাধীন অধিকার ভোগ করিবে।

সুপ্রীম কোর্টের ব্যাখ্যা: এই অধিকারটির ব্যাখ্যা প্রসংগে সুপ্রীম কোর্ট বলিয়াছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার নিজস্ব বিবেক অনুযায়ী মাত্র ধর্মীয় মতাবলম্বন করিবার অধিকার ভোগ করে না, ধর্মীয় অনুশাসন অনুযায়ী বাহ্যিক আচারানুষ্ঠান পালন করিবার এবং অপরাপর নৈতিক উন্নয়নসাধনের জন্য ধর্মীয় মতামত প্রচারের অধিকারও তাহার আছে।[১]

রাষ্ট্র মূলত কোন ধর্মীয় বিষয়ের উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। তবে কোন আচারানুষ্ঠান নির্দিষ্ট ধর্মবিশেষের পালনায় নীতির অবিচ্ছেদ্য অংগ কি না তাহা নির্ধারণ করিবার অধিকার আদালতের আছে।[২]

শিখধর্মাবলম্বী সম্পর্কে সংবিধানে বিধান রহিয়াছে যে ইহারা কৃপাণ ধারণ ও বহন করিতে পারিবে. যদিও ছয় প্রকারের স্বাধীনতাভুক্ত (পূর্বে সম্পত্তির অধিকারসহ ছিল সাত প্রকারের) সমবেত হইবার অধিকার হইল অস্ত্রহীন অবস্থায়।

ধর্মীয় স্বাধীনতার বাধানিষেধ: উপরি-বর্ণিত ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার কিন্তু নিরংকুশ বা অবাধ নহে—বিভিন্ন কারণে রাষ্ট্র এই অধিকারের উপর বাধানিষেধ আরোপ করিতে পারে। যেমন, জনশৃংখলা সদাচার জনস্বাস্থ্য এবং অন্যান্য মৌলিক অধিকার যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সেই উদ্দেশ্যে ধর্মীয় স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ করা যায়। ইহা সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে ধর্মীয় **স্বাধীনতার নামে অপরাধ অনুষ্ঠান করিতে দেওয়া হয় না।** আবার রাষ্ট্র ধর্মাচরণের সহিত সংশ্লিষ্ট যে-কোন অর্থ নৈতিক (economic), বৈত্তিক (financial), রাজনৈতিক (political) অথবা অন্য লোকায়ত (secular) কাজকর্মকে নিয়ন্ত্রিত করিতে সমর্থ। সামাজিক কল্যাণ ও সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যেও রাষ্ট্র ধর্মীয় স্বাধীনতার উপর বাধানিষেধ আরোপ করিতে পারে।

দ্বিতীয়ত, ভারতের সংবিধানে **মাত্র ব্যক্তিকেই ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার দেওয়া হয় নাই, বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়কেও** (religious denominations)

১. *Ratilal v. State of Bombay* (1958)
২. *Hanif Quareshi v. State of Bihar* (1958)

কতকগুলি বিষয়ে অধিকার প্রদান করা হইয়াছে। সংবিধান (২৬ অনুচ্ছেদ) অনুসারে প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদায় অথবা উহার যে-কোন অংশ (ক) ধর্ম ও দানের উদ্দেশ্যে সংস্থা স্থাপন ও পোষণ করিবার, (খ) ধর্মবিষয়ে আপন আপন কার্যাবলীর ব্যবস্থা করিবার, (গ) স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন করিবার ও মালিক হইবার, এবং (ঘ) আইন অনুযায়ী ঐ সম্পত্তি পরিচালনা করিবার অধিকার ভোগ করে। অবশ্য রাষ্ট্র জনশৃংখলা, সদাচার ও জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে ধর্মসম্প্রদায়ের উল্লিখিত অধিকারকে সীমাবদ্ধ করিতে সমর্থ।

তৃতীয়ত, ধর্ম বিষয়ে রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা যাহাতে নিশ্চিত হয় এবং যাহাতে এক ধর্মসম্প্রদায় অন্য ধর্মসম্প্রদায়ের উপর বলপূর্বক আপন মতামত বা বিশ্বাস চাপাইয়া দিতে না পারে, তাহার জন্য সংবিধানে কতকগুলি নির্দেশ রহিয়াছে।

যেমন, সংবিধানে বলা হইয়াছে যে কোন বিশেষ ধর্ম বা ধর্মসম্প্রদায়ের প্রসার বা পোষণের জন্য কোন ব্যক্তিকে করপ্রদান করিতে বাধ্য করা যাইবে না। আবার সম্পূর্ণভাবে সরকারী অর্থ দ্বারা পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মশিক্ষা দেওয়া যাইবে না; যেক্ষেত্রে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃতি অথবা সরকারী অর্থসাহায্য পায় সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের নিজেদের এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক হইলে তাহাদের অভিভাবকদের অনুমতি ছাড়া কোন ধর্মীয় শিক্ষায় যোগদান করিতে বাধ্য করা যাইবে না [২৮(৩) অনুচ্ছেদ]।

৫. **সংস্কৃতি ও শিক্ষাবিষয়ক অধিকার (Cultural and Educational Rights).** ভারতে বসবাসকারী নাগরিকদের অংশবিশেষের নিজস্ব বিশিষ্ট **ভাষা, লিপি ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের** অধিকার রহিয়াছে। সরকার-পরিচালিত বা সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কেবল ধর্ম, মূলবংশ, বর্ণ বা ভাষার দরুন কাহাকেও প্রবেশাধিকার হইতে বঞ্চিত করা যায় না। ধর্মভিত্তিকই হউক বা ভাষাভিত্তিকই হউক, সকল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিজেদের পছন্দমত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালিত করিবার অধিকার আছে। সরকারী সাহায্যের ব্যাপারে ইহাদের প্রতি বিভেদমূলক আচরণ করা যায় না।

● **সম্পত্তির অধিকার (Right to Property):** পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে ৪৪তম সংশোধনের দ্বারা সম্পত্তির অধিকার মৌলিক অধিকারের অধ্যায় হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। মৌলিক অধিকার না হইলেও ইহা এখন অন্যতম বিধিবদ্ধ অধিকার (a statutory right)। **৪৪তম সংশোধন সংবিধানে ৩০০(ক) অনুচ্ছেদটি যোগ** করিয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে **কোন ব্যক্তিকে আইনের নির্দেশ ব্যতীত তাহার সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না।** যাহা হোক পূর্বের ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

মালিকের অনুমতি ব্যতিরেকেই তাহার ব্যক্তিগত সম্পত্তি জনস্বার্থে অধিকার বা দখল করিবার ক্ষমতা প্রত্যেক সার্বভৌম শক্তির রহিয়াছে। ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই ক্ষমতা সম্পত্তির **সর্বোপরি ক্ষমতা** (eminent domain) নামে অভিহিত। এই ক্ষমতা প্রয়োগের তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হয়: (১) ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য আইনের নির্দেশ থাকা প্রয়োজন; (২) জনস্বার্থ বর্তমান থাকা প্রয়োজন; এবং (৩) ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্পর্কে পাশ্চাত্য দেশে স্বীকৃত নীতি: 'পুলিসী ক্ষমতা'র দ্বারাও ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করা যায়। ইহার দ্বারা বুঝায় জনস্বার্থ বা জনকল্যাণ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করিবার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে। পুলিসী ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য অনেক সময়ই ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিনাশ বা দখল করিবার প্রয়োজন হইতে পারে। এইরূপ বিনাশ বা দখলের জন্য ক্ষতিপূরণ করিবার দরকার হয় না।

সম্পত্তির অধিকারসংক্রান্ত ব্যবস্থা সংবিধানের ৩১ অনুচ্ছেদে করা হইয়াছিল। মূল সংবিধানে (এই অনুচ্ছেদে) বলা হইয়াছিল যে আইন ব্যতীত কাহাকেও সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না এবং রাষ্ট্র আইন কর্তৃক কাহারও সম্পত্তি দখল বা অধিগ্রহণ করিলে তাহার জন্য ক্ষতিপূরণ (compensation) দিতে হইবে। অনুচ্ছেদটি সংবিধানের সংশোধনের মাধ্যমে একাধিকবার পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত করা হইয়াছে। এই সকল সংশোধনের পর সম্পত্তির অধিকারসংক্রান্ত সাংবিধানিক ব্যবস্থা যাহা দাঁড়াইয়াছিল তাহা সংক্ষেপে হইল এইরূপ:

ভারতের সম্পত্তির অধিকারের বর্তমান প্রকৃতি: কোন ব্যক্তিকে আইনের নির্দেশ ব্যতীত সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করা যাইত না। ইহার পর বলা হইয়াছিল, রাষ্ট্র কাহারও সম্পত্তি সর্বজনের উদ্দেশ্যে দখল বা অধিগ্রহণ করিতে চাহিলে **সংশ্লিষ্ট আইনে অর্থপ্রদানের** (to be acquired *for an amount*) **ব্যবস্থা** করিতে হইবে। এই অর্থপ্রদানের পরিমাণ পর্যাপ্ত কি না তাহা অবশ্য আদালতে বিচার করা যাইবে না। উহা আইন দ্বারা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে, অথবা উহা আইন কর্তৃক নির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে নির্ধারিত হইবে। এই অর্থ কিভাবে দেওয়া হইবে তাহাও আইন কর্তৃক নির্দিষ্ট হইবে। ইহা ব্যতীত ২৫তম সংবিধানে বলা হইয়াছে যে রাষ্ট্র যদি ৩৯ (খ) ও ৩৯ (গ) অনুচ্ছেদে[১] বর্ণিত নির্দেশমূলক নীতি দুইটি কার্যকর করিবার জন্য আইন প্রবর্তন করে, তাহা হইলে ঐ আইন সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদে বর্ণিত 'সাম্যের অধিকার', ১৯ অনুচ্ছেদে বর্ণিত 'স্বাধীনতার অধিকার' এবং ৩১ অনুচ্ছেদে বর্ণিত 'সম্পত্তির অধিকার' ক্ষুণ্ণ করিয়াছে, এই কারণে অবৈধ হইবে না। ১৯৭৬ সালের ৪২তম সংশোধনে ইহার আরও পরিবর্তন করিয়া সংবিধানের ৩১(গ) অনুচ্ছেদে বলা হয়, নির্দেশমূলক নীতির যে-কোনটিকে কার্যকর করার জন্য আইন প্রণয়ন করা হইলে উহা সাম্যের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার [ও সম্পত্তির অধিকার] ক্ষুণ্ণ করিয়াছে বলিয়া, অবৈধ হইবে না। ১৯৭৮ সালের ৪৪তম সংশোধন দ্বারা 'সম্পত্তির অধিকার' কথাটিকে বাদ দেওয়া হইয়াছে কারণ সম্পত্তির অধিকার আর এখন মৌলিক অধিকার নয়।

রাষ্ট্র কর্তৃক ব্যক্তিগত সম্পত্তি অধিগ্রহণের সর্তাবলী: সুতরাং মোটামুটি-ভাবে বলা যায়, ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত করার তিনটি প্রধান সর্ত ছিল: (১) সর্বজনীন উদ্দেশ্য বর্তমান, (২) আইন এবং (৩) অর্থপ্রদানের (ক্ষতিপূরণের নহে) ব্যবস্থা থাকা চাই।

ব্যক্তিগত সম্পত্তি দখল বা অধিগ্রহণের উদ্দেশ্যে রাজ্য বিধানমণ্ডল কর্তৃক প্রণীত আইন রাষ্ট্রপতির সম্মতি ব্যতীত কার্যকর হইতে পারে না। এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে, সম্পত্তির অধিকার নাগরিক এবং অ-নাগরিক উভয় শ্রেণীই সমভাবে ভোগ করিতে সমর্থ।

সম্পত্তির অধিকারের বর্তমান অবস্থা: সংবিধানের বিভিন্ন সংশোধনের মাধ্যমে সম্পত্তির অধিকারকে সংকুচিত করা হইলেও অধিকারটির মৌলিকত্ব সম্বন্ধে বিশেষ মতবিরোধ থাকিয়া যায়। কারণ, ইহা সমাজতান্ত্রিক আদর্শের অনুপন্থী নয়। এইজন্য ৪৪তম সংশোধন দ্বারা ইহাকে

১. সংবিধানে নির্দেশমূলক নীতিসংক্রান্ত ৩৯(খ) ও ৩৯(গ) অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে: রাষ্ট্র এমনভাবে তাহার নীতি পরিচালনা করিবে, যেন—(১) সর্বসাধারণের হিতার্থে দেশের সম্পদের মালিকানা ও কর্তৃত্ব বণ্টিত হয়; এবং (২) দেশের অর্থ-ব্যবস্থার পরিচালনার ফলে সম্পদ ও উৎপাদনের উপায়সমূহ, মুষ্টিমেয় লোকের হস্তে পুঞ্জীভূত হইয়া জনসাধারণের স্বার্থের হানি না করে। (নির্দেশমূলক নীতির প্রসংগে আরও আলোচিত হইবে।)

মৌলিক অধিকারের অধ্যায় হইতে সরাইয়া বিধিবদ্ধ আইনের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। সংবিধানের ৩০০(ক) অনুচ্ছেদ অনুসারে কোন নাগরিককে আইন ব্যতীত তাহার সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না। অর্থাৎ, **সম্পত্তির অধিকার সংবিধানভুক্ত হইলেও বর্তমানে অন্যতম বিধিবদ্ধ অধিকার মাত্র** (only a statutory right)। ●

৬. **শাসনতান্ত্রিক প্রতিকারের অধিকার** (Right to Constitutional Remedies): বলা হয় যে, অধিকার বলবৎকরণের এবং অধিকারভংগের প্রতিকারের শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা না থাকিলে অধিকার অর্থহীন হইয়া পড়ে।

এই বলবৎকরণ ও প্রতিকারের ব্যাপারে ভারতীয় সংবিধান যে-ব্যবস্থা নিবন্ধ করিয়াছে তাহা একদিকে ব্রিটেনের শাসন-ব্যবস্থা এবং অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান হইতে গৃহীত।

আদালত কর্তৃক মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পদ্ধতি অবলম্বনে ভারতীয় সংবিধানে বলা হইয়াছে যে, মৌলিক অধিকারগুলিকে বলবৎ করিবার জন্য **প্রধান ধর্মাধিকরণের নিকট আবেদন করা যাইবে**। ৩২ অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রধান ধর্মাধিকরণ (Supreme Court) অধিকারকে বলবৎকরণের জন্য **বন্দী প্রত্যক্ষীকরণ** (*habeas corpus*), যে কোন **পরমাদেশ** (*mandamus*), **প্রতিষেধ** (prohibition), **অধিকার-পৃচ্ছা** (*quo warranto*) এবং **উৎপ্রেষণ** (*certiorari*) প্রভৃতির লেখ, আদেশ বা নির্দেশ (writs, orders or directions) জারি করিতে পারে। এই লেখ, আদেশ বা নির্দেশ জারির ক্ষমতাই ব্রিটিশ শাসন-ব্যবস্থা হইতে গৃহীত। লিখিত সংবিধান না থাকায় ইহাদের মাধ্যমেই ব্রিটিশ আদালত-সমূহ প্রথাগত আইনের (Common Law) অন্তর্ভুক্ত অধিকারসমূহ সংরক্ষিত করিয়া থাকে। ভারতীয় সংবিধানের ২২৬ **অনুচ্ছেদবলে মহাধর্মাধিকরণগুলিরও**

১. **বন্দী-প্রত্যক্ষীকরণ** (*Habeas Corpus*): কি কারণে আটক করা হইয়াছে, তাহা জানিবার জন্য আদালত এই প্রকারের আদেশ দ্বারা অবরুদ্ধ ব্যক্তিকে আদালতের সমক্ষে উপস্থিত করিতে হুকুম দিতে পারে এবং আটক আইনসংগত না হইলে অবরুদ্ধ ব্যক্তিকে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করে। আদালত এই বন্দী-প্রত্যক্ষীকরণের আদেশ যে কোন সরকারী বা বেসরকারী ব্যক্তির প্রতি দিতে সমর্থ। আমাদের সংবিধানে ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। যেমন, সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে আইনগত পদ্ধতি ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে তাহার জীবনের নিরাপত্তা বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না। এখন এমন যদি হয় যে শাসন বিভাগ কোন ব্যক্তিকে বে-আইনীভাবে আটক করে অথবা আইনবিহিত পদ্ধতি ছাড়াই আটক করে অথবা যদি যে-আইনে আটক করা হইয়াছে সে-আইন অবৈধ তাহা হইলে সুপ্রীম কোর্ট বা হাইকোর্ট বন্দী-প্রত্যক্ষীকরণের আদেশ দিতে পারে এবং আটক ব্যক্তিকে মুক্তিপ্রদান করিতে পারে। এই বন্দী-প্রত্যক্ষীকরণের আদেশ দু'একটি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়—যেমন ফৌজদারী দায়ে অভিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে আদালত যদি আটক করিয়া থাকে তাহা হইলে ঐ আদেশ প্রযোজ্য নয়। আবার যেখানে আদালত বা পার্লামেন্টের অবমাননার জন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিচার চলে তখন বন্দী-প্রত্যক্ষীকরণের আদেশ দেওয়া যায় না।

পরমাদেশ (*Mandamus*): ইহার সাহায্যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা অধস্তন আদালত বা সরকারকে আপন পদের দায়িত্বপালন করিতে আজ্ঞা দেওয়া হয়। অবশ্য এই দায়িত্ব

(High Courts) **এই লেখ ইত্যাদি জারির ক্ষমতা আছে।** ইহা ব্যতীত পার্লামেণ্ট আইন করিয়া অন্য যে কোন আদালতকে নিজস্ব এলাকার মধ্যে ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার অনুমতি দিতে পারে।

৬ (ক). আপৎকালীন অবস্থা ও মৌলিক অধিকার: জরুরী অবস্থা ঘোষণাকালীন মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করা যাইতে পারে। যথা, ৩৫৮ অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ দেখা দিলে রাষ্ট্রপতি আপৎকালীন অবস্থা ঘোষণা করিতে পারেন, এবং ঐ সময় রাষ্ট্র ১৯ অনুচ্ছেদে বর্ণিত স্বাধীনতার অধিকারসমূহকে (মতামত ব্যক্ত করিবার অধিকার, সমবেত হইবার অধিকার প্রভৃতি) ক্ষুণ্ণ করিতে সমর্থ। আদালতে গেলেও ইহার কোন প্রতিকার পাওয়া যাইবে না। **আপৎকালীন অবস্থা প্রবর্তিত থাকাকালীন বা উহার সমাপ্তি ঘটিলেও বেআইনী কাজের প্রতিবিধান**

সর্বসাধারণসংক্রান্ত দায়িত্ব হওয়া চাই। পরমাদেশের ক্ষেত্রে সাধারণত অন্য প্রতিবিধানের ব্যবস্থা থাকিলে এই আদেশ দেওয়া হয় না। তবে মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টের দায়িত্ব রহিয়াছে উহাকে কার্যকর করার। সুতরাং অন্য বিকল্প প্রতিবিধান থাকুক আর না থাকুক আদালত মৌলিক অধিকার কার্যকরকরণের উদ্দেশ্যে পরমাদেশ দিতে পারে। যখনই কোন সরকারী কর্মচারী বা সরকার মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করিয়া কোন কার্য করে তখনই আদালত নির্দেশ দিতে পারে মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণকারী সরকারী কার্যকে যেন কার্যকর করা না হয়। মৌলিক অধিকার ভিন্ন অন্যান্য ক্ষেত্রে হাইকোর্ট এই আদেশ দিতে পারে। যেমন, যে-ক্ষেত্রে সরকারী কর্মচারীর আইনগত কর্তব্য রহিয়াছে কোন কাজ করিবার সে-ক্ষেত্রে যদি সরকারী কর্মচারী দায়িত্ব পালন করিতে নারাজ হয় পরমাদেশের মাধ্যমে ঐ দায়িত্ব পালন করিতে বাধ্য করান যায়। আবার কোন আদালতের এক্তিয়ার থাকিলে ঐ এক্তিয়ারভুক্ত কর্তব্য করিতে অস্বীকৃত হয় তাহা হইলে পরমাদেশের দ্বারা ঐ এক্তিয়ারভুক্ত কর্তব্য করিতে বাধ্য করা যায়। ইহা ছাড়া আদালত যে কোন সরকারী কর্মচারী বা সরকারকে আদেশ দিতে পারে যে উহারা যেন সংবিধানবহির্ভূত আইনকে বলবৎ না করে।

প্রতিষেধ (*Prohibition*): এই প্রকার আদেশের মাধ্যমে সুপ্রীম কোর্ট এবং হাইকোর্ট অধস্তন বিচারালয়কে আপন ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিতে বাধ্য করে। অর্থাৎ, কোন অধস্তন আদালত যদি তাহার এক্তিয়ারের বাইরে বিচারকার্য চালাইতে থাকে তাহা হইলে সুপ্রীম কোর্ট কিংবা হাইকোর্ট উহা বন্ধ করিয়া দেওয়ার আদেশ প্রদান করেন। প্রতিষেধ ও পরমাদেশের মধ্যে অন্যতম পার্থক্য হইল যে পরমাদেশ বিচারালয়ের বিরুদ্ধেই কার্যকর হয় না, ইহা শাসন-কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধেও ব্যবহার করা যায়। অপরদিকে প্রতিষেধ কিংবা উৎপ্রেষণ (*Certiorari*) মাত্র বিচারালয় বা আধা-বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের (quasi-judicial authorities) বিরুদ্ধেই ব্যবহার করা যায়। আর একটি পার্থক্যেরও উল্লেখ করা যাইতে পারে। পরমাদেশ দ্বারা কার্য করিবার আদেশ দেওয়া হয় অপরপক্ষে প্রতিষেধ দ্বারা কোন কার্যকে বন্ধ রাখিতে বলা হয়। ভারতে এই প্রতিষেধ বিচারালয়ের এক্তিয়ার বহির্ভূত মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, ইহা যদি কোন আইন মৌলিক অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করে তাহা হইলে সুপ্রীম কোর্ট বা হাইকোর্ট অধস্তন বিচারালয়ের বিচারকার্য বন্ধ করিয়া দিতে পারে। সুপ্রীম কোর্ট মৌলিক অধিকারকে বলবৎকরণের জন্যই এই আদেশ দিতে পারে।

উৎপ্রেষণ (*Certiorari*): অধস্তন বিচারালয় অথবা বিচারকার্যের ক্ষমতা আছে এমন প্রতিষ্ঠান আইনগত ক্ষমতার সীমাকে লংঘন করিলে সুপ্রীম কোর্ট কিংবা হাইকোর্ট ঐ বিচারালয় বা প্রতিষ্ঠানের হাত হইতে বিচারকে ঊর্ধ্বতন বিচারালয়ের হস্তে অর্পণ করিতে পারে এবং ক্ষমতাবহির্ভূত সিদ্ধান্তকে বাতিল করিয়া দেওয়ার আদেশ দিতে পারে। এখানে উৎপ্রেষণ ও প্রতিষেধের মধ্যে এই একটি পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। প্রতিষেধের নির্দেশ কোন মামলা চলাকালীন অবস্থায় দেওয়া হয়

আদালত করিতে পারে না। তবে ১৯ অনুচ্ছেদ অকার্যকর করিতে হইলে রাষ্ট্রের আইন এবং শাসন বিভাগীয় কার্যাবলীতে এই ঘোষণা থাকা প্রয়োজন যে ঐ আইন বা শাসন বিভাগীয় কার্য জরুরী অবস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট।

৩৫৯ অনুচ্ছেদ বলে আপৎকালীন অবস্থা ঘোষণা কার্যকর থাকাকালীন রাষ্ট্রপতি আদেশ প্রদান করিয়া অধিকারসমূহকে বলবৎ করিবার উদ্দেশ্যে আদালতে আবেদন করিবার অধিকারকে স্থগিত রাখিতে পারেন। কোন কোন অধিকারসমূহের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা থাকিলে তাহা রাষ্ট্রপতির আদেশে নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে। তবে ১৯৭৮ সালের ৪৪তম সংশোধন বলা হইয়াছে যে রাষ্ট্রপতি এই আদেশ দ্বারা সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদ (জীবনের নিরাপত্তা ও ব্যক্তিগত সংক্রান্ত অধিকার) এবং ২২ অনুচ্ছেদকে (গ্রেপ্তার ও আটক সংক্রান্ত অধিকার) স্থগিত রাখিতে পারিবেন না।

(৬) খ. প্রতিরক্ষাবাহিনীর সদস্যদের মৌলিক অধিকার ও দণ্ডনিষ্কৃতি আইন: সশস্ত্রবাহিনী অথবা জনশৃংখলারক্ষায় নিযুক্ত শক্তিসমূহের (forces) সদস্যরা কতদূর এই মৌলিক অধিকারগুলি ভোগ করিবেন তাহা পার্লামেন্ট আইন করিয়া স্থির করিয়া দিতে পারে। তাছাড়া সংবিধানে দণ্ডনিষ্কৃতি আইন (Indemnity Act) পাসের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। ভারতের কোন অঞ্চলে সামরিক শাসন (martial law) প্রবর্তিত থাকাকালীন সরকারী কর্মচারী বা অন্য কেহ শৃংখলা রক্ষা বা পুনঃস্থাপন সম্পর্কে অন্যায় ও অবৈধ কার্য অনুষ্ঠিত করিলে তাহাকে বৈধ ঘোষণা বলিয়া পার্লামেন্ট আইন পাস করিতে পারে। তবে এই সামরিক আইন প্রচলিত থাকাকালীন ছাড়া অন্য কোনপ্রকার জরুরী অবস্থায় অনুষ্ঠিত অবৈধ কার্যের ক্ষেত্রে

অপরপক্ষে মামলাটি বিচার হইয়া যাওয়ার পর উৎপ্রেষণের আদেশ দেওয়া হয়। ..."*While prohibition is available during the pendency of the proceeding and before the order is made, certiorari can be issued only after the order has been made*." D. Basu

অধিকার-পৃচ্ছা (*Quo Warranto*): যখন কোন ব্যক্তি যে পদ অধিকারের যোগ্যতা সম্পন্ন নয়, সেই পদ অধিকার বা দাবি করে, তখন অধিকার-পৃচ্ছার দ্বারা তাহার দাবি বৈধ কি না, তাহার অনুসন্ধান করা হয় এবং দাবি বৈধ না হইলে তাহাকে পদচ্যুত করা হয়। তবে এই আদেশ দেওয়ার কতকগুলি সর্ত আছে: প্রথমত, যে পদ লইয়া বিবাদ হইতেছে তাহা সরকারী পদ (public office) হওয়া চাই এবং সংবিধান বা বিধিবদ্ধ আইন দ্বারা সৃষ্ট হওয়া চাই। দ্বিতীয়ত, সংবিধান বা আইন ভংগ করিয়া যখন কোন ব্যক্তিকে নিযোজিত করা হয়। তৃতীয়ত, পদটি পৃথক ও গুরুত্বপূর্ণ পদ হওয়া প্রয়োজন (The office must be substantive)। অধিকার-পৃচ্ছা জনস্বার্থের দিক হইতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, ইহার দ্বারা বে-আইনীভাবে অধিকৃত পদ হইতে পদাধিকারীকে পদচ্যুত করা যায় তবে সুপ্রীম কোর্ট কিংবা হাইকোর্ট এইরূপ আদেশ দিবে কি না তাহা তথ্য ও অবস্থার উপর নির্ভর করে।

এই আদেশ-নির্দেশগুলির ব্যাপারে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে সুপ্রীম কোর্ট মাত্র মৌলিক অধিকারসমূহকে বলবৎকরণের জন্য বিভিন্ন আদেশ-নির্দেশ দিতে পারে। অপরপক্ষে হাইকোর্ট মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ ছাড়াও অন্যান্য উদ্দেশ্যে উপরি-উক্ত ধরনের নির্দেশাদি ব্যবহার করিতে পারে (২২৬ অনুচ্ছেদ)।

পার্লামেণ্টের পক্ষে দণ্ডনিষ্কৃতি আইন পাস করিয়া অবৈধ কার্যকে বৈধ ঘোষণা করা সম্ভব কি না, সে-সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে।[১]

"Without a society conscious of common moral interests, there can be no rights." T. H. Green

স্মর্তব্য :

১ ভারতীয় সংবিধানে একটি মৌলিক অধিকারের অধ্যায় সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে।

২ পূর্বে অধ্যায়ভুক্ত অধিকারের সংখ্যা ছিল ৭, বর্তমানে ৬,

৩ মৌলিক অধিকারগুলি আদালতে বলবৎযোগ্য, এবং এই ভার সুপ্রীম কোর্টের উপর ন্যস্ত। হাইকোর্টসমূহ অনেকাংশে এই ক্ষমতার অধিকারী।

৪. কোন অধিকারই অবাধ হইতে পারে না বলিয়া মৌলিক অধিকারগুলিও অবাধ নহে।

৫ শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার মৌলিক অধিকারগুলি বলবৎকরণের মাধ্যম।

৬. মূল তালিকা হইতে যে-অধিকারটি বাদ দিয়াছে তাহা হইল সম্পত্তির অধিকার। বর্তমানে উহা অন্যতম বিধিবদ্ধ অধিকার মাত্র।

অনুশীলনী

1. **Explain the nature of Fundamental Rights as guaranteed in the Constitution of India.**

[ভারতীয় সংবিধানে সংরক্ষিত মৌলিক অধিকারগুলির প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর।] (৯৫-৯৮ পৃষ্ঠা)

2. **Explain and comment on the Right to Equality, as guaranteed in the Constitution of India.** (B. U. Hons. 1985)

[ভারতীয় সংবিধানে সংরক্ষিত সাম্যের অধিকারের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করিয়া তোমার মন্তব্য লেখ।]

(৯৮-১০৩ পৃষ্ঠা)

3. **Explain the Right to Freedom guaranteed under Article 19 of the Indian Constitution. What are the restrictions that may be imposed on its right?**

(C. U. 1985)

[ভারতীয় সংবিধানের ১৯ ধারার (অনুচ্ছেদ দ্বারা) সংরক্ষিত স্বাধীনতার অধিকার ব্যাখ্যা কর। এই অধিকারের উপর কি কি বাধানিষেধ আরোপ করা যায়? (১০৩-১০ পৃষ্ঠা)

4. **Comment on the 'Seven Freedoms' as provided in Article 19 of the Constitution of India.** (C. U. 1974, '77)

[ভারতীয় সংবিধানের ১৯ অনুচ্ছেদে সংরক্ষিত 'সপ্ত স্বাধীনতা'র উপর মন্তব্য প্রকাশ কর।]

(১০৩-১০ পৃষ্ঠা)

[স্মর্তব্য : এখন ছয় স্বাধীনতা—**Six Freedoms**]

১. **DIR Cases (1968)**

5. Name two of the main writs that may be issued by the Supreme Court of India for the protection of the fundamental rights of the citizens. (C. U. 1982)

[নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্ম সুপ্রীম কোর্ট প্রধান প্রধান যে-সকল লেখ জারী করিতে পারে তাহার মধ্যে যে কোন দুইটির উল্লেখ কর।] (১১৯-২১ পৃষ্ঠা)

6. Rewrite the following sentence, choosing the correct answer from the alternatives given within bracket.

Under the Constitution of India the right to property (is, is not) a fundamental right at present.

[বন্ধনীর ভিতর প্রদত্ত বাক্যাংশ হইতে সঠিক উত্তরটি বাছিয়া লইয়া নিম্নলিখিত বাক্যটি পুনরায় লিখ : বর্তমানে ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী সম্পত্তির অধিকার (একটি মৌলিক অধিকার/মৌলিক অধিকার নহে।)] (১১৭ পৃষ্ঠা)

7. Explain fully the Rights to Freedom of Religion under the Constitution of India. (C. U. 1966)

[ভারতের সংবিধান দ্বারা সংরক্ষিত ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারের বিস্তারিত ব্যাখ্যা কর।]

(১১৫-১৭ পৃষ্ঠা)

8. Discuss the nature and extent of Right to Property guaranteed under the Indian Constitution. (N. B. U. 1985)

[ভারতীয় সংবিধানে যে-সম্পত্তির অধিকার সংরক্ষিত রহিয়াছে তাহার প্রকৃতি ও ব্যপ্তি আলোচনা কর।] (১১৭-১৯ পৃষ্ঠা)

9. Explain the Right to Constitutional Remedies as guaranteed by the Constitution of India. (C. U. 1986)

[ভারতীয় সংবিধানে সংরক্ষিত শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার ব্যাখ্যা কর।]

(১১৯-২২ পৃষ্ঠা)

৯

রাষ্ট্রের নির্দেশমূলক নীতি
(THE DIRECTIVE PRINCIPLES OF STATE POLICY)

The directive principles 'are really in the nature of moral precepts *for the authorities of the State. Although it may be contended that the constitution is not the proper place for moral precepts nevertheless, constitutional declarations of policy of this kind are now becoming increasingly frequent. They have at best an educative value.'* Sir B. N. Rau

১. জনকল্যাণকর রাষ্ট্র ও নির্দেশমূলক নীতিসমূহ (Welfare States and Directive Principles) : বর্তমান যুগে রাষ্ট্রের কার্যাবলী ও ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা দ্রুত পরিবর্তিত হইতেছে ; সমাজের বৃহত্তর স্বার্থকে উত্তরোত্তর সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়া হইতেছে। ইহার মূলে আছে **সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণার প্রসার**। সাধারণ মানুষও আজ অনুভব করিতে শিখিয়াছে, ব্যক্তির স্ফুরণ হয় সমাজের মধ্য দিয়া এবং সমাজের সর্বাংগীণ মংগল সাধিত হইলে তবেই ব্যক্তি-কল্যাণ সাধিত হয়। ব্যক্তি-কল্যাণ সম্বন্ধে এই সাম্প্রতিক ধারণা কতকটা প্রতিফলিত হইয়াছে আমাদের সংবিধানে। যাহাতে জনকল্যাণকর কার্যে রাষ্ট্র উৎসাহিত হয়, তাহার জন্য ভারতীয় সংবিধানে কতকগুলি নির্দেশমূলক নীতি বিবৃত করা হইয়াছে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে এই বিষয়ে **প্রেরণা যোগাইয়াছে আয়ারল্যাণ্ডের সংবিধান** (১৩ পৃষ্ঠা)।

২. ভারতীয় সংবিধানভুক্ত নির্দেশমূলক নীতি-সমূহের প্রকৃতি (Nature of the Directive Principles incorporated in the Constitution of India) : নির্দেশমূলক নীতিগুলির প্রধান বিষয়বস্তু হইল যাহাকে বলা হয় **অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার**। সংবিধানে বলা হইয়াছে এই নীতিগুলি হইবে দেশশাসনের মূলতত্ত্ব এবং রাষ্ট্রের কর্তব্য হইবে এই নীতিগুলিকে আইন প্রণয়নে প্রয়োগ করা।

২.১. নির্দেশমূলক নীতিসমূহের উদ্দেশ্য : বলা হয়, ভারতীয় রাষ্ট্র নিষ্ক্রিয় পুলিসী রাষ্ট্র নয়, উহা **কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র** (Welfare State)। রাজনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাই যথেষ্ট নয়, উহাকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রসারিত না করিতে পারিলে গণতন্ত্র বাস্তবে কার্যকর হইতে পারে না। সুতরাং জনকল্যাণকর কাজকর্মের মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সমাজের সর্বাংগীণ

কল্যাণসাধনে রাষ্ট্রকে নিয়োজিত করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যেই নির্দেশসমূহকে সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে এবং ঐগুলিকে কার্যকর করার দায়িত্ব যে শাসকবর্গের রহিয়াছে তাহার উল্লেখও করা হইয়াছে। তবে সংবিধানে ইহাও সুস্পষ্টভাবে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, কোন আদালত এই নীতিগুলিকে বলবৎ করিতে পারিবে না।

ভারতীয় সংবিধান এইভাবে নীতিগুলিকে আদালতের এক্তিয়ার বহির্ভূত রাখার ব্যাপারেও আয়ারল্যাণ্ডের সংবিধানকে অনুসরণ করিয়াছে।[১]

২.২. **নির্দেশমূলক নীতিসমূহের বৈশিষ্ট্য:** এখন আলোচনা করিয়া দেখা যাউক, নির্দেশমূলক নীতিগুলির বৈশিষ্ট্য কি কি। এই বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণেই নীতিগুলির কার্যকারিতা এবং উহাদের সহিত মৌলিক অধিকারগুলির সম্পর্ক অনুধাবন করা যাইবে।

ক। নীতিসমূহ আদালতে বলবৎযোগ্য নয়: প্রথমেই মনে রাখিতে হইবে, নির্দেশমূলক নীতিগুলি বিচারালয় কর্তৃক প্রযুক্ত হইতে পারে না। সুতরাং যদিও অবশ্য শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব রহিয়াছে এই নীতিগুলির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া শাসনকার্য পরিচালনা ও আইন প্রণয়ন করিবার, এই সকল নীতির ভিত্তিতে আদালতে বলবৎযোগ্য অধিকার দাবি করা যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সংবিধানের ৪১ **অনুচ্ছেদের** কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই অনুচ্ছেদে যে নীতিটি উল্লিখিত হইয়াছে তাহাতে বলা হইয়াছে যে **কর্মের অধিকার,** শিক্ষার অধিকার এবং বেকারাবস্থা, বার্ধক্য, পীড়িতাবস্থা প্রভৃতির ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্যপ্রাপ্তির অধিকারকে কার্যকর করার জন্য রাষ্ট্র ব্যবস্থা করিবে। এখন কেহ যদি কর্মহীন বা বেকার হইয়া পড়ে তাহা হইলে রাষ্ট্র সাহায্যপ্রদানের জন্য আইন পাস করিয়া না থাকিলে ঐ ব্যক্তি সাহায্য পাওয়ার দাবি করিয়া আদালতের নিকট হইতে প্রতিকার পাইতে সমর্থ নয়। কারণ, **নির্দেশমূলক নীতি হইল সরকারের প্রতি সংবিধানের সাধারণ নির্দেশ**। ইহা হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে নির্দেশমূলক নীতিগুলিকে প্রয়োগ করার জন্য আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন। যতক্ষণ পর্যন্ত এরূপ আইন প্রবর্তিত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত নির্দেশমূলক নীতি অনুসরণ করার অজুহাতে প্রচলিত আইনকে লংঘন করা যায় না। অর্থাৎ, **প্রচলিত আইনের সীমার মধ্যে থাকিয়াই নির্দেশমূলক নীতিকে কার্যকর করিতে হইবে।**

খ। নীতিসমূহ রাষ্ট্রকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেয় নাই: দ্বিতীয়ত, নির্দেশমূলক নীতিসমূহ রাষ্ট্রের উপর কতকগুলি দায়িত্ব ন্যস্ত করিলেও রাষ্ট্র মাত্র নির্দেশমূলক নীতির জোরে যে-কোন আইন পাস করিতে পারে না। আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা তিনটি তালিকা দ্বারা কেন্দ্র ও অংগরাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টিত হইয়াছে। আইনসভাগুলিকে এই সীমার মধ্যে থাকিয়া আইন প্রণয়ন করিতে হইবে।

১. "The application of these principles in the making of laws shall be care of the Oireachtas exclusively, and shall not be cognisable by any court ... ." *Article 45 of the Irish Constitution*

নির্দেশমূলক নীতির অনুসরণে রাষ্ট্র যদি সংবিধান-নির্দিষ্ট সীমা লংঘন করিয়া আইন প্রণয়ন করে, তাহা হইলে ঐ আইন বাতিল হইয়া যাইবে।

গ। মৌলিক অধিকার ও নির্দেশমূলক নীতির মধ্যে বিরোধ বাধিলে মৌলিক অধিকারকে প্রাধান্য দেওয়া হয়: এই 'সংবিধান-নির্দিষ্ট সীমা' হইতেই আবার নির্দেশমূলক নীতিসমূহের **তৃতীয় বৈশিষ্ট্যের সন্ধান** পাওয়া যায়। মৌলিক অধিকার ও নির্দেশমূলক নীতির মধ্যে কোনপ্রকার বিরোধিতার সৃষ্টি হইলে মৌলিক অধিকারকেই প্রাধান্য দিতে হইবে। সংবিধান এ-সম্পর্কে কোনরূপ অস্পষ্টতা রাখে নাই। ৩৭ অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে নির্দেশমূলক নীতিসমূহ আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য নয়, অপরদিকে সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদে মৌলিক অধিকারগুলি যাহাতে বলবৎ হয় তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত সংবিধানের ১৩(২) অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে মৌলিক অধিকারগুলিকে ক্ষুণ্ণ করিয়া রাষ্ট্র কোন আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে না এবং এই প্রকারের আইন প্রণীত হইলে উহা বাতিল হইয়া যাইবে। মিলিতভাবে অনুচ্ছেদগুলির তাৎপর্য হইল যে মৌলিক অধিকারগুলি অলংঘনীয় এবং মৌলিক অধিকারসংক্রান্ত অধ্যায়ে যে সকল বাধানিষেধ নির্দিষ্ট করা হইয়াছে তাহা ব্যতীত অন্যভাবে আইনসভা কিংবা শাসন বিভাগ কোন মৌলিক অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করিতে সমর্থ নয়।

সুতরাং নির্দেশমূলক নীতিসমূহ মৌলিক অধিকারসমূহ দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং মৌলিক অধিকারসমূহের অধীন। কোন অবস্থাতেই নির্দেশমূলক নীতি মৌলিক অধিকারগুলিকে অতিক্রম (override) করিতে পারে না।[১]

মৌলিক অধিকারগুলি ক্ষুণ্ণ করা না হইলে নির্দেশমূলক নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্রের পক্ষে কার্য করার পথে কোন বাধা থাকিতে পারে না। অবশ্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সংবিধান-নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকিয়া আইন প্রণয়ন ও শাসনকার্য পরিচালনা করিতে হইবে।

২.৩. সংবিধানের ২৫তম, ৪২তম ও ৪৪তম সংশোধন এবং নীতিসমূহের সাম্প্রতিক গুরুত্ব: এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৭১ সালে সংবিধানের পঞ্চবিংশতিতম সংশোধন (The Twentyfifth Amendment, 1971) দ্বারা ব্যবস্থা করা হয় যে কয়েকটি নির্দেশমূলক নীতির প্রয়োগের বেলায় রাষ্ট্রের আইন মৌলিক অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করিলেও ঐ আইন অবৈধ হইবে না। সংশোধনটির উদ্দেশ্য হইল সংবিধানের ৩৯ (খ) এবং ৩৯ (গ) অনুচ্ছেদে যে নির্দেশমূলক নীতির উল্লেখ রহিয়াছে তাহাকে কার্যকর করার পথে বাধাবিপত্তি অপসারণ করা। সংবিধানের **৩৯(খ)** এবং **৩৯(গ) অনুচ্ছেদে যে নির্দেশমূলক নীতির উল্লেখ** রহিয়াছে তাহা সংক্ষেপে হইল এইরূপ: রাষ্ট্র

১. "The Directive Principles of State Policy have to conform to and run subsidiary to the Chapter on Fundamental Rights." *State of Madras v. Champakam* (1951

এমনভাবে তাহার নীতি পরিচালনা করিবে যেন—(১) **সর্বসাধারণের হিতার্থে দেশের সম্পদের মালিকানা ও কর্তৃত্ব বন্টিত হয়**; এবং (২) **দেশের অর্থ-ব্যবস্থার পরিচালনার ফলে সম্পদ ও উৎপাদনের উপায়সমূহ মুষ্টিমেয় লোকের হস্তে পুঞ্জীভূত হইয়া জনসাধারণের স্বার্থের হানি না করে।** সংশোধনটিতে নির্দেশ দেওয়া হয়, যদিও সংবিধানের ১৩ অনুচ্ছেদে নিষেধ রহিয়াছে যে মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করিয়া রাষ্ট্র কোন আইন প্রবর্তন করিতে পারিবে না তবুও রাষ্ট্র যদি উপরি-উক্ত নির্দেশমূলক নীতি দুইটি কার্যকর করার উদ্দেশ্যে আইন প্রবর্তন করে তাহা হইলে ঐ আইন সাম্যের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার ও সম্পত্তির অধিকার ক্ষুণ্ণ করিলেও অবৈধ বলিয়া বিবেচিত হইবে না। এবং ঐ আইনে যদি এই ঘোষণা থাকে যে উহা নির্দেশমূলক নীতিকে কার্যকর করার জন্য রচিত হইয়াছে তাহা হইলে আদালত ঐ আইনের বৈধতা বিচার করিতে পারিবে না।

২.৪. কেশবানন্দের মামলা : ১৯৭৩ সালে কেশবানন্দের মামলায় (Keshavananda's Case) সুপ্রীম কোর্ট সংশোধনের এই অংশটুকুকে—অর্থাৎ আদালতের বৈধতা বিচারের ক্ষমতা থাকিবে না—বাতিল করিয়া দেয়।

৩ এই সংশোধন ছাড়া ১৯৭৬ সালের ৪২তম ও ১৯৭৮ সালের ৪৪তম সংশোধনে ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে নির্দেশমূলক যে-কোন নীতিকে কার্যকর করার জন্য রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন ও প্রবর্তন করিলে উহা সাম্যের অধিকার ও স্বাধীনতার অধিকার লংঘন করিয়াছে বলিয়া বেআইনী হইবে না। এবং যদি এরূপ আইনে ঘোষণা করা হয় যে উক্ত নির্দেশমূলক নীতিকে কার্যকর করার জন্য প্রণীত হইয়াছে তাহা হইলে আদালত ঐ আইনের বৈধতা বিচার করিতে পারিবে না।

২.৫. মিনার্ভা মিলসের মামলা : ১৯৮০ সালে মিনার্ভা মিলস সংক্রান্ত মামলা সুপ্রীম কোর্ট এই সংশোধনকে অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে এই কারণে যে সংশোধনটি দ্বারা সংবিধানের মৌল বৈশিষ্ট্যকে ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছে।

৪। **নির্দেশমূলক নীতিকে অনুসরণ করা হয় নাই মাত্র এই যুক্তিতে আদালত কোন আইনকে অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে না**, কারণ নির্দেশমূলক নীতিগুলি আদালতে বলবৎযোগ্য নয়। যেমন, সংবিধানের ৫০ অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, রাষ্ট্রকে সরকারী কার্যের ক্ষেত্রে শাসন বিভাগ হইতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণের ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। এখন যদি কোন রাজ্যে গ্রাম-পঞ্চায়েত আইনে পঞ্চায়েতগুলিকে শাসন ও বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা একই সংগে দেওয়া হয়, তাহা

১. ১৯৮০ সালে সুপ্রীম কোর্ট **মিনার্ভা মিলস মামলায় (Minerva Mills Case)** এই অভিমত প্রকাশ করে যে সংবিধানের মৌল বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ করিয়া সংশোধন করা যাইবে না। এবং আদালতের সংশোধন কিংবা আইনের বৈধতা বিচারের অধিকার রহিত করা অবৈধ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

হইলে ঐ আইন নির্দেশমূলক নীতিকে অমান্য করিয়াছে বলিয়া বাতিল হইবে কি না। সুপ্রীম কোর্ট বা প্রধান ধর্মাধিকরণের অভিমত হইল যে, ঐ আইন বাতিল হইবে না।

৩. **নীতিসমূহের উপযোগিতা**: তবে নির্দেশমূলক নীতিগুলি আদালতে বলবৎযোগ্য না হইলেও আদালতগুলি এই সকল নীতির গতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সংবিধানের অন্যান্য অংশের ব্যাখ্যা করিতে পারে। ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট এই দৃষ্টিভংগিই গ্রহণ করিয়াছে। যেমন, সংবিধানের ১৯ অনুচ্ছেদে স্বাধীনতার অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে এবং রাষ্ট্রকে **যুক্তিসংগত বাধানিষেধ** (reasonable restrictions) বসাইবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

৩.১ **বাধানিষেধের যৌক্তিককতা বিচার**: এখন বাধানিষেধ যুক্তিসংগত কি না, তাহা বিচার করিবার ক্ষমতা আদালতের রহিয়াছে। সুপ্রীম কোর্ট বাধানিষেধের যৌক্তিকতা বিচার করিতে গিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছে যে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রবর্তিত বাধানিষেধের উদ্দেশ্যে যদি নির্দেশমূলক নীতির উদ্দেশ্যকে কার্যকর করা হয় তাহা হইলে ঐ বাধানিষেধকে যুক্তিসংগত বলিয়া ধরিতে হইবে।[১]

আবার সংবিধানের ৩১(২) অনুচ্ছেদ অনুসারে **সর্বজনের উদ্দেশ্যে** (public purpose) এবং আইনে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা না করিয়া রাষ্ট্র কাহারও সম্পত্তি দখল বা অধিগ্রহণ করিতে পারিবে না। এখন 'সর্বজনের উদ্দেশ্যে' সম্পত্তি দখল করা হইয়াছে কি না তাহা আদালতের বিচার্য বিষয়। কয়েকটি মামলায় আদালত এই মত প্রকাশ করিয়াছে যে নির্দেশমূলক নীতির উদ্দেশ্যে সম্পত্তি দখল করাকে সর্বজনের উদ্দেশ্যে সম্পত্তি দখল করা বলিয়া ধরিতে হইবে। সুতরাং সম্পত্তি দখলের ব্যাপারে সর্বজনের উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা নির্দেশমূলক নীতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আদালত করিতে পারে। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে ৪৪তম সংশোধন ('৭৬) অনুসারে সম্পত্তির অধিকার এখন আর মৌলিক অধিকার নয়।

নীতিসমূহের মর্যাদা: সংক্ষেপে বলা যায়, নির্দেশমূলক নীতিগুলির মর্যাদা ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনার মত। প্রস্তাবনার মতই নির্দেশমূলক নীতিসমূহের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আদালত সংবিধানের অনির্দিষ্ট শব্দের অর্থ নির্ধারণ করিতে সমর্থ।

গুরুত্ব বৃদ্ধি: তবে ১৯৭১ সালে ২৫তম সংশোধন পাস হইবার পর হইতে নির্দেশমূলক নীতিসমূহের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে—শাসন-কর্তৃপক্ষ নীতিসমূহকে পূর্বাপেক্ষা অধিক মর্যাদা দান করিয়া কার্যকর করিতে সচেষ্ট হয়। ইহার উপর ১৯৭৬ সালে সংবিধানের ৪২তম সংশোধনের পর নীতিসমূহের অবশ্যই মর্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে।[২] **তাহা হইলেও সুপ্রীম কোর্টের অভিমত হইল যে কোনও সংশোধন সংবিধানের মৌল বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ করিতে পারিবে না।**

১. *State of Bombay v. Balsara* (1951)

২. ১২৬-২৭ পৃষ্ঠা দেখ।

৪. নির্দেশমূলক নীতিসমূহের বর্ণনা (Description of the Directive Principles) : নির্দেশমূলক নীতিসমূহের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনার পর এখন যে-সকল নির্দেশমূলক নীতি ভারতীয় সংবিধানে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহাদের বর্ণনা সংক্ষেপে করা যাইতে পারে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, মূল সংবিধানে যে-সকল (১২টি) নির্দেশ ছিল তাহা ছাড়া আরও কতকগুলি (৪টি) নির্দেশ ১৯৭৬ সালের ৪২তম এবং আরও একটি দ্বৈত নির্দেশ (twofold Directive) ১৯৭৮ সালের ৪৪তম সংশোধন দ্বারা সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। সুতরাং **বর্তমানে নীতির সংখ্যা হইল** (১৩+৪+১=) ১৮।

৪.(ক) মূল সংবিধানে সন্নিবিষ্ট ১৩টি নীতি : যে-সকল নির্দেশমূলক নীতি মূল সংবিধানে সন্নিবিষ্ট হয় তাহা সংক্ষেপে হইল এইরূপ

(১) ন্যায় প্রতিষ্ঠা : প্রথমেই বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্র এমন একটি সমাজ-ব্যবস্থার প্রবর্তন করিতে চেষ্টা করিবে যাহাতে জাতীয় জীবনের সর্বত্র **সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়ের** প্রতিষ্ঠা হয়।

(২) জীবিকার অধিকার, সম্পদের মালিকানা নিয়ন্ত্রণ ও বণ্টন : রাষ্ট্র এমনভাবে নীতি পরিচালনা করিবে যেন—(১) স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে নাগরিকগণ পর্যাপ্ত জীবিকার্জনের অধিকার ভোগ করিতে পারে; (২) সর্বসাধারণের হিতার্থে দেশের সম্পদের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ বণ্টিত হয়, (৩) অর্থ-ব্যবস্থার ফলে ধন ও উৎপাদনের উপাদানসমূহ মুষ্টিমেয় লোকের হস্তগত হইয়া জনসাধারণের স্বার্থের হানি না করে; (৪) পুরুষ ও নারী উভয়েই **সমান কাজের জন্য সমান বেতন** পায়; (৫) পুরুষ ও নারী শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও শক্তি এবং **শিশুদের সুকুমার বয়সের অপব্যবহার না ঘটে**; এবং (৬) শৈশব ও যৌবন শোষণ এবং নৈতিক ও পার্থিব দুর্গতি হইতে রক্ষা পায়।

এখানে স্মর্তব্য যে সংবিধানের ২৫তম সংশোধন অনুসারে যদি উক্ত (২) এবং (৩) নির্দেশমূলক নীতি দুইটি কার্যকর করার জন্য কোন আইন চালু করিতে গিয়া সাম্যের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার ও সম্পত্তির অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হয় তাহা হইলেও ঐ আইন অবৈধ ঘোষিত হইবে না।

ইহার পর ১৯৭৬ সালের ৪২তম সংশোধনে বলা হয়, যে কোন নির্দেশমূলক নীতিকে কার্যকর করার জন্য যদি আইন পাস করা হয় এবং স্বাধীনতা ও সাম্যের অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হয় তাহা হইলেও ঐ আইন অবৈধ হইবে না। আবার ঐ আইনে যদি ঘোষণা করা হয় যে উহা নির্দেশমূলক নীতিকে কার্যকর করার জন্যই প্রবর্তিত হইয়াছে। তাহা হইলে আইনটির বৈধতা বিচারের ক্ষমতা থাকিবে না।

১৯৮০ সালের মিনার্ভা মিলস্ মামলার রায়ে [Minerva Mills v. Union of India (1980)] সুপ্রীম কোর্ট উপরি-উক্ত সংশোধনটি বাতিল করিয়া দিয়াছে এই কারণে যে সংশোধনটির ফলে সংবিধানের মৌল বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

(৩) কর্ম, শিক্ষা, সরকারী সাহায্যপ্রাপ্তি, জীবনধারণোপযোগী মজুরি: **কর্ম** ও **শিক্ষার** অধিকার এবং বেকারাবস্থায়, বার্ধক্যে, পীড়িতাবস্থায় অংগহানি হইলে কিংবা অন্যভাবে অনুচিত অভাবে পড়িলে সরকারী সাহায্যপ্রাপ্তির অধিকার যাহাতে সুনিশ্চিত হয় তাহার জন্য রাষ্ট্রকে তাহার আর্থিক উন্নতি ও সামর্থ্য অনুযায়ী যথাসম্ভব কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। কার্যের সর্তাদি ন্যায়সংগত ও মানবোচিত করিবার এবং প্রসূতিদের সহায়তার জন্য রাষ্ট্র ব্যবস্থা করিবে। কৃষি শিল্প ও অন্যবিধ কার্যে নিযুক্ত সকল শ্রেণীর শ্রমিকদের জন্য জীবনধারণের উপযোগী মজুরি, যেরূপ সর্তাধীন কাজ করিলে ভদ্র জীবিকার মান বজায় থাকে; এবং পূর্ণমাত্রায় অবসর এবং সামাজিক ও সংস্কৃতিগত সুযোগ ভোগ করিতে পারা যায় সেরূপ সর্তাদি উপযুক্ত আইন, অর্থনৈতিক সংগঠন ইত্যাদির সাহায্যে প্রবর্তনের চেষ্টা রাষ্ট্রকে করিতে হইবে।

(৪) গ্রামীণ শিল্পের প্রসার: বিশেষত, গ্রামাঞ্চলে ব্যক্তিগত ও **সমবায়িক ভিত্তিতে** কুটির শিল্পের প্রসারসাধনে রাষ্ট্রকে সচেষ্ট হইতে হইবে।

(৫) জনস্বাস্থ্য-উন্নয়ন: খাদ্যপুষ্টি বৃদ্ধি, সর্বসাধারণের জীবিকার মান উন্নয়ন এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নতিবিধান রাষ্ট্রের অন্যতম কর্তব্য। স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর উত্তেজক পানীয় এবং মাদক দ্রব্য যাহাতে ঔষধার্থ ভিন্ন অন্যভাবে ব্যবহৃত না হয় তাহার চেষ্টাও করিতে হইবে।

(৬) বৈজ্ঞানিক কৃষি, (৭) অবৈতনিক শিক্ষা, (৮) গ্রাম-পঞ্চায়েত, (৯) দেওয়ানী বিধির অভিন্নতা (১০) অনুন্নত শ্রেণীর উন্নয়ন, (১১) স্মারক সংরক্ষণ, (১২) শাসন ও বিচার বিভাগ স্বতন্ত্রীকরণ: বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষি ও পশুপালন সংগঠন এবং গবাদি পশুর হত্যা নিবারণের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

সংবিধান প্রবর্তিত হইবার পর দশ বৎসরের মধ্যে বালকবালিকারা যাহাতে চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্যন্ত বিনা বেতনে বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষালাভ করিতে পারে তাহার প্রচেষ্টা রাষ্ট্র করিবে। উপযুক্ত ক্ষমতাসম্পন্ন গ্রাম-পঞ্চায়েত সংগঠন, ভারতের সর্বত্র একই প্রকারের দেওয়ানী আইন প্রবর্তন, অপেক্ষাকৃত অনুন্নত শ্রেণীর লোক বিশেষত তপশীলী বর্ণ এবং তপশীলী উপজাতিদের শিক্ষাবিষয়ক ও আর্থিক স্বার্থের উন্নতিসাধন এবং তাহাদিগকে সামাজিক অন্যায় ও শোষণ হইতে সংরক্ষণ, চারুকলার দিক হইতে বা ঐতিহাসিক কারণে চিত্তাকর্ষক এবং পার্লামেন্টের আইন কর্তৃক জাতীয় দিক হইতে গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া ঘোষিত স্মারক স্থান ও বস্তুসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, শাসন বিভাগ হইতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ ইত্যাদি বিষয়ের রাষ্ট্রের দায়িত্ব রহিয়াছে।

(১৩) আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা এবং সম্মানজনক সম্পর্ক: আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারত কি উদ্দেশ্য সাধন করিবে তাহার ইংগিতও সংবিধানে দেওয়া হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বর্ধন, রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ন্যায়সংগত ও সম্মানজনক সম্পর্ক রক্ষা, আন্তর্জাতিক আইন ও সন্ধির প্রতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধি এবং মধ্যস্থতার সাহায্যে বিবাদসমূহের সমাধানে উৎসাহ প্রদান করিতে রাষ্ট্র চেষ্টা করিবে।

৪. (খ) ৪২তম সংশোধন দ্বারা সন্নিবিষ্ট ৪টি নীতি : উপরি-উক্ত নির্দেশমূলক নীতিগুলি ছাড়া ১৯৭৬ সালের ৪২তম সংশোধন দ্বারা আরও চারটি নির্দেশমূলক নীতি সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।[১] নীতিগুলি সংক্ষেপে হইল এইরূপ :

(১৪) শিশুদের জন্য যোগ্য পরিবেশ, (১৫) অসমর্থদের আইনগত ব্যবস্থা, (১৬) শিল্প-পরিচালনায় শ্রমিকদের ভূমিকা, (১৭) পরিবেশ সংরক্ষণ : প্রথমত, শিশুরা যাহাতে সুস্থ ও স্বাধীনভাবে এবং মর্যাদার সহিত গড়িয়া উঠিতে পারে তাহার জন্য সুযোগসুবিধা দানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, সাম্যের ভিত্তিতে যাহাতে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া রাষ্ট্রকে আইনকানুন পরিচালিত করিতে হইবে ; বিশেষ করিয়া যাহারা আর্থিক বা অন্য দিক দিয়া অসমর্থ তাহারা যাহাতে বিনা ব্যয়ে আইনগত সাহায্য (free legal aid) পায় তাহার ব্যবস্থা আইন দ্বারা করিতে হইবে। তৃতীয়ত, যাহাতে শ্রমিকরা শিল্প-পরিচালনায় অংশগ্রহণ করিতে পারে তাহার জন্য রাষ্ট্রকে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। চতুর্থত, প্রাকৃতিক পরিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং বন ও বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণের প্রচেষ্টাও রাষ্ট্রকে করিতে হইবে।

৪.(গ) (১৮) আয়-বৈষম্য ইত্যাদি হ্রাস : ইহা ব্যতীত ১৯৭৮ সালের ৪৪তম সংশোধন দ্বারা নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে রাষ্ট্র (ক) আয়-বৈষম্যকে হ্রাস করিবে এবং (খ) মর্যাদা ও সুযোগসুবিধার ক্ষেত্রে বৈষম্যকে দূর করিবে।[২]

উপসংহার উপরি-উক্ত নীতিগুলির মধ্যে গ্রাম-পঞ্চায়েত গঠনের নির্দেশ ভারতীয় রাজনৈতিক আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ন্যায়সংগত ও সম্মানজনক সম্পর্ক রক্ষার নির্দেশকেও ঐ পর্যায়ভুক্ত করা চলে। বাকিগুলি পাশ্চাত্য আদর্শেরই দ্যোতক এবং বলা যায় বহুলাংশে **শিল্পীয় গণতন্ত্র** (industrial democracy) ও সমাজতন্ত্রবাদের প্রতিফলন।

৫. নির্দেশমূলক নীতিসমূহের মূল্যায়ন বা তাৎপর্য (An Evaluation of the Directive Principles or their Significance) : নির্দেশমূলক নীতিসমূহের মূল লক্ষ্য হইল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বেশ কিছুটা সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা, সামাজিক নিরাপত্তা ও সর্বজনীন শিক্ষাপ্রসারের ব্যবস্থা করা, জীবনযাত্রার ও জনস্বাস্থ্যের মান উন্নয়ন করা এবং নারী শিশু এবং অনুন্নত শ্রেণীসমূহ ও উপজাতিদের প্রতি বিশেষ কর্তব্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করা।[৩]

---

১. ১২৯ পৃষ্ঠা দেখ।

২. এই নীতিটিকে ২নং নীতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। বস্তুত, উভয়কেই ৩৯ অনুচ্ছেদভুক্ত করা হইয়াছে।

৩. "The general tendency of these directives is to introduce a wide measure of socialism in the economic sphere, to provide social security and better standards of sanitation ... to emphasise the duty towards women and children and the obligation towards backward and tribal classes." Panikkar : *The Foundations of New India*

তিন প্রকারের বিরুদ্ধ সমালোচনা : মোটামুটি তিন দিক হইতে এই সকল নির্দেশমূলক নীতির বিরুদ্ধ সমালোচনা করা হইয়াছে। প্রথমত, বলা হইয়াছে যে নীতিগুলি যখন আদালতে বলবৎযোগ্য নহে, তখন উহারা সম্পূর্ণ মূল্যহীন। উহাদিগকে বড়জোর শাসনতন্ত্র-প্রণেতৃবর্গের সাধু ইচ্ছা (pious aspirations) বলিয়া বর্ণনা করা চলে। অধ্যাপক জেনিংসের অভিমত হইল যে লিখিত সংবিধানে এই ধরনের নীতি সন্নিবিষ্ট করা অসংগতিপূর্ণ বলিয়াই মনে হয়। দ্বিতীয়ত, নীতিগুলি সংখ্যায় অত্যধিক বলিয়া কার্যক্ষেত্রে উহাদিগকে মানিয়া চলা শাসন কর্তৃপক্ষের পক্ষে সম্ভব হইবে না। তৃতীয়ত, নীতিগুলি কোন স্বাধীন দেশের শাসন-ব্যবস্থার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে। কারণ, ঐ ধরনের নির্দেশ একমাত্র ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষই অবস্তন কর্তৃপক্ষকে দিতে পারে; কোন স্বাধীন দেশের জনপ্রতিনিধিমূলক শাসকগোষ্ঠীকে দেওয়া যায় না। স্বাধীন দেশের জনপ্রতিনিধিমূলক শাসকগোষ্ঠী জনগণের ইচ্ছাকেই রূপ দেন, জনগণের সার্বভৌমিকতাকেই (popular sovereignty) কার্যকর করেন। তাঁহারা আর কোন নির্দেশ, এমনকি সংবিধানেরও নির্দেশ মানিয়া চলিতে পারেন না।

সমালোচনার উত্তর : এই সকল সমালোচনার উত্তরে বলা হয় যে নির্দেশমূলক নীতিগুলি শাসনতন্ত্র-রচয়িতাদের সাধু ইচ্ছার প্রকাশ হইলেও উহারা মূল্যহীন নহে, কারণ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যে দলীয় সরকার শাসনকার্য পরিচালনা করে তাহারা জনমতের ভয়ে নীতিগুলিকে কোন ক্ষেত্রেই একেবারে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিতে পারে না। নীতিগুলি মানিয়া না চলিলে দলীয় সরকারকে আদালতের সপক্ষে দোষী সাব্যস্ত হইতে হইবে না সত্য, কিন্তু পরবর্তী নির্বাচনের সময় নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট জবাবদিহি করিতে হইবে। অতএব, নীতিগুলিকে অন্তত কিছুটা মান্য করিয়া চলিতে হইবে।

দ্বিতীয়ত, নীতিগুলিকে মান্য করা হোক আর না হোক উহারা সকল সময় শাসকগোষ্ঠীকে স্মরণ করাইয়া দেয় যে, যে নূতন সমাজ-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার সংকল্প আমরা গ্রহণ করিয়াছি তাহার কতকগুলি মূলনীতি আছে। এই নীতিগুলি সংখ্যায় অত্যল্প নহে! অতএব, 'নীতিগুলি বহুসংখ্যক' এই সমালোচনা গ্রহণীয় নহে।

তৃতীয়ত, অধ্যাপক হোয়ারের মতে, প্রস্তাবনার ন্যায় নির্দেশমূলক নীতিগুলিতেও স্বাধীনতা সাম্য ন্যায় মৈত্রীবন্ধন (fraternity) প্রভৃতি রাজনৈতিক আদর্শ ঘোষিত হইয়াছে। এই সকল আদর্শ প্রাচীন হইলেও—উনিশ শতকের সুরে গাঁথা হইলেও উহাদের পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন আছে।[১] কারণ, এই পুনরাবৃত্তিই জনসাধারণকে তাহাদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করিয়া রাখে। সুতরাং স্বাধীন দেশেও উহাদের উল্লেখ করা প্রয়োজন। স্যার বি. এন্. রাউ (Sir B. N. Rau) এ-সম্পর্কে

১. "There is something heroic these days in people declaring publicly that they have established their government in order to secure justice, liberty, equality and fraternity. These words have an old-fashioned nineteenth century ring about them. Yet they need reassertion in these days." K. C. Wheare

বলেন, "নির্দেশমূলক নীতিগুলি হইল রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের জন্য কতকগুলি নৈতিক উপদেশ। এরূপ অভিমত হয়ত প্রকাশ করা যায় যে সংবিধান নৈতিক উপদেশ প্রদানের স্থান নয়, কিন্তু সংবিধানে এই ধরনের নীতি ঘোষণার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। অন্তত এই নীতিগুলির শিক্ষাগত মূল্য রহিয়াছে।"

উপসংহার: তবুও বলা যায়, উপরি-উক্ত নীতিগুলির উদ্দেশ্য মহৎ হইলেও ঐগুলিকে কার্যকর করিতে হইলে সামাজিক মালিকানার ভিত্তিতে সম্পত্তির সম্পর্ককে (property relations) প্রবর্তিত করিতে হইবে। অর্থাৎ, উৎপাদনের উপায়সমূহের প্রকৃত মালিকানা সমাজের হস্তে তুলিয়া দিতে হইবে। বর্তমানে যে অর্থ-ব্যবস্থা প্রবর্তিত রহিয়াছে তাহাতে অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলেও উৎপাদনের উপায়সমূহের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। তবে সম্প্রতি যে রাষ্ট্র এই প্রাধান্য সংকুচিত করিবার দিকে ঝুঁকিয়াছে তাহাও অনস্বীকার্য। সুতরাং নির্দেশমূলক নীতিসমূহ অধিকতর পরিমাণে সার্থক হইতে চলিয়াছে।

৬. নির্দেশমূলক নীতিগুলির রূপায়ণ (Implimentation of the Directive Principles of State Policy): এখন নির্দেশমূলক নীতিগুলিকে কিভাবে রূপায়িত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে তাহার ইংগিত সংক্ষেপে দেওয়া যাইতে পারে।

(১) ন্যায় ও সাম্যের প্রতিষ্ঠা: নির্দেশমূলক নীতিসংক্রান্ত অধ্যায়ের প্রথমেই বলা হইয়াছে, রাষ্ট্র এমন সমাজ-ব্যবস্থার প্রবর্তন করিবে যে জাতীয় জীবনের সর্বত্র সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এখন জাতীয় জীবনে সার্বিক ভোটাধিকারের মাধ্যমে রাজনৈতিক ন্যায় ও সাম্য প্রবর্তিত হইলেও অর্থনৈতিক ন্যায় ও সাম্যের প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় নাই। বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অবশ্য ঘোষণা করা হইয়াছে যে আমাদের লক্ষ্য হইল সমাজতান্ত্রিক ধরনের সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং আয় ও সম্পদের বৈষম্য দূর করিয়া অর্থনৈতিক ক্ষমতার ন্যায্যজনক বণ্টন নিশ্চিত করা। কিন্তু অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ৩৫ বৎসরের সর্ত (১৯৫১-৮৬) অতিক্রান্ত হইলেও দেখা যায় যে দেশে আর্থিক বৈষম্য বিশেষ হ্রাস পায় নাই—এখনও (১৯৮৬-৮৭) জনসংখ্যার ৪০ শতাংশের মত দারিদ্র্য-সীমার নিচে রহিয়াছে।[১]

নির্দেশমূলক নীতির অন্যতম (৩৯ অনুচ্ছেদ) হইল যে রাষ্ট্র এমনভাবে আপন নীতি পরিচালিত করিবে যেন সবসাধারণের হিতার্থে দেশের সম্পদের নিয়ন্ত্রণ ও মালিকানা বণ্টিত হয় এবং ধন ও উৎপাদনের উপায়সমূহ মুষ্টিমেয় লোকের হস্তগত হইয়া জনসাধারণের স্বার্থের হানি না করে। এক্ষেত্রে দাবি করা হয় যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সূত্রপাত হইতে ভূমিসংস্কারের দিকে নজর দেওয়া হইয়াছে এবং জমিদার ও অন্যান্য

১. ষষ্ঠ পরিকল্পনা অনুসারে ১৯৮০-৮১ সালে জনসংখ্যার ৪৪'৪৮ শতাংশ ছিল দারিদ্র্য-সীমার নিচে। সপ্তম পরিকল্পনার সূচনায় উহা ৩৭ শতাংশ নামিয়া আসে। ঐ পরিকল্পনা শেষে (১৯৮৯-৯০) উহাকে ২৬ শতাংশে লইয়া যাইবার আশা করা হইয়াছে।

মধ্যস্বত্বভোগীকে অপসারিত করিয়া কৃষক ও সরকারের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করা হইয়াছে এবং (নাগাভূমি ব্যতীত) সকল রাজ্যেই ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জমির পরিমাণের ঊর্ধ্বতন সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। শিল্পক্ষেত্র সম্পর্কে বলা হয় সরকারী মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণের প্রসারসাধন করা হইয়াছে। ১৯৭১ সালে অন্যান্যের মধ্যে একচেটিয়া কারবার নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে সংবিধানের ২৫তম সংশোধনও পাস করা হইয়াছে। ইহার ফলে সাম্যের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার প্রভৃতি মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করিয়াও রাষ্ট্র একচেটিয়া কারবার-সম্পর্কিত নিয়ন্ত্রণমূলক আইন প্রবর্তন করিতে পারিবে। ২৪তম ও ৪২তম সংশোধন সম্পর্কে যথাক্রমে দুইটি মামলা হয়। একটি হইল কেশবানন্দ বনাম কেরালা রাজ্য [Keshavananda v State of Kerala (1973)]। এই মামলায় বলা হয় যে সংশোধনের দ্বারা সংবিধানের মৌল বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ করা চলিবে না এবং আদালতের বৈধতা বিচারের ক্ষমতা রহিত করা অবৈধ। আর একটি মামলায় অনুরূপ রায় প্রদান করা হয়। এই মামলাটি হইল মিনার্ভা মিলস্ বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন [Minerva Mills v. Union of India (1980)]। এই মামলায় ৪২তম সংশোধনের উপরি-উক্ত ব্যবস্থাকে অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে, কারণ হইল ঐ সংশোধনের দ্বারা সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্যকে ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছে।

এই দুই মামলার রায় যতদিন অব্যাহত থাকিবে ততদিন পর্যন্ত মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করিয়া নির্দেশমূলক নীতিকে কার্যকর করা যাইবে না। অর্থাৎ, নির্দেশমূলক নীতির উপর মৌলিক অধিকারের প্রাধান্য অটুট থাকিবে।

৪২তম সংশোধনে (১৯৭৬) বলা হইয়াছে যে নির্দেশমূলক নীতি কার্যকর করার জন্য আইন পাস করা হইলে উহা সাম্যের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার ও [সম্পত্তির অধিকার] ক্ষুণ্ণ করিলেও অবৈধ বলিয়া বিবেচিত হইবে না। এ-সম্পর্কে আদালত আইনের বৈধতা বিচার করিতে পারিবে না।

(২) বেকার-সমস্যার সমাধান ইত্যাদি: কর্মের অধিকার ও বার্ধক্য, পীড়িতাবস্থা প্রভৃতির ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য পাওয়ার অধিকার সম্পর্কে বলা হয় যে রাষ্ট্র ইহাদের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিতেছে। অবশ্য নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার বিশেষ সাফল্য অর্জন করিতে পারে নাই—অর্থনৈতিক পরিকল্পনাসমূহে নিয়োগের উপর গুরুত্ব আরোপ করা সত্ত্বেও বেকার ও অর্ধ-বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। সামাজিক নিরাপত্তামূলক ও সরকারী সাহায্যমূলক ব্যবস্থাদি সীমাবদ্ধভাবে গৃহীত হইয়াছে। কর্মচারীদের জন্য সরকারী বীমা পরিকল্পনা (Employees' State Insurance Scheme) এবং কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড পরিকল্পনার (Employees' Provident Fund Scheme) কথা দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে। শ্রমিকদের বেতনাদি সম্পর্কে বলা হয় যে দুর্বল শ্রেণীর শ্রমিকদের ক্ষেত্রে ন্যূনতম বেতন প্রবর্তন করা হইয়াছে; অনেক শিল্পের ক্ষেত্রে বেতনের হার লইয়া বিবাদের মীমাংসার জন্য মজুরি বোর্ড (Wage Boards) প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে।

(৩) কুটির শিল্পের প্রসার : কুটির শিল্প প্রসারের দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে সর্ব-ভারতীয় খাদি ও গ্রামীণ শিল্প বোর্ড (All-India Khadi and village Industries Board), সর্ব-ভারতীয় হস্তশিল্প বোর্ড (All-India Handicrafts Board), সর্ব-ভারতীয় হস্তচালিত তাঁত বোর্ড (All-India Handloom Board), সিল্ক বোর্ড (Silk Board), প্রভৃতি সংখ্যা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(৪) কৃষি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে উন্নয়ন : সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার (Community Development Programme) মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থ-ব্যবস্থার সংস্কার, কৃষি ও পশুপালনের উন্নয়ন প্রভৃতির চেষ্টা চলিয়াছে। তপশীলভুক্ত বর্ণ ও তপশীলী উপজাতি এবং অন্যান্য অনুন্নত শ্রেণীর উন্নয়নের জন্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। জনস্বাস্থ্য ও খাদ্যপুষ্টির উন্নয়নের জন্যও বিভিন্ন ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে।

এই সকল ব্যবস্থার ফলে অকালমৃত্যুর হার হ্রাস ও আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পাইয়াছে। ম্যালেরিয়া, বসন্ত, কলেরা প্রভৃতি ব্যাধি প্রতিরোধকল্পে নানা প্রচেষ্টা চলিয়াছে। স্বাস্থ্য সম্পর্কে শিক্ষার প্রসারসাধনের জন্য কেন্দ্র ও রাজ্যগুলিতে স্বাস্থ্য ব্যুরো (Health Bureaus) স্থাপিত হইয়াছে। খাদ্যপুষ্টির উন্নয়নসাধনের জন্য কেন্দ্র ১৯৬০ সালে জাতীয় পুষ্টি পরামর্শ কমিটি (The National Nutrition Advisory Committee) নিয়োগ করা হয়। উত্তেজক পানীয় ও মাদক দ্রব্যাদি নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কে রাজ্যগুলির মধ্যে অনেকেই ব্যবস্থাদি অবলম্বন করিয়াছে এবং কিছুটা সফলতা অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে।

(৫) অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা ও পঞ্চায়েত-ব্যবস্থা : সংবিধানের অন্যতম প্রধান নির্দেশ হইল বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার। কিছু কিছু রাজ্যে প্রবর্তিত হইলেও বহু রাজ্যেই অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন করা সম্ভব হয় নাই। পঞ্চায়েত-ব্যবস্থা প্রবর্তন সম্পর্কে প্রায় সকল রাজ্যই আইন পাস করিয়াছে। এই পঞ্চায়েতগুলির হস্তে স্থানীয় পৌর কার্য ছাড়া বিচারকার্যের দায়িত্বও ন্যস্ত করা হইয়াছে।

(৬) শাসন ও বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ : শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ সম্পর্কে প্রায় সকল রাজ্যই ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে বা করিতেছে এবং ম্যাজিস্ট্রেটদের বিচার-সম্পর্কিত ও বিচারসম্পর্কবিহীন (Judicial and Non-judicial) এই দুই ভাগে শ্রেণীবিভক্ত করা হইতেছে।

(৭) দেওয়ানী আইনের অভিন্নতা ও আন্তর্জাতিক শান্তিসৌহার্দ্য : সর্বত্র একই প্রকারের দেওয়ানী আইন প্রচলিত করিবার প্রচেষ্টাও চলিয়াছে। এই উদ্দেশ্যে ১৯৫৫ সালে হিন্দু বিবাহ আইন (The Hindu Marriage Act, 1955) এবং ১৯৫৬ সালে হিন্দু উত্তরাধিকার আইন (The Hindu Succession Act, 1956) পাস করা হয়। পরিশেষে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি ও নিরাপত্তা বর্ধনের জন্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছে।

(৮) অন্যান্য ক্ষেত্র : সপ্তমত, সাধারণের জন্য আইনগত সাহায্যের জন্য কিছু কিছু ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে।

পরিশেষে, শ্রমিকদের শিল্প-পরিচালনায় অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় আইন পাস করা হইয়াছে।

উপসংহার সাফল্যের তালিকা যতই দীর্ঘ করা হোক না কেন, ইহা বিতর্কের ঊর্ধ্বে যে নির্দেশমূলক নীতিগুলিকে কার্যকর করার ব্যাপারে রাষ্ট্র বিশেষ সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। রাষ্ট্রের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মুষ্টিমেয়ের হস্তে সম্পদ পুঞ্জীভূত হইয়াই চলিয়াছে। অপরদিকে লাঞ্ছিত জনসাধারণ দুঃখদুর্দশার মধ্যে জীবনযাপন করিতেছে। বলা হয় যে ৪০ শতাংশের মত লোক দারিদ্র্য-সীমার নিচে রহিয়াছে।[১] একদিকে প্রাচুর্য আর অপরদিকে দারিদ্র্য কোন সুস্থ গণতন্ত্রের দ্যোতক হইতে পারে না। এই অসংগতির মূলে রহিয়াছে ব্যক্তিগত মালিকানার প্রচলন।[২] আমরা মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা চালু রাখিয়াছি। ইহাতে শিল্পক্ষেত্রের বৃহত্তর অংশ ব্যক্তিগত মালিকানাভুক্ত। ব্যক্তিগত মুনাফা শিকার এবং সামাজিক উৎপাদন এক সংগে বেশীদিন চলিতে পারে না। এই কারণেই ভারত অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন। জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, জীবনধারণের মান, গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন, মদ্যপান রহিত, অনুন্নত শ্রেণীর স্বার্থরক্ষণ, মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ প্রভৃতি ক্ষেত্রে কোন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয় না।[৩]

পশ্চিমবংগ সরকারের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা একমাত্র দেখা যায় যে, পশ্চিমবংগে বামফ্রন্ট সরকার সীমাবদ্ধভাবে কিছু কিছু সাফল্য অর্জন করিয়াছে। এই সরকার উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করিয়াছে, গ্রাম্য ও কুটির শিল্পের প্রসার সাধন করিয়াছে এবং গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করিতে সমর্থ হইয়াছে।

The social problem of the future we considered to be how to unite the greatest liberty of action with a common ownership of the raw materials *of the globe and an equal participation in the benefits of combined labour.* J. S. Mill : *Autobiography*

স্মর্তব্য

১ বর্তমানে সংবিধানভুক্ত ১৮টি নির্দেশমূলক নীতি সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রের দৃষ্টিকোণ হইতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং রাজনৈতিক দিক দিয়া তাৎপর্যপূর্ণও বটে।

২ উহারা কিন্তু বাধ্যতামূলক বা বলবৎযোগ্য নহে।

৩ অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকারই ইহাদের বিষয়বস্তু।

৪ রাজনৈতিক কারণেই কেন্দ্র ও রাজ্য-সরকারসমূহ নীতিগুলিকে অনেকাংশে বলবৎকরণে প্রয়াসী হইয়াছে।

১. ১০৩ পৃষ্ঠা দেখ।

২. "You cannot plan for self sufficiency, far less for plenty, on the basis of the economy of scarcity, which is of the essence of private ownership and control of the instruments and means of production." D. N. Sen : From *Raj to Swaraj*

৩. S. S. Khera : *The Central Executive*, P. 9

1. Discuss the nature of Directive Principles of State Policy distinguishing them from the Fundamental rights.

[মৌলিক অধিকার হইতে পার্থক্য নির্দেশ করিয়া রাষ্ট্র-পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিসমূহের প্রকৃতি ব্যাখ্যা।] (৯২-৯৩, ১২৪-২৮ পৃষ্ঠা)

2. Write a short essay on the Directive Principles of State Policy set forth in the Constitution of India.

[ভারতীয় সংবিধানে সন্নিবিষ্ট রাষ্ট্রের নির্দেশমূলক নীতিসমূহের উপর সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ রচনা কর।] (১২৪-২৮ পৃষ্ঠা)

3. Mention at least *five* of the important Directive Principles of State Policy.

[রাষ্ট্র-পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিসমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটির উল্লেখ কর।]

(১২৯-৩০ পৃষ্ঠা)

4. Explain the nature of the Directive Principles of the State Policy in the Indian Constitution. What is the significance of their insertion in the Constitution. (C. U. 1985)

[ভারতের সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতিসমূহের প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর। এই নীতিসমূহকে সংবিধানে সন্নিবিষ্ট করার তাৎপর্য কি ?] (১২৪-২৮ পৃষ্ঠা)

5. Discuss the nature and significance of the Directive Principles and distinguish them, from the Fundamental Rights in the light of changes brought about by constitutional amendments. (N. B. U. Hons. 1985) (১২৪-২৮ পৃষ্ঠা)

১০ ভারতীয় নাগরিকের মৌল কর্তব্য
(FUNDAMENTAL DUTIES OF THE INDIAN CITIZEN)

"*Rights and duties are inseparable.*" John Lewis

Equal assertion of rights and duties is the keynote of Indian political philosophy. D. M. Brown

১. ৪২তম সংশোধন দ্বারা সন্নিবিষ্ট : ১৯৭৬ সালে ৪২তম সংশোধন দ্বারা ভারতীয় নাগরিকের **১০টি** মৌল কর্তব্য সংবিধানভুক্ত করা হয়।

ইহার ফলে সংবিধানের একটি বিরাট ফাঁক পূরিত হইয়াছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করা হয়। অধিকার অপেক্ষা কর্তব্যের উপর গুরুত্ব আরোপই প্রাচীন ভারতীয় রাজনৈতিক আদর্শ এবং এতদিন পর্যন্ত সংবিধানে এই দিকটি উপেক্ষা করা হইয়াছিল। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে সোবিয়েত ইউনিয়ন, চীন প্রভৃতি দেশের সংবিধানে নাগরিক অধিকারের সহিত নাগরিক-কর্তব্যও উল্লিখিত হইয়াছে।[১]

. প্রতিপাদ্য বিষয় হইল যে কর্তব্য পালন করিয়া তবেই অধিকার ভোগ করা সম্ভব।

বর্ণনা : ৪২তম সংশোধন দ্বারা সন্নিবিষ্ট ভারতীয় নাগরিকের মৌল কর্তব্য হইল নিম্নলিখিত রূপ : প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য হইবে—

(১) সংবিধানকে মান্য করা, সংবিধানের আদর্শ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ, জাতীয় পতাকা ও জাতীয় স্তোত্রের (National Anthem)[২] প্রতি শ্রদ্ধা জানানো ;

(২) যে-সকল মহান আদর্শ দেশের মুক্তির জন্য জাতীয় সংগ্রামকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল তাহাদিগকে পোষণ ও অনুসরণ করা ;

(৩) দেশের **সার্বভৌমিকতা, ঐক্য** ও **সংহতিকে সমর্থন** ও **সংরক্ষণ** করা ;

(৪) দেশের প্রতিরক্ষা করা, এবং আহ্বান জানানো হইলে জাতীয় সেবায় আত্মনিয়োগ করা ;

(৫) ধর্মগত, ভাষাগত এবং অঞ্চলগত বা শ্রেণীগত বিভেদের উর্ধ্বে থাকিয়া ঐক্য ও **ভ্রাতৃত্ববোধকে সম্প্রসারিত করা**, নারীদের মর্যাদাহানিকর এরূপ সকল প্রথাকে পরিহার করা ;

১. নাগরিকের মৌল কর্তব্য জাপানের সংবিধানেও সন্নিবিষ্ট।

২. রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন' গানটিকে **জাতীয় স্তোত্র** (National Anthem) এবং বঙ্কিমচন্দ্রের **'বন্দেমাতরম'কে** 'জাতীয় সংগীত' (National Song) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

(৬) আমাদের মিশ্র কৃষ্টির (compositive culture) সমৃদ্ধ ঐতিহ্যক মূল্য প্রদান ও সংরক্ষণ করা ;

(৭) বন হ্রদ নদী ও বন্যপ্রাণীসহ প্রাকৃতিক পরিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নয়নসাধন করা এবং প্রাণীসমূহের প্রতি মমত্ববোধ পোষণ করা ;

(৮) বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগি, মানবিকতাবোধ এবং অনুসন্ধান ও সংস্কারের মনোভাবের প্রসারসাধন করা ;

(৯) সাধারণের সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং হিংসার (violence) পথ পরিহার করা ;

(১০) যাহাতে দেশের ব্যক্তিগত ও যৌথ সকল কর্মপ্রচেষ্টা উন্নততর পর্যায়ে পৌঁছাইতে পারে তাহার জন্য বিবিধ কার্যকলাপের ক্ষেত্রে উৎকর্ষের জন্য প্রচেষ্টা করা।

১.১. সমর্থন : বহু বিতর্কিত ৪২তম সংশোধন দ্বারা সংবিধানে সন্নিবিষ্ট হইলেও উপরি-উক্ত নাগরিকের মৌল কর্তব্যগুলিকে স্বাগতই জানানো হইয়াছে। সুতরাং ৪২তম সংশোধনের অনেক কিছু পরে অপসারিত করা হইলেও এই সকল মৌল কর্তব্যের তালিকা কর্তব্যকে স্পর্শ করা হইবে না বলিয়াই মনে হয়। বরং মৌল বিস্তৃততর হওয়ার সম্ভাবনাই রহিয়াছে।

১.২. বিরুদ্ধ সমালোচনা : অপরদিকে কিন্তু ঘোষিত মৌল কর্তব্যগুলির বিশেষ মূল্য দেওয়া হয় না। ইহাদের উপযোগিতার বিষয়ে বলা হয় যে এগুলি রাষ্ট্র-পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিগুলির সহিতই তুলনীয়। নির্দেশমূলক নীতিগুলি রাষ্ট্রের প্রতি সংবিধানের নির্দেশ মাত্র। নাগরিক-কর্তব্যগুলিও নাগরিকের প্রতি নির্দেশ ছাড়া আর কিছুই নহে। এগুলিকে কার্যকর করিতে হইলে রাষ্ট্রকে প্রয়োজনীয় আইন পাস করিতে হইবে। সংগে সংগে অবশ্য ইহাদের মূল্য সম্পর্কে সচেতনতাও গড়িয়া তুলিতে হইবে।

১.৩. তুলনামূলক আলোচনা : মৌল কর্তব্যসমূহের ব-নার পর উহাদিগের সহিত সোবিয়েত সংবিধানে সন্নিবিষ্ট নাগরিক-কর্তব্যের একটি তুলনামূলক আলোচনার অবতারণা করা যাইতে পারে।

সোবিয়েত ইউনিয়ন সমাজতান্ত্রিক দেশ, অপরদিকে ভারত মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা বা কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে। সমাজতান্ত্রিক দেশে একদিকে যেমন ব্যক্তিগত, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অধিকার সংরক্ষিত হইয়া থাকে, অপরদিকে তেমনি আবার অন্যান্য কর্তব্য ছাড়া সামাজিক ও অর্থনৈতিক দায়িত্বেরও সুস্পষ্ট উল্লেখ করা হয়। ভারতীয় সংবিধানে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার নির্দেশমূলক নীতি হিসাবে গৃহীত হইয়াছে কিন্তু এগুলি আদালতগ্রাহ্য নয়। সুতরাং সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্তব্যের কথা ততটা উল্লিখিত হয় নাই। যেমন, সোবিয়েত ইউনিয়নে কর্মের অধিকার, বার্ধক্যে ও পীড়িত অবস্থায় রাষ্ট্রীয় সাহায্য পাইবার অধিকার, স্বাস্থ্য সংরক্ষণের অধিকার প্রভৃতি বলবৎযোগ্য অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। ভারতীয় সংবিধানে এগুলি মৌলিক অধিকার নয়, নির্দেশমূলক নীতি মাত্র। এই সকল নীতি

আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য নয়। সোবিয়েত ইউনিয়নে রাষ্ট্রীয় কর্তব্যের অন্যতম হইল নাগরিকদের জন্য অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করা। ভারতীয় সংবিধানে এ-ধরনের কর্তব্যের কথা উল্লিখিত হয় নাই। আবার সোবিয়েত ইউনিয়নে উৎপাদন উপায়সমূহের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা নাই। সুতরাং সকল সম্পত্তিই হইল সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি এবং সংবিধানে নির্দেশ রহিয়াছে যে সকল নাগরিকের কর্তব্য হইল এই সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তিকে রক্ষণাবেক্ষণ করা। এই কর্তব্য ভংগের জন্য শাস্তিপ্রদানের ব্যবস্থা রহিয়াছে। ভারতীয় সংবিধানে ব্যক্তিগত ও জাতীয় উভয় প্রকারের সম্পত্তি রহিয়াছে। কর্তব্য সম্পর্কে বলা হইয়াছে জাতীয় সম্পত্তি সংরক্ষিত করা নাগরিকের কর্তব্য। উল্লেখ্য যে, কর্তব্য আদালতগ্রাহ্য নয়। মোটকথা, সোবিয়েত ইউনিয়নের মত সমাজতান্ত্রিক দেশে অধিকার ও কর্তব্য বিস্তৃত ধরনের। অপরপক্ষে ভারতীয় সংবিধানে মৌলিক অধিকার সংখ্যায় স্বল্প এবং সীমাবদ্ধ। অনুরূপভাবে কর্তব্যগুলিও সংখ্যায় সীমাবদ্ধ।

আর একটি বিষয় সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতে পারে যে ভারতে নির্দেশমূলক নীতির মত এই কর্তব্যগুলি নীতি ভিন্ন আর কিছুই নয়। এগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য নয়। তবে মৌলিক অধিকারের বৈধতা বিচারের সময় আদালত এই কর্তব্যগুলির দিকে দৃষ্টি দিতে পারে।[১]

> *"The basis of all systems, social or political rests upon the goodness of men. No nation is good or great because Parliament enacts this or that, but because its men are good and great."*
>
> Swami Vivekananda

স্মর্তব্য

১. ভরতীয় নাগরিকের ১০টি মৌল কর্তব্য সংবিধানের ৪২তম সংশোধন দ্বারা সন্নিবিষ্ট।

২. নির্দেশমূলক নীতির মত এগুলিও আদালতে বলবৎযোগ্য নহে।

1. Write a short note on the Fundamental Duties of the Indian citizen.

[ভারতীয় নাগরিকের মৌল কর্তব্যের উপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা রচনা কর।] **(১৩৮-৪০ পৃষ্ঠা)**

2. Mention two of the Fundamental duties of the Indian Citizens.

[C. U. 1982]

[ভারতীয় নাগরিকগণের মৌলিক কর্তব্যের যে কোন দুইটির উল্লেখ কর।] **(১৩৮-৩৯ পৃষ্ঠা)**

১. D. D. Basu : *Constitutional Law of India*

১১

ভারতীয় ইউনিয়ন
ইউনিয়নের শাসন বিভাগ
(THE EXECUTIVE ON THE UNION)

The form of government at the Centre is the parliamentary system of government. The President occupies the same position as the King under the English Constitution." S. N. Mukherjee (Joint Secretary, Constituent Assembly)

১. শাসন বিভাগের গঠন (Composition of the Executive) : ভারতীয় সংবিধানে ইউনিয়নের শাসনক্ষমতা বা কার্যপালিকাশক্তি (executive power) রাষ্ট্রপতির হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে তিনি ঐ সকল ক্ষমতা প্রত্যক্ষভাবে বা তাঁহার অধীনে কর্মচারিগণের মাধ্যমে সংবিধান অনুযায়ী প্রয়োগ করিবেন।[১] সুতরাং রাষ্ট্রপতিকে 'সংবিধান অনুযায়ী'ই শাসনক্ষমতা প্রয়োগ করিতে হয়।

১.১. দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থা : সংবিধানের ৭৪ এবং ৭৫(৩) অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য করিবার ও পরামর্শ দিবার জন্য প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন এবং লোকসভার নিকট যৌথভাবে দায়িত্বশীল একটি মন্ত্রি-পরিষদ থাকিবে।

বলা হয়, সংবিধানের **এই দুই ব্যবস্থা**—(১) রাষ্ট্রপতির পক্ষে সংবিধান অনুযায়ী শাসনক্ষমতা প্রয়োগ এবং (২) দায়িত্বশীল মন্ত্রি-পরিষদের অস্তিত্ব—**রাষ্ট্রপতিকে নিয়মতান্ত্রিক শাসকেই পরিণত করিয়াছিল**। তাঁহাকে দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থার রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুযায়ীই শাসনকার্য পরিচালনা করিতে হইত। এ-বিষয়ে যা-কিছু **বির্তকের** সুযোগ ছিল তাহার **অবসান ঘটে ৪২তম সংশোধন পাসের ফলে**। ঐ সংশোধনে সুস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রি-পরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিতে বাধ্য।[২]

এ-বিষয়ে পরে বিশদ আলোচনা করা হইতেছে।

মন্ত্রীদের সাহায্য করিবার জন্য এবং দৈনন্দিন শাসনকার্য সম্পাদনের জন্য বহুসংখ্যক স্থায়ী সরকারী কর্মচারী রহিয়াছেন।

সুতরাং ইউনিয়নের শাসন বিভাগ (১) রাষ্ট্রপতি—তাঁহার অনুপস্থিতিতে উপরাষ্ট্রপতি—এবং (২) মন্ত্রি-পরিষদ ও (৩) স্থায়ী সরকারী কর্মচারীদের লইয়া গঠিত।

১. "The Executive power of the Union shall be vested in the President and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with this Constitution. *Article 53(1)*

২. Act 74(1)

২. রাষ্ট্রপতি—পরোক্ষ নির্বাচন (The President—His Election) : রাষ্ট্রপতি ভারতীয় ইউনিয়নের শীর্ষস্থানে অবস্থিত। তিনি এক বিশেষ নির্বাচকমণ্ডলী (an electoral college) দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন।

২.১. নির্বাচকমণ্ডলীর গঠন : এই নির্বাচকমণ্ডলী গঠিত হয় (ক) কেন্দ্রীয় আইনসভা বা সংসদের উভয় কক্ষের নির্বাচিত সদস্যগণ, এবং (খ) রাজ্যগুলির বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যগণকে লইয়া।

২.২. নির্বাচন-পদ্ধতির বিশদ বর্ণনা : রাষ্ট্রপতি-নির্বাচনে সংবিধান সর্বাগ্রে দুইটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিয়াছে : (ক) যথাসম্ভব ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব একই হারে হইবে। (খ) একদিকে সমষ্টিগতভাবে রাজ্যগুলি এবং অন্যদিকে ইউনিয়ন (কেন্দ্র)—এই দুই পক্ষের মধ্যে ভোটের সমতা রক্ষিত হইবে। অর্থাৎ, **সকল রাজ্যের মোট ভোটসংখ্যা এবং কেন্দ্রের** (উভয় কক্ষের) **মোট ভোটসংখ্যা সমান হইবে।** এই উদ্দেশ্যে সংসদ ও প্রত্যেক রাজ্যের বিধানসভার প্রত্যেক নির্বাচিত সদস্যের কতগুলি করিয়া ভোট দিবার অধিকার থাকিবে তাহা নির্ধারণ করিবার পদ্ধতি হইল এইরূপ : (ক) কোন রাজ্যের বিধানসভার প্রত্যেক নির্বাচিত সদস্যের ভোটসংখ্যা নির্ধারণের জন্য প্রথমে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মোট জনসংখ্যাকে বিধানসভার নির্বাচিত মোট সদস্যসংখ্যা দিয়া ভাগ করিতে হইবে। ইহার পর ভাগফলকে আবার এক হাজার দিয়া ভাগ করিতে হইবে। এই দ্বিতীয়বার ভাগ দ্বারা যে ভাগফল পাওয়া যাইবে ঐ রাজ্যের বিধানসভার প্রত্যেক নির্বাচিত সদস্যের ততগুলি করিয়া ভোট থাকিবে। তবে এই দ্বিতীয়বার ভাগের সময় ভাগশেষ পাঁচশত বা তাহার অধিক হইলে প্রত্যেক সদস্যের ভোটসংখ্যা আর একটি বাড়িয়া যাইবে।

উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা : সাম্প্রতিক উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে বুঝানো যাইতে পারে। বর্তমান রাষ্ট্রপতি রামস্বামী বেংকটরমণের নির্বাচনে পশ্চিমবংগের (১৯৭১ সালের জনগণনা অনুসারে) মোট জনসংখ্যা ছিল ৪,৪৩,১২,০১১ এবং বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যগণ সংখ্যায় ছিলেন মোট ২৯৪। এখন এই জনসংখ্যাকে সদস্যসংখ্যা দিয়া ভাগ করিলে $\left(\frac{৪,৪৩,১২,০১১}{২৯৪}\right)$ ভাগফল হইবে ১,৫০,৭২১। এই ভাগফলকে ১০০০ দিয়া ভাগ করিলে $\left(\frac{১,৫০,৭২১}{১০০০}\right)$ পুনরায় ভাগফল হইবে ১৫০, এবং ভাগশেষ থাকিবে ৭২১। সুতরাং রাষ্ট্রপতি বেংকটরমণের নির্বাচনে পশ্চিমবংগের বিধানসভার প্রত্যেক নির্বাচিত সদস্যের ভোট ছিল (১৫০+১=) ১৫১টি করিয়া।[১]

(খ) পার্লামেন্টের প্রত্যেক নির্বাচিত সদস্যের ভোটসংখ্যা নির্ধারণের জন্য প্রথমে রাজ্যসমূহের বিধানসভাগুলির সদস্যগণের মোট ভোটসংখ্যা নির্ণয় করিয়া ঐ সংখ্যাকে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের নির্বাচিত মোট সদস্যসংখ্যা দিয়া ভাগ করিতে হইবে। এই ভাগের ফলে যে ভাগফল পাওয়া যাইবে তাই হইল সংসদের প্রত্যেক নির্বাচিত সদস্যের ভোটসংখ্যা ; ভগ্নাংশ থাকিলে উহা যদি অর্ধেক বা অর্ধেকের বেশী হয় তবে ভাগফলের সহিত এক যোগ করিতে হইবে।

১. ভাগশেষ পাঁচ শতের অধিক হওয়ায় একটি করিয়া ভোট বাড়ানো হইয়াছে।

২.৩. **ভোটদান-পদ্ধতি—একহস্তান্তরযোগ্য সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব :** আয়ারল্যাণ্ডের সংবিধানের অনুকরণে ভারতীয় সংবিধানে বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্রপতির নির্বাচন হইবে একহস্তান্তরযোগ্য ভোট দ্বারা সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের (proportional representation by means of the single transferable vote) ভিত্তিতে। এই একহস্তান্তরযোগ্য ভোট দ্বারা সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের পদ্ধতির নিয়মকানুনগুলি হইল এইরূপ: রাষ্ট্রপতি-নির্বাচনে **যতজন নির্বাচনপ্রার্থী** থাকিবেন **প্রত্যেক ভোটদাতার ততগুলি পছন্দ** (preferences) থাকিবে। প্রত্যেক ভোটদাতা যে প্রার্থীকে সর্বাপেক্ষা বেশী পছন্দ করেন ব্যালট কাগজে তাঁহার নামের পাশে ১ সংখ্যা বসাইবেন। ইহা ব্যতীত পছন্দের তারতম্য অনুসারে তিনি অন্যান্য প্রার্থীর নামের পাশে ২, ৩, ৪ ইত্যাদি যতজন প্রার্থী থাকেন ততগুলি সংখ্যা বসাইতে পারেন। এই দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি পছন্দ তিনি নাও জানাইতে পারেন, কিন্তু প্রথম পছন্দ তাঁহাকে জানাইতেই হইবে। অন্যথায় তাঁহার ব্যালট পত্রটি বাতিল হইয়া যাইবে।

কোটা: ভোটদান সমাপ্ত হইলে প্রথমে কোন্ কোন্ প্রার্থী কত কত প্রথম পছন্দের **বৈধ ভোট** (valid votes) পাইয়াছেন তাহা দেখা হয়। সমস্ত প্রার্থীর প্রথম পছন্দের মোট ভোটসংখ্যাকে দুই দিয়া ভাগ করিয়া ভাগফলের সহিত ১ যোগ করিলে যে সংখ্যা পাওয়া যায় তাহাকে **'কোটা'** (quota) বলা হয়। অর্থাৎ, নির্বাচিত হইতে হইলে ঐ সংখ্যক ভোট পাওয়া প্রয়োজন।

প্রথম গণনা অথবা তৎপরবর্তী কোন গণনাকালে যদি দেখা যায় যে কোন প্রার্থী কোটা বা ততোধিক ভোট পাইয়াছেন, অথবা একজন মাত্র প্রার্থী বর্তমান রহিয়াছেন তখন ঐ প্রার্থী নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

যদি প্রথম গণনায় কাহাকেও এইভাবে নির্বাচিত করা না যায়, তবে সর্বাপেক্ষা অল্পসংখ্যক ভোটপ্রাপ্ত প্রার্থীকে **নির্বাচন হইতে বাদ** দিয়া তাঁহার ব্যালট পত্রগুলিকে পরবর্তী চিহ্নিত পছন্দ অনুসারে অবশিষ্ট প্রার্থীদের নিকট **হস্তান্তরিত** করা হয়। যে-ক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক প্রার্থী সমসংখ্যক ভোট পাইয়া গণনার সর্বনিম্ন স্থান অধিকার করেন সে-ক্ষেত্রে ঐ প্রার্থীদের মধ্যে স্বল্পতম সংখ্যক প্রথম পছন্দের ভোটপ্রাপ্ত প্রার্থীকে বাদ দেওয়া হয়। দুই বা ততোধিক ব্যক্তি স্বল্পতম সংখ্যক প্রথম পছন্দের ভোট পাইলে 'লটারী'র সাহায্যে স্থির করিতে হয় কাহাকে বাদ দেওয়া হইবে। যে-পর্যন্ত না কোন প্রার্থী 'কোটা' পান অথবা একজন মাত্র প্রার্থী অবশিষ্ট থাকেন সে-পর্যন্ত এইভাবে প্রার্থীবাদ ও ব্যালট পত্রের হস্তান্তরকরণ চলিতে থাকে।

একটি কাল্পনিক দৃষ্টান্ত : একটি কাল্পনিক উদাহরণের সাহায্যে এই নির্বাচন-পদ্ধতির ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। ধরা যাউক, রাষ্ট্রপতির জন্য তিনজন প্রার্থী হইলেন ক, খ এবং গ। আরও ধরা যাক যে বৈধ ভোটের (valid votes) মোট সংখ্যা ১০,০০০ এবং তিনজন প্রার্থী নিম্নলিখিত সংখ্যক প্রথম পছন্দের ভোট পাইয়াছেন :

ক..................৪৪০০

খ..................৩১০০

গ..................২৫০০

এক্ষেত্রে 'কোটা' হইবে $\frac{১০,০০০}{২}+১=৫০০১$।

এই উদাহরণে দেখা যাইতেছে যে প্রার্থীদের মধ্যে কেহই 'কোটা'—অর্থাৎ ৫০০১ ভোট পান নাই। সুতরাং সর্বাপেক্ষা কম ভোটপ্রাপ্ত প্রার্থী গ-কে নির্বাচন হইতে বাদ দিয়া তাঁহার ব্যালট পত্রগুলিকে পরবর্তী চিহ্নিত পছন্দ—অর্থাৎ দ্বিতীয় পছন্দ অনুসারে ক ও খ এর নিকট হস্তান্তরিত করিতে হইবে। ধরা যাক, হস্তান্তরের ফলে দেখা গেল যে গ-এর মোট ভোটসংখ্যার মধ্যে ক ৪০০ এবং খ ২১০০ দ্বিতীয় পছন্দের ভোট পাইয়াছেন। এখন দুইজন প্রার্থীর ভোটসংখ্যা দাঁড়াইবে এইরূপ :

	প্রথম পছন্দের ভোটসংখ্যা		দ্বিতীয় পছন্দের ভোটসংখ্যা		মোট ভোটসংখ্যা
ক	৪৪০০	+	৪০০	=	৪৮০০
খ	৩১০০	.	২১০০	=	৫২০০

এখন দেখা যাইতেছে, খ নির্বাচিত হওয়ার প্রয়োজনীয় ভোটসংখ্যা বা কোটা পাইয়াছেন। অতএব, খ-ই রাষ্ট্রপতিপদে নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করা হইবে।

২৪. রাষ্ট্রপতির নির্বাচন-পদ্ধতির সপক্ষে যুক্তি : রাষ্ট্রপতির নির্বাচন-পদ্ধতির সপক্ষে যুক্তি দুই প্রকার : (ক) সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের সপক্ষে যুক্তি, (খ) পরোক্ষ নির্বাচনের সপক্ষে যুক্তি।

(ক) সমানুপাতিক পদ্ধতি : সমানুপাতিক পদ্ধতির সপক্ষে যুক্তি দিতে গিয়া সংবিধানে খসড়া রচনা কমিটির চেয়ারম্যান ডক্টর আম্বেদকর উক্তি করিয়াছিলেন যে, **রাষ্ট্রপতি-নির্বাচনে যাহাতে সংখ্যালঘিষ্ঠের ভূমিকা** থাকে তাহার জন্যই ভোটাধিক্যের নীতিকে (principle of bare majority) পরিহার করিয়া একহস্তান্তরযোগ্য ভোট দ্বারা সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের নীতি গ্রহণ করা হইয়াছে।[১]

এই যুক্তির বিশেষ সারবত্তা আছে বলিয়া মনে হয় না। কোন একটি দলের পর্যাপ্ত সংখ্যাধিক্য থাকিলে রাষ্ট্রপতি-নির্বাচনে সংখ্যালঘিষ্ঠ দলগুলির কোন কার্যকর ভূমিকাই থাকিতে পারে না। একটি কাল্পনিক দৃষ্টান্তের মাধ্যমে যুক্তিটির ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। ধরা যাক, রাষ্ট্রপতি-নির্বাচনে মোট ভোটসংখ্যা হইল ১০,০০০ এবং এই মোট ভোটসংখ্যার মধ্যে কংগ্রেস (ই) দলের ভোটসংখ্যা হইল ৫০০১। এক্ষেত্রে মাত্র কংগ্রেস (ই) দলের প্রার্থীই নির্বাচিত হইবেন—নির্বাচনে সংখ্যালঘিষ্ঠ দলগুলির কোন ভূমিকা থাকিবে না। একমাত্র যখন কোন একটি দলের মোট সংখ্যার মধ্যে অর্ধেকের বেশী ভোট থাকে না তখন একাধিক দল সম্মিলিত হইয়া রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচন করে। এক্ষেত্রেও কিন্তু রাষ্ট্রপতি-নির্বাচনে সকল সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের ভূমিকা থাকে না। বস্তুত,

১. "The election of the President by bare majority has to be eliminated and we have to provide a system whereby minorities will have some voice in the election of the President." The only method,... in which the minorities shall have some hand and some say,... is undoubtedly *the system of proportional*

সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের পদ্ধতি অনুসরণের আসল যুক্তি হইল, মোট বৈধ ভোটসংখ্যার অর্ধেকের বেশী ভোটপ্রাপ্ত প্রার্থীকেই রাষ্ট্রপতিপদে নির্বাচিত করা। সাধারণ ভোটাধিক্যের নীতি (simple majority principle) অনুসৃত হইলে যেখানে বহুসংখ্যক প্রার্থীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে সেখানে কোন ব্যক্তি মোট ভোটসংখ্যার অর্ধেকের বেশী ভোট না পাইয়াও নির্বাচিত হইতে পারেন। যেমন, ভোটসংখ্যা যদি ১০০ হয় এবং ক খ গ ও ঘ এই চারিজন প্রার্থী যদি যথাক্রমে ৩৫, ৩০, ২৫ ও ১০ ভোট পান তাহা হইলে ক মাত্র শতকরা ৩৫ ভাগ ভোটের বলে ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইবেন। সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের পদ্ধতিতে এই অবস্থার হাত হইতে রেহাই পাওয়া যায়, কারণ কোন ব্যক্তি ৫০ শতাংশের অধিক ভোট না পাইলে রাষ্ট্রপতিপদে নির্বাচিত হইতে পারেন না।

(খ) পরোক্ষ নির্বাচন-পদ্ধতি: রাষ্ট্রপতিকে পরোক্ষভাবে (indirect) নির্বাচিত করিবার সপক্ষে **দুইটি যুক্তি** প্রদর্শিত হইয়াছে: (১) সংসদীয় শাসন-ব্যবস্থায় নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তাকে প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণ দ্বারা নির্বাচিত না করাই সমীচীন। কারণ, উহাতে নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা এবং প্রধান মন্ত্রী ও মন্ত্রি-পরিষদের মধ্যে বিরোধ বাধিবার সম্ভাবনা থাকে। একদিকে মন্ত্রিবর্গ দাবি করেন যে, তাঁহারাই জনসাধারণের প্রতিনিধি; অন্যদিকে রাষ্ট্রপ্রধান প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া দাবি করিতে পারেন যে তিনিই জনসাধারণের প্রতিনিধি। এইভাবে শাসন-ব্যবস্থায় অসুবিধার সৃষ্টি হইতে পারে। (২) ভারতের ন্যায় বিশাল দেশে বিরাট নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা রাষ্ট্রপতির প্রত্যক্ষ নির্বাচন অত্যন্ত **জটিল** ও **ব্যয়সাপেক্ষ** পদ্ধতি।

৩. রাষ্ট্রপতির কার্যকাল, ইত্যাদি (President's Term of Office, etc): রাষ্ট্রপতি এককালীন ৫ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইয়া থাকেন এবং **সংখ্যাহীনবার পুনর্নির্বাচিত** হইতে পারেন। এখানে উল্লেখ করা যায় যে **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র** ও **আয়ারল্যাণ্ডে** একই ব্যক্তি **দুইবারের অধিক** রাষ্ট্রপতিপদে নির্বাচিত হইতে পারেন না। রাষ্ট্রপতি কার্যকাল উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে পদত্যাগ করিতে পারেন অথবা সংসদ সংবিধানভংগের অভিযোগে বিচার করিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে পারে।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় সম্পর্কে সংবিধানে বলা হইয়াছে যে রাষ্ট্রপতির কার্যকালের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বেই পরবর্তী রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকার্য সমাধা করিতে হইবে। মৃত্যু, পদত্যাগ বা অপসারণের ফলে রাষ্ট্রপতিপদ শূন্য হইলে ৬ মাসের মধ্যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করিতে হইবে।

নির্বাচন-সংস্থার গঠন-বৈধতার প্রশ্ন: '৭৪ সালে একটি প্রশ্ন উঠে: এক বা একাধিক রাজ্যের বিধানসভাকে যদি ইতিমধ্যে ভাঙিয়া দেওয়া হয় (dissolved) তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য নির্বাচন-সংস্থার (electoral college) গঠন বৈধ হইবে কি না? শেষ পর্যন্ত বিষয়টি সুপ্রীম কোর্টের নিকট মতামতের জন্য প্রেরিত হয়। সুপ্রীম কোর্ট অভিমত প্রদান করে যে কোন রাজ্যের বিধানসভা ভাঙিয়া দেওয়া হইলেও রাষ্ট্রপতির নির্বাচন তাঁহার কার্যকাল শেষ হওয়ার পূর্বেই সমাধা

করিতে হইবে।[১] সংবিধানে (Article 71 [4]) সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, নির্বাচনী সংস্থার সভ্যপদ শূন্য থাকিলে ঐ কারণে রাষ্ট্রপতি বা উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচনের বৈধতা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন তোলা চলিবে না।

৩.১. **রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করিবার পদ্ধতি**: রাষ্ট্রপতিকে (মাত্র) **সংবিধান-ভংগের অভিযোগে** পদচ্যুত করা যায়। অভিযোগ সংসদের যে-কোন কক্ষ আনয়ন করিতে সমর্থ। অভিযোগ প্রস্তাবাকারে আনিতে হয়। প্রস্তাবটি উত্থাপন করিবার পূর্বে সংশ্লিষ্ট পরিষদের মোট সদস্যসংখ্যার অন্যূন **এক-চতুর্থাংশের দ্বারা স্বাক্ষরিত** এবং অন্তত ১৪ দিনের এক লিখিত নোটিস দিয়া প্রস্তাব উত্থাপনের অভিপ্রায় জানাইতে হয়। ইহার পর প্রস্তাবটি ঐ পরিষদের মোট সদস্যসংখ্যার অন্তত দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থনে পাস হওয়া প্রয়োজন। এক পরিষদে প্রস্তাব গৃহীত হইলে অপর পরিষদ অভিযোগ সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবার ব্যবস্থা করিবে। অনুসন্ধানের পর যদি অনুসন্ধানকারী পরিষদ মোট সদস্যসংখ্যার অন্তত **দুই-তৃতীয়াংশের ভোটাধিক্যে** এই মর্মে প্রস্তাব পাস করে যে, রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি পদ হইতে অপসারিত হইবেন।

ইম্‌পিচমেণ্ট পদ্ধতি: রাষ্ট্রপতির পদচ্যুতির এই পদ্ধতিকে ইম্‌পিচমেণ্ট বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

৩.২. **রাষ্ট্রপতিপদের যোগ্যতা**: কোন ব্যক্তি (১) ভারতের নাগরিক না হইলে, (২) ৩৫ বৎসর বয়স্ক না হইলে এবং (৩) **লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্যতাসম্পন্ন** না হইলে রাষ্ট্রপতি হিসাবে নির্বাচিত হইতে সমর্থ হন না।[২] রাষ্ট্রপতি পার্লামেণ্ট কিংবা রাজ্য বিধানমণ্ডলের সদস্য হইতে পারিবেন না। তিনি অন্য কোন লাভজনক পদেও (an office of profit) অধিষ্ঠিত থাকিতে পারেন না।

বেতন, ভাতা ইত্যাদি: রাষ্ট্রপতির বেতন, ভাতা এবং অন্যান্য অধিকার পার্লামেণ্ট আইন করিয়া স্থির করিয়া দিতে পারে। যে-পর্যন্ত সংসদ ঐ সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা না করিবে, সে-পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি সংবিধানের দ্বিতীয় তপশীলে বর্ণিত বেতন এবং ভাতা ও অন্যান্য সুযোগসুবিধা ভোগ করিবেন।

৩.৩. **রাষ্ট্রপতি কর্তৃক শপথ গ্রহণ**: কার্যভার গ্রহণের পূর্বে রাষ্ট্রপতিকে ভারতের প্রধান বিচারপতি বা তাঁহার অনুপস্থিতিতে প্রধান ধর্মাধিকরণের উপস্থিত প্রবীণতম বিচারপতির সমক্ষে ঈশ্বরের নামে শপথ করিতে হয় অথবা সত্যনিষ্ঠার সহিত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হয় যে (১) তিনি বিশ্বস্ততার সহিত রাষ্ট্রপতির কার্য সম্পাদন করিবেন,

---

১. "The election to the office of the President must be held before the expiration of the term of the President notwithstanding the fact that at the time of such election the legislative Assembly of a State is dissolved."

২. ১৯৭৪ সালের এক আইন অনুসারে রাষ্ট্রপতিপদে নির্বাচনের জন্য প্রত্যেক প্রার্থীর নাম ১০ জন নির্বাচক কর্তৃক প্রস্তাবিত এবং ১০ জন নির্বাচক কর্তৃক সমর্থিত হইতে হইবে। ইহা ব্যতীত প্রত্যেক মনোনয়ন পত্রের সহিত ২.৫ হাজার টাকা জমা রাখিতে হইবে।

(২) যথাসাধ্য সংবিধান ও আইন পরিরক্ষণ, সংরক্ষণ ও প্রতিরক্ষণ করিবেন, এবং
(৩) নিজেকে ভারতের জনগণের সেবা ও কল্যাণে নিয়োজিত করিবেন।

৩.৪. আদালতে অভিযোগের হাত হইতে অব্যাহতি: রাষ্ট্রপতি পদাধিকারবলে যে-সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ এবং কর্তব্য সম্পাদন করেন অথবা ঐ ক্ষমতা প্রয়োগ এবং কর্তব্য সম্পাদন করিতে গিয়া যে কার্য করেন তাহার জন্য তাঁহাকে আদালতের নিকট জবাবদিহি করিতে হয় না। যে-ব্যক্তি রাষ্ট্রপতিপদ অধিকার করিয়া আছেন তাঁহার বিরুদ্ধে পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন ফৌজদারী মামলা রুজু বা পরিচালনা করা যাইবে না এবং তাঁহাকে গ্রেপ্তার বা কারাবাসের জন্য কোন আদালত পরোয়ানা বাহির করিতে পারিবে না। পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে বা পরে অনুষ্ঠিত ব্যক্তিগত কার্যের জন্য রাষ্ট্রপতি যতক্ষণ পর্যন্ত পদে বহাল থাকিবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আদালতে কোন প্রকার দেওয়ানী মামলা রুজু করা যাইবে না, যদি-না দুই মাসের নোটিস প্রদান করা হয়।

৪. ভারতের উপরাষ্ট্রপতি (The Vice-President of India): ভারতের উপরাষ্ট্রপতি **সংসদের উভয় কক্ষের সদস্যগণ লইয়া গঠিত** (রাজ্য বিধানসভাসমূহের কোন ভূমিকা নাই) এক নির্বাচকমণ্ডলীর (an electoral college) দ্বারা নির্বাচিত হন। ১৯৬১ সালের সংবিধান (একাদশ সংশোধন) আইনের দ্বারা এই নির্বাচকমণ্ডলীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সংশোধনের পূর্বে সংবিধানের ব্যবস্থা ছিল যে পার্লামেন্টের উভয় পরিষদের সদস্যগণ যুক্ত অধিবেশনে মিলিত হইয়া উপরাষ্ট্রপতিকে নির্বাচন করিবেন। নির্বাচনের পদ্ধতি হইল একহস্তান্তরযোগ্য ভোট দ্বারা সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব।

৪.১. কার্যকাল: উপরাষ্ট্রপতির কার্যকালের **মেয়াদও ৫ বৎসর**।

৪.২. পদচ্যুতি: রাজ্যসভায় মোট সদস্যসংখ্যার অধিকাংশ দ্বারা পদচ্যুতির প্রস্তাব গৃহীত হইলে এবং ঐ প্রস্তাবে লোকসভা সম্মতি প্রদান করিলে তাঁহাকে পদচ্যুত করা যায়।

সুতরাং উপরাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করিবার জন্য রাষ্ট্রপতির ন্যায় ঠিক 'ইম্‌পিচমেন্ট'-পদ্ধতি অনুসরণের প্রয়োজন হয় না।

৪.৩. উপরাষ্ট্রপতিপদের যোগ্যতা: (১) ভারতের নাগরিক না হইলে, (২) ৩৫ বৎসর বয়স্ক না হইলে এবং (৩) **রাজ্যসভার সদস্যরূপে নির্বাচিত হইবার যোগ্যতা** না থাকিলে কোন ব্যক্তি উপরাষ্ট্রপতিপদে নির্বাচিত হইতে পারেন না।[১]

৪.৪. কার্যাবলী: উপরাষ্ট্রপতি **পদাধিকারবলে** সংসদের উচ্চতর পরিষদ বা **রাজ্যসভার সভাপতি**। এ-বিষয়ে ভারতীয় সংবিধান **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অনুসরণ** করিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপরাষ্ট্রপতিও পদাধিকারবলে কংগ্রেসের উচ্চতর পরিষদ বা সিনেটের (Senate) সভাপতি।

১. ১৯৭৩ সালের এক আইন অনুসারে উপরাষ্ট্রপতিপদে নির্বাচনের জন্য প্রার্থীর নাম ৫ জন নির্বাচক কর্তৃক প্রস্তাবিত এবং অপর ৫ জন নির্বাচক কর্তৃক সমর্থিত হওয়া প্রয়োজন।

মার্কিন উপরাষ্ট্রপতির সহিত তুলনা : ভারতের রাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতিতে অথবা মৃত্যু পদত্যাগ ইত্যাদি কারণে তাঁহার পদ শূন্য থাকিলে উপরাষ্ট্রপতি **রাষ্ট্রপতির কার্য সম্পাদন** করিয়া থাকেন—রাষ্ট্রপতিপদে উন্নীত হন না।[১] রাষ্ট্রপতির পদ স্থায়ীভাবে শূন্য হইলে আবার নূতন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। এ-ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থা একটু স্বতন্ত্র ধরনের। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মৃত্যু পদচ্যুতি পদত্যাগ ইত্যাদি কারণে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইলে উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতিপদেই উন্নীত হন, অস্থায়ীভাবে রাষ্ট্রপতির কার্য পরিচালনা করেন না। এইভাবেই থিয়োডর রুজভেল্ট, ট্রুম্যান, জনসন এবং জেরাল্ড ফোর্ড রাষ্ট্রপতিপদে উন্নীত হইয়াছিলেন।

৫. **পদমর্যাদা :** বলা হয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস উপরাষ্ট্রপতিকে সহজেই ভুলিয়া যায়। উক্তিটি ভারতের উপরাষ্ট্রপতি সম্বন্ধেও সমভাবে প্রযোজ্য। প্রথমত, ভারতের উপরাষ্ট্রপতির **পদটি** আনুষ্ঠানিকভাবে **মোটেই গুরুত্বপূর্ণ** নয়—সংবিধান শাসনসংক্রান্ত কোন ক্ষমতাই উপরাষ্ট্রপতির হস্তে ন্যস্ত করে নাই। রাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতি অথবা তাঁহার পদ শূন্য না হইলে উপরাষ্ট্রপতির পক্ষে অস্থায়ীভাবেও শাসন-সংক্রান্ত কোন কার্য পরিচালনা করা সম্ভব হয় না। দ্বিতীয়ত, ব্যবহারিক দিক দিয়া সংসদীয় শাসন-ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতির পদই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নহে, যিনি তাঁহার অস্থায়ী প্রতিনিধি হইতে পারেন মাত্র সেই উপরাষ্ট্রপতির পদ ত দূরের কথা। তৃতীয়ত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে অনেক সময় উপরাষ্ট্রপতিকে ক্যাবিনেটের বৈঠকে যোগদানের জন্য আহ্বান করা হয় ; সংসদীয় শাসন-ব্যবস্থায় কিন্তু ইহা সম্ভব নয়।

অনাবশ্যক মহামহিম : সুতরাং ভারতের উপরাষ্ট্রপতিকে প্রকৃতই 'অনাবশ্যক মহামহিম' (His Superfluous Highness) বলিয়া অভিহিত করা চলে।

৫.১. **পদমর্যাদার কিছুটা বৃদ্ধি :** পূর্বে ভারতের উপরাষ্ট্রপতি পদমর্যাদায় প্রধান মন্ত্রীরও নিম্নে ছিলেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রিদপ্তর (Home Ministry) কর্তৃক প্রকাশিত পদমর্যাদার তালিকায় (Table of Precedence) উপরাষ্ট্রপতির স্থান ছিল তৃতীয়—অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রীর নিম্নে। বর্তমানে অবশ্য ঐ তালিকায় উপরাষ্ট্রপতির স্থান রাষ্ট্রপতির পরই—অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রীর ঊর্ধ্বে।[২]

সম্প্রতি উপরাষ্ট্রপতির পদকে অন্যভাবে কিছুটা **গুরুত্বপূর্ণ করিয়া তোলার প্রচেষ্টা** করা হইতেছে—তাঁহাকে দেশের প্রতিনিধি হিসাবে বিভিন্ন দেশে শুভেচ্ছা সফরে পাঠানো হইতেছে, বিভিন্ন মিশন ও প্রতিনিধির সহিত আলোচনায় তাঁহাকে অন্যতম মুখপাত্র নিযুক্ত করা হইতেছে, ইত্যাদি।

৫.২. **রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইলে কার্যপরিচালনা সংক্রান্ত আইন (Law regarding Discharge of Presidential Function) :** সংবিধান অনুসারে

১. ভি. ভি. গিরি ও বি. ডি. জাত্তি উভয়ই রাষ্ট্রপতির কার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতিপদে উন্নীত হন নাই। গিরি অবশ্য পরে নির্বাচনের মাধ্যমেই রাষ্ট্রপতিপদ লাভ করিয়াছিলেন।

২. প্রথমে পদমর্যাদার তালিকায় প্রধান মন্ত্রী উপরাষ্ট্রপতির ঊর্ধ্বে ছিলেন। পরে তৎকালীন উপরাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণাণের আপত্তিতে উহার উক্ত পরিবর্তন করা হয়।

রাষ্ট্রপতির মৃত্যু পদত্যাগ ইত্যাদি কারণে রাষ্ট্রপতিপদ শূন্য হইলে বা রাষ্ট্রপতি দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থাকিলে, যতদিন-না নূতন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন ততদিন উপরাষ্ট্রপতি **রাষ্ট্রপতির কার্য পরিচালনা** করেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতিপদে অস্থায়ীভাবে আসীন উপরাষ্ট্রপতি যদি পদত্যাগ করেন বা মৃত্যু ইত্যাদির দরুন ঐ পদ শূন্য হয় তবে কে রাষ্ট্রপতির কার্য পরিচালনা করিবেন সে-সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা সংবিধানে নাই। এই ব্যবস্থা করা হয় ১৯৬৮ সালের আইন দ্বারা। আইনটি অনুসারে রাষ্ট্রপতির কার্য-পরিচালনার জন্য উপরাষ্ট্রপতির **পরবর্তী** ব্যক্তি হইলেন **ভারতের প্রধান বিচারপতি।**

৫.৩. **রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন সম্পর্কে বিবাদ-মীমাংসার ব্যবস্থা:** ১৯৭৮ সালে সংবিধানের ৪৪তম সংশোধনে ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচনসংক্রান্ত আইনাদি সংসদ রচনা করিবে।

সুপ্রীম কোর্টের এক্তিয়ার: এই সংশোধন অনুসারে রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতির নির্বাচন সম্পর্কে কোন সন্দেহ জাগিলে অথবা কোন বিবাদ বাধিলে সুপ্রীম কোর্ট ঐ সম্পর্কে অনুসন্ধান এবং মীমাংসা করিবে। এবং **সুপ্রীম কোর্ট যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে তাহাই চূড়ান্ত** বলিয়া পরিগণিত হইবে [৭১ (১) অনুচ্ছেদ]।[১] পূর্বের (৩৯তম সংশোধন অনুসারে) এই ক্ষমতা ছিল যে সংসদ আইন দ্বারা সৃষ্ট এক কর্তৃপক্ষের হস্তে এবং উহার সিদ্ধান্ত আদালতের এক্তিয়ার বহির্ভূত করা হইয়াছিল।

৬. **রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার বর্ণনা** (Description of Presidential Powers): ভারতীয় সংবিধানে রাষ্ট্রপতির হস্তে প্রভূত **আইনগত ক্ষমতা** ন্যস্ত করা হইয়াছে। এই সকল ক্ষমতা মোটামুটি **চারি শ্রেণীতে** বিভক্ত: (ক) শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা, (খ) আইনসংক্রান্ত ক্ষমতা, (গ) অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা এবং (ঘ) জরুরী অবস্থাদি সংক্রান্ত ক্ষমতা।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা সম্পর্কে বলা হয় যে ভারতীয় সংবিধানের উদ্দেশ্য হইল সংসদীয় বা ক্যাবিনেট শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করা। এইরূপ শাসন-ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধান নিয়মতান্ত্রিক শাসক হিসাবে কার্য করেন। আইনত তাঁহার হস্তে বিবিধ ক্ষমতা ন্যস্ত থাকিলেও সরকার পরিচালনার দায়িত্ব বহন করেন আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল মন্ত্রিবর্গ। এইজন্যই রাষ্ট্রপ্রধানকে মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিতে হয়। ইহার উপর ভারতীয় সংবিধানের ১৯৭৬ সালের ৪২তম সংশোধন সুস্পষ্ট নির্দেশ দেয় যে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রি-পরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিতে বাধ্য থাকিবেন। সুতরাং ভারতের রাষ্ট্রপতি সম্পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে সকল ক্ষেত্রেই মন্ত্রি-পরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী তাঁহার ক্ষমতাকে প্রয়োগ করিবেন। ইংল্যাণ্ডের রাজা বা রাণীর কোন স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা আছে কি না সে-বিষয়ে মতবিরোধ থাকিলেও সংবিধানের ৪২তম সংশোধনের ফলে ভারতের রাষ্ট্রপতির ক্ষেত্রে এ-বিষয়ে মতদ্বৈধতার অবসান ঘটিয়াছে।[২] এখন

১. The Constitution (44th Amendment) Act, 1978

২. ১৪ পৃষ্ঠ. দেখ।

আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রপতির হস্তে **ন্যস্ত** বিভিন্ন প্রকার **ক্ষমতার**—অর্থাৎ যে ক্ষমতার ব্যবহার তিনি মন্ত্রি-পরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী করিতে বাধ্য—**বর্ণনা** করা হইতেছে।

৬.ক. **শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা** (**Executive Powers**): কেন্দ্রীয় সরকার বা ইউনিয়নের সমগ্র কার্যপালিকাশক্তি (executive power) রাষ্ট্রপতির হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে এবং তিনি প্রত্যক্ষভাবে অথবা তাঁহার অধীন কর্মচারিগণের মাধ্যমে সংবিধান অনুযায়ী এই ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া থাকেন (১৪১ পৃষ্ঠা)।

(১) নিয়োগ, ইত্যাদি: ইউনিয়নের কার্যপরিচালনা সম্বন্ধে সংবাদ জানিবার অধিকার রাষ্ট্রপতির রহিয়াছে। রাজ্যপালগণের, এটর্নি-জেনারেলের ও ইউনিয়নের মন্ত্রীদের নিয়োগ ও পদচ্যুত করিবার ক্ষমতা হইল রাষ্ট্রপতির। ইহা ব্যতীত সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিগণ, অডিটর-জেনারেল, নির্বাচন কমিশনার, ইউনিয়ন পাব্‌লিক সার্ভিস কমিশন ও যুগ্ম কমিশন, আন্তঃরাজ্য কমিশন প্রভৃতির নিয়োগ রাষ্ট্রপতি করেন। জরুরী অবস্থায় রাজ্যপালের কার্য সম্পাদনের জন্য যে ব্যবস্থা করা তিনি সমীচীন মনে করেন সেই ব্যবস্থাই অবলম্বন করিতে পারেন।

(২) প্রতিরক্ষা: রাষ্ট্রপতি দেশের **রক্ষিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক** (Supreme Commander of the Armed Forces)। তবে এই ক্ষমতা সংসদ-প্রণীত আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সংসদের হস্তে রক্ষিবাহিনী, যুদ্ধ ও শান্তি বিষয়ে আইন করিবার অনন্য (exclusive) ক্ষমতা রহিয়াছে। সুতরাং সংসদের অনুমোদন ব্যতীত রাষ্ট্রপতির পক্ষে যুদ্ধঘোষণা বা সৈন্য নিয়োগ করা সম্ভবপর নহে।

(৩) বৈদেশিক সম্পর্ক: আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে ভারতের প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব হইল রাষ্ট্রপতির। তিনিই অন্যান্য দেশের কূটনৈতিক প্রতিনিধিগণকে গ্রহণ করেন এবং অন্য দেশে ভারতীয় প্রতিনিধিগণকে প্রেরণের জন্য নিয়োগ করেন।

(৪) ক্ষমাপ্রদর্শন: রাষ্ট্রপতির ক্ষমাপ্রদর্শনের ক্ষমতাও আছে। অপরাধের জন্য দণ্ডিত ব্যক্তিকে তিনি ক্ষমাপ্রদর্শন অথবা তাহার দণ্ডাদেশ হ্রাস করিতে পারেন, তিনি দণ্ডাদেশকে স্থগিত রাখিতেও সমর্থ। যেস্থলে দণ্ড বা দণ্ডাদেশ সামরিক আদালত কর্তৃক প্রদত্ত হয়, যেস্থলে কেন্দ্রীয় সরকারের অধিকারভুক্ত বিষয় সম্পর্কিত আইনভংগের জন্য দণ্ড বা দণ্ডাদেশ প্রদত্ত হয় এবং যেস্থলে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় সেই স্থলে রাষ্ট্রপতি এই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন। শাসন বিভাগের পক্ষে **বিচার বিষয়ে হস্তক্ষেপ** করিবার এই ক্ষমতার প্রয়োজন হয় **বিচারকার্যের ভুলত্রুটি সংশোধনের জন্য**।[১]

৬.খ. **আইনসংক্রান্ত ক্ষমতা** (**Legislative Powers**): ইংল্যাণ্ডের রাজা বা রাণীর মত রাষ্ট্রপতি সংসদের অবিচ্ছেদ্য অংগ। সংসদ গঠিত হয় রাষ্ট্রপতি + লোকসভা ও রাজ্যসভা—এই দুইটি পরিষদ লইয়া।[২]

১. "This is a necessary prerogative of the executive to rationalise justice in certain cases."

২. ইংল্যাণ্ডে আইনসভা হইল রাজা (রাণী)-সহ পার্লামেন্ট (The King (or Queen) in Parliament)। ভারতে কিন্তু পার্লামেন্টই (সংসদই) আইনসভা এবং উহা গঠিত হয় রাষ্ট্রপতি এবং লোকসভা ও রাজ্যসভা লইয়া।

(১) **মনোনয়ন** : রাষ্ট্রপতি সংসদের উচ্চতর পরিষদের ১২ জন সদস্য মনোনীত করেন। নিম্নতর পরিষদ বা লোকসভাতেও **অনধিক ২ জন** ইংগ-ভারতীয় সদস্য মনোনীত করিবার ক্ষমতা তাঁহার রহিয়াছে।

(২) **সংসদের অধিবেশন, ইত্যাদি** : তিনি সংসদের অধিবেশন আহ্বান করেন। সংসদের উভয় পরিষদ বা যে-কোন পরিষদের অধিবেশনের অবসান এবং লোকসভাকে ভাঙিয়া দেওয়ার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হস্তে ন্যস্ত। তিনি সংসদের যে-কোন পরিষদে বা মিলিতভাবে উভয় পরিষদে অভিভাষণ প্রদান এবং যে-কোন পরিষদে **বাণী** (message) প্রেরণ করিতে পারেন। প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনের পর এবং প্রত্যেক বৎসর সংসদের প্রথম অধিবেশনের প্রারম্ভে সমবেত উভয় পরিষদে তাঁহাকে অভিভাষণ প্রদান করিতে হয়। এই **উদ্বোধনী বক্তৃতায়** সরকারী নীতির কথাই উল্লিখিত হইয়া থাকে।

(৩) **বিলে সম্মতিজ্ঞাপন** : রাষ্ট্রপতির সম্মতি ব্যতীত কোন বিল আইনে পরিণত হইতে পারে না। সংসদের উভয় পরিষদে বিল পাস হওয়ার পর ঐ বিল সম্মতির জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত করা হয়। তিনি উহাতে (১) সম্মতি দিতে পারেন, (২) না'ও দিতে পারেন, অথবা (৩) বিলটি **অর্থ বিল না হইলে** তিনি উহাকে উভয় পরিষদের নিকট পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরত পাঠাইতে পারেন। সংবিধানে বলা হইয়াছে, যে-কোন বিল (অর্থ বিল ব্যতীত) রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থিত করার পর **যথাসম্ভব শীঘ্র** রাষ্ট্রপতি তাঁহার বাণী (message) সহ বিলটিকে কক্ষদ্বয়ের নিকট ফেরত পাঠাইতে পারেন এবং তাঁহার বাণীতে বিলকে বা বিলের বিশেষ অংশের পুনর্বিবেচনা—বিশেষ করিয়া সংশোধনের অনুরোধ জানাইতে পারেন।

এইরূপ ফেরত পাঠাইবার পর বিলটি দ্বিতীয়বার উভয় পরিষদে পাস হইলে তিনি উহাতে সম্মতি দিতে বাধ্য থাকেন (১১১ অনুচ্ছেদ) ।

ভিটো : রাষ্ট্রপতির বিল বাতিল করার ক্ষমতা বা ভিটো ক্ষমতা (veto power) —(১) পূর্ণাংগ ভিটো (absolute veto), (২) স্থগিতকারী ভিটো (suspensive veto) এবং (৩) পকেট ভিটো (pocket veto)—এই তিন ধরনের ভিটোর সংমিশ্রণ। পূর্ণাংগ ভিটোর ক্ষেত্রে বিলে রাষ্ট্রপ্রধান সম্মতিজ্ঞাপন করিতে অস্বীকার করিলে বিলটি বাতিল হইয়া **যায়**। ভারতের রাষ্ট্রপতির **আইনত** পূর্ণাংগ ভিটো প্রয়োগ করিবার ক্ষমতা আছে,—তিনি কোন বিলে সম্মতি-জ্ঞাপনে অস্বীকার করিতে পারেন। অবশ্য রাষ্ট্রপতি সম্পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক শাসকপ্রধান বলিয়া—অর্থাৎ তিনি সর্বক্ষেত্রে মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুযায়ী চলিতে বাধ্য বলিয়া—তাঁহার পক্ষে পূর্ণাংগ ভিটো ক্ষমতা প্রয়োগের বিশেষ কোন প্রশ্ন থাকিতে পারে না। একমাত্র বিশেষ অবস্থায় মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুযায়ীই তিনি এই ভিটো প্রয়োগ করিতে সমর্থ।

স্থগিতকারী ভিটোর ক্ষেত্রে শাসন বিভাগ কোন বিলে সম্মতি না দিলে সেই বিল যদি আইন-সভা কর্তৃক পুনরায় অনুমোদিত হয় তাহা হইলে শাসন বিভাগ ঐ বিলকে স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য থাকে। রাষ্ট্রপতি কোন বিলকে বাতিল না করিয়া দিয়া পুনর্বিবেচনার জন্য সংসদের নিকট ফেরত পাঠাইল বিলটি যদি সংসদে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে গৃহীত হয় তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি সম্মতি দিতে বাধ্য থাকেন।

পকেট ভিটোর ব্যবস্থা থাকিলে শাসকপ্রধান বিলে সম্মতি না দিয়া অথবা উহাকে ফেরত না পাঠাইয়া বিলটি ফেলিয়া রাখিতে পারেন।[১] ভারতের রাষ্ট্রপতি কোন বিলে সম্মতিজ্ঞাপন না করিয়া বা উহাকে ফেরত না পাঠাইয়া অনির্দিষ্ট কালের জন্য ফেলিয়া রাখিতে পারেন। এইভাবে যতদিন বিলটি তাঁহার কাছে থাকে ততদিন উহা আইনে পরিণত হয় না। অতএব, এই ক্ষমতা পকেট ভিটোরই অনুরূপ। তবে সংবিধানের নির্দেশ হইল রাষ্ট্রপতি এইরূপ বিল যথাসম্ভব শীঘ্র ফেরত পাঠাইবেন।[২] উপরন্তু, রাষ্ট্রপতি নিয়মতান্ত্রিক শাসকপ্রধান বলিয়া ইহা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

(৪) রাজ্যের আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির সম্মতি : রাজ্যের আইন প্রণয়ন ব্যাপারেও রাষ্ট্রপতির সম্মতির প্রয়োজন হইতে পারে। রাজ্য বিধানমণ্ডলে পাস হইয়াছে এমন যে-কোন বিলকে রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য রাখিয়া দিতে পারেন। রাষ্ট্রপতি ঐরূপ বিলে সম্মতি দিতেও পারেন, নাও দিতে পারেন। এ-বিষয়ে ভারতীয় সংবিধান ক্যানাডার সংবিধানের অনুরূপ।

(৫) সংশোধনসংক্রান্ত বিলে সম্মতি : ১৯৭১ সালের সংবিধানের ২৪তম সংশোধন অনুসারে সংবিধানের সংশোধনসংক্রান্ত কোন বিল পার্লামেণ্টে পাস হইবার পর উহাকে যখন রাষ্ট্রপতির নিকট সম্মতির জন্য উপস্থিত করা হইবে রাষ্ট্রপতি তখন ঐরূপ বিলে **সম্মতি দিতে বাধ্য** থাকিবেন।

---

(৬) অর্ডিন্যান্স বা জরুরী আইন : সংবিধান রাষ্ট্রপতিকে অর্ডিন্যান্স বা জরুরী **অস্থায়ী আইন জারি করার ক্ষমতাও দিয়াছে।**

---

১২৩ অনুচ্ছেদ অনুসারেই যখন সংসদের উভয় পরিষদ অধিবেশনে না-থাকা অবস্থায় রাষ্ট্রপতি যদি কোন সময় সন্তুষ্ট হন যে, এমন অবস্থা বর্তমান যাহাতে তাঁহার পক্ষে অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন তাহা হইলে তিনি অর্ডিন্যান্স জারি করিতে পারেন এবং উহা **আইনের মতই কার্যকর** হয়। অর্থাৎ, অর্ডিন্যান্সকে আইন বলিয়াই গণ্য করিবে হইতে।[৩] অর্ডিনান্স জারির ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টিই শেষ কথা নয় এবং এ-বিষয় সম্পর্কে আদালতে প্রশ্ন করা যাইতে পারে এবং আদালত যদি মনে করে যে সংসদের ক্ষমতা-বহির্ভূত বিষয়ের উপর অর্ডিন্যান্স জারি করা হইয়াছে—তবে ঐ অর্ডিন্যান্স **বাতিল** হইয়া যায়।[৪] আবার প্রত্যেক অর্ডিন্যান্সকে সংসদের উভয় পরিষদের নিকট উপস্থিত করিতে হয় এবং সংসদের পুনর্মিলিত হইবার তারিখ হইতে ছয় সপ্তাহ পর্যন্ত উহার মেয়াদ থাকে। তবে ঐ সময়ের পূর্বেই সংসদের উভয় পরিষদ

---

১. বলা হয়, মার্কিন রাষ্ট্রপতি বিলটি ফেরত না পাঠাইয়া পকেটে পুরিয়া—অর্থাৎ ফেলিয়া রাখিতে পারেন। এই 'পকেটে পুরিয়া' রাখা হইতেই 'পকেট ভিটো' কথাটির উদ্ভব ঘটিয়াছে।

২. পূর্ববর্তী পৃষ্ঠা দেখ।

৩. "The power of the President to issue Ordinance under Article 123 of the Constitution is a legislative and not an executive power." The Supreme Court in *National Security Act* (1980) *Case* (1981)

৪. The Constitution (44th Amendment) Act, 1978

অনমুমোদনে (disapproval) প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া উহাকে রহিত করিতে পারে। ইহা ছাড়াও রাষ্ট্রপতি যে-কোন সময়ে অর্ডিন্যান্সকে প্রত্যাহার করিতে পারেন।

অর্ডিন্যান্স জারির ক্ষমতার সমালোচনা : অর্ডিন্যান্সের সাহায্যে আইন প্রবর্তনের ব্যবস্থা বর্তমান সংবিধানে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন (The Government of India Act, 1935) হইতে গৃহীত। যাই হোক, এই ব্যবস্থা বিশেষভাবে সমালোচিত হইয়াছে। এই অর্ডিন্যান্স জারির ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রীদের ক্ষমতা, কারণ রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুযায়ীই কার্য করিবেন। পার্লামেন্টে সমালোচনার হাত এড়াইবার জন্য মন্ত্রীদের পক্ষে ইহার অপব্যবহার করা সম্পূর্ণ সম্ভব। সরকারের পক্ষে এই অর্ডিন্যান্সের সাহায্যে নাগরিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করাও অসম্ভব নয়।[১] অতীতে অনেক বারই ইহা করা হইয়াছে।

সমর্থন : অপরপক্ষে আবার অর্ডিন্যান্স জারির ব্যবস্থা থাকায় কয়েকটি ক্ষেত্রে জাতীয়করণের উদ্দেশ্যকে বানচাল করার প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করা সম্ভব হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ, কয়লাখনি শিল্পের জাতীয়করণের উল্লেখ করা হয়। এক্ষেত্রে হঠাৎ অর্ডিন্যান্স জারি করিয়া কারচুপির সম্ভাবনা রোধ করা হয়।

গ। **অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা (Financial Powers) :** নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় **সরকারী আয়ব্যয় ধার্য** বা **অনুমোদন করিবার পূর্ণ ক্ষমতা** হইল আইনসভার হস্তে। কিন্তু **শাসন বিভাগ দাবি** না জানাইলে কোন ব্যয় মঞ্জুর এবং শাসন বিভাগের অনুমোদন ব্যতীত **কোন কর** ধার্য করা যায় না।

বাজেট পেশ, ব্যয়মঞ্জুরী ও আকস্মিক ব্যয় : ভারতীয় সংবিধান অনুসারে প্রত্যেক আর্থিক বৎসর সম্পর্কে **রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব** রহিয়াছে ঐ বৎসরের আনুমানিক আয় ও ব্যয়ের একটি বিবরণী (Annual Financial Statement) বা বাজেট সংসদের উভয় পরিষদের সমক্ষে উপস্থাপিত করিবার। তাঁহার সুপারিশ ব্যতীত কোন ব্যয়মঞ্জুরীর দাবি করা যায় না। কর ঋণ ইত্যাদি সম্পর্কিত রাজস্ব বিল বা সংশোধন উত্থাপনও রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ছাড়া করা যাইতে পারে না। আবার আকস্মিক ব্যয়-সংকুলানের জন্য ভারতের একটি **আকস্মিকতা-তহবিলেরও** (Contingency Fund of India) সৃষ্টি করা যাইতে পারে। এই তহবিল রাষ্ট্রপতির হস্তে ন্যস্ত থাকে এবং তিনি এই তহবিল হইতে অকল্পিত ব্যয়-সংকুলানের জন্য সংসদের অনুমোদন-সাপেক্ষে অগ্রিম অর্থ প্রদান করিতে পারেন।

ঘ। **জরুরী অবস্থাদি সংক্রান্ত ক্ষমতা (Powers relating to Emergency) : ভারতীয় সংবিধান রাষ্ট্রপতিকে তিন প্রকারের জরুরী অবস্থা ঘোষণার ক্ষমতা দিয়াছে : (১) জরুরী বা আপৎকালীন অবস্থার ঘোষণা (Proclamation of Emergency), (২) রাজ্যে শাসন-ব্যবস্থার অচলাবস্থাসংক্রান্ত ঘোষণা (Proclamation in case of Failure of Constitutional Machinery in a State), এবং (৩) আর্থিক সংকটাবস্থার ঘোষণা (Proclamation of Financial Emergency)।**

১. "An objectionable feature ··· is that ··· it empowers the executive, if it were so inclined, to suppress opposition and the legal rights of the people through the instrumentality of ordinances." Asok Chanda : *Federalism in India*

এই জরুরী অবস্থাদি সংক্রান্ত ক্ষমতার বিশদ আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে করা হইতেছে।

৭. **মন্ত্রি-পরিষদ—গঠন ও সংবিধানে উল্লিখিত কার্যাবলী (Council of Ministers—Composition and Functions as laid down in the Constitution)** ; আনুষ্ঠানিকভাবে সংবিধান রাষ্ট্রপতির হস্তে প্রভূত আইনগত ক্ষমতা ন্যস্ত করিয়াছে। ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপতির ভূমিকা ও পদমর্যাদা বিচার করিতে হয়।

সংসদীয় শাসন-ব্যবস্থা : ভারতের ন্যায় সংসদীয় শাসন-ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধানের ক্ষমতা মন্ত্রি-পরিষদের পরামর্শ অনুসারেই ব্যবহৃত হয়। ইহার উপর ৪২তম সংশোধন অনুসারে সংবিধানের সুস্পষ্ট নির্দেশ হইল যে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রি-পরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করিতে বাধ্য থাকিবেন। ইহার সহিত ১৯৭৮ সালে ৪৪তম সংশোধনের দ্বারা যোগ করা হইয়াছে যে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রি-পরিষদকে উহার পরামর্শকে পুনর্বিবেচনা করিতে বলিতে পারেন ; কিন্তু পুনর্বিবেচনার পর মন্ত্রি-পরিষদ যে পরামর্শ দিবে রাষ্ট্রপতিকে তাহা বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাই হইল মন্ত্রি-পরিষদের সহিত রাষ্ট্রপতি ও সংসদের সম্পর্কের পশ্চাদপট (backdrop)।

গঠন ও কার্য সংক্রান্ত, সংবিধানগত সংক্ষিপ্ত ব্যবস্থা : মন্ত্রি-পরিষদের গঠন ও কার্যাবলী সম্পর্কে কিন্তু আমাদের 'বিরাট, বিষয়বহুল ও জটিল' সংবিধানে কোন বিস্তৃত ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করা হয় নাই। শুধু বলা হইয়াছে : (ক) রাষ্ট্রপতিকে তাঁহার কার্যাবলী সম্পাদনে সহায়তা করিবার ও পরামর্শদানের জন্য একটি মন্ত্রি-পরিষদ থাকিবে এবং ঐ মন্ত্রি-পরিষদের শীর্ষে থাকিবেন **প্রধান মন্ত্রী**[১] এবং (খ) প্রধান মন্ত্রী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং **প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী** রাষ্ট্রপতি অন্যান্য মন্ত্রীকে নিযুক্ত করিবেন।

৭.৩. **কার্যক্ষেত্রে সম্প্রসারণ** : সুতরাং সংসদীয় শাসন-ব্যবস্থার নীতি অনুসারে কেন্দ্রে যে একটি মন্ত্রি-পরিষদ অবশ্যই থাকিবে, সংবিধানে মাত্র তাহারই উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু এই মন্ত্রি-পরিষদের সদস্য কতজন হইবেন, মন্ত্রীদের মধ্যে কোন শ্রেণীবিভাগ থাকিবে কি না, ইত্যাদি বিষয় সংবিধানে মোটেই উল্লিখিত হয় নাই। কার্যক্ষেত্রে অবশ্য নেহরু-সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত ব্যবস্থায় মন্ত্রীদের বিভিন্ন পর্যায়ভুক্ত করা হয় এবং ইহার ফলে ব্রিটেনের মত **মন্ত্রিসভা ও ক্যাবিনেটের** (Ministry and the Cabinet) **মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য** সূচিত হয়। এই ব্যবস্থাই তখন হইতে চলিয়া আসিতেছে।

মন্ত্রিগণের তিনটি পর্যায় : নেহরু-সরকার প্রবর্তিত এবং তখন হইতে অনুসৃত ব্যবস্থায় মন্ত্রিগণকে মোটামুটি তিন পর্যায়ভুক্ত করা হইয়াছে : (১) প্রথম পর্যায়ের মন্ত্রীরা হইলেন **ক্যাবিনেট মন্ত্রী** বা ক্যাবিনেটের সদস্যভুক্ত মন্ত্রী (Cabinet Ministers)

১. "There shall be a Council of Ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise the President in the exercise of his functions." *Article 74 (1)*

এবং (২) দ্বিতীয় পর্যায়ের মন্ত্রীদের বলা হয় **রাষ্ট্রমন্ত্রী** (Ministers of State)। রাষ্ট্রমন্ত্রীরা ক্যাবিনেটের সদস্য না হইলেও সংশ্লিষ্ট দপ্তরসংক্রান্ত বিষয়াদির আলোচনার সময় ইহাদিগকে ক্যাবিনেটের বৈঠকে যোগদানের জন্য আহ্বান করা হয়। আবার অনেক সময় রাষ্ট্রমন্ত্রীদের স্বতন্ত্রভাবে দপ্তরের ভার (independent charge) দেওয়া যাইতে পারে। (৩) তৃতীয় পর্যায়ে আছেন উপমন্ত্রিগণ (Deputy Ministers)। তাঁহাদের কার্য হইল সংশ্লিষ্ট বিভাগ বা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে সাহায্য করা।[১]

সম্প্রসারণের ফলে ক্যাবিনেটের উদ্ভব: সুতরাং দেখা যাইতেছে, সংবিধানে শুধু মন্ত্রি-পরিষদের কথা উল্লেখ করা হইলেও অবলম্বিত ব্যবস্থার ফলে কার্যক্ষেত্রে মন্ত্রিসভা এবং মন্ত্রি-পরিষদের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করিয়াছে। ইহার দরুন সংবিধানে উল্লিখিত রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শদানের কার্য তাহা গিয়া পড়িয়াছে মন্ত্রিসভার একাংশের বা ক্যাবিনেটের হস্তে।

এখন মন্ত্রি-পরিষদের উক্ত দুই কার্যের—পরামর্শদান ও সহায়তা—পরিপ্রেক্ষিতেই নিম্নে রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা এবং তাঁহার সহিত মন্ত্রি-পরিষদের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা হইতেছে।

৮. রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা ও তাঁহার ক্ষমতার তাৎপর্য এবং মন্ত্রি-পরিষদের সহিত তাঁহার সম্পর্ক (Position of the President and Significance of his Powers and his relation to the Council of Ministers):

স্মর্তব্য যে, ভারতীয় সংবিধান ব্রিটেনের ধরনের সংসদীয় শাসন-ব্যবস্থারই প্রবর্তন করিয়াছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের প্রতিষ্ঠা করে নাই।

ভারতীয় সংবিধান ব্রিটিশ ধরনের সংসদীয় শাসন প্রবর্তিত করিলে কতকগুলি বিষয়ে ভারতের রাষ্ট্রপ্রধানের সহিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের সাদৃশ্য রহিয়াছে।

৮.ক. ভারতের ও মার্কিন রাষ্ট্রপতির পদের সাদৃশ্য: (১) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত ভারতের শাসন বিভাগের শীর্ষে অবস্থিত পদাধিকারীকে **রাষ্ট্রপতি আখ্যা** দেওয়া হইয়াছে। (২) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন-সংস্থার দ্বারা নির্বাচিত হন এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অধিষ্ঠিত থাকেন। (৩) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত ইম্‌পিচমেণ্ট-পদ্ধতি ব্যতীত অন্যভাবে রাষ্ট্রপতিকে তাঁহার কার্যকালের মধ্যে অপসারিত করা যায় না। (৪) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে যেমন বলা হইয়াছে যে শাসনক্ষমতা একজন রাষ্ট্রপতির হস্তে ন্যস্ত থাকিবে, ভারতীয় সংবিধানেও বলা হইয়াছে যে ইউনিয়নের শাসনক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হস্তে ন্যস্ত থাকিবে। (৫) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত—উভয় রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শদানের জন্য মন্ত্রিগণ রহিয়াছেন।

---

১. শ্রীবেংকটরমণ রাষ্ট্রপতি হইবার পর দিন (২৫.৭.৮৭) কেন্দ্রে ছিলেন ১৫ জন ক্যাবিনেট মন্ত্রী; স্বতন্ত্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত ৮ জন রাষ্ট্রমন্ত্রী; ২৮ জন অন্য রাষ্ট্রমন্ত্রী এবং ৩ জন উপমন্ত্রী।

এইরূপ সাদৃশ্য হইতে এই সিদ্ধান্তে আসা স্বাভাবিক নয় যে, ভারতের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও পদমর্যাদা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও পদমর্যাদার অনুরূপ।

৮.খ. ভারতের রাষ্ট্রপতি ও ইংল্যাণ্ডের রাণীর পদমর্যাদাগত অধিক সাদৃশ্য : কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে এইরূপ মনে হইলেও ভারতের রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদার সহিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা সম্পূর্ণ তুলনীয় বলিয়া মনে করিলে ভুল করা হইবে। ভারতীয় গণপরিষদে সংবিধান-রচনার সময় সংবিধান-রচয়িতৃগণও একথা সুস্পষ্টভাবেই ঘোষণা করেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত ভারতীয় রাষ্ট্রপতিকে প্রকৃত শাসক করা ভারতীয় সংবিধানের লক্ষ্য নহে ; ইংল্যাণ্ডের সংসদীয় শাসন-ব্যবস্থায় রাজা বা রাণী যে পদমর্যাদা ভোগ করেন ভারতের রাষ্ট্রপতিও সেই পদমর্যাদা ভোগ করিবেন।[১] নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাচিত হইলেও ইংল্যাণ্ডের রাজা বা রাণীর মতই **ভারতের রাষ্ট্রপতি শাসনতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান** ও **জাতির প্রতীক** এবং ঐ হিসাবেই বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হইবেন। প্রকৃত শাসনকার্য পরিচালনা করিবে আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল মন্ত্রি-পরিষদ এবং **প্রধান মন্ত্রীই** হইবেন **প্রধান শাসক**। রাষ্ট্রপতিকে মন্ত্রি-পরিষদের পরামর্শ অনুযায়ীই প্রায় সকল ক্ষেত্রেই কার্য করিতে হইবে।

৪২-তম সংশোধনের অন্যতম তাৎপর্য : ইহার পর সংবিধানের ৪২তম সংশোধনের ব্যবস্থার ফলে রাষ্ট্রপতি যে সম্পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক শাসকপ্রধান তাহা বিতর্কের ঊর্ধ্বে দাঁড়ায়।

৮.গ. রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার তাৎপর্য এবং মন্ত্রি-পরিষদের সহিত তাঁহার সম্পর্ক : ভারতীয় সংবিধান ইউনিয়নের সমগ্র শাসনক্ষমতা বা কার্যপালিকাশক্তি রাষ্ট্রপতির হস্তে ন্যস্ত করিয়াছে। সংবিধানে আরও বলা হইয়াছে, রাষ্ট্রপতি হয় প্রত্যক্ষভাবে অথবা অধস্তন কর্মচারীর মাধ্যমে (either directly or through *officers subordinate to him*) এই ক্ষমতা—অর্থাৎ শাসনক্ষমতা—সংবিধান অনুযায়ী প্রয়োগ করিবেন।

তত্ত্বগতভাবে শাসনক্ষমতা (executive) বলিতে সাধারণত বুঝায় '**আইনকে কার্যকর করার ক্ষমতা**'কে ('the power to execute laws')।[২] শাসনক্ষমতার এই **সংকীর্ণ সংজ্ঞা** কিন্তু বর্তমান দিনের উপযোগী নহে।

শাসনকার্যের বিস্তৃতি : ভারতীয় সুপ্রীম কোর্টের মতে, নীতি-নির্ধারণ ও উহাকে কার্যকর করা, শৃংখলা রক্ষা করা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কল্যাণসাধন করা, বৈদেশিক নীতি পরিচালনা করা প্রভৃতি সকলই শাসনকার্যের অন্তর্ভুক্ত।[৩]

---

(১) সংবিধানগত ব্যবস্থা : এখন প্রশ্ন : শাসনক্ষমতা প্রয়োগ সম্পর্কে ভারতীয় সংবিধানে রাষ্ট্রপতির 'অধস্তন কর্মচারী'দের (officers subordinate to the

---

১. "Under the ... Constitution the President occupies the same position as the King under the English Constitution." Dr. Ambedkar

২. Locke's definition

৩. *Ram Jawaya v. State of Punjab* (1955)

President) কথা যে উল্লিখিত হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে মন্ত্রীরা পড়েন কি না—অর্থাৎ **মন্ত্রীরা রাষ্ট্রপতির অধস্তন কর্মচারী কি না?** ১৯৩৫ সালেরও ভারত শাসন আইনভুক্ত **'অধস্তন কর্মচারী'** ব্যাখ্যা প্রসংগে **প্রিভি কাউন্সিল** (Privy Council) অভিমত প্রকাশ করে যে প্রাদেশিক মন্ত্রীরা গভর্নরের অধস্তন কর্মচারী।[১] বর্তমান সংবিধানে মন্ত্রীরা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং রাষ্ট্রপতির ইচ্ছায় পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। সুতরাং প্রিভি কাউন্সিলের অনুসরণে **বলা হয়** যে বর্তমান ভারতীয় সংবিধানেও মন্ত্রীরা রাষ্ট্রপতির অধস্তন কর্মচারী। সংবিধানের অন্যান্য ব্যবস্থার মধ্যে রহিয়াছে যে, দেশের রক্ষিবাহিনীর সর্বাধিনায়কত্ব রাষ্ট্রপতির হস্তে ন্যস্ত থাকিবে এবং এই ক্ষমতার প্রয়োগ আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে। রাষ্ট্রপতির নামে যে-সকল আদেশ দেওয়া হয়—অর্থাৎ রাষ্ট্রপতির নামে যে শাসনকার্যাদি সম্পাদিত ও প্রচারিত হয় তাহা রাষ্ট্রপতির আদেশ বলিয়া কিভাবে প্রমাণসিদ্ধ হইবে সে-সম্পর্কে নিয়মকানুন স্থির করিবার ক্ষমতা হইল রাষ্ট্রপতির।

এই প্রসংগে **ব্রিটিশ ব্যবস্থার** কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ব্রিটেনের নিয়ম হইল মন্ত্রীদের অংশগ্রহণ ব্যতীত রাজা বা রাণী কোন কার্য করিতে পারেন না। রাজশক্তির (Monarch's or Sovereign's) কোন কার্য আইনসম্মত হইতে হইলে উহাতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর প্রতিস্বাক্ষর (counter signature) থাকা প্রয়োজন। ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীদের অংশগ্রহণ ব্যতীতই তাঁহার সিদ্ধান্তকে আইনত কার্যকর করিতে সমর্থ। সুতরাং আইনের দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে ইউনিয়নের সমগ্র শাসনক্ষমতা বা কার্যপালিকাশক্তি রাষ্ট্রপতির হস্তেই ন্যস্ত করা হইয়াছে—সংবিধান সরাসরি মন্ত্রি-পরিষদের হস্তে কোন শাসনক্ষমতাই ন্যস্ত করে নাই। সংবিধানে মন্ত্রি-পরিষদের উপর রাষ্ট্রপতিকে তাঁহার কার্যসম্পাদনে শুধু সাহায্য করিবার ও পরামর্শ-দানের দায়িত্বই ন্যস্ত করা হইয়াছে। ইহার উপর সংবিধানে আরও বলা হইয়াছে, মন্ত্রীরা রাষ্ট্রপতিকে **কোন পরামর্শ দিয়াছিলেন কি না** এবং দিয়া[ছি]লে কি পরামর্শ দিয়াছিলেন, সে-সম্বন্ধে কোন আদালত অনুসন্ধান করিতে পারিবে না।

(২) মন্ত্রীদের নিয়োগ ও কার্যসম্পাদন : সংবিধান অনুসারে মন্ত্রীদের আপন আপন পদে অধিষ্ঠিত থাকা রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টির উপর নির্ভর করে।[২] কোন মন্ত্রী ৬ মাস ধরিয়া সংসদের কোন কক্ষের সদস্য না থাকিলে মন্ত্রিপদ হইতে অপসারিত হইবেন। অতএব, পার্লামেন্টের সদস্য নন এমন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি অন্তত ছয় মাসের জন্য মন্ত্রিপদে নিয়োগ করিতে পারেন। আবার মন্ত্রীদিগকে যে নির্বাচিত সদস্যই হইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই; তাঁহাদের পক্ষে মনোনীত সদস্য হইলেও চলে। সুতরাং রাষ্ট্রপতি সদস্য নন এমন ব্যক্তিকে প্রথমে রাজ্যসভায় মনোনীত এবং পরে মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিতে পারেন।

১. *Emperor v. Sibnath Banerji* (1945)

২. "The Ministers shall hold office during the *pleasure* of the President." *Article* 75 (2)

রাজীব মন্ত্রি-পরিষদের সদস্য কে. কে. তেওয়ারী রাষ্ট্রপতি জৈল সিং-এর ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করিলে জৈল সিং রাজীবকে বলিয়া তাঁহাকে বরখাস্ত করেন।

ভারত সরকারের কার্যাদি সম্পাদনের সুবিধার জন্য এবং মন্ত্রীদের মধ্যে ঐ কার্য বণ্টন করিয়া দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপতি **নিয়মকানুন স্থির** করিয়া দেন। শাসনকার্যাদি বণ্টন সম্পর্কে ব্রিটেনের নিয়ম হইল যে মন্ত্রীদের মধ্যে বিভিন্ন শাসন বিভাগ বণ্টন করিয়া দিবেন প্রধান মন্ত্রী। ভারতীয় সংবিধানে আরও বলা হইয়াছে যে, শাসনকার্য পরিচালনা ও আইনসংক্রান্ত প্রস্তাব সম্পর্কে মন্ত্রি-পরিষদের সকল সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রপতিকে জানানো প্রধান মন্ত্রীর কর্তব্য। রাষ্ট্রপতি ঐ সকল বিষয় সম্বন্ধে যে খবরাদি জানিতে চাহেন তাহাও প্রধান মন্ত্রীকে জানাইতে হইবে। কোন বিষয় সম্পর্কে কোন মন্ত্রীর সিদ্ধান্ত মন্ত্রি-পরিষদে বিবেচিত না হইয়া থাকিলে রাষ্ট্রপতির নির্দেশক্রমে প্রধান মন্ত্রীকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর সিদ্ধান্তকে মন্ত্রি-পরিষদের নিকট বিচারবিবেচনার জন্য পেশ করিতে হয়।

সংবিধানগত ব্যবস্থার একটি ব্যাখ্যা : সংবিধানের উপরি-উক্ত ব্যবস্থাগুলির দরুন সেদিন অর্থাৎ ১৯৭৬ সালে সংবিধানের ৪২তম সংশোধন পাস হওয়া পর্যন্ত অনেকেরই অভিমত ছিল যে রাষ্ট্রপতি নিছক শাসনতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান নন, এমনকি তাঁহার পক্ষে প্রকৃত শাসকে (real ruler) পরিণত হইবারও যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে।

---

(৩) পূর্বে মন্ত্রীদের পরামর্শ গ্রহণে সাংবিধানিক বাধ্যতার অনস্তিত্ব এইরূপ অভিমতের সপক্ষে আরও যুক্তি ছিল। আয়ারল্যাণ্ড জাপান প্রভৃতি দেশের মত ভারতের **মূল সংবিধানে** কোথাও বলা হয় নাই যে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীদের পরামর্শ গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকিবেন। আবার ব্রিটেনের নিয়ম যে রাজশক্তির কার্য কোন মন্ত্রীর সহি ব্যতীত সম্পাদিত হইতে পারে না, তাহাও ভারতের রাষ্ট্রপতির বেলায় সংবিধানভুক্ত হয় নাই। আইনত রাষ্ট্রপতি নিজের সিদ্ধান্তকে মন্ত্রিগণকে বাদ দিয়াই কার্যকর করিতে সমর্থ ছিলেন। রাষ্ট্রপতি এইভাবে চলিলেও সংবিধানকে ভংগ করা হইবে না বলিয়াই অভিমত প্রকাশ করা হইত।[১] ভারতের সংবিধানে রাষ্ট্রপতিকে কোনরূপ স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা অবশ্য দেওয়া হয় নাই। কিন্তু রাষ্ট্রপতি মন্ত্রি-পরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিতে বাধ্য থাকিবেন, এরূপ নিয়মও মূল সংবিধানে সন্নিবিষ্ট করা হয় নাই। সুতরাং রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীদের পরামর্শ ব্যতীতই কার্য করিয়াছেন এই যুক্তিতে আদালত রাষ্ট্রপতির কোন আদেশ ইত্যাদি বাতিল করিতে পারিত না।

ঐতিহাসিক সতর্কবাণী : সব দিক বিচার করিয়া কোন কোন শাসনতন্ত্রবিদ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে রাষ্ট্রপতি যাহাতে 'একনায়কে' (Dictator) পরিণত না হন সেই উদ্দেশ্যে ভারতীয় সংবিধানে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হয় নাই।[২] ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া তাঁহারা সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন যে এইরূপ ত্রুটির জন্য জার্মেনীর ওয়েমার সংবিধানকে ধ্বংস করিয়া একনায়কত্বের প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হইয়াছিল।

১. B. M. Sharma : *Federalism in Theory and Practice*

২. "It is possible to contend that the constitution does not sufficiently guard against the President becoming dictator." Alan Gledhill : *The Republic of India*

ব্যাখ্যার বিরোধিতা : রাষ্ট্রপতিপদের প্রকৃতি সম্পর্কে উপরি-উক্ত ব্যাখ্যা অনেকের নিকটই গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। তাঁহাদের মতে, আক্ষরিক ব্যবস্থা যাহাই হোক না কেন, ভারতীয় সংবিধান ইংল্যাণ্ডের মত দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থাই প্রবর্তন করে। সুতরাং ইংল্যাণ্ডের রাজশক্তির মত ভারতীয় রাষ্ট্রপতি নিয়মতান্ত্রিক শাসকপ্রধান হিসাবেই কার্য করিতে বাধ্য ছিলেন।

(৪) দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থার নীতিনির্দেশ : ইহা ছাড়া, ভারতীয় সংবিধানে এমন **কতকগুলি অনুচ্ছেদ** আছে যাহার দরুন নিয়মতান্ত্রিক শাসকপ্রধান হিসাবে রাষ্ট্রপতির পক্ষে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই মন্ত্রি-পরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। (১) সংবিধান অনুসারে কেন্দ্রে একটি মন্ত্রি-পরিষদ অবশ্যই থাকিবে। সুতরাং রাষ্ট্রপতি মন্ত্রি-পরিষদ ছাড়া কার্য করিতে পারিতেন না। (২) ঐ মন্ত্রি-পরিষদ লোকসভার নিকট যৌথভাবে দায়িত্বশীল। (৩) রাষ্ট্রপতি তাঁহার কার্যপালিকা শক্তি (executive power) সংবিধান অনুযায়ী প্রয়োগ করিতে বাধ্য। তাঁহাকে শপথ গ্রহণ করিতে হয় যে, তিনি সংবিধানকে পরিরক্ষণ, সংরক্ষণ ও প্রতিরক্ষণ করিবেন এবং ভারতের জনগণের সেবায় ও কল্যাণসাধনে আত্মনিয়োগ করিবেন। ইহা ব্যতীত পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, সংসদ রাষ্ট্রপতিকে সংবিধান-ভংগের অভিযোগে বিচার করিয়া পদ হইতে অপসারিত করিতে পারে (৪৬ পৃষ্ঠা)। শাসনতন্ত্রে এই সমস্ত **বিধান থাকার ফলে** রাষ্ট্রপতির পক্ষে লোকসভার আস্থাভাজন মন্ত্রি-পরিষদকে অগ্রাহ্য করিয়া কার্য করা অথবা মন্ত্রি-পরিষদকে পদচ্যুত করা সহজসাধ্য ছিল না।

এমন যদি হইত যে রাষ্ট্রপতি লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থনপ্রাপ্ত মন্ত্রি-পরিষদকে অগ্রাহ্য করায় ঐ মন্ত্রি-পরিষদ পদত্যাগ করিল, অথবা রাষ্ট্রপতি মন্ত্রি-পরিষদকে পদচ্যুত করিলেন, তখন কি ঘটিতে পারিত ? এইরূপ অবস্থায় রাষ্ট্রপতিকে অবশ্যই অন্য একটি মন্ত্রি-পরিষদ গঠন করিতে হইত। কিন্তু এইরূপ করিবার একটি বিশেষ অসুবিধা ছিল : পদত্যাগকারী বা পদচ্যুত মন্ত্রি-পরিষদের লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় নূতন মন্ত্রি-পরিষদ নিশ্চয়ই লোকসভার আস্থাভাজন হইতে সমর্থ হইত না। ইহার ফলে শাসন-ব্যবস্থায় সংকট দেখা দিত। অবশ্য রাষ্ট্রপতি লোকসভাকে ভাঙিয়া দিয়া সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা হইলেই যে রাষ্ট্রপতি পরিত্রাণ পাইতেন এমন কোন নিশ্চয়তা ছিল না। কারণ, পূর্বতন পদত্যাগকারী বা পদচ্যুত মন্ত্রি-পরিষদের দল যদি নির্বাচনে জয়লাভ করিয়া লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাইত তাহা হইলে স্বতই ঐ দল সংসদে রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে সংবিধান লংঘন ও ভংগের অভিযোগ আনয়ন করিত।[১] কোন সুস্থ মস্তিষ্ক রাষ্ট্রপতিই এইভাবে নিজের বিপদ নিজেই টানিয়া আনিবেন না—ইহাই ছিল বিরুদ্ধ অভিমত পোষণকারীদের ধারণা।

---

১. The President "would be guilty of violating the Constitution if he purports to act without reference to, and independently of, their (Minister's) advise......" Alladi Krishnaswami Ayyar

সুপ্রীম কোর্টের অভিমত: সুতরাং বলা হইত, ভারতের রাষ্ট্রপতি ইংল্যাণ্ডের রাজা বা রাণীর মত নিয়মতান্ত্রিক শাসকপ্রধান হিসাবে কার্য করিবেন; এবং শাসনকার্য পরিচালনায় প্রকৃত ক্ষমতা ভোগ করিবে লোকসভার আস্থাভাজন ও উহার নিকট যৌথভাবে দায়িত্বশীল মন্ত্রি-পরিষদ বা ক্যাবিনেট। ভারতীয় সুপ্রীম কোর্টও এই অভিমত সমর্থন করিয়াছিল।[১]

---

৯. রাষ্ট্রপতি কি সম্পূর্ণ নামসর্বস্ব শাসক ছিলেন? (Was the President a mere Constitutional Head?):

তবে রাষ্ট্রপতিকে জাঁকজমকসম্পন্ন সাক্ষিগোপাল (a 'magnificent cipher') বলিয়াও মনে করা হইত না। বলা হইত, ইংল্যাণ্ডের রাজা বা রাণীর মত রাষ্ট্রপতির **তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার** রহিয়াছে: মন্ত্রিবর্গকে 'পরামর্শ দিবার, উৎসাহ প্রদান করিবার এবং সতর্ক করিয়া দিবার' অধিকার (the right to be consulted, the right to encourage and the right to warn')। বলা হইত যে ইহার বেশী কিছু করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না।

(১) রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা সম্পর্কে সংশয়: ১৯৭৬ সালের ৪২তম সংশোধনের পর অনেকেই এই অভিমত প্রকাশ করেন যে রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা সম্পর্কে আর কোন মতবিরোধ নাই। ঐ সংশোধনে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ দেওয়া হয় যে রাষ্ট্রপতি তাঁহার সকল কার্য সম্পাদনে মন্ত্রি-পরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী চলিতে বাধ্য থাকিবেন। কিন্তু ১৯৭৯ সালের জুলাই মাস হইতে ১৯৮০ সালের ১৪ই জানুয়ারী পর্যন্ত যে-সকল রাজনৈতিক ঘটনা ঘটে তাহা হইতে রাষ্ট্রপতিকে মাত্র শাসনতান্ত্রিক প্রধান (constitutional head) বলিয়া বর্ণনা করা কঠিন। বস্তুত, ঘটনাবলী প্রমাণ করে যে বিশেষ অবস্থায় **রাষ্ট্রপতি সক্রিয় রাষ্ট্রপ্রধান** (active head) হইয়া দাঁড়াইতে পারেন।

ঐ সময় দেখা গিয়াছিল যে, রাষ্ট্রপতি সংবিধানের নিয়ামক ও রাজনীতির নিয়ন্ত্রক হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।[২]

ভবিষ্যতে এরূপ ঘটনা ঘটিবে না তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। ৪২তম সংশোধনের আক্ষরিক ব্যাখ্যা (literal interpretation) সর্বাবস্থায় প্রয়োগ করা হইলে কতকগুলি

১. "The President has been made a formal or constitutional head of the executive and the real executive powers are vested in the Ministers or the Cabinet." *Ram Jawaya v. State of the Punjab* (1956)

অন্য একটি মামলায় রাষ্ট্রপতিপদের জন্য বেংকটরমণের বিরোধী প্রার্থী শ্রীকৃষ্ণ আয়ারের নেতৃত্বে সুপ্রীম কোর্ট অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিল।

২. "During the critical period of July 15, 1979 to January 14, 1980 the President was not merely a constitutional head but was *reality the Head of the State*. During this period he *was his own master* and indeed he was the *master of the Constitution as well*." M. V. Pylee: *Crisis Conscience and the Constitution*

অস্বস্তিকর বা অচলাবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে। জ্ঞানী জৈল সিং ও শ্রীরাজীব গান্ধীর মধ্যে সংঘর্ষের ফলে এই আশংকাই দেখা দিয়াছিল।

(২) তাঁহার স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা: একথা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে যে দু'একটি অবস্থায় রাষ্ট্রপতির যে স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা আছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যেমন, (ক) প্রধান মন্ত্রীর নিয়োগ এবং (খ) লোকসভা ভাঙিয়া দেওয়ার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা রহিয়াছে। অবস্থাবিশেষে এই দুইটি ক্ষমতা **প্রকৃত ক্ষমতা** হইয়া উঠিতে পারে। এক্ষেত্রে ব্রিটেনের রীতিনীতি কতদূর অনুসৃত হইবে সে-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে।

২ ক. প্রধান মন্ত্রীর নিয়োগ: প্রধান মন্ত্রীর নিয়োগ ব্যাপারে ব্রিটেনের রাণীর মত রাষ্ট্রপতির স্বেচ্ছাধিকার রহিয়াছে। অবশ্য স্বাভাবিক অবস্থায় এই অধিকারের বিশেষ গুরুত্ব নাই। কারণ, তাঁহাকে লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে প্রধান মন্ত্রীরূপে নিয়োগ করিতে হয়। তবে ভারতীয় সংবিধানে অবকাশ রহিয়াছে যে লোকসভার সদস্য নন এমন ব্যক্তিকেও রাষ্ট্রপতি **৬ মাসের জন্য** প্রধান মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত করিতে পারেন [৭৫ (৫) অনুচ্ছেদ]। এই **৬ মাসের মধ্যে** ঐ ব্যক্তিকে সংসদের সদস্য হইতে হইবে এবং লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন পাইতে হইবে। এখন আবার অবস্থা এমন হইতে পারে যে লোকসভায় কোন রাজনৈতিক দলেরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা নাই। এ-অবস্থায় রাষ্ট্রপতির পক্ষে স্ববিবেচনা অনুযায়ী কার্য করিবার সুযোগ ঘটিয়া যায় এবং এমনকি তিনি রাজনীতিতেও লিপ্ত হইয়া পড়িতে পারেন।[১] ইহার ফলে দেশের রাজনীতির বিভিন্ন দিকে নানা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইতে পারে।[২] আবার তখন সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসকদলের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ বাধিয়া যায় এবং দলত্যাগের হিড়িক পড়িয়া যায় তখন রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করিলে এক নেতার পরিবর্তে অন্য নেতাকে পরোক্ষভাবে মদত দিতে পারেন ও রাজনীতিতে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ পাইতে পারেন। যেমন ঘটিয়াছিল **মোরারজি দেশাইয়ের পতনের সময়** (১৯৭৯ সালে)।

এ-ব্যাপারে আরও একটি সম্ভাবনা: আরও একটি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি সক্রিয় হইয়া উঠিতে পারেন। যেমন, হঠাৎ যদি কোন প্রধান মন্ত্রীর মৃত্যু ঘটে এবং লোকসভার আস্থাভাজন অন্য কোন নেতার সন্ধান না পাওয়া যায় তখন রাষ্ট্রপতি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন? স্বভাবতই তাঁহার ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বনের সুযোগ ঘটিবে [৭৪ (১) অনুচ্ছেদ]। উপরি-উক্ত ক্ষেত্রে সংবিধানের নির্দেশ যে রাষ্ট্রপতি সর্বাবস্থায় মন্ত্রি-পরিষদের অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শমত কার্য

১. "... when no party in Parliament (the House of the People to be more precise) has a clear majority, the President's choice of a particular person as Prime Minister may decisively swing the pendulum one way or the other." M. V. Pylee: *Crisis Conscience and the Constitution*

২. Refer D. Basu: *Constitutional Law of India*: and see also D. Basu; *Commentary on the Constitution of India Vol. I*

করিতে বাধ্য এই নিয়মটি খাটে না। খাটাইতে গেলে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থার সৃষ্টি হইবে, যাহা নিশ্চয়ই সংবিধানের উদ্দেশ্য নয়।[১]

সুতরাং এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে প্রধান মন্ত্রী নিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির স্বেচ্ছা অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বনের যথেষ্ট সুযোগ বা অবকাশ রহিয়াছে।

২ খ. **লোকসভা ভাঙিয়া দেওয়া :** লোকসভা ভাঙিয়া দেওয়ার ক্ষমতা হইল রাষ্ট্রপতির বিশেষাধিকার (privilege)। কিন্তু তিনি এই ক্ষমতা স্ববিবেচনাধীন প্রয়োগ করিতে পারেন কি না সে-সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ রহিয়াছে। সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতিকে মন্ত্রি-পরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিতে হয় [৭৪ (১) অনুচ্ছেদ]। সুতরাং বলা হয় যে লোকসভা ভাঙিয়া দিবার ব্যাপারে রাষ্ট্রপতিকে প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিতে হইবে। কিন্তু অনেকেই এ-সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথমত, মন্ত্রি-পরিষদের পরামর্শ বাধ্যতামূলক করিতে হইলে ঐ **মন্ত্রি-পরিষদকে লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠের আস্থাভাজন** হইতে হইবে [৭৫ (৩) অনুচ্ছেদ]। এ অবস্থায় প্রশ্ন উঠে যে লোকসভায় পরাজিত মন্ত্রি-পরিষদের পরামর্শ গ্রহণ করিতে বাধ্য কি না ? এ-সম্পর্কে একটি অভিমত হইল পরাজিত প্রধান মন্ত্রীর অধিকার রহিয়াছে লোকসভা ভাঙিয়া দেওয়া ব্যাপারে পরামর্শ প্রদানের এবং রাষ্ট্রপতির কর্তব্য হইল ঐ পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করার। কিন্তু বিপরীত ধারণা পোষণকারীরা বলেন যে, প্রধান মন্ত্রী যে-পরামর্শই দিন না কেন রাষ্ট্রপতি যদি কোন সময় মনে করেন যে লোকসভা জনগণের ইচ্ছাকে প্রকাশ করে না তাহা হইলে নিজের বিবেচনা অনুযায়ী লোকসভাকে ভাঙিয়া দিয়া নির্বাচনের ব্যবস্থা করিতে পারেন।[২]

জেনিংসের অভিমত : আবার অন্যতম সংবিধানবিদ জেনিংস (Ivor Jennings) এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, যখন কোন দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে না তখন রাষ্ট্রপ্রধানের আইনসভাকে ভাঙিয়া না দিয়া স্বীকৃত বিরোধী পক্ষের নেতাকে (Leader of the official opposition) মন্ত্রি-পরিষদ গঠনের জন্য আহ্বান জানানোই হইল সঠিক পন্থা। এ-সম্পর্কে রাষ্ট্রপ্রধান কাহারও সহিত পরামর্শ নাও করিতে পারেন।[৩] যদি আমরা ধরিয়াও লই যে পরাজিত প্রধান মন্ত্রীর লোকসভা ভাঙিয়া দেওয়ার অধিকার আছে তাহা হইলেও সকল শাসনতন্ত্রবিদ এ-বিষয় সম্পর্কে একমত যে পরাজিত প্রধান মন্ত্রীর নিকট দুইটি পথ খোলা থাকে : (১) পরাজিত প্রধান মন্ত্রী সংসদ বা আইনসভা ভাঙিয়া দেওয়ার পরামর্শ দিতে পারেন, অথবা (২) প্রধান মন্ত্রী পদত্যাগ করিতে পারেন, এবং এ-অবস্থায়

১. M. V. Pylee : *Crisis Conscience and the Constitution*

২. "There is also the other view that notwithstanding the advice of the Prime Minister and his Cabinet, the President if he thinks that the House has ceased to represent the wishes of the people *suo-moto* and of his own accord dissolve the House." M. V. Pylee

৩. "The rule is that on the defeat and resignation of the Government, the Queen should first send for the Leader of the Opposition. The rule has, for its corollary, the rule that before sending for the leader of the opposition the monarch should consult no one." Jennings : *Cabinet Government*

বিরোধী পক্ষ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পদত্যাগকারী প্রধান মন্ত্রীর আইনসভা ভাঙিয়া দিবার পরামর্শ দেওয়ার কোন অধিকার থাকে না।[১]

চরণ সিং-এর দৃষ্টান্ত : শ্রীচরণ সিং-এর মন্ত্রিত্বের পতনের সময় এই নিয়ম মানা হয় নাই। ১৯৭৯ সালে আগস্ট মাসে চরণ সিং যখন আস্থা ভোট পাইতে অসমর্থ হইয়া পদত্যাগ করেন তখন উহার সংগে রাষ্ট্রপতিকে লোকসভা ভাঙিয়া দেওয়ার পরামর্শ দেন। রাষ্ট্রপতি সঞ্জীব রেড্ডি ঐ পরামর্শ অনুযায়ীই লোকসভা ভাঙিয়া দেন এবং অসংগতভাবে চরণ সিং-কে তত্ত্বাবধানকারী সরকার (caretaker governmen-) গঠনের জন্য অনুরোধ জানান।

এক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির যাহা করা উচিত ছিল তাহা হইল চরণ সিং-এর পদত্যাগ পাওয়া মাত্র বিরোধী পক্ষের নেতা জগজীবন রামকে মন্ত্রিসভা গঠনের সুযোগ দেওয়া। তিনি কিন্তু তাহা না করিয়া স্altbবিবেচনা অনুযায়ী লোকসভা ভাঙিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।[২]

রাষ্ট্রপতির আরও একটি ক্ষমতা : আরও একটি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি নিজস্ব ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন : যখন কোন **প্রধান মন্ত্রী লোকসভায় পরাজিত** হইয়া পদত্যাগ করিতে অস্বীকার করেন তখন রাষ্ট্রপতি ঐ প্রধান মন্ত্রীকে পদচ্যুত করিতে সমর্থ [৭৫ (২) অনুচ্ছেদ]।

উপরি-উক্ত দুইটি ক্ষেত্র—প্রধান মন্ত্রীর নিয়োগ ও লোকসভা ভাঙিয়া দেওয়ার অধিকার—বাদে **অন্যান্য ক্ষেত্রেও** রাষ্ট্রপতির **স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা** প্রয়োগের সুযোগ রহিয়াছে বলিয়া অনেক শাসনতত্ত্ববিদ মনে করেন।[৩] যেমন, (ক) রাষ্ট্রপতির অধিকার রহিয়াছে ইউনিয়নের শাসন বিভাগীয় সিদ্ধান্ত ও আইনের প্রস্তাব সম্পর্কে অবহিত হওয়ার এবং যে-সকল বিষয় সম্পর্কে অবহিত হইতে চান প্রধান মন্ত্রীকে সে-সকল তথ্যাদি রাষ্ট্রপতিকে জানাইতে হয় (৭৮ অনুচ্ছেদ)। স্বভাবতই এক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির পক্ষে মন্ত্রিসভা বা প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণের প্রশ্ন উঠে না। (খ) রাষ্ট্রপতি কোন মন্ত্রীর সিদ্ধান্তকে মন্ত্রি-পরিষদের নিকট বিবেচনার জন্য উপস্থিত করার নির্দেশ প্রধান মন্ত্রীকে দিতে পারেন।

১. "... as all constitutional authorities agree, a defeated Prime Minister has to *elect between either of two alternatives*, either to resign or to advise dissolution *he cannot have both*". D. Basu : *Constitutional Law of India*; and "Either Government will resign and the opposition come into power ··· or the Government will advise the Queen to dissolve Parliament." Jennings : *The Law and the Constitution*

২. "If the Prime Minister, who is defeated in the House or who loses the confidence of the House, refuses to resign, the President *may dismiss* him. On the other hand, if he does resign, the President should at once offer an opportunity to the Opposition to form a government, in which case the outgoing Prime Minister can have *no right* to advise dissolution, and retain office as the head of *a caretaker Government*, as it is *popularly called*." D. Basu : *Constitutional Law of India*

৩. M. V. Pylee : *Crisis Conscience and the Constitutions*

এক্ষেত্রেও মন্ত্রি-পরিষদ বা প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির কার্য করার প্রশ্ন উঠে না।

(গ) পরিশেষে সংবিধানে রহিয়াছে যে কোন ব্যক্তির সংসদের সদস্য হইবার যোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠিলে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনী কমিশনের (The Election Commission) সহিত পরামর্শ করিয়া প্রশ্নটির চূড়ান্ত মীমাংসা করিবেন (১০৩ অনুচ্ছেদ)। এক্ষেত্রেও বলা হয় যে, রাষ্ট্রপতির পক্ষে মন্ত্রি-পরিষদের পরামর্শ গ্রহণ করার কোন দায়দায়িত্ব থাকে না—তিনি স্ববিবেচনা অনুযায়ী কার্য করিবার সুযোগ পান। একথাও বলা হয়, রাষ্ট্রপতি লোকসভায় সংবাদ পেশ করিতে পারেন এবং কোন বিলকে পুনর্বিবেচনা করিবার জন্য ফেরত পাঠাইতে পারেন। এক্ষেত্রেও প্রধান মন্ত্রীর সহিত **পরামর্শ করিবার প্রশ্ন** আছে বলিয়া মনে করা হয় না।

উপসংহার : উপরি-উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে সংবিধানের ভাবনীতি (spirit) সত্ত্বেও অবস্থা বিশেষে রাষ্ট্রপতির স্ববিবেচনা অনুযায়ী কার্য করার যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে এবং তাঁহার সিদ্ধান্ত রাজনীতির মোড় ঘুড়াইয়া দিতে পারে।[১] অতএব এরূপ ধারণা ঠিক নয় যে, ভারতের রাষ্ট্রপতি ইংল্যাণ্ডের রাণীর মত ক্ষমতাশূন্য শাসনতান্ত্রিক প্রধান এবং রাণীর মত তাঁহার মাত্র তিনটি অধিকার—পরামর্শ, উৎসাহ ও সতর্ক করিয়া দেওয়ার—রহিয়াছে, আর কিছু নহে। অবস্থা বিশেষে ভারতীয় **রাষ্ট্রপতির রাজনীতিতে সক্রিয় হইয়া উঠিবার ও স্বকীয় ক্ষমতা প্রয়োগের যথেষ্ট সুযোগ রহিয়া গিয়াছে।** অন্তত বলা যায়, যখন কোন দলের লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে না তখন রাষ্ট্রপতি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারেন। আবার যখন সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসক-দলের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, বিবাদ ও দলত্যাগ প্রকট হইয়া পড়ে তখনও রাষ্ট্রপতি স্ববিবেকানুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ পান। এইরূপ পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য সংবিধানে কোন ব্যবস্থা নাই।[২]

দুইটি সুপারিশ : (১) অনেক সংবিধানবিদ মনে করেন যে রাষ্ট্রপতি তাঁহার স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা যাহাতে যথাযথভাবে প্রয়োগ করেন সেই উদ্দেশ্যে পরামর্শপ্রদানের জন্য রাষ্ট্রপতির **একটি জাতীয় পরিষদ** (a National Presidential Council) থাকা প্রয়োজন। সংবিধানের সংশোধনের মাধ্যমে এ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। খসড়া সংবিধানে (Draft Constitution) এ-প্রস্তাব করা হইলেও প্রস্তাবটি গৃহীত হয়

১. "The President of India, under certain circumstances, is his own master and is neither bound by the advice of the Council of Minister, nor runs the risk of a successful impeachment against him." M. V. Pylee

২. "...there is nothing in the Constitution to meet the contingency of a major political upset depriving the ruling party of its majority in Lok Sabha. In the event of this happening. It appears that the President will be on his own." S. S. Khera; *The Central Executive*

নাই। কারণ, ইহাতে প্রধান মন্ত্রীর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা হ্রাস পাইলে সংসদীয় ব্যবস্থায় অবনমন হইবে বলিয়া আশংকা করা হইয়াছিল।[১]

(২) আর একটি সুপারিশ ছিল যে দলত্যাগ (defection) নিষিদ্ধ করাও প্রয়োজন। কারণ, দলত্যাগ চলিতে দিলে রাজনীতিক্ষেত্রে নিশ্চয়তা ও সরকারের দায়িত্ব বজায় রাখা সম্ভব হইবে না। এ-সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সংবিধান সংশোধিত (৫২-তম সংশোধন) করিয়া **দলত্যাগ-বিরোধী আইন** পাস করা হইয়াছে (১৯৮৫)।

দাবি করা হয় যে রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা সম্বন্ধে সকল মতবিরোধের অবসান ঘটিয়াছে ৪২তম সংশোধন পাস হইলে। উহাতে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে রাষ্ট্রপতি তাঁহার কার্যসম্পাদনে মন্ত্রি-পরিষদের পরামর্শ অনুযায়ীই চলিবেন।[২] তবুও কিন্তু রাষ্ট্রপতির সংগে প্রধান মন্ত্রীর সংঘর্ষের অবসান ঘটে নাই। ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি জ্ঞানী জৈল সিং এবং প্রধান মন্ত্রী রাজীব গান্ধীর মধ্যে সম্পর্কই ইহার প্রকৃত দৃষ্টান্ত।

বাস্তব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির কার্যাকার্যের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহার পদমর্যাদা ও ক্ষমতার বিশ্লেষণ: সংসদীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করাই যে ছিল ভারতীয় সংবিধানের উদ্দেশ্য সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। এইরূপ শাসন-ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধানকে নিয়মতান্ত্রিক শাসক হিসাবে কার্য করিতে হয়। সংবিধান চালু হওয়ার পর ১৯৭৯ সাল ছাড়া অন্যান্য সময়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রপতি নিয়মতান্ত্রিক শাসক হিসাবেই কাজ করিয়াছেন। তবে ইঁহারা নিছক ক্ষমতাবিহীন শাসকপ্রধান হিসাবে কার্য করেন নাই। অনেক সময়ই রাষ্ট্রপতির সংগে প্রধান মন্ত্রীর মতবিরোধ ঘটিয়াছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শেষ পর্যন্ত প্রধান মন্ত্রীর সিদ্ধান্তই কার্যকর হইয়াছে। যেমন, রাষ্ট্রপতি **রাজেন্দ্রপ্রসাদের** সংগে প্রধান মন্ত্রী **জওহরলাল নেহরুর** অনেক বিষয় সম্পর্কেই **মতান্তর** ঘটিয়াছে। তবে সুখের বিষয় উভয়েই একে অপরকে সম্মান দিয়া চলায় উভয়ের মধ্যে মোটামুটিভাবে সমঝোতা সম্ভব হইয়াছে। যে-সকল ব্যাপারে মতবিরোধ ঘটে তাহার মধ্যে হিন্দু সংহিতা বিল (Hindu Code Bill) সম্পর্কে নেহরুর সংগে রাজেন্দ্রপ্রসাদের বাদানুবাদ বিশেষভাবে উল্লেখ্য। শেষ পর্যন্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ উক্তি করেন যে পার্লামেন্ট ঐ বিল পাস করিলে তাঁহার পছন্দ হউক না হউক, তিনি উহাতে সম্মতিজ্ঞাপন করিবেন। তৎসত্ত্বেও কিন্তু ভবিষ্যতে রাষ্ট্রপতিপদের ভূমিকা কি হইবে না-হইবে, সে-বিষয়ে অনিশ্চয়তা এবং সন্দেহ রহিয়া যায়।

আবার ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডক্টর **রাজেন্দ্রপ্রসাদের একটি মন্তব্য** বিশেষ উল্লেখ্য। তিনি বলেন: "ইহা দুঃখের বিষয় যে, আমাদের দেশে ইংল্যাণ্ডের শাসন-ব্যবস্থার রীতিনীতির উপর নির্ভর করিয়া ভারতীয় সংবিধানকে ব্যাখ্যা করিবার অত্যধিক প্রবণতা দেখা যায়। ভারতের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ইংল্যাণ্ডের রাজা ও রাণীর ক্ষমতার অনুরূপ ধরিয়া লইয়া ভারতীয় **সংবিধানের ভুল ব্যাখ্যা** দেওয়া হইতেছে। ভারতীয় সংবিধানে এমন কোন বিধান নাই যাহাতে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রি-পরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী কার্য

১. *Journal of Constitutional and Parliamentary Studies*, Vol. XX. 1-410

২. ১৪১ ইত্যাদি পৃষ্ঠা দেখ।

করিতে বাধ্য।"[১] ধরিয়া লওয়া হয় যে, রাষ্ট্রপতিকে মন্ত্রি-পরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিতে হইবে। অনেকে ইহার বিরোধিতা করিয়া বলেন যে সংবিধানে রাষ্ট্রপতির স্ববিবেচনা অনুযায়ী কার্য করার যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে রাষ্ট্রপতিকে শাসনতান্ত্রিক প্রধান হিসাবে মানিয়া লইলেও কয়েকটি ঘটনার দরুন রাষ্ট্রপতিপদের ঐ প্রকৃতি হয়ত ঠিক গ্রহণ করা যায় না। ১৯৬২ সালে রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণানের চাপের ফলেই নেহরু প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ভি. কে. কৃষ্ণমেননকে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করেন। এবং সাম্প্রতিক কালে কে. কে. তেওয়ারীকে পদত্যাগ করিতে হয় জ্ঞানী জৈল সিং-এর নির্দেশে। আবার ১৯৭৩ সালে রাষ্ট্রপতি ভি. ভি. গিরি তাঁহার মতামত ব্যক্ত করিয়া বলেন যে কুশাসন, চোরাকারবারী ইত্যাদি দেশের অন্যতম অভিশাপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এমনকি তিনি প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর সরকারের সমালোচনাও করিতে ছাড়েন নাই।[২]

ব্যাপারটি হইল এইরূপ: সংবিধান রাষ্ট্রপতির হস্তে প্রভূত ক্ষমতা ন্যস্ত করিয়াছে। ক্যাবিনেট শাসন-ব্যবস্থায় কতকগুলি নিয়মকানুন বিধিবদ্ধ করা হইলেও সংবিধানে এমন কোন বিধানই ছিল না যে রাষ্ট্রপতি নিয়মতান্ত্রিক শাসক হিসাবে মাত্র মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুযায়ীই তাঁহার ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন। মাত্র আশা করা হইয়াছিল, ইংল্যাণ্ডে দুই শতাব্দীর অধিককাল ধরিয়া সংসদীয় শাসন-ব্যবস্থার যে-সকল রীতিনীতি বিবর্তিত হইয়াছে তাহা ভারতে অনুসৃত হইবে এবং রাষ্ট্রপতির ভূমিকা ইংল্যাণ্ডের রাজা বা রাণীর ভূমিকার অনুরূপ হইবে।[৩]

কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে না যে ভারত ইংল্যাণ্ড নয়। সুতরাং ইংল্যাণ্ডের নজির দিয়া ভারতের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার ব্যাখ্যা করা যায় না—ইংল্যাণ্ডে যে শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি কার্য করে তাহা স্বাভাবিকভাবে ভারতেও কার্যকর হইবে এমন যুক্তি স্বীকার করিয়া লওয়া কঠিন। উপরন্তু, ভারতের রাষ্ট্রপতি পরোক্ষভাবে হইলেও যে নির্বাচিত হন তাহা মনে রাখিতে হইবে। সুতরাং তিনি দলীয় লোক না হইয়া পারেন না। এই অবস্থায় ক্ষমতালিপ্সু ও উচ্চাকাংক্ষী হইলে পার্লামেন্টীয় শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি ভংগ করিয়াও সংবিধান-প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের দিকে ঝুঁকিতে পারেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে আয়ারল্যাণ্ডের মত ভারতীয় সংবিধানেও সংসদীয় শাসন-ব্যবস্থার সুস্পষ্ট রীতিনীতি-গুলিকে বিধিবদ্ধ করিয়া রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করিবার দাবি উঠিয়াছিল। তবে এ-সম্পর্কে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত কিছুই করা হয় নাই। হয়ত, করিবার প্রয়োজনীয়তাও ঠিক অনুভূত হয় নাই। কিন্তু ১৯৭৫ সালের জুন মাসে ঘোষিত আভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থায়

---

১. **Translation of excerpt of Dr. Rajendra Prasad's** ***speech on the occasion of the laying the foundation of the Indian Law Institute*****, 1960**

২. **"Reports credited him (V. V. Giri) with saying that in spite of her best efforts, the big majority which Mrs. Gandhi had asked for and got in the last general election had not yielded the promised results." S. S. Khera :** ***The Central Executive***

৩. **"The laws and conventions under which the parliamentary democracy of England has been functioning constitute the assumptions on which our government is based." K. M. Panikkar :** ***The State and the Citizen***

যখন সংবিধানকে ঢালিয়া সাজিবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় তখন **স্বরণ সিং কমিটির সুপারিশ** অনুসারে রাষ্ট্রপতিকে সংবিধান দ্বারাই সন্দেহাতীত **নিয়মতান্ত্রিক শাসকে পরিণত** করা হয়। ইহাতে মন্ত্রি-পরিষদ হইয়া উঠে সর্বেসর্বা, এবং মন্ত্রি-পরিষদের কর্ণধার হিসাবে সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হন প্রধান মন্ত্রী।

কিন্তু ১৯৭৯ সালের ঘটনাবলী ইহা প্রমাণ করিয়াছে যে বিশেষ পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপতি প্রকৃত শাসক হইয়া দাঁড়াইতে পারেন।

৮. ১৯৭৯ সালের ঘটনাবলী: দলীয় কোন্দল ও দলত্যাগের ফলে জনতা দলের প্রধান মন্ত্রী মোরারজী দেশাইকে পদত্যাগ করিতে হয়। ১৯৭৯ সালের জুলাই মাসে তিনি রাষ্ট্রপতি সঞ্জীব রেড্ডীর নিকট পদত্যাগপত্র পেশ করেন এবং বিদায়ী প্রধান মন্ত্রী হিসাবে বেতার মারফত জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে চাহেন। রাষ্ট্রপতি এইরূপ ভাষণ দেওয়ার বিরোধিতা করেন। দেশাই অবশ্য জানিতে চান যে কোন্ নিয়ম অনুসারে তাঁহাকে ভাষণ দেওয়ার অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইল।[১] বিষয়টি বেশী দূরে অগ্রসর হয় নাই। পদত্যাগের সময় তিনি লোকসভাকে ভাঙিয়া দেওয়ার পরামর্শ দেন নাই। ইহার পর দলত্যাগকারী শ্রীচরণ সিং (তৎকালীন) জনতা-এস (Janata-S) দলের নেতা হিসাবে রাষ্ট্রপতির সংগে দেখা করেন এবং মন্ত্রি-পরিষদ গঠনের দাবি জানান। শ্রীদেশাইও একই সংগে মন্ত্রি-পরিষদ গঠনের দাবি রাখেন, বলেন যে বৃহত্তর দলের নেতা হিসাবে এ-অধিকার তাঁহার আছে। রাষ্ট্রপতি উভয়কেই সমর্থকদের তালিকা পেশ করিয়া তাঁহাদের নিজ নিজ দাবি প্রমাণ করিতে বলেন।

ইতিমধ্যে রাষ্ট্রপতি লোকসভার বিরোধী দলের নেতা ওয়াই বি. চ্যবনকে (Y. B Chavan) আনুষ্ঠানিকভাবে মন্ত্রি-পরিষদ গঠন করিবার সুযোগ দেন, সে-সুযোগ চ্যবন ধন্যবাদের সহিত প্রত্যাখ্যান করেন। ইহার পর চরণ সিং ও দেশাই উভয়ই মন্ত্রি-পরিষদ গঠনের দাবি রাখিলে রাষ্ট্রপতি স্বয়ং **সমর্থকদের তালিকা যাচাই** করিয়া শ্রীচরণ সিংকে মন্ত্রি-পরিষদ গঠনের জন্য আহ্বান জানান, কিন্তু নির্দেশ দেন যে যথাসম্ভব শীঘ্র তাঁহাকে লোকসভার আস্থা ভোট পাইতে হইবে।

ইতিমধ্যে শ্রীজগজীবন রাম জনতা দলের নেতৃপদে অধিষ্ঠিত হন। চরণ-সিং লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাইতে অপারগ হইয়া পদত্যাগের সংগে লোকসভা ভাঙিয়া দিয়া নির্বাচনের পরামর্শ দেন। রাষ্ট্রপতি তাঁহার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেন, তবে তৎক্ষণাৎ লোকসভা ভাঙিয়া দিয়া নির্বাচনের আদেশ দেন না। তিনি শ্রীচরণ সিংকে **তদারকি সরকার** (caretaker government) **গঠন**[২] করিয়া কাজ চালাইয়া যাইতে বলেন।

১. **"Mr. Reddy told me not to broadcast my speech to the nation. Under what law? Where does the Constitution say that? ......I did not insist because I did not want to *create a crisis*." Morarji Desai**

২. **এই কাজও কতদূর সংবিধান-সংগত তাহা বিচার্য। কারণ, সংবিধানে তদারকি সরকারের কোন ব্যবস্থা নাই।**

সংগে সংগেই জনতা দলের নির্বাচিত নেতা শ্রীজগজীবন রাম রাষ্ট্রপতির সংগে দেখা করিয়া **অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাচনের** (mid-term poll) **বিরোধিতা** করেন এবং বিরোধী দলের নেতা হিসাবে মন্ত্রি-পরিষদ গঠনের দাবি জানান। ইহার প্রতিবাদে শ্রীচরণ সিং রাষ্ট্রপতিকে জানান যে শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি অনুসারে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রি-পরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিতে বাধ্য, এবং ঐ মন্ত্রি-পরিষদের লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকিলেও রাষ্ট্রপতিকে বাধ্যতামূলকভাবে মন্ত্রি-পরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিতে হইবে। সুতরাং তাঁহার (চরণ সিং-এর) পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতিকে লোকসভা ভাঙিয়া দিয়া অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাচনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

শেষ পর্যন্ত নাটকের উপর যবনিকাপাত হয়। রাষ্ট্রপতি লোকসভা ভাঙিয়া দেন। (২২শে আগষ্ট, ১৯৭৯) এবং ১৯৮০ সালের জানুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত হয় লোকসভার নির্বাচন, যাহার ফলে ক্ষমতায় পুনরধিষ্ঠিত হন শ্রীমতী গান্ধী।

৯. ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে পার্লামেণ্টীয় রীতিনীতি :

এখন দেখা যাক ১৯৭৯ সালে রাষ্ট্রপতি কতদূর সংসদীয় শাসন-ব্যবস্থার রীতিনীতি বা আইনকানুন অনুসারে তাঁহার ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়াছেন।

(ক) প্রধান মন্ত্রীকে বাছাই করা : জনতা দলের ভাঙনের ফলে শাসনতান্ত্রিক সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপতি রেড্ডী যে শ্রীমোরারজী দেশাই ও শ্রীচরণ সিংএর মধ্যে একরূপ বাছাই করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, তিনি দুইজনকে একই সংগে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করিতে বলিয়াছিলেন। ইহা **বাছাই-এর একটি পদ্ধতি**। আরও বলা যায়, তিনি তদারকি প্রধান মন্ত্রী হিসাবে শ্রীচরণ সিং-কেই বাছিয়া লইয়াছিলেন যদিও-বা বৃহত্তম দলের নেতা হিসাবে শ্রীজগজীবন রামকেই তাঁহার এ-সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল।

আবার ইন্দিরা গান্ধীর নিধনের পর শ্রীরাজীব গান্ধীকে প্রধান মন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করাইয়া রাষ্ট্রপতি জৈল সিং এই **বাছাই-এর কাজই** করিয়াছিলেন।

(খ) লোকসভা ভাঙিয়া দেওয়া : রাষ্ট্রপতি যে লোকসভা ভাঙিয়া দিয়েছিলেন তাহা লোকসভার আস্থাভোট গ্রহণে অসমর্থ প্রধান মন্ত্রী শ্রীচরণ সিং-এর সুপারিশমত বা নিজের ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি অনুসার সে-সম্বন্ধে মতবিরোধ থাকিতে পারে। অনেকে মনে করেন যে, বিলম্ব হইলেও রাষ্ট্রপতি শেষ পর্যন্ত চরণ-সিং-এর পরামর্শ অনুযায়ীই লোকসভা ভাঙিয়া দেন। অপরপক্ষে রাষ্ট্রপতি সঞ্জীব রেড্ডী উক্তি করিয়াছেন যে তিনি নিজের বিবেকানুযায়ী লোকসভা ভাঙিয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

যেটিই হউক, রাষ্ট্রপতি যে সংসদীয় রীতিনীতি ভংগ করিয়াছিলেন সে-সম্পর্কে সন্দেহ নাই।

যদি ধরা যায় যে তিনি চরণ সিং-এর পরামর্শ অনুযায়ীই সিদ্ধান্ত লইয়াছিলেন তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে যে উহা সমীচীন হইয়াছিল কিনা? কারণ, সংসদীয় রীতিনীতি অনুযায়ী পরাজিত বা লোকসভার আস্থাহীন প্রধান মন্ত্রীকে দুইটি বিকল্পের মধ্যে একটিকে

বাছিয়া লইতে হইবে : (ক) তিনি পদত্যাগ করিতে পারেন, অথবা (খ) আইনসভাকে ভাঙিয়া দেওয়ার পরামর্শ দিতে পারেন।[১] চরণ সিং **উভয় প্রকার অধিকারই দাবি** করিয়াছিলেন—তিনি পদত্যাগ করিবার সময় আবার লোকসভাকে ভাঙিয়া দেওয়ার পরামর্শও দেন। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির পক্ষে চরণ-সিং-এর পরামর্শ গ্রহণ করা সমীচীন হয় নাই বলিয়াই মনে করা হয়। আবার যদি ধরা যায় যে রাষ্ট্রপতি নিজস্ব বিবেকানুযায়ী কার্য করিয়াই লোকসভাকে ভাঙিয়া দিয়াছিলেন তাহা হইলে উহাও শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি সম্মত হয় নাই।[২] কারণ, তাঁহার উচিত ছিল বিরোধী দলের নেতা শ্রীজগজীবন রামকে মন্ত্রি-পরিষদ গঠন করিবার জন্য আহ্বান জানানো।

সুতরাং দেখা যায়, বিশেষ অবস্থায় রাষ্ট্রপতি রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারেন এবং তাঁহার কার্যকলাপ রাজনীতিতে সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিতে পারে।

(গ) জাতির উদ্দেশ্যে এবং অন্যান্য প্রসংগে রাষ্ট্রপতির ভাষণ : জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে রাষ্ট্রপতি কি মন্ত্রি-পরিষদকে এড়াইয়া নিজের অভিমত প্রকাশ করিতে পারেন? বলা যায়, সংসদের অধিবেশনের প্রারম্ভে রাষ্ট্রপতির ভাষণ মন্ত্রি-পরিষদ কর্তৃক রচিত হয় সত্য, কিন্তু অন্যান্য ভাষণের ক্ষেত্রে তাঁহার স্বাধীনতা রহিয়াছে। তবুও অনেকে মনে করেন যে শাসনতান্ত্রিক প্রধান হিসাবে রাষ্ট্রপতির পক্ষে সংবিধান সম্পর্কিত বিতর্কমূলক ভাষণ না দেওয়াই উচিত **তিনি সংবিধানের রক্ষক**। সুতরাং এই সংবিধান বজায় রাখা হইবে কি না, সে-সম্পর্কে দেশবাসীকে চিন্তা করিতে বলা তাঁহার পক্ষে গর্হিত কার্য হইয়াছিল। "গির্জার মঞ্চ হইতে কখনই নাস্তিকতা প্রচার করা উচিত নয়" (Atheism must not be preached from the pulpit of cathedral.—Laski)। রাষ্ট্রপতি শ্রীসঞ্জীব রেড্ডীর ১৯৭৯ সালের স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালীন এই ভাষণ[৩] প্রসংগে উল্লেখ্য যে ঐ ভাষণ তিনি মন্ত্রি-পরিষদের সহিত পরামর্শ না করিয়াই দিয়াছিলেন। এই নীতি সম্পর্কিত বিষয় সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির পক্ষে মতামত প্রকাশ সংসদীয় ব্যবস্থার রীতিনীতি বহির্ভূত কার্য।[৪]

১. **Jennings : *The Law and the Constitution***

২. **Jennings : *Cabinet Government*, p. 29**

৩. "The time is ripe now for enlightened public opinion...to consider the steady and cumulative deterioration of standard in public morality in all its aspects and review the *provisions of the constitution in the light of our experience* ..." President Sanjiva Reddy's broadcast to the nation on the eve of the Independence day, August 15, 1979.

৪. "... President Sanjiva Reddy's broadca.. ... embodies in fact his own assessment of the political situation in the country and what he thought should be done to set matters right in the interests of the Nation."

M. V. Pylee : *Crisis Conscience and the Constitution*

আবার মাদ্রাজে ১৯৭৯ সালে রাজাজীর জন্ম শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে ভাষণ প্রসংগে রাষ্ট্রপতি রেড্ডী উক্তি করেন যে বর্তমানে নেতৃবৃন্দের মধ্যে পুত্রাহত (*'son-stroke'*) হওয়ার প্রবল ঝোঁক দেখা দিয়াছে—অর্থাৎ বিভিন্ন নেতারা পুত্রদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়ার প্রবণতা দেখা দিয়াছে। ইহা বুঝা কঠিন নয় যে রাষ্ট্রপতি শ্রীমোরারজী দেশাই এবং শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি পরোক্ষভাবে কটাক্ষপাত করিয়াছিলেন। এরূপ উক্তি শাসনতান্ত্রিক প্রধান রাষ্ট্রপতির পক্ষে করা সমীচীন হইয়াছে বলিয়া কেহই মনে করেন না।[১]

(ঘ) আস্থাভোটের নির্দেশ: কোন মন্ত্রি-পরিষদ নিযুক্ত করিয়া উহাকে **যথাসম্ভব** শীঘ্র লোকসভার আস্থাভোট গ্রহণ করিতে নির্দেশ দেওয়া রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত কি না—সে প্রশ্নেও মতবিরোধের অবকাশ রহিয়াছে। যেখানে মন্ত্রি-পরিষদকে লোকসভার নিকট সর্বদাই দায়িত্বশীল থাকিতে হইবে [৭৪ (৩) অনুচ্ছেদ] সেখানে লোকসভায় তাহার সংখ্যাগরিষ্ঠতা কোনরূপ বিলম্ব না করিয়াই প্রমাণিত হওয়া উচিত। কিন্তু রাষ্ট্রপতি এ-সম্পর্কে নির্দেশ দিতে বা অনুরোধ করিতে পারেন কি? করিলে তিনি সক্রিয় শাসনতান্ত্রিক প্রধান (an Active Constitutional Head) হইয়া উঠেন যাহা সংসদীয় গণতন্ত্রের সহিত ঠিক সংগতিপূর্ণ নহে।[২] এ-সম্পর্কে অন্যতম শাসনতন্ত্রবিদ এম. ভি. পাইলী (M. V. Pylee) অভিযোগ করিয়া বলিয়াছেন যে আমরা অনাস্থা-সূচক ভোটের (vote of non-confidence) কথা বুঝি, কিন্তু আস্থাসূচক ভোট নেওয়ার নির্দেশকে বুঝিতে পারি না।[৩]

কোন রাষ্ট্রপতির পক্ষে আস্থাসূচক ভোট নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। ইহার দ্বারা দলত্যাগকে উসকানিই দেওয়া হয়। (বর্তমানে অবশ্য দলত্যাগ আর সম্ভব নয়, তবে নেতা-পরিবর্তন নিশ্চয়ই সম্ভব।)

(ঙ) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ: যে মন্ত্রি পরিষদ পদত্যাগ করে তাহার প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শ মানিতে রাষ্ট্রপতি বাধ্য কি না? এ-সম্পর্কে পূর্বেই বলা হইয়াছে রাষ্ট্রপতি লোকসভা শ্রীচরণ সিং-এর পরামর্শ অনুযায়ী ভাঙিয়া দিয়াছিলেন, না এই ব্যাপারে নিজের ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়াছিলেন, সে-সম্পর্কে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে।

(চ) তাঁহার স্ববিবেকানুযায়ী কার্য: তদারকি সরকার গঠন সম্পর্কেও রাষ্ট্রপতি রেড্ডী বোধ হয় স্ববিবেকানুযায়ী (in his discretion) কার্য করেন। সকল সময় কেন্দ্রে একটি মন্ত্রি-পরিষদ অবশ্যই থাকিবে এবং মন্ত্রি-পরিষদের শীর্ষে থাকিবেন প্রধান

---

১. **M. V. Pylee:** ***Crisis Conscience and the Constitution*, p. 122**

২. ব্রিটেন সম্পর্কে ল্যাস্কি বলিয়াছেন: **"An active monarch is unthinkable within the framework of our (British) constitution."** ***Parliamentary Government in England***

৩. **"A minority government may stay in office so long as no-confidence motion is not passed against it. It has *no obligation to seek vote of confidence*. ... By the stipulation of the vote of confidence, the President has set a precedent, which we may hope, would be the first and the last of its kind." M. V. Pylee**

মন্ত্রী (৭৪ অনুচ্ছেদ)। **কেন্দ্রে রাষ্ট্রপতি শাসনের** (President's rule) **কোন ব্যবস্থা নাই।** সুতরাং রাষ্ট্রপতি রেড্ডীকে একটি তদারকি মন্ত্রি-পরিষদের ব্যবস্থা করিতেই হইত। এক্ষেত্রে তিনি হয়ত বৃহত্তম দলের নেতা শ্রীজগজীবন রামকে এই সুযোগ দিতে পারিতেন। শ্রীরাম বৃহত্তম দলের নেতা—অন্তর্বর্তীকালীন প্রধান মন্ত্রী হিসাবে কার্য করিবার তাঁহার দাবি ছিল এইটুকুই। এই দাবি রাষ্ট্রপতি মানিয়া লন নাই।

(ছ) মন্ত্রি-পরিষদের ভূমিকা সম্পর্কে নির্দেশ: আবার শ্রীওয়াই. বি. চ্যবনকে মন্ত্রি-পরিষদ গঠনের জন্য যখন আহ্বান করেন তখন রাষ্ট্রপতি কতকগুলি **সর্ত পালনের নির্দেশ** দেন। এ নির্দেশে বলা হয় যে চ্যবন যেন সুসংহত এবং স্থায়ী সরকার গঠন করিবার প্রচেষ্টা করেন। সরকার ঐ উদ্দেশ্যে জাতীয় কল্যাণকামী ব্যক্তিদের সহকর্মী বা মন্ত্রি-পরিষদের অন্তর্ভুক্ত করার উপদেশও দেন। সংসদীয় রীতিনীতি অনুসারে এইরূপ আদেশ বা উপদেশ দেওয়া সমীচীন হয় নাই।[১]

শ্রীচরণ সিংকে তদারকি সরকারের নেতৃত্ব করিবার ভার দিয়া ঐ সরকারের উপর তিনি নির্দেশ দিয়াছিলেন যে উহা দৈনন্দিন কাজ চালাইয়া যাইবে মাত্র—**কোন নীতি নির্ধারণ বা নীতি-পরিবর্তন করিবে না।** তদারকি সরকারের পক্ষে এইরূপ কোনকিছু করাও উচিত নয়। এবং ইহাও সত্য যে চরণ সিং নীতিসংক্রান্ত ব্যাপারেও ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন ও আদেশনির্দেশ দিয়াছিলেন। প্রশ্ন হইল: রাষ্ট্রপতির নিকট হইতে এরূপ নির্দেশ আসিতে পারে কি না? প্রসংগত উল্লেখ্য, শ্রীদেশাই পদত্যাগের পর তদারকি প্রধান মন্ত্রী হিসাবে বেতার ও দূরদর্শনে ভাষণ দিতে উদ্যত হইলে রাষ্ট্রপতির নির্দেশে তাহা বাতিল হইয়া যায় (১৬৭ পৃষ্ঠা)।

সক্রিয় রাষ্ট্রপতি: সকল দিকের বিবেচনা করিয়া বলা যায়, উদ্ভূত বিশেষ পরিস্থিতির জন্য ভারতের রাষ্ট্রপতি ঠিক নিয়মতান্ত্রিক শাসকের ভূমিকায় আর নাই, তিনি নূতন পোশাকে সজ্জিত হইয়া আদেশনির্দেশ প্রদান ও স্বাধীনতাকামী কার্য করিতেও পারেন।

তাঁহার এইরূপ ভূমিকা যে সংসদীয় গণতন্ত্রের পরিকল্পনা সংবিধান-প্রণেতৃবর্গ করিয়াছিলেন তাহার সহিত সম্পূর্ণ অসামঞ্জস্যপূর্ণ বলিয়াই অনেকে মনে করিতেছেন। কাহারও কাহারও (যেমন, জনতা দলের) মতে, আবার রাষ্ট্রপতি শুধু সংসদীয় গণতন্ত্র-বিরোধী কার্যই করেন নাই, তিনি সংবিধান ভংগও করিয়াছিলেন। এই কারণে তিনি ইমপিচমেণ্ট (impeachment) পদ্ধতিতে অপসারণের যোগ্য বলিয়া অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছিল।

উপসংহার: যাই হোক, কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এ-পর্যন্ত মোটামুটি নিছক শাসনতান্ত্রিক প্রধান বলিয়া রাষ্ট্রপতি গণ্য হইতেন, কিন্তু ১৯৭৯ সালের

---

১. "The King or the Queen, while inviting a party leader to explore the possibility of forming a new government does not stipulate any conditions or proffer any advice such as our President did." M. V. Pylee : *Crisis Conscience and the Constitution*

ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টিকে দেখা হইলে বলিতে হয় যে বিশেষ পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপতি সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও প্রভাবশালী ব্যক্তি হইয়া উঠিতে পারেন। সংবিধান-প্রণেতৃবর্গ এইরূপ অবস্থার উদ্ভবের কল্পনা স্বপ্নেও করেন নাই।

কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক ক্ষমতা দ্বৈত কেন্দ্রাবলম্বী: ১৯৭৯ সালের ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে এ অবস্থায় একথা বলা বোধ হয় অযৌক্তিক হইবে না যে ভারতে রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস হইল দ্বৈত: একদিকে রাষ্ট্রপতি এবং অপরদিকে প্রধান মন্ত্রী। রাজনৈতিক অবস্থা অনুযায়ী দুই প্রধানের ক্ষমতার তারতম্য ঘটিতে পারে।

১০. মন্ত্রি-পরিষদের সহিত সংসদের সম্পর্ক (Relation between the Union Council of Ministers and Parliament): সংসদীয় শাসন-ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ ও ব্যবস্থা বিভাগের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে এবং মন্ত্রি-পরিষদ হইল এই দুই বিভাগের মধ্যে যোগসূত্র। ভারতীয় সংবিধান এই সংসদীয় শাসন-ব্যবস্থাই প্রবর্তিত করিয়াছে।[১] সুতরাং ইউনিয়নের (কেন্দ্রীয়) মন্ত্রি-পরিষদের সহিত সংসদের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। মন্ত্রীদের সংসদের উভয় পরিষদের **যে-কোন একটির** সদস্য **হইতে হয়।**

যে মন্ত্রী ৬ মাস একাদিক্রমে পার্লামেন্টের কোন পরিষদেরই সদস্য নহেন তিনি ঐ সময়ের পর আর মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারেন না।

প্রত্যেক মন্ত্রীরই অধিকার রহিয়াছে সংসদের যে-কোন পরিষদে, সম্মিলিত অধিবেশনে এবং সংসদের যে-কোন কমিটিতে বক্তব্য পেশ করিবার বা উহাদের কাযে অংশগ্রহণ করিবার। তবে তিনি যে পরিষদের সদস্য সেই পরিষদেরই মাত্র ভোটদানে সমর্থ। এই ব্যবস্থার সুবিধা হইল যে মন্ত্রীরা যে পরিষদের সদস্য নহেন সে পরিষদেও আপনাপন নীতির ব্যাখ্যা ও সমর্থন এবং বিল পাসের ব্যবস্থা করিতে পারেন।

১০ ১. যৌথ দায়িত্ব: সংসদের সহিত মন্ত্রীদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল **লোকসভার** নিকট মন্ত্রীদের **যৌথ দায়িত্ব**। অর্থাৎ, সকল প্রকার সরকারী নীতি ও কাজকর্মের জন্য মন্ত্রি-পরিষদকে সমষ্টিগতভাবে লোকসভার নিকট দায়ী থাকিতে হয়। ক্যাবিনেটে যাহা ঘটে এবং যে-সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তাহার জন্য মন্ত্রি-পরিষদের প্রত্যেক সদস্যকে দায়িত্ব বহন করিতে হয়। ক্যাবিনেটের সকল সিদ্ধান্তকেই তাহাকে সমর্থন করিতে হয়। অন্যথায় তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হয়।

তাৎপর্য: এই যৌথ দায়িত্বের দরুনই মন্ত্রীরা সংসদে ও সংসদের বাহিরে অভিন্ন সংস্থা হিসাবে কার্য করেন এবং একই সুরে কথা বলেন। সরকারী নীতির বিরোধিতা করাই যথেষ্ট নহে, উহাকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করাও মন্ত্রীদের কর্তব্য। সংসদে এক সহযোগে ভোট দেওয়াও তাঁহাদের কর্তব্য।

---

১. "In the Indian Constitution ··· we have the same system of Parliamentary executive as in England ... ." *Ram Jawaya v. State of the Punjab* (1955)

আবার কোন মন্ত্রীর পক্ষে ক্যাবিনেটকে পরামর্শ না করিয়া কোন নূতন নীতি ঘোষণা অথবা সরকারের ভবিষ্যৎ নীতি সম্পর্কে ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ করা অনুচিত, কারণ ইহাতে সরকারের ঐক্য ও সংহতি নষ্ট হইবার খুবই সম্ভাবনা থাকে। এ-বিষয়ে অবশ্য প্রধান মন্ত্রী কতকটা স্বাধীনতা ভোগ করেন।

১০.২ **ব্রিটেনের সহিত তুলনা** যৌথ দায়িত্ব থাকার জন্যই যখন কোন মন্ত্রীর শাসনকার্য পরিচালনায় দোষত্রুটি দেখা দেয় তখন স্বাভাবিকভাবে সমগ্র মন্ত্রি-পরিষদকে দায়ী করা হয়। এই দিক হইতে কোন মন্ত্রীর সমালোচনা বা পরাজয়কে সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনা বা সরকারের পরাজয় বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়।[১] ব্রিটেনে এই যৌথ দায়িত্ব সম্পূর্ণ প্রথাগত ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ভারতীয় সংবিধানে সুস্পষ্ট বিধান রহিয়াছে যে, মন্ত্রি-পরিষদ লোকসভার নিকট যৌথভাবে দায়ী থাকিবে।[২] ইহার তত্ত্বগত তাৎপর্য হইল যে লোকসভা যদি মন্ত্রি-পরিষদের উপর অনাস্থা প্রকাশ করে তাহা হইলে মন্ত্রি-পরিষদকে একযোগে পদত্যাগ করিতে হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, মন্ত্রিত্বরক্ষা, আইনকানুন পাস এবং অর্থমঞ্জুরার জন্য প্রয়োজন হয় মন্ত্রীদের লোকসভার সমর্থন পাইবার। বলা হয় যে, জনপ্রিয় কক্ষ (popular chamber) লোকসভা এইভাবে সরকারকে নিয়ন্ত্রণাধীন রাখিতে সমর্থ হয়। কিন্তু বর্তমান সময়ে সকল দেশেই আইনসভার অবনতি (decline) ঘটিয়া শাসন বিভাগের কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার মূলে রহিয়াছে দলীয় নিয়মানুবর্তিতা, প্রধান মন্ত্রীর আইনসভা ভাঙিয়া দিবার জন্য পরামর্শদানের ক্ষমতা, নির্বাচন-এলাকার বিস্তৃতি ও সক্রিয় জন-কল্যাণকর রাষ্ট্রের কার্যের বিপুলতা ও জটিলতা ইত্যাদি। স্বাভাবিকভাবেই সংখ্যা-গরিষ্ঠ দলের সরকারের বিরুদ্ধে আইনসভার অনাস্থা প্রস্তাব কদাচিৎ পাস হইয়া থাকে।

১০.৩. **আইন প্রণয়ন** আইন প্রণয়নের প্রয়োজন অনুভব করিয়া বিভিন্ন বিষয়ে আইনের খসড়া প্রণয়ন এবং উহা সংসদে উপস্থিত করা মন্ত্রীদের কার্য। সংখ্যা-গরিষ্ঠতার বলে সংসদে উহা পাস করাইয়া লইতে মন্ত্রীদের বেগ অসুবিধা হয় না। মন্ত্রীরা ছাড়াও সংসদের অন্যান্য সদস্য আইনের প্রস্তাব করিতে পারেন, কিন্তু মন্ত্রি-পরিষদের সমর্থন না থাকিলে উহা সংসদে পাস হওয়া অসম্ভব।[৩] উপরন্তু লোকসভার অধিকাংশ সময়ই ব্যয়িত হয় সরকারী কার্যসম্পাদনে।

সরকারী আয়ব্যয় সরকারী আয়ব্যয়ের ক্ষেত্রেও মন্ত্রি-পরিষদের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। ভারতীয় সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতির—অর্থাৎ সরকারের দায়িত্ব রহিয়াছে প্রত্যেক আর্থিক বৎসরের জন্য আনুমানিক আয়ব্যয়ের হিসাব সংসদের

১. "Collective responsibility means ... that an attack on a Minister is an attack on the Government. The defeat of a Minister is the defeat of the Government." Jennings *The Queen's Government*

২. "The Council of Ministers shall be *collectively* responsible to the House of the People." *Article 75 (3) of the Constitution of India*

৩ এইজন্য বেসরকারী বিল বড় একটা পাস হয় না।

সমক্ষে উপস্থাপিত করিবার। সংসদের আইন কর্তৃক অনুমোদিত না হইলে কোন কর ধার্য বা সরকারী ব্যয় করা সম্ভব নয়। এখানে অবশ্য মনে রাখিতে হইবে যে 'সংসদের অনুমোদন' বলিতে প্রকৃতপক্ষে লোকসভারই অনুমোদন বুঝায়, কারণ রাজ্যসভা লোকসভা কর্তৃক অনুমোদিত অর্থ বিলকে বাতিল করিতে পারে না। সুতরাং বলা হয়, আয়ব্যয় নির্ধারণের ক্ষমতার সাহায্যে লোকসভা মন্ত্রি-পরিষদকে সম্যকভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। কিন্তু লোকসভার নিয়ন্ত্রণ নানাভাবে সীমাবদ্ধ। প্রথমত, এমন কতকগুলি সরকারী ব্যয় আছে যাহা লোকসভার ভোটের সাহায্যে রদবদল করা যায় না। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত—অর্থাৎ সরকারী অনুমোদন ব্যতীত—কোন ব্যয়মঞ্জুরীর দাবি উত্থাপন করা যায় না। তৃতীয়ত, করধার্য ঋণসংগ্রহ ইত্যাদি সম্পর্কিত অর্থবিষয়ক কোন বিল রাষ্ট্রপতির—অর্থাৎ সরকারের সুপারিশ ব্যতীত উত্থাপন করা যায় না। সুতরাং লোকসভার ক্ষমতা হইল সরকারী ব্যয়হ্রাস বা না-মঞ্জুর করার অথবা করহ্রাস বা বিলোপসাধন করার। এখানেও বলিতে হয় যে সরকারী ব্যয়হ্রাস বা না-মঞ্জুর করার লোকসভার ক্ষমতা কতকটা আনুষ্ঠানিক। দলীয় সমর্থনের বলে সরকার যে-কোন ব্যয় মঞ্জুর করাইয়া লইতে পারে। ইহা ব্যতীত বাজেটের জটিলতা, সময়ের অভাব ইত্যাদির ফলে লোকসভায় নিয়ন্ত্রণ শিথিল না হইয়া পারে না।

অতএব দেখা যাইতেছে, আইন প্রণয়ন ব্যাপারে ও আর্থিক বিষয়ে প্রকৃত ক্ষমতা রহিয়াছে মন্ত্রি-পরিষদেরই হস্তে—এবং শাসনকার্য সংক্রান্ত সকল ব্যাপারেই দায়িত্ব বহন করে মন্ত্রি-পরিষদ।

১১. ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মন্ত্রি-পরিষদের কার্যাবলী ও ইহার প্রকৃত ভূমিকা (Functions of the Council of Ministers in Practice and its Real Role):

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মন্ত্রি-পরিষদের ভূমিকার প্রেক্ষাপটেই বিষয়টির আর ব্যাখ্যা করা যায়।

প্রকৃত কর্তৃত্ব ও শাসনক্ষমতার ব্যবহারকারী মন্ত্রি-পরিষদের ভূমিকা হইল নিম্নলিখিতরূপ:

১১.১. শাসন ও ব্যবস্থা বিভাগের মধ্যে যোগসূত্র: কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় ক্যাবিনেট বা মন্ত্রি-পরিষদের মাধ্যমেই শাসন বিভাগ, ব্যবস্থা বিভাগ এবং বিভিন্ন সরকারী দপ্তর একই সূত্রে গ্রথিত এবং একই নীতির ভিত্তিতে সহযোগিতার বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া থাকে, কারণ ক্যাবিনেট যে-সাধারণ নীতি স্থির করে তাহা প্রতিফলিত হয় শাসন বিভাগের বিভিন্ন দপ্তরের নীতি ও কার্য এবং সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনে। বর্তমান সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্র সর্বব্যাপারে কর্মমুখর হইয়া উঠিয়াছে। এই সমস্ত কল্যাণকর কার্য, বৈদেশিক সম্পর্ক, প্রতিরক্ষা ইত্যাদি বিষয়সমূহ সম্বন্ধে নীতি-নির্ধারণ ও চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার দায়িত্ব হইল ক্যাবিনেটের। ইহার পর ঐ নীতি ও সিদ্ধান্তগুলিকে কার্যকর করার জন্য আইন প্রণয়নের প্রয়োজন হইলে তাহারও ব্যবস্থা করিতে হয়। আইন প্রণয়নসংক্রান্ত কর্মসূচী নির্ধারণ, সংসদে

বিল উত্থাপন ইত্যাদি মন্ত্রীদের কর্তব্য। বস্তুত, আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ক্যাবিনেটের হস্তে ন্যস্ত। সংসদের অধিবেশনের প্রারম্ভে রাষ্ট্রপতি যে অভিভাষণ প্রদান করেন তাহাতে ক্যাবিনেটের কর্মসূচীর কথা উল্লিখিত হয়। মন্ত্রীরা যে-সকল বিল উত্থাপন করেন তাহা সহজেই সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয়, কারণ মন্ত্রীরা দলীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার সাহায্যে সংসদকে নিয়ন্ত্রণ করিতে সমর্থ হন। বাজেট প্রণয়ন, কিভাবে সরকারী অর্থ ব্যয় করা হইবে এবং কোন্ কোন্ কর ধার্য করা হইবে ইত্যাদি সমস্তই নির্ধারণ করে ক্যাবিনেট। মন্ত্রীরা ব্যতীত সংসদের অপর কোন সদস্য ব্যয়মঞ্জুরীর দাবি বা করধার্য বা ঋণ করার প্রস্তাব আনয়ন করিতে পারেন না। সংসদ যখন অধিবেশনে থাকে না তখন রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে অর্ডিন্যান্সের সাহায্যে আইন প্রবর্তনের ক্ষমতাও ক্যাবিনেটের রহিয়াছে।

সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত নীতি অনুযায়ী সামগ্রিকভাবে শাসন বিভাগ ক্যাবিনেট কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হইয়া থাকে। সমস্ত দপ্তরের তত্ত্বাবধান করা ইহার দায়িত্ব। সংসদ কর্তৃক গৃহীত আইনকে যথোপযুক্তভাবে কার্যকর করা হইতেছে কি না তাহা দেখা এবং যেক্ষেত্রে আইন নাই সেক্ষেত্রে নীতি-নির্ধারণ করা মন্ত্রীদের কর্তব্য। বর্তমান সময়ে আইনসংক্রান্ত কার্যের বিপুলতা ও জটিলতার জন্য সংসদ অনেক ক্ষেত্রে মাত্র আইনের কাঠামো স্থির করিয়া দেয়। আদেশ, নিয়মকানুন ইত্যাদির সাহায্যে আইনকে পরিপূর্ণ করিয়া কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করার ভার শাসন-কর্তৃপক্ষের উপর থাকে।

অতএব: ক্যাবিনেটই শাসনকার্য পরিচালনার কেন্দ্রীয় শক্তি। যুদ্ধ, শান্তি, বৈদেশিক নীতি, আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং আভ্যন্তরীণ বিষয় সমস্তই ক্যাবিনেটের উদ্যোগে সম্পাদিত হয়।

১১২. **আমলাতান্ত্রিকতার অভিযোগ**: কার্যের চাপ ও বিষয়সমূহের জটিলতার জন্য মন্ত্রীদের আবার স্থায়ী সরকারী কর্মচারীদের (civil servants) উপর নির্ভর করিতে হয়। এইজন্য অনেকে **সমালোচনা** করিয়াছেন যে প্রকৃত শাসনক্ষমতা সরকারী কর্মচারীদের হস্তে পড়িয়াছে এবং **সরকার** হইয়া দাঁড়াইয়াছে **আমলাতান্ত্রিক** (bureaucratic)। ইহার উত্তরে বলা হয়, মন্ত্রীরা লোকসভার নিকট তাঁহাদের দপ্তরসংক্রান্ত কার্যের জন্য জবাবদিহি করিতে হয়। এই অবস্থায় মন্ত্রীরা যাহাতে পার্লামেন্টের বাহিরে কোন অসুবিধায় না পড়েন তাহার দিকে নজর রাখিয়া সরকারী কর্মচারীদের কার্য করিতে হয়। মন্ত্রীরাও রাজনৈতিক ফলাফলের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া স্থায়ী সরকারী কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করেন।

সময়ের অভাবে ক্যাবিনেট মাত্র অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির বিচারবিবেচনা করিতে পারে। নূতন নীতি প্রবর্তন বা প্রচলিত নীতি পরিবর্তনের প্রশ্ন উঠিলে অথবা কোন বিষয়ের সহিত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রশ্ন জড়িত থাকিলে ক্যাবিনেটের সহিত পরামর্শ করা মন্ত্রীদের কর্তব্য। শাসন বিভাগের বিভিন্ন দপ্তরের কার্যের মধ্যে সমন্বয়-সাধন এবং সরকারের সাধারণ নীতির মূল ধারাগুলিকে সুনির্দিষ্টভাবে স্থিতিকরণ ক্যাবিনেটের দায়িত্ব। ইহা না হইলে বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে বিরোধ ও অসামঞ্জস্য দেখা দেয়।

১২. শাসন বিভাগের প্রাধান্য (Supremacy of the Executive) : উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, আইন প্রণয়ন, শাসনকার্য পরিচালনা, সরকারী আয়ব্যয় নির্ধারণ প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই ক্যাবিনেটের ক্ষমতা ও প্রাধান্য পরিব্যাপ্ত। (১) **আইন প্রণয়ন** ক্যাবিনেটের উদ্যোগেই সম্পাদিত হয় এবং ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্তই সাধারণত চরম বলিয়া গণ্য হয়, কারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার বলে ক্যাবিনেট সংসদে ইচ্ছামত আইন পাস করাইয়া লইতে পারে। (২) ইহা ব্যতীত সময় ও জ্ঞানের অভাবের দরুন সংসদ শাসন বিভাগের হস্তে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা **সমর্পণ** করিতে বাধ্য হইয়াছে। এই অর্পিত ক্ষমতাবলে শাসন বিভাগ **নিয়মকানুন ও আদেশনির্দেশ** প্রবর্তন করিয়া থাকে। সরকারী আয়ব্যয়ের ব্যাপারেও ক্যাবিনেট সর্বেসর্বা। (৩) **আয়ব্যয়** কি হইবে না-হইবে, কি করনীতি প্রবর্তন করা হইবে, ইত্যাদি সকলই চূড়ান্তভাবে ক্যাবিনেট স্থির করে এবং সংসদ এ-সম্পর্কে সামান্য ক্ষমতাই প্রয়োগ করিতে সমর্থ হয়। (৪) বিশেষত **পরিকল্পনার** ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ক্যাবিনেটের ক্ষমতা ও প্রভুত্ব দ্রুত সম্প্রসারিত হইয়াছে। (৫) **যুদ্ধ, শান্তি, বৈদেশিক নীতি** ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ব্যাপারে ক্যাবিনেটই প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী। আভ্যন্তরীণ শাসনক্ষেত্রে শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রক ও পরিচালক হইল ক্যাবিনেট। (৬) এই সকল ক্ষমতা ব্যতীত ভারতীয় সংবিধান সরাসরি শাসন বিভাগের হস্তে **কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতা ন্যস্ত** করিয়াছে। যেমন, রাষ্ট্রপতির অর্ডিনান্স জারি করা ও জরুরী অবস্থার ঘোষণা করার ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে ক্যাবিনেটের ক্ষমতা অর্ডিন্যান্সের মারফত ক্যাবিনেট সংসদের সম্মুখীন না হইয়া গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রবর্তন করিতে পারে এবং নাগরিক-অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে পারে ; এমন কি আদালতের রায়কেও অতিক্রম করিতে পারে। (৭) অনুরূপভাবে জরুরী ঘোষণার দ্বারা সরকার মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ন করিতে পারে এবং বিচারালয়ে প্রতিকারের পথ বন্ধ করিয়া দিতে পারে।

১৩. ক্যাবিনেট নায়কতন্ত্র ? : ক্যাবিনেটের এই ব্যাপক ও নিরংকুশ ক্ষমতার দিকে লক্ষ্য করিয়া সমালোচকগণ অভিযোগ করিয়াছেন যে ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্রের **অন্তরালে ক্যাবিনেটের নায়কতন্ত্র** (Cabinet Dictatorship) কার্য করিতেছে।[১] ক্যাবিনেটের তুলনায় সংসদ ক্ষমতাশূন্য। একমাত্র ক্যাবিনেটের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে স্বীকৃতিদানের সংস্থা হিসাবেই সংসদকে গণ্য করিতে হয়। সংসদ যে-সকল আলোচনা-সমালোচনা করে তাহা সরকারকে বিশেষ স্পর্শ করে না। যৌথ দায়িত্ব থাকিলেও সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও দলীয় নিয়মানুবর্তিতার দরুন সরকারের পক্ষে সংসদকে ভয় করিয়া চলিবার কোন কারণই নাই।

১. অনেকের ধারণা হইল, বর্তমানের ক্যাবিনেটের প্রাধান্য হ্রাস পাইয়া প্রধান মন্ত্রীর কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং ক্যাবিনেটের নায়কতন্ত্রের কথা ঠিক বলা চলে না। আবার ১৯৭১ সালের শাসনতান্ত্রিক সংকটের দরুন রাষ্ট্রপতির মর্যাদা ও ক্ষমতার বিশেষ পরিবর্তন ঘটে (১৬৮-৭২ পৃষ্ঠা)। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লইয়া পুনরায় প্রধান মন্ত্রী হওয়ায় এই দিকে গতি পরিবর্তনের সম্ভাবনা রহিয়াছে।

বিরোধী দলের দুর্বলতা ও উহার ফলাফল : অবশ্য ইংল্যাণ্ডের মত দেশেও ক্যাবিনেটের হাতে ক্ষমতা পুঞ্জীভূত হইয়াছে। ইংল্যাণ্ডে বিরোধী দলের সমালোচনা এবং সদাজাগ্রত সংবাদপত্র ও নির্বাচকমণ্ডলীর ভয়ে ক্যাবিনেট বা সরকার নিয়ন্ত্রিত থাকে এবং জনমত অনুযায়ী চলিতে বাধ্য হয়। এইখানেই ভারতীয় সংসদীয় গণতন্ত্রের দুর্বলতা দেখা যায়। স্বাধীনতার পর হইতে কংগ্রেস দল বিপুল সংখ্যাধিক্যে জয়লাভ করিয়া এককভাবে শাসনক্ষমতা ভোগ করিয়া আসিতেছিল। অন্যান্য বিরোধী দল থাকিলেও সংসদে ইহাদের সদস্যসংখ্যা ছিল নগণ্য এবং ইহাদের কর্মসূচী ছিল অস্পষ্ট। ইহাদের পক্ষে বিকল্প সরকার গঠনের কোন আশাই ছিল না। এই অবস্থার দুইটি অকাম্য প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হইত। একদিকে বিরোধী দলগুলি দায়িত্বশীল ও সংগঠনমূলক সমালোচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিত না, এবং অপরদিকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত সরকারী দল জনমতকে স্বীকৃতিদানের গুরুত্বও উপলব্ধি করিত না। চতুর্থ নির্বাচনের (১৯৬৭) ফলে এই অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন দেখা দিলেও (মধ্যবর্তী) নির্বাচনের পর অবস্থার আরও অবনতি ঘটে—বিরোধী দলগুলি পূর্বের তুলনায় আরও দুর্বল হইয়া পড়ে। আর উহাদের মধ্যে কোনরূপ দায়িত্বশীলতাও গড়িয়া উঠে না। ১৯৭৭ সালের মার্চ মাসের ষষ্ঠ সাধারণ নির্বাচনে বিভিন্ন বিরোধী দল সম্মিলিত হইয়া জনতা দল গঠন এবং কংগ্রেসকে পরাজিত করিয়া সরকার গঠন করে। ফলে কংগ্রেস দল বিরোধী দলের ভূমিকা গ্রহণ করে। কিন্তু কংগ্রেস দলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হওয়ায় বিরোধী দল সুষ্ঠুভাবে ও যথেষ্ট দায়িত্বের সহিত কার্য করিতে পারে নাই। নিজেদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদ থাকায় সরকারী দলও ঐক্য ও শক্তি হারাইয়া ফেলে। ফলে (১৯৮০ সালের নির্বাচনে) লোকসভায় প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ আসনের অধিকারিণী শ্রীইন্দিরা গান্ধী আবার প্রধান মন্ত্রীর ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হন। ইন্দিরা গান্ধীর নিধনের পর অষ্টম লোকসভার নির্বাচনে (১৯৮৪) কংগ্রেস (ই) দল শ্রীরাজীব গান্ধীর নেতৃত্বে চারি-পঞ্চমাংশ (৫০৯ এর মধ্যে ৪০১টি) আসন অধিকার করিলে বিরোধী দলগুলির অস্তিত্ব সংকটাপন্ন হইয়া উঠে। পরে ১৯৮৬-এর শেষদিক হইতে প্রশাসনিক কেলেংকারী ইত্যাদির অভিযোগের জন্য আবার কিছুটা পুনরুজ্জীবিত হয়। তবে এখনও (অক্টোবর, '৮৭) দানা বাঁধিতে পারে নাই।

ক্যাবিনেটের দুর্বলতা : ভারতীয় সংসদীয় গণতন্ত্রের আর একটি দুর্বলতার প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। ইংল্যাণ্ডের মত ভারতের নির্বাচকমণ্ডলী শিক্ষিত, সুসংহত ও সদাজাগ্রত নহে; ইহারা ধর্মগত, ভাষাগত ও বর্ণগত কারণে বিভক্ত। সুতরাং জনমতের প্রভাব সরকারের উপর যতটা পড়া উচিত ততটা পড়ে না।

নায়কতন্ত্রের অভিযোগ কতদূর সমর্থনযোগ্য : ভারতীয় সংসদীয় গণতন্ত্রের উপরি-উক্ত দুর্বলতা স্বীকার করা হইলেও ভারতে 'ক্যাবিনেট নায়কতন্ত্র' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং পার্লামেন্ট সম্পূর্ণভাবে শক্তিহীন—এই অভিযোগ স্বীকার করিয়া লওয়া হয় না। বর্তমানে ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে পার্লামেন্টের প্রধান কার্য

হইল আলোচনা, সমালোচনা ও বিতর্ক অনুষ্ঠিত করা এবং ইহাদের মাধ্যমে সরকারী কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রিত করা।

ক. সংসদীয় নিয়ন্ত্রণের ব্যাপ্তি: ভারতে দলীয় ব্যবস্থার দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও বিরোধী দলগুলি মোটামুটি দক্ষতার সহিত সরকারের ত্রুটিবিচ্যুতির সমালোচনা করিতে সমর্থ হইয়াছে। সরকারী দলের ক্ষমতার উৎস হইল নির্বাচকমণ্ডলী। সংসদে বিরোধী দলগুলি বিভিন্ন সময় নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট সরকারী দলের দোষত্রুটি তুলিয়া ধরে। ফলে সংসদ বিশেষত লোকসভায় যে বিতর্ক, সমালোচনা, প্রশ্নজিজ্ঞাসা চলে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই সরকারকে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে হয়। সংসদের কার্যপদ্ধতি পরিচালনার যে নিয়মকানুন প্রবর্তিত রহিয়াছে তাহাতে প্রশ্নজিজ্ঞাসা ও অর্ধ-ঘণ্টার আলোচনা, রাষ্ট্রপতির প্রারম্ভিক অভিভাষণ সম্পর্কে বিতর্ক, জরুরী গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ বিষয় সম্পর্কে মুলতবী প্রস্তাবের মাধ্যমে বিতর্ক, জনসাধারণের স্বার্থসংক্রান্ত বিষয়ে প্রস্তাব গ্রহণ, অনাস্থা ও অন্যান্য ধরনের গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব উত্থাপন এবং বাজেট আলোচনা প্রসংগে সরকারের সাধারণ নীতির সমালোচনার ব্যবস্থা রহিয়াছে। ইহা ব্যতীত সরকার নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে পার্লামেন্টের বিভিন্ন কমিটির গুরুত্ব রহিয়াছে। বিরোধী দলগুলি কমিটির কাযের মাধ্যমে সরকারী কাযের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। এই কমিটিগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইল **সরকারী গণিতক কমিটি** (The Public Accounts Committee)[1], আনুমানিক ব্যয়হিসাব কমিটি (The Committee on Estimates), এবং সরকারী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত কমিটি (The Committee on Public Undertakings)। অর্থনৈতিক বিষয় সম্পর্কিত এই কমিটিগুলি সরকারের উপর সংসদের নিয়ন্ত্রণ বিস্তার করিতে সাহায্য করিয়াছে। এই প্রসংগে সরকারী প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত কমিটির (The Committee on Government Assurances) কথাও উল্লেখ করিতে হয়। মন্ত্রীরা যে-সকল প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন ঐগুলি কতদূর প্রতিপালিত হইতেছে তাহা এই কমিটি দেখে এবং লোকসভার নিকট ঐ সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদান করে।

খ. সমালোচনার ফলে মন্ত্রীদের পদত্যাগ: উপরি-উক্ত পন্থাগুলি ছাড়া **আভ্যন্তরীণ বিরোধিতা** এবং **সমালোচনাও** ক্ষমতাপ্রাপ্ত সরকারী দলকে সংযত রাখিতে সহায়তা করিয়াছে। জনতা দল কোন সুসংহত দল ছিল না, ইহার মধ্যে পরস্পরবিরোধী স্বার্থসম্পন্ন বিভিন্ন গোষ্ঠী ছিল। ইহাদের মধ্যে যে আলোচনা-সমালোচনা চলে তাহার দ্বারা জনতা দলের নেতৃবৃন্দ নিয়ন্ত্রিত হইতেন। ক্যাবিনেট যে সংসদের সমালোচনা এবং জনমতকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া চলিতে পারে না তাহা একাধিক মন্ত্রীর পদত্যাগের দ্বারা প্রমাণিত হয়। বলা হয়, বর্তমানে ক্যাবিনেটের নায়ক-তন্ত্র শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছে। তবুও কিন্তু বিভিন্ন দিক হইতে দেখিলে ক্যাবিনেটের বিরুদ্ধে নায়কতন্ত্রের অভিযোগ বিশেষ সমর্থন করা যায় না। অবশ্য অভিযোগকে ভিত্তিহীন প্রমাণ করাই যথেষ্ট নয়। গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় রাখিতে হইলে বলিষ্ঠ

---

১. সরকারী দলের কেহ ইহার সভ্য হইতে পারেন না।

জনমত ও সচেতন নির্বাচকমণ্ডলী গড়িয়া তুলিতে হইবে। ইহার জন্য প্রয়োজন হইল ব্যাপক শিক্ষাবিস্তার এবং অর্থনৈতিক সাম্যের ভিত্তিতে মানবিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার।

১৪. প্রধান মন্ত্রী—পদমর্যাদা ও ক্ষমতা (The Prime Minister—Position and Powers) : ভারতের নিয়মতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় প্রধান মন্ত্রী অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই প্রকৃত শাসকপ্রধান। এক দিক দিয়া বলা যায়, **ভারতের প্রধান মন্ত্রী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি অপেক্ষাও অধিক ক্ষমতাশালী।** যেমন, অন্যান্য চিরাচরিত ক্ষমতা ছাড়া রাজ্যপাল নিয়োগ ও বিদেশে কূটনৈতিক প্রতিনিধি প্রেরণ ব্যাপারে প্রধান মন্ত্রী উল্লেখযোগ্য ক্ষমতা ভোগ করিয়া থাকেন। অপরপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজ্যের গভর্নরগণ নির্বাচিত হন এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক কূটনৈতিক প্রতিনিধি নিয়োগে সিনেটের সম্মতি প্রয়োজন।

ভারতীয় সংবিধানের সুস্পষ্ট ব্যবস্থা অনুসারে প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন একটি মন্ত্রি-পরিষদ থাকিবে (১৪১ পৃষ্ঠা)। রাষ্ট্রপতির অন্যতম দায়িত্ব প্রধান মন্ত্রীকে নিয়োগ করা। যেক্ষেত্রে কোন দলের লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে সেক্ষেত্রে তাঁহার স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগের অবকাশ নাই বলিলেই চলে—তাঁহাকে লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ বা অধিকসংখ্যক সদস্যের সমর্থনপ্রাপ্ত দলীয় নেতাকে প্রধান মন্ত্রীর পদে নিয়োগ করিতে হয়। কিন্তু লোকসভায় যখন কোন দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে না, অথবা যখন দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব বা দলত্যাগের ফলে কোন দল বা সম্মিলিত সরকার (coalition government) সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারায়, আবার প্রধান মন্ত্রী হঠাৎ প্রয়াত হইলে এবং পরবর্তী দলনেতা বাছাই না হইলে তখন রাষ্ট্রপতি সক্রিয় হইবার সুযোগ পান এবং মন্ত্রি-পরিষদ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারেন। রাজনীতিতে ইহার ফলে বিশেষ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৯৭৯ সালের মধ্যে সুস্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ দল না থাকায় রাষ্ট্রপতি সঞ্জীব রেড্ডী বেশ কিছুটা সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং স্ববিবেচনা অনুযায়ী প্রধান মন্ত্রী বাছাই করিয়াছিলেন (১৬৮-৬৯ পৃষ্ঠা)।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে **প্রধান মন্ত্রী রাজ্যসভারও সদস্য হইতে পারেন।** ব্রিটেনে ১৯০২ সালে লর্ড সলসবেরীর (Lord Salisbury) পদত্যাগের পর হইতে আজ পর্যন্ত লর্ড সভার কোন সদস্যকে প্রধান মন্ত্রীর পদে মনোনীত না করায় ইহা একপ্রকার শাসনতান্ত্রিক রীতিতে পরিণত হইয়াছে যে, প্রধান মন্ত্রীকে কমন্স সভারই সদস্য হইতে হইবে।[১] ভারতীয় সংবিধানে কিন্তু এইরূপ কোন বিধান নাই

---

১. ১৯৬৩ সালে ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী স্যার অ্যালেক ডগলাস হিউম (Sir Alexander [Alec] Frederic Douglas Home) যখন প্রধান মন্ত্রী মনোনীত হন তখন তিনি লর্ড সভারই সদস্য ছিলেন। প্রধান মন্ত্রী মনোনীত হওয়ার পর তিনি লর্ড সভার সদস্যপদ ও লর্ড উপাধি ত্যাগ করিয়া উপনির্বাচনে কমন্স সভার একটি আসন অধিকার করেন। সুতরাং ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীকে যে কমন্স সভারই সদস্য হইতে হইবে, এই শাসনতান্ত্রিক ঐতিহ্য বজায় রহিয়াছে।

যে, প্রধান মন্ত্রীকে লোকসভারই সদস্য হইতে হইবে। এইরূপ ব্যবস্থা নাই বলিয়াই প্রয়াতা **ইন্দিরা গান্ধীর** পক্ষে রাজ্যসভার সদস্য হইয়াও প্রথমবার প্রধান মন্ত্রীর পদ লাভ করা সম্ভব হইয়াছিল।

আর একটি বিষয়ের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতে পারে। রাষ্ট্রপতি সংসদের সদস্য নন এরূপ ব্যক্তিকে ৬ মাসের জন্য প্রধান মন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করিতে পারেন। [৭৫(৫) অনুচ্ছেদ]।

এখন বিভিন্ন দিক দিয়া প্রধান মন্ত্রীর ক্ষমতা, পদমর্যাদা ও দায়িত্বের বিবরণ দেওয়া যাইতে পারে।

ক। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে প্রধান মন্ত্রী: প্রধান মন্ত্রী ও তাঁহার দলের ক্ষমতা অংগাংগিভাবে জড়িত। লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ বা অধিকসংখ্যক সদস্য কর্তৃক সমর্থিত দলের নেতা বলিয়াই প্রধান মন্ত্রী তাঁহার পদে অভিষিক্ত হন। তাঁহার **কর্তৃত্ব** ও **নেতৃত্বের মূলভিত্তি** হইল দলীয় আনুগত্য (party loyalty)। বিশেষ কারণ না ঘটিলে তাঁহার পক্ষে ঐ আনুগত্য পাইতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। কারণ, দলীয় সদস্যগণ জানেন যে প্রধান মন্ত্রীকে জনসমক্ষে বা সংসদে হেয় করার অর্থ হইল পরোক্ষভাবে বিরোধী পক্ষকে ক্ষমতায় আসায় সাহায্য করা।[১]

সরকারী কর্মসূচী নির্ধারণ ও রূপায়ণ ব্যাপারে প্রধান মন্ত্রী দলের অভ্যন্তরে প্রাধান্য ভোগ করিয়া থাকেন। দলীয় সংগঠন সাধারণ নীতি সম্পর্কে নির্দেশ দিতে পারে মাত্র, কিন্তু **সংসদে কি কর্মপদ্ধতি** অনুসরণ করা হইবে তাহা প্রধান মন্ত্রীই স্থির করেন। ইংল্যাণ্ডেও শ্রমিক এবং রক্ষণশীল—উভয় দলের বেলাতেই অনুরূপ ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়।

দলীয় নেতা (বা প্রধান নেতা) হিসাবে নিজ দলের জনপ্রিয়তা রক্ষা ও বৃদ্ধি করার প্রধান দায়িত্ব থাকে প্রধান মন্ত্রীর উপর। নির্বাচনের সময় এই দায়িত্ব বিশেষভাবে বাড়িয়া যায়। তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদাকে ঘিরিয়াই দলের শক্তি ও জনপ্রিয়তা গড়িয়া উঠে। সুতরাং প্রধান মন্ত্রীকে দলীয় নেতৃত্বে সুদক্ষ হইতে হয়, জনসাধারণের ধ্যানধারণা উপলব্ধি করিয়া জনমত পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করিবার যথোপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিতে হয়। জনসাধারণের মধ্যে ব্যক্তিপূজার যে দুর্বলতা থাকে তাহার সুযোগ গ্রহণের জন্য প্রধান মন্ত্রীর ব্যক্তিত্ব সত্যানুবর্তিতা সাহস ইত্যাদি সম্পর্কে সংবাদপত্র চলচ্চিত্র বেতার দূরদর্শন প্রভৃতির মাধ্যমেও মোহের সৃষ্টি করা হয়। এই সকল কারণে প্রধান মন্ত্রী স্বতই দলের অন্যান্য সকলের অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ভোগ করেন।

খ। সংসদের অভ্যন্তরে প্রধান মন্ত্রী: সংসদের অভ্যন্তরে সরকারী নেতৃত্ব ও দলীয় সংহতি রক্ষা করার দায়িত্ব প্রধান মন্ত্রীর উপর ন্যস্ত। যাহাতে দলীয় সদস্যরা সকল সময় সরকারী নীতি ও কাজকর্মকে সমর্থন জানান তাহার তদারকির জন্য হুইপগণ

১. এই কারণেই শ্রীবিশ্বনাথ প্রতাপ সিং ও অন্যান্যেরা শ্রীরাজীব গান্ধীর বিরুদ্ধে কিছুই করিতে পারেন নাই।

(Whips) রহিয়াছেন। ইহারা দলীয় সদস্যদের উপদেশ-নির্দেশ প্রদান করেন এবং প্রয়োজনবোধে তাঁহাদের উপর চাপ সৃষ্টি করেন। কোন সদস্য বিদ্রোহ করিলে তাঁহাকে দল হইতে বহিষ্কারের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। এবং বহিষ্কারের দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

খ. ১. সুযোগসুবিধা বিতরণ: সদস্যদের নিয়ন্ত্রিত করার অন্যতম উপায় হইল সুযোগসুবিধা বিতরণ (rewards and patronage)। প্রধান মন্ত্রী বিভিন্নভাবে অনুগ্রহ বিতরণ করিতে পারেন। যেমন, মন্ত্রিপদে নিয়োগ হইতে সুরু করিয়া বিভিন্ন কমিটির সদস্যপদে নিয়োগ, বিদেশে যাওয়ার সুযোগপ্রদান ইত্যাদি সকলই মূলত প্রধান মন্ত্রীর ইচ্ছানুযায়ী হইয়া থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সকল সুযোগসুবিধার সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অর্থাগমের প্রশ্ন জড়িত থাকে।

সাধারণ নীতির ব্যাখ্যার ব্যাপারে প্রধান মন্ত্রী সরকারের মুখপাত্র হিসাবে কার্য করেন। গুরুত্বপূর্ণ বিল সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান ও সরকারী কাযের সমর্থন করার প্রধান দায়িত্বও তিনি বহন করেন। **লোকসভা ভাঙিয়া দেওয়ার ব্যাপারে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দিবার অধিকার একমাত্র তাঁহারই** রহিয়াছে। অনেক সময় তিনি এই ক্ষমতা প্রয়োগের ভীতি প্রদর্শন করিয়া দলীয় সদস্যদের সমর্থন পাইতে প্রচেষ্টা করিয়া থাকেন।

গ। **অন্যান্য মন্ত্রীর সহিত সম্পর্ক**: অন্যান্য মন্ত্রীর সহিত প্রধান মন্ত্রীর সম্পর্ক আলোচনা প্রসংগে অনেক সময় প্রধান মন্ত্রীকে '**সমপর্যায়ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে অগ্রগণ্য**' (*primus inter pares*) বলিয়া বর্ণনা করা হয়। কিন্তু বর্তমান সময়ে এই বর্ণনা প্রধান মন্ত্রীর প্রতিপত্তি ও মর্যাদা সম্যকভাবে ব্যক্ত করে না। মন্ত্রি-পরিষদের উত্থানপতন ঘটে প্রধান মন্ত্রীকে কেন্দ্র করিয়া। স্বেচ্ছাচারী না হইলেও প্রধান মন্ত্রীই হইলেন মন্ত্রি-পরিষদের কেন্দ্রবিন্দু। তাঁহার মতাদর্শ অনুযায়ীই রাষ্ট্রপতি অন্যান্য মন্ত্রীকে নিয়োগ করেন, মন্ত্রীদের মধ্যে বিভিন্ন দপ্তর বণ্টিত হয় প্রধান মন্ত্রীর নির্দেশে। কোন মন্ত্রী অকাম্য বলিয়া বিবেচিত হইলে প্রধান মন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করাইতে পারেন। সাম্প্রতিক কালে ঘটনার মধ্যে শ্রীচরণ সিং ও শ্রীরাজনারায়ণের মন্ত্রিপদ হইতে পদচ্যুতির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। তবে চরম অবস্থা ছাড়া অন্য সময় এই পন্থা অবলম্বনের প্রয়োজন হয় না।

সাধারণত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী প্রধান মন্ত্রীর অনুরোধক্রমে বা ইংগিতমত পদত্যাগ করেন এবং দপ্তরসমূহ পুনর্বণ্টিত হয়।[১] এইভাবেই ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ডক্টর জন মাথাই, টি. টি. কৃষ্ণমাচারী, গুলজারিলাল নন্দ, পুনাচ্ছা, (সাম্প্রতিক কালে রাজীব গান্ধীর নির্দেশে) কে. কে. তেওয়ারি প্রভৃতি পদত্যাগ করিয়াছিলেন।

সমন্বয়সাধনের দায়িত্ব: ক্যাবিনেটের সংহতিত্ব এবং নীতির সমন্বয়সাধন করা প্রধান মন্ত্রীর অন্যতম কর্তব্য। মন্ত্রি-পরিষদের কর্মসূচী এবং বিভিন্ন দপ্তর কর্তৃক

১. "The Prime Minister can shuffle his pack as he pleases."

অনুসৃত নীতির মধ্যে বিরোধ বাধিলে তিনি উহার মীমাংসা করেন। দপ্তরসমূহের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীরা অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলি সম্পর্কে প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ করেন।

প্রধান মন্ত্রীর প্রাধান্য: **কার্যক্ষেত্রে ইংল্যাণ্ডের মত ভারতেও বর্তমানে বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যাপারে (decision-making) ক্যাবিনেটের তাৎপর্য ও গুরুত্ব দ্রুত হ্রাস পাইয়াছে এবং প্রধান মন্ত্রীর প্রাধান্য মোটামুটিভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।**

ঘরোয়া ক্যাবিনেট: প্রথমত, প্রধান মন্ত্রী সকল মন্ত্রীকে সমান গুরুত্ব প্রদান করেন না—মাত্র কয়েকজনের সংগে পরামর্শ করিয়া চলেন। এই মন্ত্রিগোষ্ঠীকে অনেক সময় আভ্যন্তরীণ ক্যাবিনেট বা ঘরোয়া ক্যাবিনেট (inner cabinet or kitchen cabinet) আখ্যা দেওয়া হয়।[১]

দ্বিতীয়ত, ক্যাবিনেটের কাজকর্ম তদারকি করার জন্য **ক্যাবিনেট দপ্তরখানা** রহিয়াছে। ইহার দুইটি শাখা হইল: (ক) কর্মচারী ও শাসনসংস্কার সংক্রান্ত বিভাগ (The Department of Personnel and Administrative Reforms) এবং (খ) ক্যাবিনেটের বিষয় সংক্রান্ত বিভাগ (The Department of Cabinet Affairs)। ক্যাবিনেটের বিষয় সংক্রান্ত বিভাগ কর্মসূচী এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যাপারে সমন্বয়সাধনের কার্য করিয়া থাকে। এই **ক্যাবিনেট দপ্তরখানা** এবং **উহার কর্মসচিব** (Cabinet Secretary) **প্রধান মন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণাধীন**

তৃতীয়ত, একাধিক **স্থায়ী** ও **অস্থায়ী ক্যাবিনেট কমিটি** (standing and *ad hoc* Cabinet Committees) নিয়োগ করিয়া বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই সকল কমিটির নিয়োগ প্রধান মন্ত্রীর কর্তৃত্বাধীন এবং প্রায় সকল **কমিটির সভাপতি** (Chairman) হন **প্রধান মন্ত্রী**। সুতরাং সামগ্রিকভাবে ক্যাবিনেটের কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের অবকাশ থাকে না, প্রধান মন্ত্রী যে-সকল প্রস্তাব ক্যাবিনেটে উপস্থিত করেন তাহাতেই ক্যাবিনেট সম্মতি প্রদান করে।[২]

চতুর্থত, প্রধান মন্ত্রীর নিজস্ব দপ্তরখানা রহিয়াছে, ইহার মাধ্যমে এবং সহযোগে তিনি তাঁহার কর্তৃত্ব স্থাপনে প্রয়াস পাইয়া থাকেন।

প্রধান মন্ত্রী শাসিত সরকার: উপরি-উক্ত বিষয়গুলির উল্লেখ করিয়া অনেকে অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন যে সরকারকে ক্যাবিনেট-শাসিত সরকার (Cabinet

১. "Informal groups of ministers can also prove important: neither Nehru nor his daughter is an exception to the rule that a PM makes some ministers more equal than others when it comes to friendly consultation...." Morris-Jones: *The Government and Politics of India*

২. "Practically all the committees are presided over by the Prime Minister, and therefore the Cabinet might be hesitant to function as a revisionary authority and be content to play the role of a recording authority." Asok Chanda: *Indian Administration.*

Government) না বলিয়া প্রধান মন্ত্রী শাসিত সরকার (Prime Ministerial Government) বলিয়াই অভিহিত করাই অধিক বাস্তবধর্মী হইবে।

ঘ। **প্রচারযন্ত্রের উপর প্রধান মন্ত্রীর প্রভাব** : প্রধান মন্ত্রীর শক্তির আর একটি উৎস হইল সংবাদপত্র বেতার দূরদর্শন প্রভৃতির মাধ্যমে প্রচারকার্য পরিচালনা। দিনের পর দিন এই সকল প্রচারযন্ত্রের মাধ্যমে সরকারী ও দলীয় নীতি সম্পর্কে প্রধান মন্ত্রী ব্যাপক প্রচারকার্য চালাইয়া থাকেন।[১] অধিকাংশ সাংবাদিকও প্রধান মন্ত্রীর সুনজরে থাকিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার বক্তব্যসমূহকে প্রাধান্য দিয়া থাকেন। অনেক সময়ই প্রধান মন্ত্রীর বৈদেশিক ভ্রমণকে ঘটা করিয়া প্রচার করা হয়।

৬। **রাষ্ট্রপতির সহিত প্রধান মন্ত্রীর সম্পর্ক** : সংবিধান অনুযায়ী শাসনক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হস্তে ন্যস্ত। এই ক্ষমতা মন্ত্রি-পরিষদের দ্বারা প্রযুক্ত, কারণ সংবিধানে রহিয়াছে রাষ্ট্রপতির একটি মন্ত্রি-পরিষদ থাকিবে এবং উহার পরামর্শ অনুসারে কার্য করিতে বাধ্য। সুতরাং ব্যাখ্যা করিয়া বলা হয় যে রাষ্ট্রপতির সকল ক্ষমতা মন্ত্রি-পরিষদের ক্ষমতা। মন্ত্রি-পরিষদের শীর্ষে থাকেন প্রধান মন্ত্রী। তাঁহাকে মনোনয়ন (choose) করেন রাষ্ট্রপতি এবং অন্যান্য মন্ত্রীকে প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী নিয়োগ করা হয় এবং এই প্রধান মন্ত্রী আবার রাষ্ট্রপতির প্রধান পরামর্শদাতা। সাধারণত তাঁহার মাধ্যমেই রাষ্ট্রপতির সহিত মন্ত্রি-পরিষদের সংযোগ স্থাপিত হয়। প্রধান মন্ত্রীর **সাংবিধানিক কর্তব্য হইল রাষ্ট্রপতিকে শাসনকার্য পরিচালনা ও আইনের প্রস্তাব সম্পর্কে মন্ত্রি-পরিষদের সিদ্ধান্ত জ্ঞাত করানো।** আবার শাসন ও আইনের প্রস্তাব সম্পর্কে যে-সমস্ত সংবাদ রাষ্ট্রপতি জানিতে চাহেন তাহাও তাঁহাকে জানানো প্রধান মন্ত্রীর কর্তব্য। স্বাভাবিক অবস্থায় রাষ্ট্রপতি হইলেন **নিয়মতান্ত্রিক শাসকপ্রধান**। সুতরাং যে-সকল ক্ষমতা তাঁহার হস্তে আইনত ন্যস্ত করা হইয়াছে তাহা সমস্ত ক্ষেত্রেই মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুযায়ী প্রযুক্ত হয়। প্রধান পরামর্শদাতা হিসাবে প্রধান মন্ত্রীই হইলেন **নিয়ন্ত্রক-প্রধান**। সংবিধানেও (৭৪ অনুচ্ছেদ) নির্দেশ রহিয়াছে যে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রি-পরিষদের (অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রীর) পরামর্শ অনুযায়ী তাঁহার কার্য সম্পাদন করিতে বাধ্য।

[কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় এই তত্ত্ব খাটিলেও বিশেষ অবস্থায় রাষ্ট্রপতি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারেন। এ-সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির মর্যাদা সম্পর্কিত আলোচনায় বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা হইয়াছে (১৬৫-৭২ পৃষ্ঠা)।]

স্বাভাবিক অবস্থাতেও রাষ্ট্রপতি তাঁহার প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন। অবশ্য এই প্রভাব নির্ভর করে রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিত্বের উপর। ইহা ছাড়াও দেখা যায় যে, অতীতে একাধিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি ও প্রধান মন্ত্রীর মধ্যে মতবিরোধ ঘটিয়াছে। আবার

১. এই দিক দিয়া ভারতীয় দূরদর্শন বিশেষ বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হয়।

আকাধিক ক্ষেত্রে প্রধান মন্ত্রী রাষ্ট্রপতির মতামত ও প্রভাবকে উপেক্ষাও করিতে পারেন নাই।[১]

অতএব, বলা যায় না যে রাষ্ট্রপতি নিছক ক্ষমতাবিহীন শাসকপ্রধান (magnificent cipher)।

এই প্রসংগে কয়েকটি দৃষ্টান্তের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

সম্পর্ক প্রসংগে কয়েকটি দৃষ্টান্ত : ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ হইলেন ভারতের প্রথম নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি। তিনি ১৯৬২ সাল পর্যন্ত ঐ পদে বহাল ছিলেন। ঐ সময় প্রধান মন্ত্রীর পদ অলংকৃত করেন জওহরলাল নেহরু।

(১) রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও নেহরু : দুই ব্যক্তিই প্রভাবশীল এবং জনপ্রিয় ছিলেন। তবে রাজেন্দ্রপ্রসাদ ছিলেন রক্ষণশীল আর নেহরু ছিলেন বহুলাংশে প্রগতিশীল। খোলাখুলি ঝগড়া না হইলেও উভয়ের মধ্যে মতবিরোধ যে ছিল তাহা অনেকেরই জানা। রাজেন্দ্রপ্রসাদ নেহরুর প্রগতিশীল কার্যকলাপকে অনেক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রাখিতে সচেষ্ট ও সমর্থ হইয়াছিলেন।

মৌল নীতি-নির্ধারণের ক্ষেত্রেও রাজেন্দ্রপ্রসাদ বিশেষ ভূমিকাও গ্রহণ করিয়াছিলেন।[২] তিনিই দাবি করেন যে রাষ্ট্রপতির মর্যাদা ঠিক ব্রিটিশ রাজা বা রাণীর মত নয়—অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি মোটেই ক্ষমতাহীন শাসকপ্রধান (a constitutional figure head) নন, নিজস্ব বিবেচনা অনুযায়ী কার্য করিবার অবকাশ তাঁহার রহিয়াছে। নেহরু এ বিষয় সম্পর্কে একমত হন না এবং নিজের পক্ষ সমর্থনের জন্য বিভিন্ন সংবিধানবিশেষজ্ঞদের মতামত গ্রহণ করেন।

রাজেন্দ্রপ্রসাদ অন্যান্য বিষয়েও নেহরুর সহিত পত্রালাপ করিতেন এবং অনেক ব্যাপারেই নেহরুকে সতর্ক করিয়া দিতেন। যেমন নেহরুকে তিনি জানান, দেশে দুর্নীতি এমন পর্যায়ে পৌঁছাইয়াছে যে যাহাতে কংগ্রেস দল শেষ হইয়া যাইতে পারে। আবার হিন্দু সংহিতা বিলের (Hindu Code Bill) বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান। রাজেন্দ্রপ্রসাদ আবার হিন্দী ভাষার দ্রুত প্রসারের পক্ষপাতী ছিলেন, অপর দিকে নেহরু এরূপ প্রচেষ্টার পক্ষপাতী ছিলেন না। রাজেন্দ্রপ্রসাদ ১৯৫২ সালে গোপালাচারীকে মাদ্রাজের উচ্চতর কক্ষে মনোনীত করার তীব্র প্রতিবাদ জানান। ইহা ব্যতীত ১৯৬০ সালে কেরলের কমিউনিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়িয়া তোলার ব্যাপারেও রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রতিবাদ জানান। অতএব, বলা যায় যে নেহরু রাজেন্দ্রপ্রসাদকে একেবারে উপেক্ষা করিয়া চলিতে পারেন নাই এবং শাসন ব্যাপারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাজেন্দ্রপ্রসাদের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

(২) রাধাকৃষ্ণান ও নেহরু : রাজেন্দ্রপ্রসাদের পর রাষ্ট্রপতি হন রাধাকৃষ্ণান। রাজেন্দ্রপ্রসাদের মত তিনিও সক্রিয় রাজনীতির বাহিরে ছিলেন, এবং তাঁহার পরিচিতি ছিল প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্ ও দার্শনিক বলিয়া। তিনি নেহরুর ইচ্ছাতেই রাষ্ট্রপতিপদে উন্নীত হন।

প্রথম দিকে রাধাকৃষ্ণানের সংগে নেহরুর সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক থাকিলেও পরবর্তী সময়ে রাধাকৃষ্ণান হইয়া দাঁড়ান সরকারের সমালোচক। বলা হয় যে ১৯৬২ সালে কৃষ্ণমেননকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীপদ হইতে সরাইয়া দেওয়ার মূলে ছিলেন রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণানই। ইহাও বলা হয় যে তাঁহার কথাতেই প্রতাপ সিং

১. For details refer L. N. Sharma : *The Indian Prime Minister* ; also see S. S. Khera : *The Central Executive* ; সাম্প্রতিক কালে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য শ্রী কে. কে. তেওয়ারীর পদচ্যুতিও স্মর্তব্য।

২. "The *Times* wrote in 1963 that President Prasad was a very real factor in the shaping of his country's policies at home and abroad. It can be said that Rajendra Prasad helped Nehru balanced his policies by putting a 'conservative' check to his radical flights." L. N. Sharma ; *The Indian Prime Minister*

কর্মচারীগণের আচরণ সম্পর্কে অনুসন্ধানের ব্যবস্থা হয়। তিনি প্রধান মন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীদের মধ্যে মধ্যস্থতা করিতেন এবং মন্ত্রীদের পরামর্শ দিতেন।

(৩) রাধাকৃষ্ণান ও শ্রীমতী গান্ধী : শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর প্রধান মন্ত্রীত্বের সময় তিনি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। যেমন, অশোক মেহতাকে ক্যাবিনেটে স্থান দেওয়ার ব্যাপারে তাঁহার হাত ছিল। জে. এল. নন্দাকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে রাখার ব্যাপারেও তাঁহার প্রভাব ছিল।

তবে ১৯৬৬ সালের পর তাঁহার প্রভাব হ্রাস পায়। তবুও কিন্তু শাসন বিভাগের বিরুদ্ধে মন্তব্য করিতে দ্বিধা করেন নাই। ১৯৬৪ সালে তিনি সুস্পষ্টভাবেই সতর্ক করিয়া দেন যে জনগণের পক্ষে দুর্বল ও অক্ষম শাসনযন্ত্রকে সহ্য করিবার ধৈর্য অপরিসীম নয়।

(৪) জাকির হুসেন ও শ্রীমতী গান্ধী : রাধাকৃষ্ণানের পরে ১৯৬৭ সালে রাষ্ট্রপতিপদে আসীন হন জাকির হুসেন। তিনি ইন্দিরা গান্ধীর অনুমোদনক্রমেই রাষ্ট্রপতি হন। রাষ্ট্রপতি হিসাবে তিনি তেমন প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই, এবং ফলে প্রধান মন্ত্রীই ছিলেন সর্বেসর্বা।

(৫) ভি. ভি. গিরি ও শ্রীমতী গান্ধী : ইহার পর ভি. ভি. গিরি রাষ্ট্রপতিপদে (১৯৬৯ সালে) নির্বাচিত হন। এ নির্বাচনেও শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সমর্থন ছিল ও কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রীসঞ্জীব রেড্ডীকে পরাজিত করিয়াই তিনি নির্বাচনে জয়ী হন। বলা যাইতে পারে, গিরির সফলতা প্রকৃতপক্ষে প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীরই জয়। গিরি মোটামুটিভাবে শাসনতান্ত্রিক প্রধান (constitutional head) হিসাবে কাজ করিলেও অনেক ক্ষেত্রেই তিনি নিজস্ব মতামত প্রকাশ্যে ব্যক্ত করিয়াছেন ও অনেক বিষয় সম্পর্কে প্রধান মন্ত্রীর উপর চাপ সৃষ্টি করিয়াছেন।

যেমন, ১৯৭৩ সালে লক্ষ্ণৌতে গান্ধীভবন উদ্বোধন প্রসংগে উক্তি করেন যে কুশাসন (maladministration), চোরাকারবার ও বিবেকহীন ব্যক্তিদের মুনাফা-শিকার প্রভৃতির ফলে দেশ পংগু হইয়া পড়িয়াছে। ইহার জন্য তিনি কংগ্রেসকেই দায়ী করেন। এমন কি তিনি উক্তি করেন যে প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা সরকার -সম্পর্কে কোন উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে নাই। ১৯৭৪ সালে রেল-ধর্মঘট প্রসংগে তিনি ধর্মঘটীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং তাহাদের প্রতি সুবিচার করিবার জন্য প্রধান মন্ত্রীর উপর চাপ দেন।

তবে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা সম্বন্ধে গিরি একথা স্বীকার করেন যে, কোন বিষয় সম্বন্ধে তিনি প্রধান মন্ত্রী বা মন্ত্রি-পরিষদের সহিত তর্কবিতর্ক করিতে পারেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতিকে প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইবে।

(৬) ফকরুদ্দীন আলি আমেদ ও শ্রীমতী গান্ধী : ইহার পর রাষ্ট্রপতি হিসাবে আসেন ফকরুদ্দিন আলি আমেদ। তিনি আগাগোড়াই শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে সমর্থন জানাইয়া গিয়াছেন।

(৭) সঞ্জীব রেড্ডী এবং ইন্দিরা গান্ধী ও জনতা দল . রাষ্ট্রপতি সঞ্জীব রেড্ডী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ ছিলেন। তাঁর নিজস্ব মতামতও ছিল। এই কারণেই অনেক সময় ইন্দিরা গান্ধীর সংগে মতানৈক্য হইতে দেখা যায়, তবে কোন সময়েই প্রকাশ্যে ইন্দিরাজীর সংগে তাঁহার বিবাদ বাধে নাই—শ্রী রেড্ডীর নিজের উক্তি : তিনি প্রধান মন্ত্রীর সংগে বিবাদে লিপ্ত হইতে চান নাই, যদিও প্রধান মন্ত্রীর নিকট হইতে অনেক সময়ই মর্যাদার পরিবর্তে উপেক্ষাই পাইয়াছিলেন। শ্রী রেড্ডী জনতা আমলেও নিজস্ব মতামত অনুযায়ী কার্য করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

(৮) জৈল সিং এবং ইন্দিরা গান্ধী ও রাজীব গান্ধী : সঞ্জীব রেড্ডীর পর রাষ্ট্রপতিপদে অধিষ্ঠিত হন জ্ঞানী জৈল সিং। বলা যায়, জৈল সিং-এর নির্বাচন ছিল একপ্রকার ইন্দিরা গান্ধীর মনোনয়নেরই ফল। জৈল সিং-এর সংগে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ইন্দিরা গান্ধীর সম্পর্ক মোটামুটি ভালই ছিল, এবং জ্ঞানীজী শ্রীমতী গান্ধীর পরামর্শ অনুযায়ীই কার্য সম্পাদন করিতেন। শ্রীজৈল সিং-এর কার্যকালের শেষার্ধ শ্রীরাজীব গান্ধীর কার্যকালের প্রথমার্ধের সমকালীন। প্রথমে উভয়ের মধ্যে অন্তত আপাতদৃষ্ট সৌহার্দ্যই ছিল। ইহা সত্য যে মোটামুটি জৈল সিং-এর জন্যই শ্রীগান্ধী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সরাসরি

প্রধান মন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করিয়াছিলেন। (কোন প্রধান মন্ত্রীর মৃত্যু হইলে প্রবীণতম মন্ত্রীকে অস্থায়ীভাবে প্রধান মন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করাই রীতি, এবং ইন্দিরা গান্ধীর হত্যার সময় শ্রীরাজীব গান্ধী মন্ত্রীও ছিলেন না।) পরে ঐ সম্পর্ক চিড় খাইতে শুরু করে, এবং তিক্ততা—বিরোধে পরিণত হয়। ইহার ফলে **সাংবিধানিক সংকট** ঘনীভূত হইয়া উঠে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য জৈল সিং মর্যাদার সহিত বিরোধক্ষেত্র হইতে সরিয়া দাঁড়ান, এবং পরবর্তী রাষ্ট্রপতি শ্রী:বেংকটরমন সহজে নির্বাচিত হইলে রাষ্ট্রপতি ও প্রধান মন্ত্রীর মধ্যে দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে।

রাষ্ট্রপতি ও নিয়মতান্ত্রিকতা—মূল্যায়ন : উপরের আলোচনা হইতে দেখা যায়, প্রধান মন্ত্রী প্রকৃত শাসক হইলেও রাষ্ট্রপতি তাঁহার উপর প্রভাব বিস্তার ও চাপ সৃষ্টি করিতে পারেন। রাজেন্দ্রপ্রসাদ, রাধাকৃষ্ণান, ভি. ভি. গিরি ও জৈল সিং এর কার্য-কালের সময় অল্পবিস্তর ইহাই ঘটিয়াছিল। ইহাও উল্লেখ করিতে হয় যে বিশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপতি প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হইয়া উঠিতে পারেন—প্রধান মন্ত্রীর নিয়োগ, লোকসভা ভাঙিয়া দেওয়া, প্রধান মন্ত্রীকে পদচ্যুত করা প্রভৃতি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারেন। ১৯৭৯-৮০ সালের ঘটনাবলী ইহারই সাক্ষ্য। জনতা সরকারের পতনের পর রাষ্ট্রপতি সঞ্জীব রেড্ডী তাঁহার পছন্দাপছন্দ অনুসারে দেশাই ও চরণ সিং-এর মধ্যে চরণ সিং-কেই প্রধান মন্ত্রীরূপে বাছিয়া লন। আবার তিনি নিজের স্ববিবেকানুযায়ী লোকসভা ভাঙিয়া দেন এবং নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। বিরোধী পক্ষের নেতা জগজীবন রামকে ইচ্ছা করিয়াই বিকল্প সরকার গঠনের সুযোগ দেন নাই।[১]

সুতরাং বলা যাইতে পারে, বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রধান মন্ত্রীর পরিবর্তে রাষ্ট্রপতিই প্রকৃত শাসক হইয়া দাঁড়াইতে পারেন। যে-ক্ষেত্রে দলীয় কোন্দল, দলত্যাগ, দলীয় শৃংখলার অবনতি ঘটে সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিদের নিজস্ব ক্ষমতা প্রয়োগের পথ খুলিয়া যায়। যেমন ঘটিয়াছিল জনতা সরকারের ভাঙনের পর।

চ। সাধারণ নির্বাচন ও প্রধান মন্ত্রী : ইংল্যাণ্ডের মত ভারতেও সাধারণ নির্বাচনের সময় ও তারিখ প্রধানত প্রধান মন্ত্রীই স্থির করেন। অবশ্য তিনি অন্যান্য দলীয় নেতাদের সহিত পরামর্শ করিয়া থাকেন। এদিক হইতেই প্রধান মন্ত্রী দলীয় সদস্যের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকেন।

উপসংহার : প্রধান মন্ত্রীর ক্ষমতা নির্ধারক বিষয়সমূহ : উপরি-উক্ত বর্ণনা হইতে ইহা সহজেই বুঝা যাইবে যে প্রধান মন্ত্রীর ক্ষমতা ও দায়িত্ব অত্যন্ত ব্যাপক এবং তিনি বিশেষ মর্যাদা ভোগ করেন। তবে মনে রাখিতে হইবে, প্রধান মন্ত্রীর ক্ষমতা অনেক পরিমাণে নির্ভর করে যে ব্যক্তি প্রধান মন্ত্রীর পদ অলংকৃত করিবেন তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও গুণাগুণের উপর। নিজস্ব দক্ষতা, মন্ত্রি-পরিষদে সভাপতিত্ব করিবার এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যসম্পাদনের শক্তি, বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান, প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করিবার ক্ষমতা এবং অপর সকলের উপর কর্তৃত্ব করিবার ক্ষমতা ইত্যাদি গুণের তারতম্যের ফলে প্রধান মন্ত্রীর মর্যাদা ও প্রতিপত্তির

---

১. ১৭৮ পৃষ্ঠা দেখ।

তারতম্য হয়। ইহা ব্যতীত দল ও মন্ত্রি-পরিষদের সমর্থন, অন্যান্য মন্ত্রীর ব্যক্তিত্ব সংসদে দলের শক্তি ইত্যাদির উপরও প্রধান মন্ত্রীর ক্ষমতা অনেকখানি নির্ভর করে।

উপ-প্রধান মন্ত্রী (Deputy Prime Minister): ভারতীয় **সংবিধানে** কেন্দ্রের মন্ত্রি-পরিষদের ক্ষেত্রে মাত্র প্রধান মন্ত্রীর পদেরই ব্যবস্থা করা হইয়াছে—**উপ-প্রধান মন্ত্রীর পদের কোন উল্লেখ নাই।** তবুও কিন্তু কয়েকবার কয়েকজন কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট মন্ত্রীকে 'উপ-প্রধান মন্ত্রী' আখ্যা দেওয়া হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় উপ-প্রধান মন্ত্রী ছিলেন স্বর্গত সর্দার প্যাটেল এবং প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই। ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে শ্রীদেশাই-এর পদত্যাগের পর প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আর কাহাকেও উপ-প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করেন নাই। জনতা সরকারেও প্রথমে এই পদ ছিল না। তবে শ্রীচরণ সিংকে দ্বিতীয়বার মন্ত্রি-পরিষদে গ্রহণ করা হইলে তাঁহাকে উপ-প্রধান মন্ত্রীর পদ দেওয়া হয়। সংগে সংগে শ্রীজগজীবন রামকেও ঐ পদে উন্নীত করা হয়। শ্রীচরণ সিং-এর তদারকি সরকারে উপ-প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হন শ্রীচ্যবন। উপ প্রধান মন্ত্রীর পদের কোন সাংবিধানিক তাৎপর্য না থাকিলেও ক্যাবিনেটে তাঁহার স্থান হইল প্রধান মন্ত্রীর পরই।

১৫. ভারতে ক্যাবিনেট শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত করা কি সমীচীন? (Should Cabinet Government be replaced by Presidential Government in India): ভারতের পক্ষে ক্যাবিনেট শাসন-ব্যবস্থা, না রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসন-ব্যবস্থা কাম্য—ইহা লইয়া সম্প্রতি বেশ কিছুটা বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছিল। বিতর্কের মূলে ছিল ১৯৭৯ সালের রাজনৈতিক ঘটনাবলী, স্থায়ী সরকারের অনস্তিত্ব এবং মন্ত্রি-পরিষদের ওলটপালট। এই পরিস্থিতিতে অনেকে ক্যাবিনেট ব্যবস্থা সম্পর্কে সন্দিহান হইয়া রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের সপক্ষে অভিমত প্রব করিতে থাকেন।

১৫.১. গণ-পরিষদে বিতর্ক: সরকারের রূপ কি হইবে না হইবে তাহা লইয়া গণ-পরিষদে সবিশেষ আলোচনা হয়—সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসন-ব্যবস্থার গুণাগুণ বিচার করা হয়। অধ্যাপক কে. টি. শাহের (K. T. Shah) মত এক দল সদস্য রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার প্রবর্তনের সুপারিশ করেন। এই সুপারিশের সপক্ষে দুইটি যুক্তি দেখানো হয়।

১৫.২. রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের সপক্ষে যুক্তি: (ক) রাষ্ট্রপতি জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন—ইহাই গণতন্ত্রের দ্যোতক। (খ) ভারতে স্থায়ী সরকার প্রবর্তিত করা প্রয়োজন। এদিক দিয়া রাষ্ট্রপতি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাচিত হইলে সরকারের স্থায়িত্ব সুনিশ্চিত করা যাইবে।

এই সকল যুক্তি গ্রহণ না করিয়া অধিকাংশ সদস্যই ক্যাবিনেট শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের দিকে ঝুঁকেন। বি. এন. রাউ, খসড়া রচনা কমিটির সদস্যরা—নেহরু প্যাটেল মুন্সী প্রভৃতি সকলেই ক্যাবিনেট সরকার প্রবর্তনের সপক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন।

১৫.৩. ক্যাবিনেট ব্যবস্থার সপক্ষে যুক্তি: ইহার স্বপক্ষে যে-সকল যুক্তি দেখান হয় তাহা ছিল এইরূপ: (ক) ব্রিটিশ ধরনের ক্যাবিনেট ব্যবস্থার একটি সুবিধা হইল যে ইহা শক্তিশালী এবং একই সংগে পরিবর্তনশীল (flexible) শাসন বিভাগের ব্যবস্থা করে। ক্যাবিনেট আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দ্বারা সমর্থিত হয় বলিয়া ইহার ক্ষমতা জনগণের প্রতিনিধিদের দ্বারা সমর্থিত। রাষ্ট্রপতি এই ক্যাবিনেটের পরামর্শ দ্বারা পরিচালিত হইবেন। আবার নিম্নকক্ষের আস্থা হারাইলে এই মন্ত্রি-পরিষদকে পদত্যাগ করিতে হয়। মন্ত্রি-পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ব্যাপক থাকিলে প্রধান মন্ত্রী-সহ মন্ত্রি-পরিষদের ব্যাপক আইনগত, শাসন বিভাগীয় ও আর্থিক ক্ষমতা থাকে। ইহা গণতন্ত্রসম্মত এই কারণে যে ক্যাবিনেটকে আইনসভার জনপ্রতিনিধি সমন্বিত নিম্নকক্ষের নিকট যৌথভাবে দায়ী থাকে।

(খ) রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের কতকগুলি অসুবিধা রহিয়াছে। রাষ্ট্রপতি ও আইনসভার মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকে না—এমনকি দু'য়ের মধ্যে বিরোধও বাধিতে পারে। আবার ভাগ-বাঁটোয়ারার ব্যবস্থাও উদ্ভূত হইতে পারে। ভারতের মত নূতন গণতন্ত্রে এই যোগাযোগের অভাব, বিরোধের সম্ভাবনা মংগলজনক হইবে না।[১]

তৃতীয়ত, বলা হয় যে ভারত ক্যাবিনেট শাসন-ব্যবস্থার সহিত বহুদিন হইতে পরিচিত। সুতরাং এই ক্যাবিনেট শাসন-ব্যবস্থাই গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত।

(ঘ) বর্তমানের একটি যুক্তি: এই সকল যুক্তি ছাড়া বর্তমানে অনেকে মনে করেন যে রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার প্রবর্তিত করা হইলে **নায়কতন্ত্রের উদ্ভবের সম্ভাবনা** রহিয়াছে। কারণ, রাষ্ট্রপতির হস্তে ব্যাপক ক্ষমতা পুঞ্জীভূত হইবে। ভারতে জনমতও খুব সতর্ক ও বলিষ্ঠ নয় যাহার ফলে ক্ষমতার অপব্যবহারকে প্রতিরোধ করিতে পারিবে।

এই সকল যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে ক্যাবিনেট শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত করা সমীচীন নহে বলিয়াই মনে হয়।

১৯৭৯ সালের ঘটনাবলী হইতে দেখা গিয়াছে যে ক্যাবিনেট ব্যবস্থার মধ্যে থাকিয়াই রাষ্ট্রপতি অনেকাংশে হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন প্রকৃত শাসক (১৬৭-৭২ পৃষ্ঠা)। ইহার উপর যদি রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার প্রবর্তন করা হয় তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি নায়কতন্ত্রের দিকে ঝুঁকিবেন। ইহার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা যাইবে না।

উপসংহার: প্রখ্যাত শাসনতন্ত্রবিদ মি. এম. ভি. পাইলী মন্তব্য করেন যে **সংশোধন-সাপেক্ষে** বর্তমানের সংসদীয় শাসন-ব্যবস্থাকেই চালু রাখা সমীচীন।[২]

---

১. "There are obvious difficulties in the way of working the Presidential system. Unless there is some kind of close union between the Legislature and the Executive it is sure to result in *a spoils system*...Parliament may take one line of action and the Executive may take another line of action. An infant democracy cannot afford, under modern conditions, to take the risk of a perpetual cleavage, feud or conflict between the Legislature and the Executive." Allaci Krishnaswami Aiyer.

২. "...it would be prudent to continue with the parliamentary system *with such modifications* as are necessary to ensure stability." M. V. Pylee: *Crisis Conscience and the Constitution*

অন্যান্য লেখক আছেন তাঁহারা মি. এম ভি পাইলার উপরি-উক্ত বক্তব্যের সহিত সম্পূর্ণ একমত নন। ইঁহাদের অভিমত হইল যে সংসদীয় সরকার সফলতার সহিত কার্যকর করিতে হইলে কতকগুলি সর্ত পূরিত হওয়া প্রয়োজন: (ক) যথাযথ আর্থিক সামাজিক ও মানসিক অবস্থা থাকা প্রয়োজন। যেমন দেশের লোকের মধ্যে সহিষ্ণুতা ও বুঝাপড়ার মনোভাব এবং সমাজের মূল বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ঐক্যমত থাকিতে হইবে। যে দেশে একদিকে মুষ্টিমেয়ের হাতে সম্পদ পুঞ্জীভূত এবং অপরদিকে অধিকাংশ লোক দারিদ্র্যক্লিষ্ট সে দেশে লোকের মধ্যে সমাজ-ব্যবস্থা সম্পর্কে ঐক্যবোধ থাকিতে পারে না। (খ) ইহা ছাড়া রহিয়াছে সাম্প্রদায়িকতা আঞ্চলিকতা বর্ণভেদ প্রভৃতি। ইহার ফলে বিচ্ছিন্নতার ভাব প্রসারিত হইতেছে এবং বিভিন্ন স্বার্থের ভিত্তিতে বিভিন্ন দলীয় চক্র সৃষ্ট হইয়া চলিয়াছে।

একটি সংশয় ও অভিমত: সংসদীয় সরকারের সাফল্যের অন্যতম সর্ত হইল দ্বিদলীয় ব্যবস্থা। যাই বলা হোক না কেন, ভারতের দলীয় ব্যবস্থার গতি হইল বহুদলীয় ব্যবস্থার দিকে। এই অবস্থায় সংসদীয় গণতন্ত্র টিকিয়া থাকিবে কি না, সে-সম্বন্ধেই সংশয় জাগিয়াছে। সুতরাং উহার সংশোধনের প্রস্তাব হইয়া পড়িয়াছে অগৌণ।

'When we made our constitution, it was not after the American model. It was rightly or wrongly, after the British model, with some variations of course, because the U. K is small, little island with a unitary government while we are a huge country which necessarily has to be a federation, and differences creep up."

Jawaharlal Nehru

স্মর্তব্য

১ কেন্দ্রে সংসদীয় না ক্যাবিনেট শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত

২. রাষ্ট্রপতি মূলত নিয়মতান্ত্রিক শাসকপ্রধান কিন্তু বিশেষ অবস্থায় বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হইতে পারেন।

৩ আইনত অবশ্য প্রভূত ক্ষমতা তাঁহার হস্তে ন্যস্ত যাহা সম্পাদিত হয় মন্ত্রি-পরিষদের পরামর্শক্রমে।

৪. মন্ত্রি-পরিষদই প্রকৃত শাসকগোষ্ঠী।

৫. মন্ত্রি-পরিষদের নেতা প্রধান মন্ত্রীই প্রকৃত শাসকপ্রধান।

৬ অন্যান্য দেশের সংসদীয় শাসন-ব্যবস্থার মত ভারতেও শাসন বিভাগের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তবে ক্যাবিনেট নায়কতন্ত্রের উদ্ভব এখনও ঘটে নাই।

৭. রাষ্ট্রপতি ও প্রধান মন্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কের সমীকরণ সাধারণতান্ত্রিক ভারতের শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাসের এমন একটি অধ্যায় যাহা বিশ্লেষণের দাবি রাখে।

অনুশীলনী

1. How is the President of India elected? How can he be removed?

(C. U. 1987)

[ভারতের রাষ্ট্রপতি কিভাবে নির্বাচিত হন? তাঁহাকে অপসারণই বা করা যায় কিরূপে]

(১৪২-৪৪ এবং ১৪৬ পৃষ্ঠা)

2. Examine: "The President is a Constitutional symbol without any substance of power" (C. U. 1962, '85)

[রাষ্ট্রপতি প্রকৃত ক্ষমতাবিহীন অন্যতম শাসনতান্ত্রিক প্রতীক মাত্র। উক্তিটির পর্যালোচনা করিয়া উহার সত্যাসত্য নির্ণয় কর।] (১৪১, ১৫৫-৬০, ১৬৫-৬৭ পৃষ্ঠা)

3. Discuss the position of the President of India in relation to his Council of Ministers. (N. B. U. (Hons.), 1985; C. U. 1975)

[তাঁহার মন্ত্রি-পরিষদের সহিত সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদার পর্যালোচনা কর।

(১৪১, ১৫৫-৬০ এবং ১৬৫-৬৭ পৃষ্ঠা)

4. Discuss the powers of the Indian President over legislation. (C. U. 1974)

[ভারতের রাষ্ট্রপতির আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতার পর্যালোচনা কর।] (১৪১, ১৫০-৫৩ পৃষ্ঠা)

5. Write a note on the Vice-President of India. (B. U. 1966, '85)

[ভারতের উপরাষ্ট্রপতির উপর একটি টীকা রচনা কর।] (১৪১, ১৪৭-৪৯ পৃষ্ঠা)

6. Discuss the relations between the Union Council of Ministers and the Union Parliament. (C. U. 1969, '71)

[ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রি-পরিষদের সহিত ইউনিয়ন আইনসভার সম্পর্ক বর্ণনা কর।]

(১৭২-৭৬ পৃষ্ঠা)

7. Discuss the position and powers of the Prime Minister of India.

(C. U 1985; B. U 1985; N. B U. 1985; N. B. U. (Hons.) 1983)

[ভারতের প্রধান মন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদমর্যাদার পর্যালোচনা কর।] (১৭৯, ১৮০-৮৪, ১৮৬-৮৭ পৃষ্ঠা)

8. Should India replace the present Parliamentary Form of Government by Presidential of the American variety?

[ভারতে কি বর্তমান সংসদীয় (মন্ত্রি-পরিষদ শাসিত) সরকারের পরিবর্তে মার্কিন ধরনের রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার প্রবর্তন করা সমীচীন?] (১৮৭-৮৯ পৃষ্ঠা)

১২ | সংবিধানের জরুরী অবস্থাদি সংক্রান্ত ব্যবস্থা (EMERGENCY PROVISIONS OF THE CONSTITUTION)

"*Emergency does not create power. Emergency does not increase granted power or diminish the restrictions imposed upon power granted or reserved...*"

U S Supreme Court in 1934

১. তিন প্রকার জরুরী অবস্থা (Three Types of Emergency Provisions) : সাধারণত রাষ্ট্রপতির জরুরী অবস্থাদি সংক্রান্ত যে-সকল ক্ষমতার উল্লেখ করা হয়, **সংবিধানে** তাহাদিগকে **জরুরী অবস্থাদি সংক্রান্ত ব্যবস্থা** (*emergency provisions*) বলিয়াই অভিহিত করা হয়। দেখা যায়, সংবিধান তিন প্রকার জরুরী অবস্থার আশংকা করিয়া রাষ্ট্রপতির হস্তে তিন শ্রেণীর জরুরী অবস্থা ঘোষণার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে: (ক) জরুরী বা আপৎকালীন অবস্থার ঘোষণা (Proclamation of Emergency), (খ) রাজ্যে শাসন-ব্যবস্থার অচলাবস্থাসংক্রান্ত ঘোষণা (Proclamation in case of Failure of Constitutional Machinery in a State); এবং (গ) আর্থিক সংকটাবস্থার ঘোষণা (Proclamation of Financial Emergency)।

ক। জরুরী বা আপৎকালীন অবস্থার ঘোষণা : জরুরী বা আপৎকালীন অবস্থা ঘোষণার ব্যবস্থা করা হইয়াছে সংবিধানের **৩৫২ অনুচ্ছেদ** দ্বারা।

মূল ব্যবস্থা: মূল ব্যবস্থা ছিল এইরূপ: যদি **রাষ্ট্রপতির প্রতীতি** হয় যে, (১) যুদ্ধ অথবা, (২) বহিরাক্রমণ অথবা (৩) সশস্ত্র অভ্যুত্থানের ফলে এমন গুরুতর জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, যাহার ফলে ভারত কিংবা ভারতের কোন অংশের নিরাপত্তা বিপন্ন হইয়াছে তাহা হইলে তিনি ঐ মর্মে সমগ্র ভারতের জন্য আপৎকালীন অবস্থার ঘোষণা করিতে পারেন। তবে এই ঘোষণা ক্যাবিনেটের লিখিত অনুমতি ব্যতীত করা যায় না।

পরবর্তীকালে পরিবর্তন : ১৯৭৬ সালের ৪২তম সংশোধনে বলা হইয়াছিল যে রাষ্ট্রপতি প্রয়োজনবোধে **ভারতীয় ভূখণ্ডের যে-কোন অংশের জন্য** সীমাবদ্ধভাবে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিতে পারেন।

এ-ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির প্রতীতিই শেষ কথা এবং কোন আদালতে এ-বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা যাইবে না।

পরিবর্তন বাতিল : ৪৪তম সংশোধন দ্বারা এই ব্যবস্থাকে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

সুতরাং বৈধতা বিচারের ক্ষমতা আদালতের আছে।

এইরূপ আপৎকালীন অবস্থার ঘোষণা তিনি যুদ্ধ কিংবা বহিরাক্রমণ কিংবা সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটিবার পূর্বেই করিতে পারেন, যদি তিনি মনে করেন যে উহার আশংকা আছে এবং ঐ আশংকা আসন্ন।

ক. ১. মেয়াদ: এইরূপ আপৎকালীন অবস্থার ঘোষণাকে সংসদের প্রত্যেক পরিষদের নিকট উপস্থাপিত করিতে হয়। সংসদের উভয় পরিষদের সমর্থন না থাকিলে উহা এক মাসের অধিককাল বলবৎ থাকে না। যে-ক্ষেত্রে ঘোষণাকে দুই পরিষদ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া সমর্থন করে সে-ক্ষেত্রে উহা এক মাসের অধিক এবং **এক এক বারে ৬ মাস** করিয়া বলবৎ থাকে। কিন্তু সর্বাধিক কতদিন পর্যন্ত তাহা সংবিধানে বলা হয় নাই।

ক. ২. ঘোষণার ফলে শাসন-ব্যবস্থার সম্ভাব্য পরিবর্তন: জরুরী অবস্থার ঘোষণার ফল বিশেষ ব্যাপক হইতে পারে: (ক) আপৎকালীন অবস্থার ঘোষণা বলবৎ থাকাকালীন কেন্দ্রীয় সরকার যে-কোন **রাজ্যকে নির্দেশ** প্রদান করিতে পারে যে উক্ত রাজ্যের শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা কিভাবে প্রয়োগ করিতে হইলে। (খ) আপৎকালীন অবস্থার ঘোষণা বলবৎ থাকাকালীন **লোকসভার** নির্দিষ্ট **মেয়াদ ৫** বৎসরকে এক একবারে এক বৎসর বাড়াইয়া লওয়া যাইতে পারে এবং (গ) সংসদ রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত যে-কোন বিষয় সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করিতে সমর্থ হইতে পারে। (ঘ) ইউনিয়ন এবং রাজ্যগুলির মধ্যে যে **রাজস্ব বণ্টন-ব্যবস্থা** আছে রাষ্ট্রপতি আদেশ দ্বারা তাহার পরিবর্তন বা ব্যতিক্রম করিতে পারেন। অবশ্য এইরূপ আদেশকে যথাসম্ভব শীঘ্র সংসদের উভয় কক্ষের নিকট উপস্থিত করিতে হয়। (ঙ) আপৎকালীন অবস্থার ঘোষণা চালু থাকাকালীন মৌলিক অধিকারগুলিতেও হস্তক্ষেপ করিতে পারা যায়। ৩৫৮ অনুচ্ছেদবলে সরকার ১৯ অনুচ্ছেদে বর্ণিত বাক্যের স্বাধীনতা, সমবেত হইবার অধিকার ইত্যাদি মৌলিক অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করিতে পারে। অবশ্য আপৎকালীন অবস্থা অবসানের সংগে সংগেই রাষ্ট্রের এই ক্ষমতারও অবসান ঘটে। তবে সংবিধানে সুস্পষ্টভাবেই বলা হইয়াছে যে আপৎকালীন ঘোষণা বলবৎ থাকাকালীন রাষ্ট্র **১৯ অনুচ্ছেদকে[১] লংঘন** করিয়া যে-সকল কাজকর্ম করিবে আপৎকালীন অবস্থার অবসানের পর উহাদের বিরুদ্ধে বৈধতার প্রশ্ন তোলা যাইবে না। অর্থাৎ, সংবিধানের ১৯ অনুচ্ছেদ-বিরোধী কোন আইন বা রাষ্ট্রকার্যের বিরুদ্ধে আদালতে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইবে না।[২] ইহা ছাড়া অন্যান্য অধিকার বলবৎকরণ নিষিদ্ধ করা যায়।

সংবিধানের ৩৫৯(১) অনুচ্ছেদবলে রাষ্ট্রপতি আদেশ প্রদান করিয়া ঐ আদেশে বর্ণিত মৌলিক অধিকারসমূহকে আদালতের মারফত বলবৎ করিবার অধিকারকে অকার্যকর করিয়া রাখিতে পারেন।

১. মৌলিক অধিকারের অধ্যায়ে স্বাধীনতা সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ
২. *Makhan Singh v. State of Punjab* (1964)

এই প্রকারের আদেশকেও পার্লামেন্টের প্রত্যেকটি কক্ষের নিকট যথাসম্ভব শীঘ্র উপস্থিত করিতে হয়।

ক. ৩. এ-পর্যন্ত (অক্টোবর, '৮৭) তিনবার এইরূপ জরুরী বা আপৎকালীন অবস্থার ঘোষণা করা হইয়াছে।

(ক) **প্রথম ঘোষণা** করা হয় চীনের সহিত সীমান্ত সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬২ সালের ২৬শে অক্টোবর তারিখে এবং ১৯৬৮ সালের ১০ই জানুয়ারী পর্যন্ত উহা বলবৎ থাকে। ১৯৬২ সালে জরুরী অবস্থার ঘোষণার অব্যবহিত পরেই রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ৩৫৯ (১) অনুচ্ছেদবলে আদেশ (Orders) জারি করিয়া ১৪ অনুচ্ছেদে বর্ণিত 'আইনের সমতার অধিকার' (equality before the law) এবং ২১ ও ২২ অনুচ্ছেদে বর্ণিত ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকারকে বলবৎ করার জন্য আদালতের আশ্রয় লওয়ার যে অধিকার সংবিধানে প্রদত্ত হইয়াছে তাহাকে অকার্যকর বলিয়া ঘোষণা করেন। এই আদেশ প্রবর্তনের পর বহু ব্যক্তিকে ইহার কিছু পূর্বে প্রণীত ভারতের প্রতিরক্ষা আইনে (Defence of India Act, 1962) গ্রেপ্তার ও আটক করা হয়। ইহার ফলে রাষ্ট্রপতির জরুরী অবস্থাকালীন ক্ষমতার তাৎপর্য ও ব্যাপকতা সম্পর্কে বিতর্কের সৃষ্টি হয়।

(খ) **দ্বিতীয় ঘোষণা** করা হয় ১৯৭১ সালের ৩রা ডিসেম্বর তারিখে পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলে।

মিসা. ইহার পরই ১৯৭১ সালের প্রতিরক্ষা আইন প্রবর্তিত হয় এবং 'মিসায়' (The Maintenance of Internal Security Act, 1971) অনেককে আটক করা হয়। মিসায় আটক ব্যক্তিদের মধ্যে অনেককে আদালত ছাড়িয়া দেওয়ার ফলে ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বরে রাষ্ট্রপতি এক আদেশ (Order) জারি করিয়া সংবিধানের ১৪, ২১ এবং ২২ অনুচ্ছেদে বর্ণিত অধিকারসমূহকে বলবৎ করার জন্য আদালতের আশ্রয় লওয়ার অধিকারকে অকার্যকর বলিয়া ঘোষণা করেন।

(গ) **তৃতীয় ঘোষণা** করা হয় ১৯৭৫ সালের জুন মাসে। ই ঘোষণার **প্রকৃতি ছিল দ্বৈত**—ইহা আভ্যন্তরীণ গোলযোগ এবং বহিরাক্রমণের আশংকা উভয়ের বিরুদ্ধে ঘোষিত হইয়াছিল। আভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা প্রত্যাহৃত হয় ১৯৭৭ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখের মধ্যরাত্রে এবং বহিরাক্রমণ সংক্রান্ত জরুরী অবস্থা প্রত্যাহৃত হয় উহার ৭ দিন পরে। কিছুদিন পূর্বে (১৯৮০ সাল) আবার জাতীয় নিরাপত্তা আইন (The National Security Act) পাস করা হইয়াছে।

ক. ৪. ৪৪তম সংশোধন দ্বারা পরিবর্তন: উল্লেখ করা যায়, ১৯৭৮ সালের ৪৪তম সংশোধনে জরুরী অবস্থার ঘোষণা সম্পর্কে বিশেষ পরিবর্তন করা হইয়াছে। পরিবর্তনগুলি হইল: (১) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ব্যাহত করে এমন সশস্ত্র অভ্যুত্থান (armed rebellion) না ঘটিলে আভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা যাইবে না।[১]

১. শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ক্যাবিনেটের পরামর্শ ব্যতীতই 'আভ্যন্তরীণ গোলযোগের' আশংকার কারণে জরুরী অবস্থার ঘোষণা করিয়াছিলেন বলিয়া জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত ব্যবস্থার এইরূপ পরিবর্তনসাধন করা হইয়াছে।

(২) ক্যাবিনেটের নির্দিষ্ট লিখিত পরামর্শ ব্যতীত রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থার ঘোষণা করিতে পারিবেন না। (৩) জরুরী অবস্থার ঘোষণা এক মাসের মধ্যে সংসদে উপস্থিত করিতে হইবে এবং সংসদের অনুমোদনসাপেক্ষ প্রথমত ৬ মাসের জন্য বলবৎ থাকিবে। সংসদ দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে অনুমোদন করিলে ইহার মেয়াদ আরও বাড়ান যাইবে। (৪) জীবন ও স্বাধীনতার অধিকারকে আদালতের মাধ্যমে বলবৎকরণের অধিকার রাষ্ট্রপতি অকার্যকর করিতে পারিবেন না। (৫) জরুরী অবস্থার ঘোষণা সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বা আদালতের এক্তিয়ারের বহির্ভূত এই ব্যবস্থা ৪৪তম সংশোধনে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

খ। রাজ্যে শাসন-ব্যবস্থার অচলাবস্থাসংক্রান্ত ঘোষণা: সংবিধানের **৩৫৬ অনুচ্ছেদ** অনুসারে কোন রাজ্যের রাজ্যপালের নিকট হইতে সংবাদ পাইয়া অথবা অন্যভাবে রাষ্ট্রপতির যদি প্রতীতি হয় যে, এমন অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে যাহার ফলে শাসনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী ঐ রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালিত হওয়া সম্ভব নহে, তবে তিনি এই মর্মে ঘোষণা করিতে পারেন।

খ.১ ঘোষণার সম্ভাব্য ফল: এইরূপ ঘোষণার দ্বারা সংশ্লিষ্ট রাজ্য শাসনসংক্রান্ত সকল কার্য এবং রাজ্য বিধানমণ্ডল ও হাইকোর্ট ছাড়া রাজ্যপাল অথবা অন্য যে-কোন সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের সকল ক্ষমতা রাষ্ট্রপতি স্বহস্তে তুলিয়া লইতে পারেন। রাজ্য বিধানমণ্ডলের ক্ষমতাও তিনি সংসদের হস্তে ন্যস্ত করিতে পারেন। সংসদ আবার রাজ্য বিধানমণ্ডলের আইন প্রণয়নের ক্ষমতাকে রাষ্ট্রপতির হস্তে ন্যস্ত এবং তাঁহাকে ঐ ক্ষমতা অন্য কোন কর্তৃপক্ষকে প্রত্যর্পণ করিবার অধিকার প্রদান করিতে পারে। যখন লোকসভা অধিবেশনে থাকে না তখন রাষ্ট্রপতি সংসদের অনুমোদন-সাপেক্ষ **'ভারতের সঞ্চিত তহবিল'** (The Consolidated Fund of India) হইতে অর্থব্যয়ের অনুমতিও দিতে পারেন।

ঘোষণার উদ্দেশ্যসাধনের জন্য প্রয়োজন বা কাম্য মনে করিলে রাষ্ট্রপতি মহাধর্মাধিকরণ ছাড়া রাজ্যের যে-কোন সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ সংক্রান্ত শাসনতন্ত্রের বিধানসমূহকে সামগ্রিক বা আংশিকভাবে অকার্যকর করিয়া রাখিতে পারেন।

খ.২. মেয়াদ: রাজ্যের শাসনতন্ত্রের অচলাবস্থার ঘোষণাকে সংসদের প্রত্যেক কক্ষের সমক্ষে উপস্থাপিত করিতে হয় এবং ২ মাস পরে ইহা বাতিল হইবে যদি না ইতিমধ্যে সংসদ উহাকে অনুমোদন করে। তবে সংসদে উভয় পরিষদ যদি প্রস্তাব পাস করিয়া উহাকে অনুমোদন করে তাহা হইলে ঘোষণাটির মেয়াদ প্রত্যেকবার ৬ মাস করিয়া বাড়িয়া যাইবে এবং উহা সর্বাধিক এক বৎসর ধরিয়া চালু থাকিতে পারে। আবার **নির্বাচন কমিশন** যদি অভিমত প্রকাশ করে যে কোন রাজ্যে **নির্বাচন করার মত অবস্থা নাই** তাহা হইলে সংসদ প্রস্তাবের মাধ্যমে বরাংবার ঘোষণাটির মেয়াদ ৬ মাস করিয়া বাড়াইয়া রাষ্ট্রপতির **শাসনকে ৩ বৎসর পর্যন্ত চালু রাখিতে পারে।**[১] ১৯৭৮ সালের ৪৪তম সংশোধনে রাষ্ট্রপতির ঘোষণা সম্পর্কে

১ The Constitution (44th Amendment) Act, 1978

বিচারবিবেচনা করার **আদালতের ক্ষমতাকে পুনর্বহাল** করা হইয়াছে। পূর্বে ৩৮তম সংশোধন অনুসারে রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আদালতে কোন প্রশ্ন তোলা যাইত না।

এ পর্যন্ত বহুবার (২৫ বার) এবং বহুরাজ্যে (২২টি রাজ্য ও কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলে) শাসন-ব্যবস্থার অচলাবস্থা ঘোষণা করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে সর্বাধিক হইল কেরলে (৯ বার), এবং তারপর আছে পাঞ্জাব (৮ বার)। পশ্চিমবংগ ও ত্রিপুরার ঘোষণার সংখ্যা হইল যথাক্রমে ৪ ও ২।[১]

কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলে রাষ্ট্রপতির শাসন : কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলেও রাষ্ট্রপতির শাসন হইতে পারে। এই ব্যবস্থা চালু করা হয় সংবিধান বলে নয়, **কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলের শাসন-ব্যবস্থা আইন** (Government of Union Territories Act, 1963) অনুসারে।

কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলসমূহের মধ্যে এ-পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির শাসন সর্বাধিকবার ঘোষিত হয় পণ্ডিচেরিতে—৫ বার। তারপর আছে গোয়া, মিজোরাম ও অরুণাচলপ্রদেশ।[২] বর্তমানে অবশ্য শেষোক্ত তিনটি কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলই অংগরাজ্য।

৪. আর্থিক সংকটাবস্থার ঘোষণা : আর্থিক সংকটাবস্থার ঘোষণার ব্যবস্থা করা হইয়াছে **৩৬০ অনুচ্ছেদ** দ্বারা। যদি রাষ্ট্রপতির প্রতীতি হয় যে, এমন অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে যাহাতে ভারত কিংবা ভারতের কোন অংশের **আর্থিক স্থায়িত্ব** বা **সুনাম বিপন্ন** হইয়াছে তাহা হইলে তিনি সেই মর্মে ঘোষণা করিতে পারেন উল্লেখ্য, এ ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির প্রতীতিই (satisfaction) ছিল চূড়ান্ত এবং আদালতে কোন প্রশ্ন তোলা যাইত না।[৩]

৪৪তম সংশোধন দ্বারা এই অবস্থার অবসান করা হইয়াছে—অর্থাৎ রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত নয়।

৪.১ মেয়াদ ও ফল : এইরূপ ঘোষণাকে সংসদের প্রত্যেক কক্ষের সমক্ষে উপস্থিত করিতে হয় এবং ইহার মেয়াদ উপরি-উক্ত প্রথম প্রকারের ঘোষণার মেয়াদের অনুরূপ—প্রথমে ১ মাস এবং সংসদের উভয় কক্ষ দ্বারা সমর্থিত হইলে এক একবারে ৬ মাস করিয়া।

আর্থিক সংকটাবস্থার ঘোষণা বলবৎ থাকাকালীন কেন্দ্রীয় সরকার আর্থিক সমীচীনতার যে-সকল নীতি স্থির করিয়া দেয় তাহা পালনের জন্য ইহা যে-কোন অংগরাজ্যকে নির্দেশ দিতে পারে। ঘোষণা দ্বারা সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিগণ ছাড়া যে-কোন সরকারী কর্মচারীর বেতন ও ভাতা হ্রাস করা যাইতে পারে

১. ***President's Rule in the States and Union Territories*—Lok Sabha Secretariat, 1987**

২. ***Ibid***

৩. **The Constitution (38th Amendment) Act, 1975**

৪.২. **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুকরণ**: বলা হয়, এই আর্থিক সংকটাবস্থা ঘোষণার ক্ষমতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় **শিল্প-সংকটত্রাণ আইনের (National Industrial Recovery Act [NIRA], 1933) অনুকরণে** বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। বিগত তৃতীয় দশকের বিশ্বব্যাপী মন্দাবাজারের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন আর্থিক সংকটে পতিত হইয়াছিল তখন ইহার প্রতিবিধানমূলক ব্যবস্থা হিসাবে মার্কিন রাষ্ট্রপতিকে উক্ত আইন দ্বারা অর্থসম্বন্ধীয় ব্যাপক ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছিল। আমাদের দেশও যে অনুরূপ সংকটের কবলে পড়িতে পারে তাহা আশংকা করিয়াই আর্থিক সংকটাবস্থার ঘোষণার ক্ষমতা সংবিধানভুক্ত করা হইয়াছে। অনেকের অভিমত হইল যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উক্ত আইন এবং ভারতীয় সংবিধানের আর্থিক সংকটাবস্থাসংক্রান্ত ব্যবস্থা **তুলনীয় নয়**। কারণ ইউনিয়ন তালিকা, যুগ্ম তালিকা এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে কেন্দ্রের হস্তে যে ব্যাপক ক্ষমতা ন্যস্ত করা হইয়াছে তাহার মাধ্যমেই আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার উক্ত মার্কিন দেশের আইনের উদ্দেশ্য সাধন করিতে সমর্থ। এই সমালোচকদের প্রতিপাদ্য বিষয় হইল যে, ভারতীয় সংবিধানের আর্থিক সংকট সম্পর্কিত **ব্যবস্থার প্রকৃত উদ্দেশ্য** স্বাভাবিক অবস্থাতেও অংগরাজ্যের বাজেটের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের হস্তে রাখা।[১]

৫ জরুরী অবস্থাদি সংক্রান্ত ব্যবস্থার সমালোচনা (Criticism of the Emergency Provisions):

গণপরিষদে বিতর্কের সময় জরুরী অবস্থাসংক্রান্ত অধ্যায়ের তীব্র সমালোচনা করা হয়। অধ্যাপক কে. টি. সাহা উক্তি করেন, এই অধ্যায়ের বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে ভারতীয় সংবিধানে নামমাত্র স্বাধীনতা বা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীকামাথও আশংকা প্রকাশ করেন যে, সংবিধানের জরুরী অবস্থাসংক্রান্ত ব্যবস্থার ফলে ভারতে এক সর্বাত্মক পুলিসী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইবে।[২]

মোটামুটিভাবে, যে-সকল সমালোচনা করা হইয়াছে তাহা সংক্ষেপে হইল এইরূপ: প্রথমত, যে-সকল কারণ থাকিলে রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থাদির ঘোষণা করিতে সমর্থ, সেই সকল কারণের উদ্ভব হইয়াছে কি না, আদালত তাহার বিচার করিতে পারে না। ঐ কারণ সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি 'সন্তুষ্ট' থাকিলেই হইল।

(ক) স্বৈরাচারিতার সম্ভাবনা: যাঁহারা আদালতকে ব্যক্তি-স্বাধীনতার রক্ষাকবচ বলিয়া মনে করেন তাঁহাদের মতে, ইহার ফলে শাসন বিভাগের স্বৈরাচারী হইবার যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে। বর্তমানে অবশ্য ৪৪তম সংশোধন দ্বারা এই অবস্থার অবসান করা হইয়াছে—অর্থাৎ আদালত জরুরী অবস্থার যৌক্তিকতা বিচার করিয়া দেখিতে পারে।

১. Dr. K. V. Rao: *Parliamentary Democracy of India*

২. "I fear that by this single chapter we are seeking to lay the foundation of a totalitarian State, a police State, a State completely opposed to all the ideals and principles that we have held aloft during the last few decades." H. V. Kamath

(খ) প্রকারভেদবিহীন জরুরী অবস্থা: দ্বিতীয়ত, ভারতীয় সংবিধানে **যুদ্ধের সময় সংকটপূর্ণ সময়ের** আপৎকালীন অবস্থা ও **অন্য সময়ের** জরুরী অবস্থার মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় নাই। উভয় প্রকারের জরুরী অবস্থাতেই রাষ্ট্রপতি আদালতের মাধ্যমে মৌলিক অধিকার বলবৎ করিবার অধিকারকে অকার্যকর করিয়া রাখিতে পারেন, এবং সরকার সংবিধানের ১৯ অনুচ্ছেদে সংরক্ষিত বাক্য ও মতামতের স্বাধীনতা, সমবেত হইবার স্বাধীনতা ইত্যাদি ক্ষুণ্ণ করিতে পারে। অভিযোগ করা হইয়াছে, একবার প্রবর্তিত হইলে ভারতে জরুরী অবস্থার কোন পরিসমাপ্তির লক্ষণ দেখা যায় না এবং যে ক্ষমতা বিশেষ জরুরী অবস্থায় প্রযোজ্য তাহা অন্য ন্য শান্তিপূর্ণ অবস্থাতেও ব্যবহার করা হয়।[১] ১৯৭৫ সালে ঘোষিত জরুরী অবস্থাকে ইহার বিশেষ নজির হিসাবে দেখানো হয়। উহা ঘোষিত হয় ১৯৭৫ সালের জুন মাসে এবং প্রত্যাহৃত হয় ১৯৭৭ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখের মধ্যরাত্রে। (১৯৩ পৃষ্ঠা)

(গ) আইনসিদ্ধ করিবার সময়নির্দেশ নাই: তৃতীয়ত, সংবিধানে আপৎকালীন অবস্থার ঘোষণাকে সংসদের নিকট অতি সত্বর উপস্থাপনের নির্দেশ দেওয়া হয় নাই—সংসদের অনুমোদন ব্যতিরেকেও ঘোষণা ১ মাস পর্যন্ত অব্যাহতভাবে চলিতে পারে। মৌলিক অধিকার বলবৎকরণের অধিকার স্থগিত রাখিবার জন্য রাষ্ট্রপতির আদেশকেও সংসদের নিকট উপস্থাপিত করিবার সময় ধার্য করিয়া দেওয়া হয় নাই। শুধু বলা হইয়াছে, **যথাসম্ভব শীঘ্র** ঐরূপ আদেশকে পার্লামেন্টের নিকট উপস্থাপিত করিতে হইবে।

(ঘ) রাজ্যগুলির ভংগুর স্বাতন্ত্র্য: পরিশেষে, আশংকা করা হয় যে রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা ঘোষণার দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকারকে রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করিবার যে ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে রাজ্যসমূহের স্বাতন্ত্র্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে। যে-ক্ষেত্রে কেন্দ্রের সরকারী দলের সংগে কোন অংগরাজ্যের সরকারী দলের মতবিরোধ দেখা দিবে সে-ক্ষেত্রেই সম্ভাবনা থাকিবে ঘোষণার সাহায্যে উক্ত রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা কেন্দ্রের হস্তে তুলিয়া লইবার।

এ-আশংকা যে অমূলক নহে তাহা অনেকবারই প্রমাণিত হইয়াছে।[২]

(ঙ) আর্থিক বিষয়ে একাধিপত্য: ইহা ছাড়াও আশংকা করা হয় যে, কেন্দ্রীয় সরকার আর্থিক সংকটাবস্থার ঘোষণার সাহায্যে রাজ্যগুলির উপর আর্থিক বিষয়ে একাধিপত্য করিতে সমর্থ হইবে।

৫.১. সমালোচনার উত্তর: উপরি-উক্ত সমালোচনার উত্তর এইভাবে দেওয়া হয়: সংবিধান সংসদীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত করিয়াছে। এই শাসন-ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে কার্য করিবেন এবং মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুযায়ী তাঁহাকে

১. "In this country we have an un ..di.g emergency ... the emergency powers which are ment to be used under exceptional circumstances are being used under normal circumstances." Justice K. S. Hegde

২. কেরল, পাঞ্জাব, পশ্চিমবংগ প্রভৃতি ইহার সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত

ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে হইবে। সংবিধান অনুসারে মন্ত্রি-পরিষদ সংসদের জনপ্রিয় কক্ষ লোকসভার নিকট যৌথভাবে দায়িত্বশীল বলিয়া সরকারী স্বৈরাচারিতার অথবা ক্ষমতা অপপ্রয়োগের কোন অবকাশ বা আশংকা নাই। ইহা ছাড়া জরুরী ক্ষমতার সপক্ষে বলা হয় যে জাতীয় নিরাপত্তা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। এই নিরাপত্তা বহিরাক্রমণের ফলেও বিপন্ন হইতে পারে, আবার আভ্যন্তরীণ গোলযোগের জন্যও বিপন্ন হইতে পারে। সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাথমিক দায়িত্ব হইল জাতির নিরাপত্তা ও আইনশৃংখলা রক্ষার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করা।

শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা সম্পর্কে বলা হয়, রাজ্যগুলিতে নানা কারণে দায়িত্বশীল সরকার কার্য না করিতে পারে এবং স্থায়ী মন্ত্রিসভা গঠন করাও সম্ভবপর না হইতে পারে। এইরূপ অবস্থায় সাময়িকভাবে কেন্দ্রের পক্ষে হস্তক্ষেপ করা অনিবার্য হইয়া পড়ে। আবার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিলে দায়িত্বশীল সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার ব্যবস্থা করা হয়। গত কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দাবি করা হয় যে, সংবিধানে জরুরী অবস্থার ব্যবস্থা করিয়া সংবিধান-প্রণেতৃবর্গ দূরদর্শিতার পরিচয়ই দিয়াছেন।

৫.২. **উপসংহার**: তবুও বলা যায়, যে-ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকার হইতে ভিন্ন দলীয় এবং ভিন্ন মতাবলম্বী সে-ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের ব্যাপারে রাজ্যপালের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ করিবার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়।

৫.৩. **অচলাবস্থা ঘোষণার পরস্পরবিরোধী নীতি**: ইহার ফলে বিভিন্ন রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থার ঘোষণার ব্যাপারে পরস্পরবিরোধী নীতির প্রয়োগও দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন, ১৯৫৯ সালে **কেরলে** 'সুশাসনের জন্য' রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তন করা হইয়াছিল, কিন্তু পরবর্তী বৎসরে আসামে বাঙালী নির্যাতনের সময় উহা করা হয় নাই। আবার ১৯৬৫ সালে ঐ **কেরলেই** নির্বাচনের পর কোন দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ না করায় আইনসভাকে মিলিত হইবার সুযোগ না দিয়াই শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা ঘোষণা করা হইয়াছিল, কিন্তু চতুর্থ নির্বাচনের (১৯৬৭ সাল) পর **রাজস্থানে** কংগ্রেসী দলের নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকা সত্ত্বেও কংগ্রেসী দলের নেতা শ্রীমোহনলাল সুখাদিয়াকে মন্ত্রিসভা গঠনের ভার অর্পণ করা হইয়াছিল। ইহার ফলে রাজস্থানে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয় এবং ঐ রাজ্যে সাময়িকভাবে অচলাবস্থা ঘোষণা করা হয়। ঐ চতুর্থ নির্বাচনেরই পর হরিয়ানা রাজ্যের ক্ষেত্রে রাও বীরেন্দ্র সিং-এর নেতৃত্বে যে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয় তাহা ভাঙিয়া দিয়া রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হয় এই কারণ দর্শাইয়া যে দল ভাঙাভাঙির দরুন কোন স্থায়ী সরকার ঐ রাজ্যে গঠন সম্ভব নয়। রাও বীরেন্দ্র সিং-এর বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা নাই—এই দাবি কিন্তু করা হয় নাই। অভিযোগ ছিল যে কংগ্রেসের পক্ষে সরকার গঠন সম্ভব ছিল না বলিয়াই উক্ত পন্থা কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যপালের সহযোগে গ্রহণ করে।

এই প্রসংগে ১৯৭৭ সালে লোকসভার ষষ্ঠ নির্বাচনের পর উত্তর-ভারতের রাজ্যগুলির আইনসভা ভাঙিয়া দিয়া নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইবার পূর্বেই সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থার উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই ব্যবস্থা ঠিক শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থার দরুন

করা হয় নাই, করা হইয়াছিল এই সকল রাজ্যের কংগ্রেসী সরকার জনমতের সহিত সংযোগ হারাইয়া ফেলিয়াছিল—এই যুক্তিতে। ১৯৮০ সালের নির্বাচনে কেন্দ্রে কংগ্রেস (ই) ক্ষমতায় পুনরাধিষ্ঠিত হইলে আবার ইহা করা হইয়া ছল। সুপ্রীম কোর্ট অবশ্য এইভাবে কেন্দ্রের নূতন নির্বাচন ঘোষণার ক্ষমতা আছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছিল। তবুও বলা যায়, কেন্দ্রের এই ক্ষমতা প্রয়োগ শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা ঘোষণারই অন্যতম প্রকারভেদ।

পরিশেষে, ১৯৮৭ সালের মধ্যভাগে (১১ই মে) পাঞ্জাবে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তন করা হইয়াছিল এই যুক্তিতে যে প্রতিষ্ঠিত (বার্ণালা) সরকার উগ্রপন্থী দমনে বিশেষ উৎসুক বা তৎপর নহে। রাজ্যপাল শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় এই মর্মেই রিপোর্ট দিয়াছিলেন। কিন্তু রাজ্যপালের দায়িত্ব হইতেছে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের শাসনকার্য সংবিধান অনুযায়ী পরিচালিত না হইলে মাত্র তাহা জানানো—প্রতিষ্ঠিত সরকার কোন অলিখিত দায়িত্ব পালন করিতেছে কিনা, তাহা জানানো নয়। এই অবস্থায় পাঞ্জাবে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হয় কি করিয়া?[১]

"In a democratic State, the effective safeguard against abuse of executive powers, whether in peace or in emergency, is ultimately to be found in the existence of enlightened, vigilant and vocal public opinion." Justice Gajendragadkar

---

স্মর্তব্য

১. রাষ্ট্রপতির হস্তে ন্যস্ত জরুরী অবস্থাদি সংক্রান্ত ক্ষমতা বিশেষ ব্যাপক।

২. ইহা ব্যক্তি-স্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পরিপন্থী।

৩ তবে যৌক্তিকতা বিচারের ক্ষমতা আদালতের হাতে দিয়া কাঠিন্যের কিছুটা হ্রাস করা হইয়াছে।

অনুশীলনী

1. **Examine the emergency powers of the President of India.** (C. U. 1970, '86)
[ভারতের রাষ্ট্রপতির জরুরী অবস্থাদি সংক্রান্ত ক্ষমতার পর্যালোচনা কর।] (৯১-৯৯ পৃষ্ঠা)

2. **Describe the emergency provisions of the Indian Constitution.** (C. U. 1976)
[ভারতীয় সংবিধানে জরুরী অবস্থার জন্য যে-ব্যবস্থা আছে তাহা বর্ণনা কর।] (১১১-২৬ পৃষ্ঠা)

3. **Under what circumstances can the President of India declare (a) Proclamation of Emergency and (b) Emergency due to the failure of constitutional machinery in a State?** (C. U. 1974)
[কোন্ কোন্ অবস্থায় রাষ্ট্রপতি (ক) জরুরী বা আপৎকালীন অবস্থার ঘোষণা এবং (খ) রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থার দরুন জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিতে পারেন?] (১১১-১২, ১১৪-১৫ পৃষ্ঠা)

4. **How is the Emergency Provisions of the Indian Constitution change the Centre-State relations in the country?** (N. B. U. (Hons.), 1985)
[ভারতীয় সংবিধানে জরুরী অবস্থা সম্পর্কে ব্যবস্থাদি কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কে পরিবর্তন ঘটাইয়া থাকে?]
(১১১-১২ ১১৮-১৯ পৃষ্ঠা)

5. **Write a short note on Financial Emergency.** (C. U 1974)
[আর্থিক জরুরী অবস্থার উপর একটি টীকা রচনা কর।] (১১৫-১৬ পৃষ্ঠা)

---

১. রাজ্যপালের রিপোর্টের ভিত্তিতে পাঞ্জাবে রাষ্ট্রপতির শাসনের মেয়াদ আবার বাড়ানোও হয়। রিপোর্ট না কি ছিল উগ্রপন্থী দমনকার্য চলতেছে। সুতরাং রাজ্য এখনও জনপ্রিয় সরকার প্রবর্তনের উপযোগী নয়। ইহাকে বোধহয় রাজ্যে 'সাংবিধানিক ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়া' বলিয়া ধরা যায় না।

১৩

ভারতের এটর্নি-জেনারেল (THE ATTORNEY-GENERAL FOR INDIA)

"It shall be the duty of the Attorney-General to give advice to the Government of India upon such legal matters, and to perform such other duties of a legal character, as may from time to time be referred or assigned to him by the President...."
The Constitution of India

১. **পদাধিকারীর পরিচয়:** ভারত সরকারের **প্রধান আইনজ্ঞ কর্মচারীকে** বলা হয় এটর্নি-জেনারেল। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনেও এই পদটি ছিল এবং পদাধিকারীকে যুক্তরাষ্ট্রের **এ্যাড্‌ভোকেট-জেনারেল** (The Advocate-General for Federation) বলিয়া অভিহিত করা হইত।

১.১. **নিয়োগ, যোগ্যতা ও ভাতা:** বর্তমান সংবিধান অনুসারে এটর্নি-জেনারেল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। **সুপ্রীম কোর্টের বিচারক হইবার যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকেই** এটর্নি-জেনারেলের পদে নিয়োগ করা যায়। অন্যভাবে বলা যায়, কোন ব্যক্তি ভারতের নাগরিক না হইলে এবং অন্তত পাঁচ বৎসরকাল হাই-কোর্টের এ্যাড্‌ভোকেট না থাকিলে অথবা রাষ্ট্রপতির মতে **বিশিষ্ট আইনজ্ঞ** (distinguished jurist) না হইলে তিনি এটর্নি-জেনারেলের পদে নিয়োগের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না।[১] এটর্নি-জেনারেল তাঁহার পদে কতদিন অধিষ্ঠিত থাকিবেন বা না-থাকিবেন তাহা নির্ভর করে রাষ্ট্রপতির খুশির উপর।

কার্যকাল বা নিয়োগের ব্যাপারে বয়সের কোন বাধানিষেধ আরোপ করা হয় নাই এবং রাষ্ট্রপতিই এটর্নি-জেনারেলের বেতন বা পারিশ্রমিক ধার্য করেন।

কার্যাবলী: সংবিধানের নির্দেশ হইল: (১) রাষ্ট্রপতি যে-সকল আইনসংক্রান্ত বিষয় স্থির করিয়া দিবেন এটর্নি-জেনারেল সেই সকল বিষয় সম্পর্কেই ভারত সরকারকে পরামর্শ দিবেন এবং অন্যান্য আইনসংক্রান্ত কর্তব্য সম্পাদন করিবেন। (২) ইহা ছাড়া সংবিধান বা অন্য কোন আইন দ্বারা তাঁহার হস্তে যে-সমস্ত কর্তব্য ন্যস্ত হইয়াছে তাহাও সম্পাদন করিতে হয়। এটর্নি-জেনারেলের কার্যাদি সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি যে-সকল নিয়ম প্রবর্তন করিয়াছেন তাহাতে নিম্নলিখিত **কর্তব্যগুলি** তাঁহার হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে:

(১) ভারত সরকার যে-সকল আইনসংক্রান্ত বিষয় সম্পর্কে পরামর্শ চাহিয়া পাঠায় সেই সকল বিষয় সম্পর্কে তাঁহাকে পরামর্শ দিতে হয় এবং সেই সকল আইন-সংক্রান্ত কর্তব্য সম্পাদন করিতে হয় যাহা ভারত সরকার নির্দিষ্ট করিয়া দেয়। (২) সুপ্রীম

---

১. *Articles 76 (1) and 194 (3) of the Constitution of India*

কোর্টের নিকট যে-সকল মামলায় ভারত সরকার সংশ্লিষ্ট থাকে সেই সকল মামলায় এটর্নি-জেনারেলকে ভারত সরকারের পক্ষ সমর্থন করিয়া ওকালতি করিতে হয়। (৩) যে-ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি কোন আইন বা তথ্য ঘটিত প্রশ্ন সুপ্রীম কোর্টের নিকট অভিমতের জন্য প্রেরণ করেন সে-ক্ষেত্রে তিনি ভারত সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন। (৪) সংবিধানে বা অন্যান্য আইনে যে কার্য তাঁহার হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে তাহা এটর্নি-জেনারেলকে সম্পাদন করিতে হয়।

যাহাতে তাঁহার কর্তব্য যথাযথভাবে সম্পাদিত হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে সংবিধানে সুস্পষ্ট নির্দেশ রহিয়াছে যে ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের অন্তর্গত সকল আদালতে এটর্নি-জেনারেলের শ্রবণাধিকার (right to audience) থাকিবে। ইহা ব্যতীত সংবিধানের ৮৮ অনুচ্ছেদ অনুসারে তিনি সংসদের যে-কোন কক্ষে বা সংযুক্ত অধিবেশনে যোগদান বা বক্তব্য পেশ করিতে পারেন। কিন্তু তিনি সংসদের সদস্য নন বলিয়া কোন ভোটপ্রদান করিতে সমর্থ নন।

২. ইংল্যাণ্ডের এটর্নি-জেনারেলের সহিত তুলনা: ভারতের মত ইংল্যাণ্ডেও এটর্নি-জেনারেল সরকারকে গুরুত্বপূর্ণ আইনসংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু ইংল্যাণ্ডে এটর্নি-জেনারেলের নিয়োগ সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক ব্যাপার। ক্ষমতাপ্রাপ্ত দলের সমর্থক এমন খ্যাতিসম্পন্ন আইনজীবীদের মধ্য হইতেই এটর্নি-জেনারেলকে নিযুক্ত করা হয়। তিনি আবার কমন্স সভার সদস্য। পূর্বে অনেক সময় এটর্নি-জেনারেলকে ক্যাবিনেটের সদস্যপদ দেওয়া হইলেও বর্তমান বড় একটা ইহা করা হয় না। যেহেতু ইংল্যাণ্ডে এটর্নি-জেনারেলের নিয়োগ রাজনৈতিক ব্যাপার সেইহেতু দলীয় সরকারের পরিবর্তনের সংগে এটর্নি-জেনারেলও পরিবর্তিত হন। ভারতীয় সংবিধানে যে ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহাতে এটর্নি-জেনারেল পদে বহাল থাকা রাষ্ট্রপতির খুশির উপর নির্ভর করে: অন্যান্যের মত এ-ব্যাপারেও রাষ্ট্রপতি ক্যাবিনেটের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করিলেও ইংল্যাণ্ডের মত ভারতে দলীয় সরকারের পরিবর্তনের সংগে এটর্নি-জেনারেল পরিবর্তিত হইবেন এমন কোন কথা নাই। আবার ইংল্যাণ্ডের এটর্নি-জেনারেল **ক্যাবিনেটের সদস্য** হইতে পারেন, কিন্তু ভারতের এটর্নি-জেনারেল ক্যাবিনেটের সদস্য হন না। আর এক দিক দিয়াও ভারতের এটর্নি-জেনারেলের সংগে ইংল্যাণ্ডের এটর্নি-জেনারেলের পার্থক্য রহিয়াছে। ইংল্যাণ্ডে এটর্নি জেনারেল ব্যক্তিগতভাবে ওকালতি করিতে পারেন না, কিন্তু ভারতীয় সংবিধানে এরূপ ব্যক্তিগতভাবে ওকালতি করা নিষিদ্ধ করা হয় নাই। শুধু বলা হইয়াছে, ভারত সরকারের স্বার্থের বিরুদ্ধে কোনপ্রকার ব্যক্তিগত মামলা পরিচালনা ভারতের এটর্নি-জেনারেল করিতে পারিবেন না।

"The appointment of the Attorney-General becomes in practice a political appointment without *the advantage of his being included in the Cabinet."* G. N. Joshi

স্মর্তব্য

১. ভারত সরকারের প্রধান আইনজ্ঞ কর্মচারী ও আইনসংক্রান্ত প্রধান পরামর্শদাতা এটর্নি-জেনারেল নামে অভিহিত।

২. তিনি সংসদের সদস্য নন তবে সংসদের উভয় কক্ষে বক্তব্য পেশ করিবার অধিকার তাঁহার আছে।

অনুশীলনী

1. **Write a note on the Attorney General for India.** **(C. U. 1965, '74)**
[ভারতের এটর্নি-জেনারেলের উপর একটি টীকা রচনা কর।] **(২০০-০১ পৃষ্ঠা)**

১৪ ইউনিয়নের ব্যবস্থা বিভাগ
(THE LEGISLATURE OF THE UNION)

> *"India is a Sovereign Democratic Republic with a parliamentary form of government based on universal adult franchise. Sovereignty rests with the people. The executive authority is ultimately accountable for all its decisions and actions to the people through their elected representative ."* *The Indian Parliament* (Government of India Publication)

১. সংসদ (পার্লামেণ্ট)—গঠন (Parliament—Composition) : ব্যবস্থা বিভাগের সংগঠন বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম। **ইংল্যাণ্ডে** রাজা বা রাণী পার্লামেণ্টের অবিচ্ছেদ্য অংগ। এইজন্যই বলা হয় যে ইংল্যাণ্ডের ব্যবস্থা বিভাগ **রাজা বা রাণী-সহ-পার্লামেণ্ট** (The King or Queen-in-Parliament)। **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে** রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থা বিভাগের অংগ নহেন ; ঐ দেশে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সিনেট (Senate) ও প্রতিনিধিসভা (House of Representatives) এই দুইটি কক্ষ লইয়া গঠিত আইনসভা বা কংগ্রেসের হস্তে ন্যস্ত। ভারত ব্রিটিশ শাসন-ব্যবস্থাকেই অনুকরণ করিয়াছে।

১.১. তিনটি অংগ : ভারতীয় ইউনিয়নের ব্যবস্থা বিভাগকে বলা হয় সংসদ (পার্লামেণ্ট)। সংসদ (ক) রাষ্ট্রপতি এবং (খ) দুইটি পরিষদ লইয়া গঠিত। পরিষদ দুইটির মধ্যে উচ্চতর কক্ষ (পরিষদের) নাম **রাজ্যসভা** এবং নিম্নতর কক্ষ (পরিষদের) নাম **লোকসভা**।[১]

স্মর্তব্য : রাষ্ট্রপতি সংসদের তিনটি অংগের অন্যতম।

২. রাজ্যসভার গঠন : রাজ্যসভার মোট সদস্যসংখ্যা **অনধিক** ২৫০। সদস্যগণের মধ্যে **১২ জন** রাষ্ট্রপতি কর্তৃক **মনোনীত** হন। চারুকলা বিজ্ঞান সাহিত্য ও সমাজসেবায় (art, science, literature and social service) বিশেষ জ্ঞান বা বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে এমন সমস্ত ব্যক্তির মধ্য হইতে রাষ্ট্রপতিকে মনোনয়ন করিতে হয়। বাকী **অনধিক** ২৩৮ জন সদস্য হইলেন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলসমূহের প্রতিনিধি।

---

১. পূর্বে ইংরাজীতে ইহাদিগকে যথাক্রমে 'Council of States' এবং 'House of the People' বলা হইত। এই দুইটির বাংলা প্রতিশব্দ ছিল রাজ্য-পরিষদ ও লোকসভা। বর্তমানে সরকারীভাবে ভারতীয় নাম গ্রহণ করা হইয়াছে। তবে রাজ্য-পরিষদ না বলিয়া বলা হয় রাজ্যসভা।

২১. **নির্বাচন পদ্ধতি : রাজ্যের প্রতিনিধিগণ সংশ্লিষ্ট রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যগণ কর্তৃক একহস্তান্তরযোগ্য ভোট দ্বারা সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের** (Proportional Representation by means of the single transferable vote) **পদ্ধতিতে নির্বাচিত হইয়া থাকেন।**

কেন্দ্রশাসিত (ইউনিয়ন) অঞ্চলসমূহ হইতে রাজ্যসভার প্রতিনিধি নির্বাচনের পদ্ধতি সংসদ আইন করিয়া স্থির করে। বর্তমান আইন অনুসারে রাজ্যসভায় প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য প্রত্যেক ইউনিয়ন অঞ্চলে একটি করিয়া বিশেষ নির্বাচন-সংস্থা (electoral college) গঠন করা হয়। দিল্লীর ক্ষেত্রে নির্বাচন-সংস্থা দিল্লীর মেট্রোপলিটন কাউন্সিলের (Metropolitan Council) নির্বাচিত সদস্যদের লইয়া গঠিত হয়।

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রতিনিধিগণও নির্বাচন-সংস্থার সদস্যগণ কর্তৃক একহস্তান্তরযোগ্য ভোট দ্বারা সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের পদ্ধতিতে নির্বাচিত হন।

বর্তমানে (নভেম্বর, '৮৭) রাজ্যসভা ২৪৪ জন সদস্য লইয়া গঠিত। ইহাদের মধ্যে ২০৮ জন হইলেন রাজ্যসমূহের প্রতিনিধি (পশ্চিমবংগের ১৬, ত্রিপুরার ১) এবং ৪ জন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলসমূহের (দিল্লী ৩, পণ্ডিচেরি ১)। ইহা ছাড়া ১২ জন সদস্য চারুকলা বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্য হইতে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হইয়াছেন।

২.২. **গঠন-সম্পর্কে লক্ষণীয় বিষয় :** রাজ্যসভার গঠন সম্পর্কে লক্ষ্য করিবার বিষয় হইল যে, সোবিয়েত ইউনিয়ন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় উচ্চতর কক্ষে অংগরাজ্যসমূহের সম-প্রতিনিধিত্বের (equal representation) ব্যবস্থা ভারতে প্রবর্তিত নহে—**আসন বণ্টনের ভিত্তি** জনসংখ্যা। যেমন, উত্তরপ্রদেশের ৩৪ কিন্তু হিমাচলপ্রদেশের মাত্র ৩।

২.৩. **মনোনয়ন এবং পরোক্ষ নির্বাচনের সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি :** পরোক্ষ নির্বাচন এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনয়নের ব্যবস্থাকে সমালোচনা করা হইয়াছে। বলা হয়, পরোক্ষ নির্বাচনের জন্য দুর্নীতির সম্ভাবনা রহিয়াছে এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনয়ন **গণতন্ত্র-বহির্ভূত পন্থা**। অপরপক্ষে বলা হয়, এই ব্যবস্থার সাহায্যে যাঁহারা রাজনৈতিক দলাদলির মধ্যে জড়িত হইতে ইচ্ছুক নহেন এমন সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিকে রাজ্যসভায় স্থান দেওয়া সম্ভব হয়। উপরন্তু, রাজ্যসভা ও লোকসভা একই পদ্ধতিতে সংগঠিত হওয়া সমীচীন নয়।

৩. **লোকসভার গঠন :** মূল সংবিধানের ব্যবস্থা ছিল যে লোকসভা **অনধিক ৫২৫ জন সদস্য লইয়া গঠিত হইবে।** ইহাদের মধ্যে অনধিক ৫০০ জন সদস্য হইবেন রাজ্য হইতে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং অনধিক ২৫ জন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রতিনিধি।

৩.১. **সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি**: ১৯৭৩ সালের ৩১তম সংশোধন (The Constitution [31st Amendment] Act, 1973) দ্বারা লোকসভার সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা হয়। এই সংশোধনে বলা হইয়াছে যে লোকসভার সর্বাধিক সদস্যসংখ্যা হইবে ৫৪৫ জন। ইহার মধ্যে **অনধিক ৫২৫** জন রাজ্যগুলি হইতে নির্বাচিত হইবেন এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির প্রতিনিধি থাকিবেন **অনধিক ২০** জন। কিন্তু ৩টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল (অরুণাচল, গোয়া ও মিজোরাম) অংগরাজ্যের মর্যাদা পাওয়ায় রাজ্যগুলির সদস্যসংখ্যা (৫) বৃদ্ধি পাইয়াছে, এবং লোকসভার সদস্য-সংখ্যা সেই পরিমাণ হ্রাস ঘটিয়াছে।

লোকসভার বর্তমান (নভেম্বর, ১৯৮৭) **সদস্যসংখ্যা** মোট ৫৪৪। ইহার মধ্যে রাজ্যগুলি (২৫টি) হইতে নির্বাচিত-সদস্য ৫৩০, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলসমূহ (৬টি) হইতে ১২ এবং (৫৪৪ – ৫৩০ – ১২ =) বাকী ২ জন হইলেন মনোনীত ইংগ ভারতীয় সদস্য।[১]

৩.২. **প্রত্যক্ষ নির্বাচন**: বিভিন্ন রাজ্য হইতে সদস্যগণ প্রত্যক্ষভাবে প্রাপ্ত-বয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হন।

বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে লোকসভার আসন বণ্টনকার্য (allocation of seats) পূর্ববর্তী জনগণনার ভিত্তিতে নির্বাচন-এলাকা নির্ধারণ কমিশনের (Delimitation Commission) সুপারিশ অনুসারে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্পাদিত হয়।

১৯৭৬ সালের ৪২তম সংশোধন অনুসারে ২০০১ সালের জনগণনা পর্যন্ত লোক-সভার আসন-বণ্টন অপরিবর্তিত থাকিবে।

বর্তমান আইন অনুযায়ী ইউনিয়ন (কেন্দ্রশাসিত) অঞ্চলের প্রতিনিধিগণও প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। **ইংগ ভারতীয় সম্প্রদায়** সম্পর্কে বিধান হইল, রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে তাহারা লোকসভায় উপযুক্তসংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারে নাই, তাহা হইলে তিনি ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত অনধিক ২ জন প্রতিনিধিকে মনোনীত করিতে পারেন।

৩.৩. **আসন সংরক্ষণ**: নির্বাচিত সদস্যগণের মধ্যে তপশীলী বর্ণ এবং কয়েকটি তপশীলী উপজাতির (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) জন্য লোকসভায় আসন-সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। সংবিধানের প্রবর্তনের ১০ বৎসর পরে—অর্থাৎ ১৯৬০ সালের জানুয়ারী মাসের ২৬ তারিখে এই সংরক্ষণ-ব্যবস্থা তুলিয়া দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সংবিধানের ৮ম (১৯৫৯), ২৩তম (১৯৭০) এবং ৪৫তম (১৯৮০) সংশোধনের ফলে উক্ত ব্যবস্থার মেয়াদ এক একবারে ১০ বৎসর করিয়া বৃদ্ধি করিয়া ১৯৯০ সালের ২৫শে জানুয়ারী পর্যন্ত লইয়া যাওয়া হইয়াছে। পরে মেয়াদ আরও বৃদ্ধি পাইতে পারে।

---

১. *India* 1986

সংসদে আসন বণ্টন

(Allocation of Seats in Parliament)

রাজ্যসভা

ক। অংগরাজ্যসমূহ

১.	অন্ধ্রপ্রদেশ	১৮
২.	আসাম	৭
৩.	বিহার	২২
৪.	মহারাষ্ট্র	১৯
৫.	গুজরাট	১১
৬.	হরিয়ানা	৫
৭.	কেরল	৯
৮.	মধ্যপ্রদেশ	১৬
৯.	তামিলনাড়ু (পূর্বতন মাদ্রাজ)	১৮
১০.	কর্ণাটক (পূর্বতন মহীশূর)	১২
১১.	উড়িষ্যা	১০
১২.	পাঞ্জাব	৭
১৩.	রাজস্থান	১০
১৪.	উত্তরপ্রদেশ	৩৪
১৫.	পশ্চিমবংগ	১৬
১৬.	জম্মু ও কাশ্মীর	৪
১৭.	নাগাভূমি	১
১৮.	মণিপুর	১
১৯.	মেঘালয়	১
২০.	ত্রিপুরা	১
২১.	হিমাচলপ্রদেশ	৩
২২.	সিকিম	১
২৩.	মিজোরাম	১
২৪.	অরুণাচলপ্রদেশ	১
২৫.	গোয়া	

খ। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলসমূহ

১.	দিল্লী	৩
২.	পণ্ডিচেরি	১
	মোট	২৩২

গ। মনোনীত ১২

মোট ২৪৪

লোকসভা

ক। অংগরাজ্যসমূহ

১.	অন্ধ্রপ্রদেশ	৪২
২.	আসাম	১৪
৩.	বিহার	৫৪
৪.	গুজরাট	২৬
৫.	হরিয়ানা	১০
৬.	জম্মু ও কাশ্মীর	৬
৭.	কেরল	২০
৮.	মধ্যপ্রদেশ	৪০
৯.	তামিলনাড়ু (পূর্বতন মাদ্রাজ)	৩৯
১০.	মহারাষ্ট্র	৪৮
১১.	কর্ণাটক (পূর্বতন মহীশূর)	২৮
১২.	নাগাভূমি	১
১৩.	উড়িষ্যা	২১
১৪.	পাঞ্জাব	১৩
১৫.	রাজস্থান	২৫
১৬.	উত্তরপ্রদেশ	৮৫
১৭.	পশ্চিমবংগ	৪২
১৮.	ত্রিপুরা	২
১৯.	মণিপুর	২
২০.	মেঘালয়	২
২১.	হিমাচলপ্রদেশ	৪
২২.	সিকিম	১
২৩.	মিজোরাম	১
২৪.	অরুণাচলপ্রদেশ	২
২৫.	গোয়া	২

খ। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলসমূহ

১.	আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	১
২.	চণ্ডীগড়	১
৩.	দাদরা ও নগর হাভেলি	১
৪.	দিল্লী	৭
৫.	লাক্ষাদ্বীপ	১
৬.	পণ্ডিচেরি	১
	মোট	৫৪২[১]

১. ইহা ব্যতীত ইংগ-ভারতীয় সম্প্রদায় হইতে রাষ্ট্রপতি-মনোনীত দুইজন সদস্য আছেন। সুতরাং লোকসভার মোট সদস্যসংখ্যা হইল (৫৪২+২=) ৫৪৪ জন। ···*India*, 1985

৩.৪. **সদস্যপদের যোগ্যতা, ইত্যাদি** : সংসদের সদস্য হইবার যোগ্যতা সম্পর্কে সংবিধানে বলা হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তি সংসদের সদস্যপদলাভে যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না যদি : (ক) সে ভারতের **নাগরিক** না হয়, অথবা স্বেচ্ছায় বৈদেশিক রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন করিয়া থাকে ; (খ) তাহার **বয়স** রাজ্যসভার আসনের বেলায় অন্যূন ৩০ বৎসর এবং লোকসভার আসনের বেলায় অন্যূন ২৫ বৎসর না হয়, এবং (গ) সংসদ প্রণীত নির্দিষ্ট **অন্যান্য যোগ্যতা** তাহার না থাকে।

৩.৫. **অযোগ্যতা সম্পর্কে নিয়মকানুন** : আদালত কর্তৃক কোন ব্যক্তি বিকৃত মস্তিষ্ক বলিয়া ঘোষিত হইলে অথবা অমুক্ত দেউলিয়া (undischarged insolvent) হইলে অথবা কোন বৈদেশিক রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিয়া থাকিলে সেই ব্যক্তি সংসদের সদস্য হইবার অযোগ্য বিবেচিত হইবে। সংসদ আইন করিয়া ভারত সরকার বা রাজ্য সরকারের অধীনে যে-সকল **লাভজনক পদে** (office of profit) **অধিষ্ঠিত** ব্যক্তিদের অযোগ্য বলিয়া ঘোষণা করিবে তাহারা সদস্যপদলাভে অযোগ্য বিবেচিত হইবেন। তবে **মন্ত্রীরা** লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত বলিয়া সদস্যপদলাভে অযোগ্য বিবেচিত হইবেন না (১০২ (২) অনুচ্ছেদ)।

১৯৮৫ সালে ৫২তম সংবিধানের সংশোধনবলে সংসদ **দলত্যাগ-বিরোধী আইন** পাস করিয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে কোন আইনসভার সদস্য দলত্যাগ করিলে সে আর সংসদের সদস্যপদে আসীন থাকিতে পারিবে না।

৩.৬. **সভাদ্বয়ের আয়ুষ্কাল** : উভয় কক্ষের মধ্যে **রাজ্যসভা স্থায়ী পরিষদ**—ইহাকে ভাঙিয়া দেওয়া যায় না। প্রত্যেক ২ বৎসর অন্তর ইহার সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশকে অবসর গ্রহণ করিতে হয়। লোকসভার আয়ুষ্কাল ছিল ৫ বৎসর। ৪২তম সংশোধনে ইহা বাড়াইয়া করা হয় ৬ বৎসর। বর্তমানে আবার উহা ৫ বৎসরে ফিরাইয়া লওয়া হইয়াছে।[2] তবে এই সময়ের মধ্যে রাষ্ট্রপতি লোকসভাকে ভাঙিয়া দিতে সমর্থ। দেশে জরুরী বা আপৎকালীন অবস্থার ঘোষণা থাকাকালীন সংসদ আইন করিয়া লোকসভার মেয়াদ **এক একবার ১ বৎসরের জন্য** বৃদ্ধি করিতে পারে (৮৩ অনুচ্ছেদ)।

৩.৭. **অধিবেশন** : রাষ্ট্রপতিকে সময়ান্তরে সংসদের প্রতি কক্ষের অধিবেশন আহ্বান করিতে হয় (১৫১ পৃষ্ঠা)। **দুইটি অধিবেশনের মধ্যে ৬ মাস কাল অতিবাহিত হইতে পারে না।** রাষ্ট্রপতি উভয় কক্ষ বা যে কোন কক্ষের অধিবেশনের অবসান করিতে পারেন এবং লোকসভাকে ভাঙিয়া দিতে পারেন (৮৫ অনুচ্ছেদ)।

৩.৮. **রাজ্যসভার সভাপতি ও সহ-সভাপতি** : স্মর্তব্য যে, পদাধিকারবলে ভারতের **উপরাষ্ট্রপতিই** রাজ্যসভার সভাপতি (১৪৭ পৃষ্ঠা)। একজন সহ-সভাপতিও আছেন। তিনি রাজ্যসভার সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন।

---

১. ১৯৭৬ সালের ৪২তম সংশোধন।

২. ১৯৭৮ সালের ৪৪তম সংশোধন।

৩.৯. লোকসভার স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার: লোকসভার সভাপতিত্ব করেন স্পীকার। স্পীকারের অনুপস্থিতিতে অথবা তাঁহার পদ শূন্য থাকিলে ডেপুটি স্পীকার তাঁহার কার্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। ইঁহারা উভয়েই লোকসভার সদস্যগণ কর্তৃক নিজেদের মধ্য হইতে নির্বাচিত হন।

৪. কেন্দ্রে দ্বিপরিষদ-ব্যবস্থা (Bicameralism at the Centre): উনিশ শতকে দ্বিতীয় পরিষদ-ব্যবস্থা বিশেষভাবে সমর্থিত হইলেও বর্তমানে কিন্তু দ্বিতীয় পরিষদের উপযোগিতা সম্পর্কে অনেকেই সন্দেহ পোষণ করিয়া থাকেন। ফলে যেখানে দ্বিতীয় পরিষদ আছে বা নূতন করিয়া প্রতিষ্ঠিত হয় সেখানে ঐ পরিষদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিবার প্রচেষ্টা করা হয়।

* ভারতে দ্বিতীয় পরিষদের সূচনা হয় ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনেও কেন্দ্র এবং কয়েকটি প্রদেশে দ্বিতীয় পরিষদকে বজায় রাখা হয়।

৪.১. যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় দ্বিতীয় পরিষদের তাৎপর্য: বর্তমান ভারতীয় সংবিধান যখন রচিত হয় তখন দ্বিতীয় পরিষদের সমস্যা লইয়া বিশেষ আলোচনা হয় নাই। তবে **গণপরিষদে গোপালস্বামী আয়েংগারের উক্তি** হইতে সংবিধান রচয়িতৃগণের মনোভাবের কিছুটা ইংগিত পাওয়া যায়।

৪.২. গণপরিষদে দ্বিপরিষদত্বের সমর্থন: দ্বিপরিষদ লইয়া আলোচনার প্রথম পর্যায়ে তিনি উক্তি করেন যে পৃথিবীর সকল **যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায়** একটি করিয়া **দ্বিতীয় পরিষদের প্রয়োজনীয়তা** স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে।[১] উক্তিটির তাৎপর্য হইল যে অংগরাজ্যগুলির প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য একটি দ্বিতীয় পরিষদ থাকা প্রয়োজন, কারণ তাহা না হইলে অংগরাজ্যগুলির স্বার্থহানির সম্ভাবনা থাকে। সংবিধান রচনার পরবর্তী পর্যায়ে অবশ্য গোপালস্বামী আয়েংগার এই যুক্তির পরিবর্তে অন্য **দুইটি যুক্তির** আশ্রয় গ্রহণ করেন: (১) নিম্ন পরিষদ মুহূর্তের আবেগে আকস্মিক ও অবিবেচনাপ্রসূত আইন পাস করিতে পারে। ফলে জাতীয় স্বার্থ ব্যাহত হইবার আশংকা রহিয়াছে। কিন্তু দুইটি পরিষদ থাকিলে এরূপ হওয়া দুষ্কর। (২) দ্বিতীয় পরিষদ থাকিলে পরোক্ষ নির্বাচন বা মনোনয়নের মাধ্যমে অসংশ্লিষ্ট (unassociated) গুণীজ্ঞানী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের আইন প্রণয়নের সংগে সংযুক্ত করা সম্ভব হয়।

৪.৩. দ্বিপরিষদত্বের বিরোধিতা: অতএব, ভারতীয় সংসদের দ্বিতীয় পরিষদ বা রাজ্যসভার উদ্দেশ্য হইল অবিবেচনা আইনের ত্রুটি সংশোধনে সাহায্য করা এবং অংগরাজ্যগুলির প্রতিনিধিত্ব ও স্বার্থ সংরক্ষিত করা। এখন প্রথমটি সম্পর্কে বলা হয়, বর্তমানে মুহূর্তের আবেগে ত্রুটিপূর্ণ আইন পাস হওয়ার বিশেষ কোন সম্ভাবনা থাকে

১. "The need for a second chamber has been felt practically all over the world, wherever there are federations of any importance." Gopalaswami Ayyangar

না—কোন আইনই এখন বিশেষ বিবেচনা না করিয়া পাস করা হয় না।[১] আইন প্রণয়নের সিদ্ধান্ত মন্ত্রি-পরিষদই করে। আইনের খসড়া আইনজ্ঞদের দ্বারা রচিত হয়। ঐ খসড়া সম্পর্কে সরকার এবং সংশ্লিষ্ট স্বার্থের মধ্যে আলাপ-আলোচনা হয়। ইহার পর আইনের খসড়া আইনসভায় উত্থাপিত হয় এবং জনপ্রিয় কক্ষে উহা বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্নভাবে আলোচিত হয়। এত করার পরও আইনের ত্রুটি থাকিবে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় না।

অগণতান্ত্রিকতার একটি দৃষ্টান্ত: ইহা ছাড়া লোকসভা জনসাধারণ কর্তৃক সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হয়। অপরপক্ষে রাজ্যসভা অংশত পরোক্ষভাবে (রাজ্য বিধানসভাসমূহ কর্তৃক) নির্বাচিত সদস্য এবং অংশত রাষ্ট্রপতি মনোনীত সদস্য লইয়া গঠিত। সুতরাং লোকসভার সিদ্ধান্তে রাজ্যসভাকে হস্তক্ষেপ করিতে দেওয়ার অর্থ হইল **গণতান্ত্রিকতার বিরোধিতা** করা।

৪.৪. রাজ্যসভার সদস্যগণের উৎকর্ষ ও নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে সন্দেহ: আবার রাজ্যসভা যে অসংশ্লিষ্ট (unassociated) অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত বলিয়া যে দাবি তাহাও তর্কাতীত নহে বাজ্যগুলি হইতে যাঁহারা রাজ্যসভায় প্রেরিত হন তাঁহারা রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যগণ কর্তৃক একহস্তান্তরযোগ্য ভোটের দ্বারা সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের পদ্ধতিতে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। বিধানসভার সদস্যরা দলীয় ভিত্তিতে তাঁহাদের দলের মনোনীত ব্যক্তিদের একযোগে ভোট দিয়া নির্বাচন করেন। ইহাকে নির্বাচন না বলিয়া **মনোনয়নই** বলা যাইতে পারে। সাধারণত যাঁহারা সাধারণ নির্বাচনে সাফল্য অর্জন করার আশা রাখেন না বা সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই এমন সকল দলীয় ব্যক্তিরই রাজ্যসভায় নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং নিরপেক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাই রাজ্যসভার সদস্য হইবেন এরূপ ধারণা করা ভুল। আবার রাষ্ট্রপতি যাঁহাদের মনোনীত করেন তাঁহারাও কেন্দ্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মনোনীত ব্যক্তিগণ, কারণ রাষ্ট্রপতি মন্ত্রি-পরিষদের পরামর্শ অনুযায়ীই ইহাদের মনোনীত করিয়া থাকেন।

ইহা ছাড়া অধ্যাপক হোয়ারারের অনুসরণে বলা যায়, দ্বিতীয় কক্ষের হস্তে সামান্য ক্ষমতা থাকিলেও উহাতে দলীয় রাজনীতি থাকিতে বাধ্য।[২]

৪.৫. রাজ্যসভার গঠনে বিরোধিতা: রাজ্যসভার সপক্ষে পূর্ববর্তী যুক্তি হইল যে ইহা অংগরাজ্যগুলির প্রতিনিধিত্ব করে।[৩] যুক্তরাষ্ট্রীয় তত্ত্বের একটি নীতি হইল যে

১. 'Legislation is not made *ex nihilo* ; it does not suddenly, as out of a clean sky, find its way to the statute book." Laski

২. "If second chambers are to be anything more than debating societies or discussion circles, party is bound to come in."

৩. "A Second Chamber is all the more necessary in India because of the essentially federal nature of the Constitution." *The Indian Parliament* (Government of India Publication)

অংগরাজ্যগুলির স্বার্থসংরক্ষণের জন্য প্রত্যেক রাজ্য হইতে প্রেরিত প্রতিনিধি লইয়া গঠিত একটি দ্বিতীয় পরিষদ থাকিবে। নিম্নতর কক্ষের সদস্যগণ জনসংখ্যার ভিত্তিতে জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হন; সুতরাং যে-সকল অংগরাজ্যের জনসংখ্যা অধিক তাহারাই নিম্নতর কক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতার বলে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও জনবিরল অংগরাজ্যগুলির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিতে সমর্থ হয়। এই কারণেই বলা হয় যে যুক্তরাষ্ট্রে অংগরাজ্যগুলির প্রত্যেকেই সমমর্যাদা ভোগ করিবে। **সমমর্যাদার নীতিকে কার্যকর করিতে হইলে** আয়তন ও জনসংখ্যা নির্বিশেষে সকল অংগরাজ্যকেই দ্বিতীয় পরিষদে **সমসংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার** দিতে হইবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, সুইজারল্যাণ্ড ও সোবিয়েত ইউনিয়নে দ্বিতীয় পরিষদে সমপ্রতিনিধিত্বের এই নীতি প্রবর্তিত হইয়াছে।

ভারতীয় সংসদের দ্বিতীয় পরিষদের গঠনে কিন্তু **যুক্তরাষ্ট্রীয় সমপ্রতিনিধিত্বের নীতিকে স্বীকার** করিয়া লওয়া হয় নাই। জনসংখ্যার ভিত্তিতে রাজ্যসভার আসনগুলি বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। ইহার ফলে জনবহুল রাজ্যগুলির আসনসংখ্যা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের প্রতিনিধিসংখ্যার তুলনায় অধিক হয়। ইহা ছাড়া রাষ্ট্রপতি কয়েকজনকে মনোনীত করেন। সুতরাং বলা যায়, বৃহৎ রাজ্যগুলির হস্তক্ষেপ হইতে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা ভারতীয় সংবিধানে নাই। অর্থাৎ, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় দ্বিতীয় পরিষদের যে ভূমিকা থাকা প্রয়োজন তাহা রাজ্যসভার নাই। এই প্রসংগে আরও মনে রাখা প্রয়োজন যে সংবিধানের ২৪৯ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাজ্যসভা যদি দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে এরূপ প্রস্তাব পাস করে যে জাতীয় স্বার্থে রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয় সম্পর্কে সংসদের পক্ষে আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন বা সমীচীন তাহা হইলে পার্লামেন্ট এ বিষয় সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করিতে পারে। ইহার অর্থ, রাজ্যসভা দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে ক্ষমতা বণ্টন-ব্যবস্থা পরিবর্তিত করিতে সমর্থ। এখন বিভিন্ন অংগরাজ্যের সমপ্রতিনিধিত্বের আদর্শ না থাকায় বৃহৎ রাজ্যগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করিয়া লইতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি প্রতিফলনের দাবি: অতএব, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় দ্বিতীয় পরিষদের যে ভূমিকা থাকা উচিত তাহা নিশ্চিত করিতে হইলে সংবিধানের সংশোধন করিয়া রাজ্যসভাকে অংগরাজ্যের সমপ্রতিনিধিত্বের নীতির ভিত্তিতে গঠিত করার ব্যবস্থা করিতে হইবে বলিয়া দাবি করা হয়।

৪.৬. উপসংহার: উপসংহারে বলা যায়, সংসদের দ্বিতীয় কক্ষের সার্থকতা সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে। অবশ্য রাজ্যসভার কর্মসচিব শ্রী এস্. এন্. মুখার্জী, শ্রী কে. সান্তানাম প্রভৃতি কোন কোন ব্যক্তি রাজ্যসভার গুণগান করিয়াছেন। এই প্রসংগে ইংরাজ লেখক মরিস-জোনস্ (Morris-Jones) অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে রাজ্যসভা থাকায় প্রয়োজনীয় সমস্যা সম্পর্কে বিতর্কের অতিরিক্ত সুযোগ পাওয়া যায়

এবং আইনসংক্রান্ত কাজের চাপ কতকটা লাঘব করা যায়। তবে তিনি ইহাও মন্তব্য করিয়াছেন যে উচ্চতর কক্ষ হিসাবে রাজ্যসভার সদস্যদের বা উহার কার্যের কোন বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় না।[১] বস্তুত, গত কয়েক বৎসরের মধ্যে রাজ্যসভা উল্লেখযোগ্য কোন কাজ করিতে সমর্থ হয় নাই। কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য বিলের সংশোধনের সুপারিশ করিয়াছে, কিছু কিছু বিল উত্থাপনও করিয়াছে। কিন্তু এই কাজের জন্য জনসাধারণের অর্থ ব্যয় করিয়া দ্বিতীয় পরিষদ রাখিবার যুক্তি আছে কি না, সে-সম্পর্কে ঘোরতর সন্দেহ রহিয়াছে। বিতর্কের ব্যাপারেও রাজ্যসভার বিশেষ ভূমিকা আছে বলিয়া মনে হয় না। কারণ দেখা গিয়াছে, লোকসভায় যে-সকল যুক্তিতর্ক অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে রাজ্যসভা তাহার পুনরাবৃত্তিই করিয়াছে। এই অবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন থাকিয়া যায় যে এই কক্ষের বিলোপসাধন, না সংস্কারসাধন করা হইবে ?

৫. স্পীকারের পদমর্যাদা ও ক্ষমতা (Position and Powers of the Speaker): সংসদের পদাধিকারিগণের মধ্যে লোকসভায় স্পীকারের পদ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। লোকসভার নিয়মশৃংখলা, লোকসভার সদস্যদের স্বাধীনতা এবং লোকসভার মর্যাদা ও সুনাম স্পীকারের কর্মকুশলতা ও দক্ষতার উপর অনেকখানি নির্ভরশীল।

৫.১. স্পীকারের নিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতা—সংবিধানগত ব্যবস্থা: যাহাতে ব্রিটিশ কমন্স সভার স্পীকারের মত ভারতীয় স্পীকারও নিরপেক্ষ এবং স্বাধীনভাবে তাঁহার কর্তব্যপালন করিতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে ভারতীয় সংবিধান **কতকগুলি বিশেষ ব্যবস্থা** লিপিবদ্ধ করিয়াছে: (ক) স্পীকার ডেপুটি স্পীকারের বেতন ও ভাতা ভারত সরকারের সঞ্চিত তহবিলের (Consolidated Fund of India) উপর ধার্য—অর্থাৎ উহা প্রতি বৎসর লোকসভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয় না। (খ) ইহাদিগকে পদচ্যুত করিতে হইলে লোকসভার মোট সদস্যসংখ্যার অধিকাংশের দ্বারা প্রস্তাব গৃহীত হওয়া প্রয়োজন। ১৪ দিনের নোটিশ ভিন্ন ঐরূপ প্রস্তাব উত্থাপন করা যায় না।

(গ) ইহা ছাড়াও লোকসভার শৃংখলা রক্ষা বা কার্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলা ছাড়া স্পীকার (বা ডেপুটি স্পীকার) কক্ষের তর্কবিতর্কে অংশগ্রহণ করেন না এবং যখন কোন বিষয়ের সপক্ষে ও বিপক্ষে ভোট সমানসংখ্যক হয় তখনই কেবল তিনি তাঁহার 'নির্ণায়ক ভোট' (casting vote) প্রদান করিয়া অচলাবস্থার অবসান করেন। অন্য সময়ে তাঁহার ভোটদানের ক্ষমতা নাই।

৫.২. দায়িত্ব ও ক্ষমতা: স্পীকারের ক্ষমতা ও কর্তব্য বিশেষ ব্যাপক। (ক) লোকসভার আলোচনা ও বিতর্ক নিয়ন্ত্রণ করা এবং শৃংখলা বজায় রাখা স্পীকারের প্রধান দায়িত্ব। একদিকে যেমন সদস্যদের—বিশেষত **সংখ্যালঘু দলের**—মতামত প্রকাশের

১. "The upper house is distinct neither in the character of its members nor in the work it does." Morris-Jones: *The Government and Politics in India*

স্বাধীনতা যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয় তাহা দেখা তাঁহার কর্তব্য, অন্যদিকে তেমনি আবার যাহাতে পরিষদের কার্যে বিঘ্ন না ঘটে অথবা নিয়মকানুনের অপব্যবহার না হয় তাহার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখাও তাঁহার দায়িত্ব। (খ) তিনি কক্ষের নেতার (Leader of the House) সহিত পরামর্শ করিয়া লোকসভার কার্যক্রম (agenda) স্থির করেন এবং রাষ্ট্রপতির উদ্বোধনী বক্তৃতার বিষয়বস্তুর আলোচনার জন্য সময় ধার্য করেন।

(গ) বৈধতার প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসক আবার স্পীকার প্রশ্নজিজ্ঞাসা, প্রস্তাব, বিল উত্থাপন, মুলতবী প্রস্তাব ইত্যাদির গ্রহণযোগ্যতার বিচার করেন এবং যখন কোন বৈধতার প্রশ্ন উঠে তখন তাহার মীমাংসা করিয়া থাকেন। এই সকল ক্ষেত্রে তাঁহার সিদ্ধান্তই চরম বলিয়া গণ্য হয়। (ঘ) বিভিন্ন বিষয়—যেমন, বাজেট, জরুরী বিষয় আলোচনার জন্য মুলতবী প্রস্তাব ইত্যাদি—সম্পর্কে **বক্তৃতার সময়** তিনি **নির্ধারণ** করিয়া দেন। যাহাতে অর্থবিষয়ক কাযাদি যথাসময়ে সমাপ্ত হয় তাহার জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন পন্থা তিনি অবলম্বন করিতে পারেন। (ঙ) আলোচনা বন্ধের প্রস্তাবে অনুমতি প্রদান করা বা না-করার অধিকার তাহার আছে। তাহার নির্দেশে ভোটগ্রহণ করা হয় এবং ভোটের ফলাফল তিনিই ঘোষণা করেন।

(চ) শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব: পরিষদের শৃংখলা যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয় তাহার জন্য তাঁহাকে সতর্ক থাকিতে হয়। একাধিক সদস্য বক্তৃতা করিতে চাহিলে তিনি স্থির করেন কাহাকে প্রথম সুযোগ দেওয়া হইবে। বক্তৃতায় অপ্রাসংগিক বিষয় বা বিরুক্তির পুনরুক্তি থাকিলে তিনি উহাকে বন্ধ করিয়া দিতে পারেন। কোন সদস্যের আচরণ বিশেষভাবে বিশৃংখলাজনক হইলে স্পীকার তাঁহাকে **বহিষ্কারের আদেশ** দিতে পারেন এবং সংশ্লিষ্ট সদস্য ঐ দিনের অধিবেশনে আর উপস্থিত থাকিতে পারেন না। যেস্থলে কোন সদস্য ক্রমাগত এবং ইচ্ছাকৃতভাবে পরিষদের কার্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া পরিষদের নিয়মকানুনের অপব্যবহার করেন অথবা স্পীকারকে অগ্রাহ্য করিয়া চলেন সেস্থলে স্পীকার অধিবেশনের বাকী সময়ের জন্য উক্ত সদস্যের 'নামোল্লেখ (name) করিতে পারেন। বিশৃংখলা আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গেলে তিনি পরিষদের কার্য সাময়িকভাবে বন্ধ রাখিতে পারেন।

(ছ) অর্থ বিল কি না তাহার চূড়ান্ত মীমাংসা: কোন বিল 'অর্থ' বিল' (Money Bill) কি না, এই সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উঠিলে স্পীকার উহার সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন এবং তাঁহার সিদ্ধান্তই চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া বিবেচিত হয়।

রাজ্যসভায় প্রেরণকালে এবং রাষ্ট্রপতির নিকট অনুমতির জন্য উপস্থিত করিবার সময় প্রত্যেক অর্থ বিল সম্পর্কে স্পীকারকে এই মর্মে **প্রমাণপত্র স্বাক্ষর** করিতে হয় যে উহা অর্থ বিল।

(জ) লোকসভার মুখপাত্র: স্পীকারকে রাষ্ট্রপতির সহিত সংসদের আদান-প্রদানের মাধ্যম হিসাবে কার্য করিতে হয়। রাষ্ট্রপতি যে-সমস্ত সংবাদ সংসদে

প্রেরণ করেন তাহা স্পীকারের নিকট প্রেরিত হয়। অপরপক্ষে সংসদ যাহা রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করিতে চায় তাহাও স্পীকারের মাধ্যমে করা হয়। অর্থাৎ, **স্পীকার হইলেন 'লোকসভার মুখপাত্র'** (spokesman)[১]। ইহা ব্যতীত স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকারের অনুপস্থিতিতে লোকসভায় সভাপতিত্ব করিবার জন্য সভাপতিদের একটি তালিকা প্রণয়ন, বিভিন্ন কমিটির সভাপতি নিয়োগ, বিভিন্ন কমিটির গঠন ও পদ্ধতির সাধারণ তত্ত্বাবধান, পরিষদে আগন্তুকদের উপস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি ক্ষমতাও স্পীকারের।

(ঝ) একটি নূতন দায়িত্ব : ৩৩তম সংশোধন (১৯৭৪) দ্বারা স্পীকারের হস্তে আর একটি দায়িত্ব ন্যস্ত করা হইয়াছে। লোকসভার কোন সদস্য পদত্যাগপত্র পেশ করিলে তিনি অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন যে পদত্যাগ স্বেচ্ছামূলক (voluntary) কি না বা প্রকৃত (genuine) কি না। যদি না হয় তাহা হইলে তিনি পদত্যাগকে স্বীকার করিয়া লইবেন না।

৫.৩. স্পীকারপদের জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলী : স্পীকারপদের উপরি-উক্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও ক্ষমতা হইতে ইহা সহজেই অনুমান করা যায় যে, স্পীকারকে অতি সুদক্ষ ব্যক্তি হইতে হয়। তাঁহার ব্যক্তিগত গুণাগুণ বুদ্ধিবিবেচনা কর্মকুশলতা ও অভিজ্ঞতার উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। সর্বোপরি দায়িত্বশীল সংসদীয় শাসন-ব্যবস্থায় স্পীকারকে সরকারী নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত হইয়া নিরপেক্ষভাবে কার্য করিতে হইবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের যেমন শাসনকার্য পরিচালনা করিবার অধিকার থাকে, বিরোধী দলের আবার তেমনি থাকে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সরকারকে সমালোচনা করিবার অধিকার। স্পীকারের **প্রধান কর্তব্য** হইল যে বিরোধী দল যেন অযৌক্তিক-ভাবে সরকারী ও লোকসভার কার্য ব্যাহত না করে এবং অপরদিকে আবার বিরোধী দলের সমালোচনায় অধিকার যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয় তাহার প্রতিও দৃষ্টি দেওয়া। সুতরাং স্পীকারকে সর্বতোভাবে নিরপেক্ষ হইতে হইবে।

৫.৪. কাম্য রীতিনীতির প্রয়োজনীয়তা : বলা হয়, ভারতীয় স্পীকারকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ করিতে এবং দলীয় পক্ষপাতিত্ব হইতে দূরে রাখিতে হইলে ইংল্যাণ্ডে কমন্স সভার স্পীকারকে ঘিরিয়া যে-সকল রীতিনীতি গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা ভারতেও প্রবর্তিত করা প্রয়োজন। প্রথমত, আইনসভায় **স্পীকার নির্বাচন** যাহাতে **সর্ববাদিসম্মত** হয় তাহার প্রচেষ্টা করিতে হইবে। **ইংল্যাণ্ডে** যখন কোন স্পীকার নির্বাচনের প্রয়োজন হয় তখন সংখ্যাগরিষ্ঠ দলই বিরোধী দলের সহিত পরামর্শ করিয়া নাম প্রস্তাব করে এবং নির্বাচন সাধারণত সর্ববাদিসম্মত হয়।

ভারতে কিন্তু স্পীকার-নির্বাচন সর্ববাদিসম্মত করিবার ঐতিহ্য গড়িয়া উঠে নাই—বরং নির্বাচন লইয়া সরকারী দল ও বিরোধী দলের মধ্যে অশোভন বিবাদবিসংবাদ ও

---

১. (ইংল্যাণ্ডে) এই মুখপাত্র বা spokesman হইতেই speaker শব্দটি উদ্ভূত। পরে অবশ্য স্পীকারের উপর অন্যান্য বিশেষ দায়িত্ব বর্তায় এবং 'মুখপাত্রে'র ভূমিকা গৌণ হইয়া দাঁড়ায়।

মনোমালিন্যই চলে দেখা যায়। চতুর্থ নির্বাচনের পর ১৯৬৭ সালে যখন শ্রীসঞ্জীব রেড্ডীকে স্পীকারপদে নির্বাচিত করা হয় তখন বিরোধী দল অভিযোগ করে যে সংখ্যাগরিষ্ঠ কংগ্রেস দল স্পীকার নিয়োগ ব্যাপারে সর্বদলীয় মতৈক্যের কোন প্রচেষ্টাই করে নাই।

দ্বিতীয়ত, বলা হয় যে স্পীকারপদকে দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে রাখিতে হইলে কোন পূর্বতন স্পীকার সাধারণ নির্বাচনে দাঁড়াইলে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সমীচীন নয়। ইংল্যাণ্ডে এ-সম্পর্কে কোন সুপ্রতিষ্ঠিত প্রথা (convention) না থাকিলেও সাধারণত নির্বাচনে পূর্বতন স্পীকারের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিহার করিবার চেষ্টা হয় এবং কোন ক্ষেত্রেই স্পীকার দলীয় প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনে অবতীর্ণ হন না। ভারতে এই ঐতিহ্য এখনও গড়িয়া উঠে নাই—পূর্বতন স্পীকারগণকে দলীয় প্রার্থী হিসাবে পুনর্নির্বাচনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে দেখা যায়।

তৃতীয়ত, কোন পূর্বতন স্পীকার আইনসভার সদস্য হইলে এবং স্পীকারপদ পুনরায় গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক থাকিলে তাঁহাকে ঐ পদে পুনর্নির্বাচিত করা সমীচীন। ইংল্যাণ্ডে এই নীতি অনুসৃত হইলেও ভারতে উহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন ১৯৬২ সালে যখন শ্রীঅনন্তশায়নম আয়েংগার লোকসভার সদস্য হন তখন তাঁহাকে স্পীকারপদে পুনর্নির্বাচিত না করিয়া বিহারের রাজ্যপাল নিযুক্ত করা হয়।

পরিশেষে, ব্রিটেনে যখনই কমন্স সভার কোন সদস্য স্পীকারপদে নির্বাচিত হন তখনই তিনি দলীয় সদস্যপদ ত্যাগ করেন এবং দলীয় সভাসমিতিতে যোগদান করেন না, এমনকি কথাবার্তায় এমন কোন মতপ্রকাশ করেন না যাহাতে তাঁহার নিরপেক্ষতায় কাহারও সন্দেহ জন্মিতে পারে। ভারতে নিরপেক্ষতার এই ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা চলিয়াছে। লোকসভার কোন সদস্য যখন স্পীকারপদে নির্বাচিত হয় তখন তিনি দলীয় রাজনীতি হইতে যথাসম্ভব দূরে থাকিতে চেষ্টা ক[illegible] কেন্দ্রে গতি এই দিকে হইলেও, রাজ্যগুলিতে এখনও অনেক সময় স্পীকারের ব[illegible]গত রাজনীতি ও পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ শুনা যায়।[১]

চতুর্থ নির্বাচনের কিছুদিন পরে স্পীকারের ক্ষমতা ও দায়িত্ব লইয়া বিভিন্ন রাজ্যে তুমুল বিতর্কের ঝড় উঠে। ইহার দরুন এ-সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নীতি নির্ধারণের প্রচেষ্টা করা হয় ১৯৬৮ সালের এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত স্পীকার-সম্মেলনে (Speakers' Conference)। এই প্রচেষ্টা লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভাসমূহ সকল স্পীকারের ক্ষমতা ও দায়িত্বের সহিত সম্পর্কিত বলিয়া ইহার আলোচনা রাজ্য বিধানসভার স্পীকারের প্রসংগে পরে করা হইবে।

১. "It must be admitted, however, that the position of the Speaker in some States is hardly as strong as that at the Centre.... Not in all cases by any means are the Speakers themselves withdrawn from the hurly-burly of stormy State politics to be able to command respect from all sides." Morris-Jones

৫.৫. বর্তমান পরিস্থিতি (Present Position): বর্তমানে (লোকসভার ও রাজ্য বিধানসভার) স্পীকারপদের মর্যাদার বিশেষ অবনতি দেখা যায়।

বস্তুত, বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্পীকারগণ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন শাসকদলের সমর্থক।

পূর্বে স্পীকারগণের মধ্যে মভলংকর, অনন্তশায়নম আয়েংগার, ধীলন প্রভৃতি সাহসিকতার সহিত নিরপেক্ষতা বজায় রাখার চেষ্টা করিয়াছেন। ইঁহাদের স্পীকার-সম্পর্কিত মন্তব্যের মধ্যেও নিরপেক্ষতার কথা সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

মভলংকর: লোকসভার প্রথম স্পীকার মভলংকর উক্তি করিয়াছিলেন যে, ব্রিটেনে স্পীকার সম্পর্কে যে-সকল রীতিনীতি গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা ভারতে অবর্তমান। যেমন, ব্রিটেনে কোন স্পীকার যদি পুনরায় স্পীকার হইতে চান তাহা হইলে বিরোধী দল উহাতে বাধা দেয় না এবং স্পীকার মনোনয়নে সংসদ কিংবা সংসদের বাহিরে তাহার বিরুদ্ধে নির্বাচনী দ্বন্দ্ব হয় না। সুতরাং ভারতে এই রীতি না থাকায় স্পীকারের পক্ষে দলের সংগে সম্পূর্ণ যোগাযোগ ছিন্ন করা সম্ভব নয়। মভলংকর **প্রতিশ্রুতি** দিয়াছিলেন যে, তৎসত্ত্বেও স্পীকার হিসাবে তিনি দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে থাকিয়া **নিরপেক্ষভাবে লোকসভার কার্য** পরিচালনা করিয়া যাইবেন।[১] কার্যক্ষেত্রেও এই নীতিকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া নিরপেক্ষতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন।

অনন্তশায়নম আয়েংগার: অনন্তশায়নম আয়েংগারও এই **নিরপেক্ষতার নীতি** অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। ১৯৫৬ সালের মার্চ মাসে যখন স্পীকারপদ গ্রহণ করেন তখন তিনি দ্বিধাহীনভাবে ঘোষণা করেন যে তিনি কোন দলের মধ্যে পার্থক্য করিয়া চলিবেন না এবং প্রত্যেক সদস্যের ও প্রত্যেক গোষ্ঠীর অধিকার সংরক্ষণ করিয়া চলিবেন।[২] এবং তাহাই করিয়াছেন।

ধীলন: ধীলনও স্পীকারপদের দায়িত্ব নির্ভীকভাবে পালন করিয়াছেন এবং প্রধান মন্ত্রীর ভ্রূকুটিতে কর্তব্যচ্যুত হন নাই। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তুলমোহন সংক্রান্ত বিবাদের সময় ধীলনকে বলিয়াছিলেন মোরারজী দেশাইকে বহিষ্কার করিতে। ধীলন কিন্তু ঐ কথা শোনেন নাই। ইহাতে ইন্দিরা গান্ধী ক্ষুব্ধ হন এবং ইহার ফলে ধীলন স্পীকারপদে ইস্তফা দেন।

সঞ্জীব রেড্ডী: সঞ্জীব রেড্ডী রাজনীতি করিলেও যখন ১৯৬৭ সালে স্পীকারপদে নির্বাচিত হন তখন তিনি ঘোষণা করেন যে তিনি নিরপেক্ষভাবে কাজ চালাইবেন।[৩] কিন্তু ১৯৬৯ সালে আবার রাজনীতিতে নামেন এবং স্পীকারপদ ত্যাগ করিয়া রাষ্ট্রপতিপদপ্রার্থী হন।

হেগড়ে ও জাখর: সঞ্জীব রেড্ডীর পরবর্তী দুই স্পীকার কে. এস. হেগড়ে ও বলরাম জাখর সম্বন্ধে বলা যায় যে তাঁহাদের নিরপেক্ষতার পরীক্ষা ঠিকমত হয় নাই। হইলেও ঐ পরীক্ষায় তাঁহারা উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। হেগড়ে ছিলেন জনতা আমলের স্পীকার। সপ্তম লোকসভা নির্বাচনের পর কংগ্রেস (ই) দল তাঁহার বদলে বলরাম জাখরকে স্পীকার মনোনয়ন করে। পরবর্তী (অষ্টম) লোকসভাতেও তাঁহাকে মনোনয়ন দেওয়া হয়। ধারণা হইল, হেগড়ে ছিলেন জনতা দলের সমর্থক, আর জাখর কংগ্রেস (ই) দলের। এইরূপ দলীয় সমর্থককে স্পীকার নির্বাচন করা সংসদীয় গণতন্ত্রের স্বাস্থ্যের দিক দিয়া যুক্তিযুক্ত নহে।

---

১ "Though a Congressman, it would be my duty to be *impartial* and remain above all considerations of party or political career." G. V. Mavalankar

২. "I assure every section of this House, and every group and even every individual who does not belong to any particular group that I will never let down their privileges." Ananthasayanam Ayyangar (March 8, 1956)

৩. "My office requires of me to be *impartial* and *judicious* in the conduct of my work." Sanjiva Reddy (1967)

বর্তমান অবনতি: মোটামুটিভাবে বলা যায়, বর্তমান স্পীকাররা ঠিক আর নিরপেক্ষভাবে কার্য সম্পাদন করিতেছেন না। দেখা যায়, তাঁহারা নিয়মিতভাবে শাসকদলের সপক্ষেই রুলিং দিয়া চলিয়াছেন।

৫.৬. **বর্তমান স্পীকারের ভূমিকার একটি মূল্যায়ন:** এই বিষয় সম্পর্কে **কুলদীপ নায়ারের উক্তি** উদ্ধৃত করা যাইতে পারে: "স্পীকার ও চেয়ারম্যানদের গুণগত মানের ব্যাপারে সংসদীয় ক্ষেত্রে সবচেয়ে শোচনীয় অবনতি ঘটিয়াছে। তারা দলীয় ব্যক্তিতে পরিণত হইয়াছেন। সংকীর্ণতার সহিত সম্পর্কবিহীন রুলিং তারা কদাচ দেন। মভলংকর ও অনন্তশায়নম আয়েংগারের দিন আর নাই। বর্তমান স্পীকার বলরাম জাখর এখনও মাঝে মধ্যে পাঞ্জাবের কংগ্রেস (ই) রাজনীতি লইয়া হাবুডুবু খান। তিনি এমনই 'অস্বস্তিকর' রকমের সরকার-ঘেঁষা যে তাঁহার দলের লোকেরাই তাকে 'মহারাণীর বিশ্বস্ত ভৃত্য' বলিয়া থাকেন। আনতুলে প্রসংগ চোখে আঙুল দিয়া দেখাইবার মত ঘটনা। বিরোধীরা শ্রীমতী গান্ধীর বিরুদ্ধে যে অধিকার-ভংগের প্রস্তাব আনিতে চাহিয়াছিলেন তাহা স্পীকার জাখর নাকচ করিয়া দেন। তিনি বলেন, রুলিং দিবার আগে তিনি প্রাসংগিক সব কাগজপত্র দেখিয়া লইয়াছেন। তিনি কি করিয়া জানিলেন, আনতুলে সংক্রান্ত সব কাগজপত্রই তাকে দেখান হইয়াছে?[১] বস্তুত, শাসকদলের স্বার্থরক্ষার একটি প্রবণতা জাখরের আছে।"[২]

৫.৭. **রাজ্য হইতে একটি দৃষ্টান্ত:** এই প্রসংগে রাজ্য হইতে একটি ঘটনা উল্লেখ করিলে বুঝা যাইবে যে স্পীকারপদের মর্যাদা কিভাবে ক্ষুণ্ণ হইতে চলিয়াছে। কেরলে ১৯৮২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সংযুক্ত গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট যখন পরাজয়ের মুখে তখন স্পীকার **এস সি. জোস** নির্ণায়ক (casting) ভোট দ্বারা করুণাকরণ মন্ত্রিসভাকে বাঁচাইয়া দেন। বস্তুত, ১৯৮১ সালের ডিসেম্বরে করুণাকরণ মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার পর যতবারই বিধানসভায় ভোটাভুটি হইয়াছে ততবারই নবনির্বাচিত স্পীকার এস. সি জোস সরকারের পক্ষে ঝুঁকিয়া করুণাকরণ মন্ত্রিসভাকে রক্ষা করিয়াছেন। সুতরাং বলা যায়, বর্তমান স্পীকারগণ স্পীকারপদের সম্মান ও মর্যাদা নষ্ট করিয়াছেন এবং শাসকদলের হাতিয়ার হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।[৩]

৫.৮. **একটি প্রাসঙ্গিক বিষয়.** প্রসংগত উল্লেখ্য, স্পীকারগণ অবসরপ্রাপ্তির পর অন্যান্য লাভজনক উচ্চপদে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। যেমন, অনন্তশায়নম আয়েংগার ও হুকুম সিং পরবর্তী সময়ে যথাক্রমে বিহার ও রাজস্থানের রাজ্যপাল নিযুক্ত হন। উন্নতি ও উচ্চপদে নিয়োগের আশা থাকিলে সকল স্পীকারই যে ভবিষ্যতের কথা চিন্তা

১. আনতুলে ট্রাস্টে টাকা দেওয়ার বিনিময়ে তিনি সিমেন্টের পারমিট বণ্টন করিয়াছিলেন। ১৯৮২ সালে আদালতে অভিযুক্ত হওয়ার পর তিনি মুখ্যমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করেন।

২. ১৯৮১ সালের ২১শে নভেম্বর মাসের আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত কুলদীপ নায়ারের প্রবন্ধ।

৩. "Some of the rulings of the Speakers are not beyond reasonable suspicion of the Opposition that the office is being used to protect the interests of the party in power." K. V. Rao: *Parliamentary Democracy of India.*"

করিয়া শাসকদলের অনুকূলে কার্য করিতে উৎসুক থাকিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য কি? সুতরাং এরূপ নিয়োগকে বন্ধ করিতে হইবে।

৫.৯. আর একটি করণীয় কার্য: আর একটি বিষয়কে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে—স্পীকারপদে নিযুক্ত হওয়ার পর দলীয় সম্পর্ক পরিত্যাগ করার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সংবিধানের সংশোধনের দ্বারা এই দুইটি বিষয় সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন বলিয়াই অভিমত প্রকাশ করা যাইতে পারে।[১]

৬. সংসদ ও সংসদ-সদস্যদের অধিকার ও অব্যাহতি (Privileges and Immunities of Parliament and its Members): যাহাতে সংসদে কার্যকর্তব্য যথাযথভাবে সম্পাদিত হইতে পারে তাহার জন্য সংসদ ও তাহার সদস্যগণ কতকগুলি সুযোগসুবিধা ও অধিকার ভোগ করিয়া থাকেন।

ক। বাক্-স্বাধীনতা: সংসদের অভ্যন্তরে সদস্যদের বাক্-স্বাধীনতা রহিয়াছে। সংসদ বা তাহার কোন কমিটিতে কোন কিছু বলিবার জন্য অথবা ভোটদানের দরুন কোন সদস্য **আদালতে অভিযুক্ত হন না।** অবশ্য এই ব্যাপক বাক্-স্বাধীনতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া যাহা ইচ্ছা তাহা বলা যায় না। প্রত্যেক সদস্যকে সংশ্লিষ্ট কক্ষের যে-সকল নিয়মকানুন থাকে তাহা মান্য করিয়া চলিতে হয়। নিয়মকানুন ভংগ করা হইলে শাস্তিপ্রদান, যেমন বহিষ্কারের আদেশ ইত্যাদি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়।

সীমাবদ্ধতা: অবশ্য সংবিধানে বলা হইয়াছে যে, প্রধান ধর্মাধিকরণ বা মহাধর্মাধিকরণের কোন বিচারকের আচরণ সম্পর্কে পদচ্যুতির প্রস্তাব ভিন্ন অন্য প্রকার কোন আলোচনা করা যাইবে না।

খ। কাগজপত্রাদি প্রকাশের স্বাধীনতা: কাগজপত্রাদি প্রকাশ করা সম্পর্কেও সংবিধান অধিকার-সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছে। লোকসভা অথবা রাজ্যসভার কর্তৃত্বাধীনে কোন রিপোর্ট, কাগজপত্র, ভোট বা কার্যবাহ প্রকাশের জন্য কোন ব্যক্তি আদালতে অভিযুক্ত হন না।

অন্যান্য অধিকার এবং ৪৪তম সংশোধন. ১৯৭৬ সালের পূর্বে সংবিধানের ব্যবস্থা ছিল যে অন্যান্য যে-সকল অধিকার ও সুযোগসুবিধা সংসদের দুই পরিষদ এবং উহাদের সদস্যগণ ভোগ করিবেন তাহা সংসদ সময়ান্তরে আইন দ্বারা স্থির করিয়া দিবে। যতদিন পর্যন্ত সংসদ উহা ঐভাবে স্থির না করিবে, ততদিন পর্যন্ত সংসদ ও সংসদ-সদস্যগণ সংবিধান প্রবর্তিত হওয়ার তারিখে ব্রিটেনের কমন্স সভা ও কমন্স সভার সদস্যগণ বা কমিটি যে-সমস্ত অধিকার ভোগ করিত সেই সকল অধিকারই ভোগ করিবেন। **৪২তম সংশোধনে (১৯৭৬) এই ব্যবস্থার পরিবর্তন করা হয়।** বলা হয়, অন্যান্য অধিকার ও সুযোগসুবিধা **সংসদের প্রত্যেক কক্ষ পৃথকভাবে নির্ধারণ করিবে।** সংশোধনটিতে **কমন্স সভার উল্লেখ প্রত্যাহার** করা হইয়াছে। **৪৪তম সংশোধন (১৯৭৮)** দ্বারা ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে প্রত্যেক সুযোগসুবিধা

১. Philip Laundy: *The Office of the Speaker in the Parliaments of the Commonwealth*

সংসদের আইন দ্বারা স্থিরীকৃত হইবে। তবে যে পর্যন্ত না এই আইন করা হইতেছে পূর্বের সুবিধাগুলিই অব্যাহত থাকিবে।

বর্তমান অন্যান্য অধিকার ও সুযোগসুবিধা: বর্তমানে সংসদ ও সংসদ সদস্যগণ যে অন্যান্য সুযোগসুবিধা ভোগ করিয়া থাকে তাহা সংক্ষেপে নিম্নলিখিত রূপ:

গ। গ্রেপ্তার না হইবার স্বাধীনতা (Freedom from arrest): সংসদের অধিবেশনকালে উহার কোন সদস্যকে **দেওয়ানী দায়ে আটক** করা যায় না। অধিবেশন আরম্ভ হইবার ৪০ দিন পূর্ব হইতে এবং অধিবেশন সমাপ্ত হইবার ৪০ দিন পর পর্যন্ত এই অব্যাহতি দেওয়া হয়। এই অব্যাহতি অবশ্য **ফৌজদারী অভিযোগ** অথবা **নিবর্তনমূলক আটকের** (preventive detention) বেলায় প্রযোজ্য নহে। কোন সদস্যকে কারাগারে নিক্ষেপ করা বা আটক করা হইলে ঐ সংবাদ অবিলম্বে সংসদের নিকট প্রেরণ করিতে হয়। ইহা ব্যতীত সংসদের অধিবেশন চলার সময় জুরির কার্য হইতে অব্যাহতি পাওয়ার অধিকার প্রত্যেক সদস্যের রহিয়াছে। সংসদের অনুমতি ব্যতীত অধিবেশনকালীন অবস্থায় কোন সদস্যকে আদালতে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ডাকা যায় না।

ঘ। সদস্য নয় এমন ব্যক্তিদের সংসদের কক্ষে উপস্থিতি নিষিদ্ধ করিবার অধিকার (Right to exclude strangers): সংসদের প্রত্যেক কক্ষ বিতর্ক ও আলোচনার গোপনীয়তা রক্ষাকল্পে যাহারা সদস্য নয় এমন ব্যক্তিদের কক্ষে উপস্থিতি নিষিদ্ধ করিয়া দিতে সমর্থ। সাধারণত যুদ্ধের মত সংকটাবস্থায় সংসদ এই অধিকার প্রয়োগ করিয়া থাকে। অনেক সময় আবার শৃংখলা রক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট কক্ষ যাহারা সদস্য নয় এমন ব্যক্তিদেব কক্ষ হইতে চলিয়া যাইবার আদেশ দিতে পারে।

ঙ। আভ্যন্তরীণ কার্যপদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করিবার অধিকার (Right to control internal proceedings): প্রত্যেক কক্ষ উহার কার্যপদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত করিবার অধিকার ভোগ করে। কক্ষের অভ্যন্তরে যাহা বলা হয় বা করা হয় তাহাতে আদালতের কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা নাই। তবে এমন প্রামাণিক দৃষ্টান্ত নাই যে, সংসদের অভ্যন্তরে হত্যার মত অপরাধ অনুষ্ঠিত হইলে সাধারণ আদালত শাস্তিবিধান করিতে সমর্থ নয়।

চ। অবমাননার জন্য দণ্ডবিধানের অধিকার (Right to commit for contempt): প্রত্যেক কক্ষ তাহার অধিকার বলবৎ ও কার্যধারা নিয়ন্ত্রণ করিবার এবং শৃংখলা বজায় রাখিবার জন্য যাঁহারা কক্ষের অধিকারের বিরুদ্ধাচরণ করেন তাঁহাদের শাস্তিপ্রদান করিতে পারে। উচ্চ আদালতের ন্যায় অবমাননা বা অধিকার-ভংগের জন্য যে-কোন ব্যক্তিকে (তিনি কক্ষের সদস্য হোন বা না-হোন) দণ্ডিত বা শাস্তিপ্রদান করিতে সমর্থ।

অবমাননা বা ঐ অধিকারভংগ বলিতে কি বুঝায় সে-সম্পর্কে মে-র (May) কথা উল্লেখ করিয়া বলা যায়, সংসদের কক্ষদ্বয় বা উহাদের সদস্য বা কর্মচারীদের কার্যে বাধাবিঘ্নের সৃষ্টি হইতে পারে অথবা

পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ ভাবে ঐরূপ হইবার সম্ভাবনা থাকে এরূপ কোন কার্য করা বা না-করাকেই অবমাননা বলিয়া ধরা যাইতে পারে।[১]

অবমাননার জন্য তিনপ্রকার শাস্তি: অধিকারভংগ বা অবমাননার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রত্যেক কক্ষ মোটামুটি তিনভাবে শাস্তিপ্রদান করিতে পারে: (ক) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কক্ষের সমক্ষে উপস্থিত হইতে বলা হয় এবং তারপর তাহাকে তিরস্কার ও সতর্ক (admonition) করিয়া দেওয়া হয়। (খ) আবার কক্ষ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বলপূর্বক কক্ষের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া কঠোরভাবে ভৎর্সনা (reprimand) করিতে পারে। (গ) ইহা অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ শাস্তি হইল যে কক্ষ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কারাগারে নিক্ষেপ করিতে পারে। তবে যে-ব্যক্তিকে এইভাবে আটক রাখা হয় কক্ষের অধিবেশন বন্ধ হইবার সংগে সংগে সে মুক্তিলাভ করে। অবমাননার জন্য দণ্ডদান ব্যাপারে অন্য কোন আদালতের কোনপ্রকার হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই। একমাত্র পরোয়ানায় অবমাননার কারণ নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া থাকিলে এবং আটক বেআইনী প্রমাণিত হইলে আদালতে প্রতিকার পাওয়া যায়। ইহা হইতে দেখা যায়, কক্ষের অবমাননার দরুন দণ্ডদানের মাত্রা ব্যাপকই নহে, অবাধও বটে।

ব্রিটিশ কমন্স সভার সদস্যদের মত ভারতীয় সংসদ ও রাজ্য আইনসভাগুলির সদস্যরা অধিবেশনের ৪০ দিন পূর্ব হইতে অধিবেশনের ৪০ দিন পর পর্যন্ত আটকের হাত হইতে অব্যাহতি পান। অধিবেশন বন্ধ থাকাকালীন অবস্থায় কোন সদস্য এই অব্যাহতি দাবি করিতে পারেন না।[২] আবার ইংল্যাণ্ডের অনুকরণে ভারতেও 'নিবর্তনমূলক আটক আইন' ইত্যাদি অথবা ফৌজদারী আইনে আটক করা হইলে আইনসভাগুলির কোন সদস্য আটক হইতে অব্যাহতির স্বাধীনতা ভোগ করেন না।[৩] ব্রিটিশ কমন্স সভার মত ভারতীয় সংসদ এবং রাজ্য আইনসভার যে-কোন পরিষদের বিচার করিবার অধিকার রহিয়াছে যে উহার কোন অধিকারকে ভংগ করা হইয়াছে কি না এবং এ-সম্পর্কে পরিষদের সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার কোন আদালতের নাই। প্রত্যেক পরিষদ তাহার অধিকারভংগ বা অবমাননার জন্য শাস্তিপ্রদান করিতে সমর্থ। সংসদ এবং রাজ্য আইনসভাগুলিতে অধিকারসংক্রান্ত কমিটি (Committee of Privileges) রহিয়াছে। অধিকারভংগের প্রশ্ন উঠিলে এই কমিটি তাহার অনুসন্ধান করে এবং এ-সম্পর্কে সুপারিশ করে।

'ব্লিৎস' পত্রিকার ঘটনা: ১৯৬১ সালের ১৫ই এপ্রিল তারিখে 'ব্লিৎস' (Blitz) পত্রিকায় লোকসভার সদস্য আচার্য কৃপালনীর বক্তৃতার তীব্র সমালোচনা করা হয়। পত্রিকাটির বিরুদ্ধে অভিযোগ আসে যে লোকসভার সদস্য হিসাবে শ্রীকৃপালনীকে অবমাননা ও হেয় প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। বিষয়টি অধিকারসংক্রান্ত কমিটি অনুসন্ধান করে এবং উক্ত পত্রিকার সম্পাদক কারাঞ্জিয়াকে লোকসভার অধিকারভংগের এবং লোকসভাকে অবমাননা করার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে। ইহার পর স্পীকার কারাঞ্জিয়াকে লোকসভায় উপস্থিত করাইয়া তীব্র ভাষায় তিরস্কার করেন।

---

১. "Any act or omission which obstructs or impedes either House of Parliament in the performance of its functions or which obstructs or impedes any member or officer of such House in the discharge, of his duty or which has the tendency, directly or indirectly, to produce such results may be treated as a contempt, even though there is no precedent of the offence." May : *Parliamentary Practice*

২. *Raj Narain v. Atmaram, A.*, 1954

৩. *Ansumali v. State of West Bengal* (1952)

সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বর মাসে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে অধিকারসংক্রান্ত কমিটির সুপারিশক্রমে সংসদের অবমাননা এবং অধিকারভংগের দরুন জেলে নিক্ষেপ করা হয়।

আইনসভার অবমাননা ও উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা সংক্রান্ত মামলা: আইনসভার অধিকার সম্পর্কে ১৯৬৪ সালে উত্তরপ্রদেশে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। ঐ সালে উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা সমাজতন্ত্রী কর্মী শ্রীকেশব সিংহকে বিধানসভার অবমাননার দোষে দোষী সাব্যস্ত করিয়া ৭ দিনের কারাবাস দণ্ড দেয়। শ্রীসিংহের পক্ষ হইতে ইহার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আবেদন করা হইলে হাইকোর্ট শ্রীসিংহকে জামিনে খালাসের আদেশ প্রদান করে। ইহার পর ঐ বিধানসভা আবেদন-বিচারকারী বিচারকদ্বয়ের বিরুদ্ধে অবমাননার অভিযোগ আনয়ন করিয়া বিচারকদ্বয়কে বিধানসভার সমক্ষে উপস্থিত হইতে নির্দেশ দেয়। হাইকোর্ট অবশ্য বিচারসভার এই প্রস্তাবের প্রয়োগ বন্ধ করিয়া রাখিবার আদেশ প্রদান করে।

৬.১. আইনসভা বনাম আদালত—সুপ্রীম কোর্টের অভিমত: আইনসভা ও আদালতের এই বিবাদ অকাম্য রূপ ধারণ করায় রাষ্ট্রপতি বিষয়টিকে সংবিধানের ১৪৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্টের নিকট অভিমতের জন্য প্রেরণ করেন। বিষয়টির সকল দিক বিবেচনা করিয়া সুপ্রীম কোর্ট যে অভিমত প্রদান করে তাহা সংক্ষেপে হইল এইরূপ: ভারতীয় সংবিধানের ১৯৪(৩) অনুচ্ছেদ [সংসদের ক্ষেত্রে ১০৫ (৩) অনুচ্ছেদ] অনুসারে আইনসভাগুলির অধিকারের পরিধি ও বিষয়বস্তু কি হইবে না-হইবে, সংবিধানের অন্যান্য অনুচ্ছেদের পরিপ্রেক্ষিতে তাহা স্থির করিবার ক্ষমতা আদালতের আছে।[১] আইনসভা সাধারণ পরোয়ানা (অর্থাৎ যে পরোয়ানায় অবমাননার কারণ প্রদর্শিত হয় নাই) জারি করিলেও আদালতগুলির বিচার করিবার এক্তিয়ার নষ্ট হয় না, কারণ সংবিধানে মৌলিক অধিকারভংগের জন্য আদালতে প্রতিকার পাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং এ-সম্পর্কে আইনসভা আদালতের এক্তিয়ারমুক্ত নয়।

আইনসভা সংবিধান-প্রদত্ত অধিকার বলে নিজের অবমাননার অভিযোগে বিচারকদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে সমর্থ নয়।

৬.২. উপসংহার—আইনসভাসমূহের ব্যাপক অধিকারের যৌক্তিকতা: এখন প্রশ্ন, সংসদ ও রাজ্য আইনসভাগুলির ক্ষমতা, অধিকার ও অব্যাহতি (powers, privileges and immunities) আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া সমীচীন কি না? ইহার উত্তরে বলা যায়, আইনসভাগুলির কর্তব্যপালনের জন্য উহাদের **বাক্‌-স্বাধীনতার মত কতকগুলি অধিকার** থাকা প্রয়োজন, কিন্তু তাই বলিয়া আইনসভার হস্তে সুযোগসুবিধা ও অধিকার নির্ধারণ করার অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা থাকিবে—এরূপ অভিমত সম্পূর্ণ যুক্তিহীন। এমনকি ইংল্যাণ্ড অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশেও

---

১. "In construing the Article 194(3) the Courts must have regard to the other provisions of the Constitution bearing on the same subject." In re 143 (*U. P. Legislature v. Judiciary*) (1964)

আইনসভার ব্যাপক অধিকার সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করা হইতেছে।[১] বর্তমান গণতান্ত্রিক দেশে দলীয় সরকার কার্য করে এবং সরকার শাসন বিভাগ ও ব্যবস্থা বিভাগকে দলীয় সমর্থনের বলে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। এই অবস্থায় আইনসভার পক্ষে যুক্তিসংগত সমালোচনার পথ রুদ্ধ করা কঠিন নয়। কিন্তু গণতন্ত্রে আইনসভাকে সমালোচনার সম্মুখীন হইয়া কার্য করিতে হইবে এবং এ-সম্পর্কে অসহিষ্ণু হইলে চলিবে না।

৬.৩. **সুপ্রীম কোর্টের অভিমত**: এই প্রসংগে সুপ্রীম কোর্টের অভিমত বিশেষ উল্লেখ্য। উত্তরপ্রদেশে আইনসভার সহিত আদালতের বিবাদের বিবেচনা করিবার সময় সুপ্রীম কোর্ট বলে, ইহা যেন ভুলিয়া না যাওয়া হয় যে **অবমাননার জন্য শাস্তি-প্রদানের ক্ষমতাকে সতর্কতা ও বিবেচনার সহিত প্রয়োগ করিতে হইবে।**[২] প্রসংগত উল্লেখ্য যে, ১৯৫৪ সালের ভারতীয় প্রেস কমিশনও (The Indian Press Commission [1954]) আইনসভার অধিকারসমূহ আইনের দ্বারা নির্ধারিত করিবার জন্য সুপারিশ করে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে জনতা সরকার আইনের দ্বারা সুযোগসুবিধা নির্ধারিত করার প্রস্তাব করিয়াছিল। বর্তমান সময় পর্যন্ত সুযোগসুবিধা আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয় নাই।

৬.৪. **অধিকার সম্পর্কে আর একটি প্রশ্ন**: লোকসভা এবং রাজ্যের বিধানসভার সদস্যদের অধিকার সম্পর্কে আর একটি প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইতে পারে: মৌলিক অধিকারসমূহের সহিত আইনসভার সুযোগসুবিধার অসংগতি দেখা দিলে উহার মীমাংসা কি হইবে? পূর্বের এক মামলায় [শর্মা বনাম শ্রীকৃষ্ণ (Sharma v. Sri Krishna, 1959]) সুপ্রীম কোর্ট রায় দেয় যে আইনসভাগুলির সুযোগসুবিধা ও অধিকার মৌলিক অধিকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে না। কিন্তু পরবর্তী সময়ে (১৯৬৫) সুপ্রীম কোর্ট এ অভিমত প্রকাশ করে যে আইনসভার সুযোগসুবিধা ও অধিকার ১৯ অনুচ্ছেদে বাক্-স্বাধীনতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হইলেও সংবিধানের ২০ অনুচ্ছেদ (অপরাধী সাব্যস্ত সম্পর্কে সংরক্ষণ), ২১ অনুচ্ছেদ (জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা সংরক্ষণ), ২২ অনুচ্ছেদ (গ্রেপ্তার ও আটক-সম্পর্কিত অধিকার) এবং ৩২ অনুচ্ছেদ (শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার) দ্বারা আইনসভার সুযোগসুবিধা নিয়ন্ত্রিত হইবে। অন্যভাবে বলা হয় যে উপরি-উক্ত মৌলিক অধিকারগুলি আইনসভার সুযোগসুবিধার উপর প্রাধান্য পাইবে।

৭. সংসদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী (Powers and Functions of Parliament):

সংবিধান-প্রবর্তিত ক্যাবিনেট শাসন-

---

১. "... now in Australia and—though naturally to a lesser extent—in England it is asked whether some of the privileges are not out of date." Morris-Jones: *Parliament in India*

২. "In ought never to be forgotten that the power to punish for contempt must always be exercised cautiously, wisely and with circumspection." In re 143 (*U. P. Legislature* v. *Judiciary*) (1964)

ব্যবস্থায় ব্যবস্থা বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক বর্তমান থাকে, কারণ আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাই মন্ত্রি-পরিষদ গঠন করেন এবং দেশের শাসনভার প্রাপ্ত হন। সুতরাং সংসদের অন্যতম কার্য হইল দেশের প্রকৃত শাসক মন্ত্রি-পরিষদ বা ক্যাবিনেট গঠনে সহায়তা করা।

আইন প্রণয়ন, সরকারী আয়ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, মন্ত্রি-পরিষদকে নিয়ন্ত্রণ, অভিযোগ জ্ঞাপন ও তাহার প্রতিকার দাবি এবং বিতর্কের মাধ্যমে জনমত গঠন হইল সংসদের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্য। ইহা ব্যতীত রাষ্ট্রপতিকে সংবিধান লংঘনের অভিযোগে বিচার করিয়া পদচ্যুত, শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন, অক্ষমতা বা অসদাচারের দরুন প্রধান ধর্মাধিকরণ ও মহাধর্মাধিকরণের বিচারকগণকে পদ হইতে অপসারণ করিবার ক্ষমতাও সংসদের আছে।

ক। আইন প্রণয়নের ক্ষমতা (Law-making Powers): ইউনিয়ন তালিকা ও যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয় সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা সংসদ ভোগ করে। যুগ্ম তালিকা সম্পর্কে রাজ্য বিধানমণ্ডলেরও আইন প্রণয়নের ক্ষমতা আছে। তবে রাজ্যের আইনের সহিত সংসদের আইনের বিরোধ দেখা দিলে রাজ্যের আইন যতদূর পর্যন্ত অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয় ততদূর পর্যন্ত বাতিল হইয়া যায়—কেন্দ্রের আইনই বলবৎ থাকে।

রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয় সম্পর্কেও কতিপয় অবস্থায় সংসদ **আইন প্রণয়ন** করিতে সমর্থ। (১) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ঘোষিত জরুরী অবস্থা কার্যকর থাকাকালীন অথবা (২) আন্তর্জাতিক সন্ধির সর্তাদি পালনের জন্য প্রয়োজন হইলে রাজ্য তালিকার যে কোন বিষয় সম্পর্কে সংসদ আইন প্রণয়ন করিতে পারে। (৩) আবার রাজ্যসভা যদি দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে স্থির করে যে, জাতীয় স্বার্থেই রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয় সম্পর্কে সংসদের আইন প্রণয়ন করা উচিত তবে সংসদ ঐ বিষয় সম্পর্কে আইন প্রণয়নের অধিকারী হয়। (৪) দুই বা ততোধিক রাজ্যের আইনসভা প্রস্তাব করিয়া সংসদকে উহাদের সম্পর্কে রাজ্য তালিকাভুক্ত কোন বিষয়ের উপর আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দিতে পারে। **অবশিষ্ট বিষয়গুলি** (Residuary Powers) সম্পর্কে সংসদ আইন করার অনন্য ক্ষমতা ভোগ করে।[১] সংসদের দুই কক্ষে বিল পাস হইবার পর রাষ্ট্রপতির সম্মতির প্রয়োজন হয়। রাষ্ট্রপতি বিলে সম্মতি দিতেও পারেন, নাও দিতে পারেন। তিনি অর্থ বিল ভিন্ন অন্য বিলকে পরিষদদ্বয়ের নিকট পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরত পাঠাইতে পারেন।

সম্মতিপ্রদান ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা: দ্বিতীয়বার পাসের পর ঐ বিল যখন তাহার নিকট উপস্থিত করা হয়, তখন তাহাতে সম্মতিজ্ঞাপন করিতে তিনি বাধ্য থাকেন। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, সংবিধান সংশোধনসংক্রান্ত বিল পার্লামেণ্টে পাস হইলে তাহাতে রাষ্ট্রপতি সম্মতি দিতে বাধ্য থাকেন।

১. ৩১ পৃষ্ঠা দেখ।

অবশ্য রাষ্ট্রপতির বিল না-মঞ্জুর করার ক্ষমতা একপ্রকার **আনুষ্ঠানিক ক্ষমতা**। এই প্রসংগে আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সংসদের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা কতকটা তত্ত্বগত ব্যাপার, কারণ আইন করার সিদ্ধান্ত, আইনের খসড়া প্রণয়ন এবং দলীয় সমর্থনের বলে উহাকে সংসদ কর্তৃক পাস করানো **সমস্তই ক্যাবিনেটের** উদ্যোগে এবং পরিচালনায় সম্পাদিত হয়।

ক. ১. অর্পিত ক্ষমতাবলে আইন প্রণয়ন: যে-সকল ক্ষেত্রে আইন করার ক্ষমতা শাসন বিভাগের হস্তে অর্পিত (delegated) হয় সেই সকল ক্ষেত্রে সংসদ অর্পিত ক্ষমতাবলে প্রণীত নিয়মকানুনকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। এই উদ্দেশ্যে **'অধস্তন আইনসংক্রান্ত কমিটি'** (Committee on Subordinate Legislation) নামে একটি কমিটি রহিয়াছে। বর্তমানে সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রের কার্য দ্রুত বাড়িয়া গিয়াছে। এই কারণে প্রত্যেক দেশেই ব্যবস্থা বিভাগ শাসন বিভাগের হস্তে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সমর্পণ করিতে বাধ্য হইতেছে। কিন্তু যাহাতে অর্পিত ক্ষমতার অপপ্রয়োগ না ঘটে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্যই অধস্তন আইনসংক্রান্ত কমিটি নিয়োগ করা হয়। অতএব, ভারতেও ইহা করা হইয়াছে।

খ। সরকারী আয়ব্যয় নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা (Financial Powers): গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় সরকারী আয়ব্যয়ের উপর আইনসভার নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হয়।

সংবিধানের ব্যবস্থা: সংবিধানে এ-সম্পর্কে যে ধারা রহিয়াছে তাহাতে **সংসদের আইন** দ্বারা অনুমোদিত না হইলে কোন ব্যয় বা করধার্য বা করসংগ্রহ করা সম্ভব হয় না।

লোকসভারই ক্ষমতা: পার্লামেণ্টের এই ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে লোকসভারই ক্ষমতা। কারণ, অর্থ বিল সম্পর্কে রাজ্যসভা লোকসভার সিদ্ধান্তকে অতিক্রম করিতে পারে না।

খ. ১. ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা: আমাদের এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, সংসদের নিয়ন্ত্রণক্ষমতা নানাভাবে সীমাবদ্ধ। **সরকারের সুপারিশ ব্যতীত কোন ব্যয়মঞ্জুরীর দাবি বা করধার্যের প্রস্তাব করা যায় না।** আবার অনেক ব্যয় আছে যাহা 'কেন্দ্রীয় সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য'—অর্থাৎ ঐ ব্যয় প্রতি বৎসর ভোটের সাহায্যে নির্ধারিত হয় না। সরকারী আয়ব্যয় সম্পর্কে লোকসভার ক্ষমতা হইল ব্যয় হ্রাস বা না-মঞ্জুর করার অথবা কর হ্রাস বা বিলোপ করার। এক্ষেত্রেও দলীয় নিয়মানুবর্তিতা, বাজেটের জটিলতা, সময়ের অভাব ইত্যাদি কারণের জন্য শাসন বিভাগই আসল নিয়ন্ত্রক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

খ ২. নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি: তবুও সংসদ, বিশেষ করিয়া লোকসভা, সরকারী আয়ব্যয়কে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। সরকারী আয়ব্যয়-ব্যবস্থা ঠিকমত পরিচালিত হইতেছে কি না, তাহা দেখিবার জন্য **লোকসভার দুইটি কমিটি** আছে।[১] মন্ত্রিগণ

---

১. (i) Committee on Public Accounts, and (ii) Committee on Estimates

এই কমিটির সদস্য হইতে পারেন না। সংসদের নির্দেশ উপেক্ষা করা হইলে, অর্থ অপচয় করা হইলে, বেআইনীভাবে অর্থব্যয় করা হইলে এবং ব্যয়সংক্ষেপের প্রচেষ্টা না করা হইলে কমিটিদ্বয় সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং কিভাবে আয়ব্যয়সংক্রান্ত বিষয় পরিচালনা করিতে হইবে সে-সম্বন্ধে লোকসভার মারফত শাসন বিভাগকে নির্দেশ দেয়।

গ। শাসন-বিভাগকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা (Power of Controlling the Executive) : সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করা সংসদের অন্যতম কার্য বলিয়া উল্লেখ করা হয়। সংবিধান অনুসারে মন্ত্রি-পরিষদ লোকসভার নিকট যৌথভাবে দায়িত্বশীল। লোকসভায় অনাস্থা প্রস্তাব পাস হইলে অথবা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মন্ত্রি-পরিষদের পরাজয় ঘটিলে মন্ত্রি-পরিষদ ক্ষমতাচ্যুত হয়। বর্তমান সময়ে অবশ্য দলীয় ব্যবস্থার ফলে মন্ত্রি-পরিষদের লোকসভায় পরাজয়ের সম্ভাবনা অতি অল্প।[১]

তবে সংসদে বিতর্ক ও সমালোচনার মাধ্যমে মন্ত্রি-পরিষদকে সংযত রাখিতে সমর্থ হয় এবং এখানেই সংসদের সার্থকতা, এ-বিষয়ে সংসদের যথেষ্ট সুযোগও রহিয়াছে।

গ. ১. নিয়ন্ত্রণক্ষমতার ব্যাপকতা : খবরাখবরের জন্য মন্ত্রীদের (১) প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা, (২) রাষ্ট্রপতির উদ্বোধনী বক্তৃতার উপর বিতর্ক, (৩) মুলতবী প্রস্তাব, (৪) নিন্দাসূচক প্রস্তাব, (৫) অনাস্থা প্রস্তাব, (৬) বাজেট আলোচনা ইত্যাদির সাহায্যে সংসদ অভিযোগ জ্ঞাপন ও সরকারের সমালোচনা করিয়া থাকে। সংসদের যুক্ত অধিবেশনে রাষ্ট্রপতি যে বক্তৃতা প্রদান করেন তাহাতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে সরকারী নীতি ও কর্মসূচীর উল্লেখ থাকে ; এই বক্তৃতা লইয়া যে বিতর্ক চলে তাহাতে সরকারী দলকে সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হয়। আবার যখন কোন গুরুত্বপূর্ণ জরুরী বিষয়ের আলোচনার প্রয়োজন হয় তখন যে-কোন সদস্য মুলতবী প্রস্তাব (a motion for the adjournment of the House) আনয়ন করিতে পারেন। এরূপ প্রস্তাব সম্পর্কে সরকারকে সতর্ক হইয়া চলিতে হয়, কারণ ইহার অর্থ হইল লোকসভা সরকারের প্রতি আস্থা হারাইয়াছে। বিষয়টি বিশেষ জরুরী না হইলে সংক্ষিপ্ত আলোচনার জন্য সভার দৃষ্টি আকর্ষণ (Calling Attention) করা যাইতে পারে। ১৫ দিনের নোটিশ দিয়া জনসাধারণের স্বার্থসম্পর্কিত যে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রস্তাব আনয়ন করিবার অধিকার সংসদের প্রত্যেক সদস্যের আছে। এরূপ প্রস্তাব পাস হইলে উহাকে কার্যকর করিবার জন্য স্পীকার উহা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর নিকটে প্রেরণ করেন। রাষ্ট্রপতির উদ্বোধনী বক্তৃতার উপর ভিত্তি করিয়া সদস্যগণ সরকারী নীতি ও কর্মপদ্ধতির সমালোচনা এবং অভিযোগ জ্ঞাপন করিয়া থাকেন। বাজেট পেশ কালেও এই সুযোগ মিলে।

গ. ২. সরকারী প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটি : সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করিবার আর একটি উপায় হইল সরকারী প্রতিশ্রুতিসংক্রান্ত কমিটি (Committee on

---

১. ১৭৩ পৃষ্ঠা দেখ।

Government Assurances)। **মন্ত্রীরা লোকসভার যে-সকল প্রতিশ্রুতি দেন** তাহা এই কমিটি পরীক্ষা করিয়া দেখে এবং কতদূর এই সকল প্রতিশ্রুতি কার্যকর করা হইয়াছে এবং করা হইয়া থাকিলে সময়মত করা হইয়াছে কি না সেই সম্পর্কে লোভসভার নিকট রিপোর্ট প্রদান করে।

এই কমিটি সংসদীয় বিষয়সংক্রান্ত মন্ত্রিদপ্তর (Ministry of Parliamentary Affairs) কর্তৃক সংসদের উভয় কক্ষ হইতে সদস্য লইয়া গঠিত হয়। এই মন্ত্রিদপ্তর অনুরূপ আরও কমিটি গঠন করিতে পারে।[১]

গ. ৩. অধস্তন আইনসংক্রান্ত কমিটি: শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণের কার্যে অধস্তন বা অর্পিত আইনসংক্রান্ত কমিটিও (Committee on Subordinate Legislation) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। বর্তমানে সংসদ কার্যের চাপে শাসন বিভাগের হস্তে আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা সমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। এই ক্ষমতাকে অধস্তন আইন প্রণয়নের ক্ষমতা বলা হয়। যাহাতে এই ক্ষমতার অপ-ব্যবহার না ঘটে সেদিকে দৃষ্টি রাখাই অধস্তন আইনসংক্রান্ত কমিটির উদ্দেশ্য।

কিছুদিন পূর্বে একজন লোকপাল (Lokpal) নিয়োগ করিবার প্রস্তাব করা হয়। বলা হইয়াছিল, লোকপাল মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগের অনুসন্ধান করিবেন। প্রস্তাবটি কার্যকর করিবার ব্যবস্থা হইতেছে।

এই সকলের ফলে মন্ত্রি-পরিষদকে সংযত ও সতর্ক হইয়া চলিতে হয়, কারণ নির্বাচকদের নিকট দলের জনপ্রিয়তা হ্রাস পাইলে শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে পরাজয়েব সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে।

৮. সংসদীয় শাসন-ব্যবস্থায় বিরোধী দলের ভূমিকা (Role of the Opposition in Parliamentary System of Government): সংসদীয় শাসন-ব্যবস্থার মূলভিত্তি হইল দলীয় প্রতি-দ্বন্দ্বিতা। বিভিন্ন দল নিজ নিজ কর্মসূচীর ভিত্তিতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে এবং নির্বাচনের ফলে যে দল বা দলীয় সম্মেলন (coalition) আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে সেই দল বা সম্মেলন সরকার গঠন করে আর সংখ্যালঘু দল বা দলগুলি সরকারের বিরোধিতা করিয়া থাকে। শাসনকার্যের জন্য মন্ত্রিগণ আইনসভার নিকট— বিশেষ করিয়া আইনসভার জনপ্রিয় কক্ষের নিকট—দায়িত্বশীল থাকেন। নিম্নতর কক্ষের আস্থা হারাইলে মন্ত্রীদের পদত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু বর্তমান সময় দলীয় ব্যবস্থা, রাষ্ট্রকার্যের বিপুলতা, জটিলতা প্রভৃতির ফলে **প্রকৃত ক্ষমতা আইনসভার হাত হইতে ক্যাবিনেট বা মন্ত্রি-পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত হইয়াছে।** সুতরাং মন্ত্রি-পরিষদের আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকিলে উহার পরাজিত হওয়ার বিশেষ কোন আশংকা থাকে না।

৮.১. বর্তমানে আইনসভার প্রধান কার্য ও বিরোধী দলের প্রয়োজনীয়তা: এইজন্যই বলা হয় যে বর্তমান সময়ে আইনসভার আসল কার্য

১. *India* 1986

হইল বিতর্ক করা, সরকারের সমালোচনা করা এবং **জনসাধারণের অভিযোগ জ্ঞাপন করা।** আইনসভা এই কার্যগুলি দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিতে পারিলেই সরকার নিয়ন্ত্রিত থাকে। ইহার জন্য প্রয়োজন হয় ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী বিরোধী পক্ষের।[১] সরকারী দলকে বিরোধী পক্ষের সমালোচনার সম্মুখীন হইয়া কার্য করিতে হয়। এই সমালোচনার জন্যই শাসন-ব্যবস্থায় দুর্নীতি বা দোষত্রুটির প্রকাশ কঠিন হইয়া পড়ে, কারণ সরকারী দল জনসমর্থন হারাইবার ভয়ে এবং পরবর্তী নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার আশংকায় সতর্ক হইয়া চলে। সুতরাং বলা হয়, **গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় একদিকে যেমন সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকারী দলের প্রয়োজন, অপরদিকে আবার তেমনি প্রয়োজন হইল সংসদে সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের।**[২]

৮২. **সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিকতা:** বিরোধী দল ও সরকারী দল উভয়কেই আবার বুঝাপড়ার মনোভাব লইয়া চলিতে হয়। ইহা ব্যতীত সংসদীয় শাসন-ব্যবস্থা চলিতে পারে না। সংখ্যালঘিষ্ঠ দলকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে যে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল শাসনকার্য পরিচালনা করিবার অধিকারী। অপরদিকে আবার সরকারকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে যে বিরোধী পক্ষের সমালোচনার অধিকার রহিয়াছে। অবশ্য বিরোধী দলকে সমালোচনাব দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে—সরকারী দলের পরাজয় ঘটিলে বিকল্প সরকার গঠনের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

৮.৩. **বিরোধী দল ও গণতন্ত্র:** উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে ইহা সহজেই বুঝা যায় যে উদারনৈতিক গণতন্ত্রে বিশ্বাসী লেখকগণের মতে **বিরোধী দল না থাকিলে গণতন্ত্রের অস্তিত্বকে স্বীকার করিয়া লওয়া অযৌক্তিক।** এমন কি সর্বজনীন ভোটাধিকার (adult suffrage) এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন (majority rule) থাকিলেও গণতন্ত্র সুনিশ্চিত হয় না। এই লেখকগণ বলেন যে নাৎসী জার্মানী, ফ্যাসীবাদী ইতালী ও কমিউনিস্ট দল-শাসিত সর্বাত্মক সোবিয়েত শাসন-ব্যবস্থাতেও সার্বজনীন ভোটাধিকার ও সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন বর্তমান ছিল বা আছে। কিন্তু এই সকল দেশে গণতন্ত্রের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য বিরোধী দলের অস্তিত্ব না থাকায় এই শাসন-ব্যবস্থাগুলিকে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা বলা চলে না।

গণতন্ত্রের তিনটি বৈশিষ্ট্য: গণতন্ত্র থাকিতে হইলে তিনটি বৈশিষ্ট্যই—অর্থাৎ সর্বজনীন ভোটাধিকার, সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন ও বিরোধী দলের অস্তিত্ব বর্তমান থাকা প্রয়োজন।

এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হইলে বলিতে হয় যে সোবিয়েত ইউনিয়নে কোন গণতন্ত্র নাই, আছে কমিউনিস্ট দল পরিচালিত সর্বাত্মক শাসন-ব্যবস্থা। বিরোধী দলের

১. "...under modern conditions the concerted action of the Opposition is the best means of controlling a Government." Lord Campion : *Parliament—A Survey*

২. "Democratic Government demands not only a parliamentary majority but also a parliamentary minority." Jennings : *Cabinet Government*

অনস্তিত্বের ফলে সোবিয়েত শাসন-ব্যবস্থা অগণতান্ত্রিক। সুতরাং গণতন্ত্রের প্রধান মাপকাঠি হইল বিরোধী দলের অস্তিত্ব।[১]

৮.৪. **মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভংগি :** মার্ক্সবাদী লেখকগণের দৃষ্টিভংগি অবশ্য একটু ভিন্ন ধরনের। ইহারা বলেন, যখন কোন সমাজে স্বার্থের সংঘাত থাকে তখন বিভিন্ন স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য গড়িয়া উঠে বিভিন্ন দল। সোবিয়েত ইউনিয়নের মত দেশে শোষণের অবসানের ফলে স্বার্থের সংঘাত নাই। সুতরাং বিভিন্ন দল বা বিরোধী দলের অস্তিত্ব থাকার কারণও নাই। ইহা ছাড়া মনে রাখিতে হইবে যে সোবিয়েত দেশে আলোচনা-সমালোচনার যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে। কমিউনিস্ট দলের অভ্যন্তরে সমালোচনার সুযোগ রহিয়াছে। ইহা ছাড়া জনসাধারণ সরকারের ত্রুটিবিচ্যুতির সমালোচনা করিয়া থাকে, এমনকি নির্বাচিত প্রতিনিধিরা ঠিকমত কাজ না করিলে তাহারা প্রত্যাগমনের নির্দেশ দিতে পারে। তবে সোবিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক জীবনধারার বিরুদ্ধে কেহ কাজ করিলে তাহাকে কঠোর হস্তে দমন করা হয়।

এই দৃষ্টিকোণ হইতে বলা যায়, **গণতন্ত্রের মাপকাঠি** এই নয় যে কতকগুলি দল থাকিবে, মাপকাঠি হইল দলগুলি জনসাধারণকে শোষণের হাত হইতে মুক্তি প্রদানে কতদূর আগ্রহী—অর্থাৎ ইহাদের শ্রেণীসম্পর্ক কি।[২]

৮.৫. **ইংল্যাণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত :** আবার এমন হইতে পারে যে শাসকশ্রেণীর মধ্যেও একাধিক দল থাকিতে পারে। ইহাদের কর্মসূচীর মধ্যে বিশেষ পার্থক্য থাকে না। এই দলগুলি প্রচলিত শোষণমূলক সমাজকে অব্যাহত রাখিতে চায়। যেমন ইংল্যাণ্ডে রক্ষণশীল দল ও শ্রমিক দলের নেতৃবৃন্দ ইংল্যাণ্ডের ধনতান্ত্রিক সমাজকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে চায়। দল দুইটির মধ্যে মাত্রাগত পার্থক্য থাকিলেও কোন **গুণগত পার্থক্য** নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুইটি দলের—রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাটিক দল—বেলায় একই কথা বলা হয়। ইহাদের মধ্যে কোন মৌল পার্থক্য নাই। উভয় দলই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখিতে সপ্রচেষ্ট। এই সকল দলের যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে তাহা হইলে ক্ষমতা ও আসন দখলের লড়াই।[৩]

১. "Universal suffrage and majority rule may be essential to democracy, but they do not inevitably produce it and they do not mark it off from other forms of government···*Our idea of democracy is that Opposition to the government...is not only permissible but also essential*" (italics ours) K. C. Wheare : *Parliament and Politics* ; Refer also Ernest Barker ; *The Party System.*

২. "The traditional view of bourgeois scholars that democracy is indentical with multiplicity of parties is either naive or hypocritical. The yardstick of democracy is not the number of political parties, but their class basis and the sincerity of their desire to fight to the finish for the emancipation of working class and for the building of socialism and communism."...V. Chkhikvadze ; *The State, Democracy and Legality in the USSR.*

৩. "Opposition and rivalry between bourgeois parties is largely confined to the struggle for office and seats ; it does not in any way affect the foundation of monopoly domination." Chkhikvadze : *The State, Democracy and Legality in the USSR* ; Refer also D. N. Sen ; *From Raj to Swaraj*

এখানে উল্লেখ্য যে সমাজতান্ত্রিক দেশেও একাধিক দল থাকিতে পারে।[১]

তবে ইহাদের সকলেরই লক্ষ্য হইবে সমাজতন্ত্রকে গড়িয়া তোলা। সুতরাং কমিউনিস্ট দলের সহিত বিরোধিতা থাকার কোন প্রশ্নই উঠে না।

পরিশেষে, একথা মার্ক্সবাদীরা স্বীকার করেন যে উদারনৈতিক ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্রে বিরোধী পক্ষের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে। তবে বিরোধী পক্ষকে শ্রমজীবীদের প্রতিনিধি এবং ধনতন্ত্রের অবসান ঘটাইতে বদ্ধপরিকর হইতে হইবে। (Opposition is as a rule progressive, if it is directed towards the abolition of capitalist domination.—Chkhikvadze)

উদারনৈতিক গণতন্ত্রের সমর্থকগণ কিন্তু মনে করেন যে বিরোধী দল থাকিলেই প্রকৃত গণতন্ত্র বজায় থাকে। এই বিরোধী দল সরকারী দলের ত্রুটিবিচ্যুতি জনসমক্ষে প্রচার করিয়া সরকারী দলকে সংযত রাখে এবং জনগণের অভিযোগের প্রতিবিধান করে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, এই সমর্থকগণের অন্যতম অনুমান হইল যে উভয় দলই—সরকারী ও বিরোধী দল—বুঝাপড়ার ভিত্তিতে কাজ করিবে এবং সমাজের মৌল বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একমত পোষণ করিবে। তবে বলিতে হয় যে, উদারনৈতিক ধনতন্ত্রে বিশ্বাসী লেখকগণের এই অনুমান ততক্ষণ পর্যন্ত কার্যকর থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না সামাজিক, আর্থিক ও সাংস্কৃতিক সংকট প্রবল হইয়া দাঁড়ায়। ইংল্যাণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই সংকটের সম্ভাবনা রহিয়া গিয়াছে। কারণ, এই দুইটি দেশেই ধনতন্ত্র নানাভাবে সংকুচিত হইয়া পড়িয়াছে এবং জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটাইতে পারিতেছে না। ইহা অনস্বীকার্য যে, **উদারনৈতিক ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা সংকটের সম্মুখীন।**

৯. ভারতীয় পার্লামেন্টে বিরোধী দলের ভূমিকা (Role of the Opposition in the Indian Parliament):

দাবি করা হয় যে ভারতে একাধিক বিরোধী দল থাকায় শাসক দল স্বৈরাচারী হইতে পারে না, গণতন্ত্রও সুরক্ষিত হইয়াছে। এই মতামত কতটা সমর্থনযোগ্য তাহার জন্য শাসক দল ও বিরোধী দলগুলির, প্রকৃতি সামান্য আলোচনার অপেক্ষা রাখে। স্বাধীনতার পর বেশীর ভাগ সময়ই কংগ্রেস দল ও পরে কংগ্রেস (ই) দল শাসনক্ষমতায় আসীন ছিল এবং অধিকাংশ সময় ইহার সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল বিপুল।

শাসক দলের নীতি : এই শাসক দলের নীতি হইল ভারতে বিবর্তনমূলক পদ্ধতিতে সমাজতন্ত্র প্রবর্তিত করা— অর্থাৎ জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা।

ইহা ব্যক্তিগত মালিকানার (ownership of means of production) অবসান চায় না, চায় মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থার প্রবর্তন। এই নীতির ফলে প্রচলিত সামাজিক সম্পর্কের কোন মৌল পরিবর্তন হয় না। শাসক দল ছাড়া রহিয়াছে বিরোধী দলগুলি, যাহাদের অধিকাংশের কোন সুস্পষ্ট নীতি ও কর্মসূচী নাই।

১. "A one-party system is not an obligatory feature of socialism." Chkhikvadze

তিন শ্রেণীর বিরোধী দল. বিরোধী দলগুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়: কতকগুলি দল আছে যেগুলি বিশেষমাত্রায় দক্ষিণপন্থী। এই দলগুলির অভিযোগ হইল যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত শাসক দল সমাজের আমূল সংস্কারের দিকে ঝুঁকিয়াছে, এবং কমিউনিস্ট মতবাদের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। এই দল কমিউনিস্ট দেশ—সোবিয়েত ইউনিয়ন (এবং চীনের সংগে) আঁতাত করিয়া চলিয়াছে। এই সকল দল অবশ্য ব্যক্তি-স্বাধীনতার নামে ব্যক্তিগত মালিকানা সংরক্ষণের পক্ষপাতী।

দ্বিতীয় শ্রেণীর বিরোধী দলগুলি বর্তমান সরকারের সমালোচনা করিলেও শাসক দলকে সমর্থন করিয়া চলে।

তৃতীয় শ্রেণীর বিরোধী দলগুলি সমাজের আমূল সংস্কারের কথা বলে এবং ধনতন্ত্রের অবসান ঘটাইয়া সাম্যবাদী সমাজ প্রবর্তিত করিতে আগ্রহী। এই দলগুলির মধ্যে কমিউনিস্ট দলের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।[১]

ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তে পৌছান যায় যে শাসক দল অধিকাংশ বিরোধী দল অবস্থিত সমাজকে অব্যাহত রাখিতে চায়; তবে ইহারা কিছু কিছু সংস্কারের কথা বলিয়া থাকে।

৯.১. বিরোধী দলসমূহের মধ্যে শৃংখলার অভাব: দেখা যায় যে দুই কমিউনিস্ট দল, বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক দল, ফরওয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি কয়েকটি দল ছাড়া অন্যান্য বিরোধী দল সুশৃংখলিত ও সুসংগঠিত নয়। ইহা ছাড়া শৃংখলার অভাবে **দলত্যাগ** (defection) লাগিয়াই আছে, যদিও সংবিধানের ৫২তম সংশোধন (১৯৮৫) দ্বারা দলত্যাগ **নিষিদ্ধ** করা হইয়াছে। আবার দলীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে ক্ষমতার জন্য কলহবিবাদের বিরতিও নাই, এবং ব্যক্তিগত স্বার্থে প্রায়শই নিত্যনূতন গোষ্ঠী-উপদল গজাইয়া উঠিতেছে। এই সকলের ফলে কোন শক্তিশালী বিরোধী দল গঠিত হইতেছে না, বা ন্যূনতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে বিরোধী দলগুলি ঐক্যবদ্ধ হইয়া শাসক দলের বিরোধিতা করিতে পারিতেছে না। ইন্দিরা গান্ধীর সময় হইতে বর্তমানে রাজীব গান্ধীর সময় পর্যন্ত এ একই অবস্থা চলিতেছে।

৯.২. সাম্প্রদায়িক ও আঞ্চলিক দল: উপরি-উক্ত তিন ধরনের দলগুলি ছাড়া সাম্প্রদায়িক ও আঞ্চলিক স্বার্থের ভিত্তিতে গঠিত দল রহিয়াছে।

সুতরাং বলা যায়, ভারতীয় সংসদীয় শাসন-ব্যবস্থায় বিরোধী দলের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইলেও এখন পর্যন্ত সংসদ ও রাজ্য আইনসভাগুলিতে সুসংহত ঐক্যবদ্ধ বিরোধী দল গড়িয়া উঠিতে পারে নাই।[২] বস্তুত, একদিক দিয়া **প্রকৃত বিরোধী দল নাই বলিলেই চলে,** কারণ **কোন বিরোধী দলই এককভাবে বিকল্প সরকার**

১. Refer Gopalan's Article entitled Opposition in *Indian Parliament* edited by A. B. Lal

২. "The absence of a well-knit and strong opposition is the chief defect in our Parliament and State Legislatures." Dr. L. M. Singhvi in *Parliament and Administration in India* (*edited by Dr. L. M. Singhvi*)

(alternative government) গঠনের আশা রাখে না। ইহার ফলে বিরোধী দলগুলি দায়িত্বের সহিত সমালোচনা করে না এবং গঠনমূলক পরামর্শও প্রদান করে না।[১] দু'একবার ছাড়া (চতুর্থ ও ষষ্ঠ) প্রথম হইতে অষ্টম সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত লোকসভায় কংগ্রেস দল এত বিপুলসংখ্যক আসন দখল করিতে সমর্থ হয় যে উহার শক্তির সহিত অন্য কোন দলের তুলনাই করা চলে না। ইহা ব্যতীত সব সময়েই অন্যান্য দলকে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন এবং পক্ষান্তরে কংগ্রেসকে দেখা গিয়াছে উহাদের তুলনায় ঐক্যবদ্ধ। রাজীব গান্ধীর বিরুদ্ধে অভ্যন্তরীণ বিরোধিতা সত্ত্বেও এই অবস্থার খুব একটা পরিবর্তন ঘটে নাই—বিরোধিতা কখনও বিদ্রোহে পরিণত হয় নাই। শাসনকার্য পরিচালনা ও আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত পূর্বাভিজ্ঞতাও কংগ্রেস দলের অধিক। পরিশেষে, এখন পর্যন্ত বিরোধী দলগুলির মধ্যে কমিউনিস্ট দল, বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল, ফরওয়ার্ড ব্লক ব্যতীত অন্য কোন দলের সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী নাই এবং কমিউনিস্ট দল পরস্পর বিরোধী দুই অংশে বিভক্ত ছিল। বর্তমানে অবশ্য দুই অংশের মধ্যে কতকটা সমঝোতা হইয়াছে। এই সকল কারণে সরকারী দল বিরোধী দলগুলির সমালোচনা ও বিরোধিতাকে ততটা গুরুত্ব প্রদান করে নাই। অনেক ক্ষেত্রেই মন্ত্রীরা নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার কথা মনে করিয়া বিরোধী পক্ষের প্রশ্নজিজ্ঞাসা ও সমালোচনায় অসহিষ্ণু হইয়া পড়িতেন এবং বিরোধী দলের বক্তব্যের প্রতি কর্ণপাত করিতে চাহেন নাই। অপরদিকে বিরোধী দলগুলি দায়িত্বের সহিত কর্তব্য পালন করিতে পারে নাই। বেশীর ভাগ সময় ইহারা হৈহল্লা করিয়া সংসদের কাজে বাধার সৃষ্টি করিতে থাকে এবং সময়ের অপচয় ঘটায়। এমনকি সংসদের বাহিরেও বিশৃংখলার সৃষ্টি করে।[২] ইহার কারণও আছে। বিরোধী দলগুলি ঐক্যবদ্ধ নয় এবং বিকল্প সরকার গঠনের আশাও রাখে না, এবং সরকারও বিরোধী দলগুলির বক্তব্যকে সহানুভূতির সহিত বিচারবিবেচনা করে না।

চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের (১৯৬৭) ফলে লোকসভায় কংগ্রেস দলের প্রাধান্য হ্রাস পাইলে[৩] বিরোধী দলগুলির সম্মুখে সংঘবদ্ধ ও সুগঠিত হইবার সুযোগ উপস্থিত হয়। মতবিরোধ, দৃষ্টিভংগির পার্থক্য, সুবিধাবাদী নীতি ইত্যাদির জন্য তাহারা এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে পারে নাই। ইহার পর (১৯৬৯) কংগ্রেস দুই অংশে বিভক্ত হইয়া পড়িলে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পরিচালিত কংগ্রেস সরকার সংখ্যালঘিষ্ঠ দলে পরিণত হয়। এই পরিস্থিতিও বিরোধী দলগুলি কাজে লাগাইতে পারে নাই।

---

১. "In our country for want of an organised Opposition able to replace the Government, the criticism of the Opposition groups is becoming irresponsible and impracticable." Dr. L. M. Singhvi

২. "Opposition groups resort to creating disturbances to drown the voice of the Ministers of the Government and to prevent them from explaining their points of view ...These disturbances encourage a resort to direct action outside Parliament. These does not augur well for the future of democracy." Dr. L. M. Singhvi

৩. বিভিন্ন রাজ্যেও কংগ্রেস দলের প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ হয় এবং পশ্চিমবংগ সহ কয়েকটি রাজ্যে অকংগ্রেসী সরকারও গঠিত হয়।

১৯৭১ সালের পঞ্চম (মধ্যবর্তী) নির্বাচনে শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস আবার পুনরুজ্জীবিত হইয়া লোকসভায় দুই-তৃতীয়াংশের অধিক আসন দখল করিতে সমর্থ হয়। ইহার ফলে বিরোধী দলগুলি একেবারে কোণঠাসা হইয়া পড়ে বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। উপরন্তু, তাহারা একরূপ পরস্পরবিরোধীও ছিল। ১৯৭৭ সালের **ষষ্ঠ সাধারণ নির্বাচনে অভূতপূর্ব ঘটনা** ঘটে: কংগ্রেস শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় এবং মাত্র ১৫৩টি আসন সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়। অপরপক্ষে জনতা দল (জনসংঘ, সোসালিস্ট দল, বি-এল-ডি, সি-এফ-ডি প্রভৃতি দল লইয়া গঠিত) উল্লেখ্য সংখ্যাধিক্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় এবং সরকার গঠন করে। **কংগ্রেস তখন বিরোধী দলের ভূমিকা গ্রহণ** করে। কিন্তু বিভিন্ন দল লইয়া গঠিত জনতা দল বেশীদিন ঐক্য বজায় রাখিতে পারে নাই—অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে জোট ভাঙিয়া যায়।

সপ্তম সাধারণ নির্বাচনে (জানুয়ারী, ১৯৮০) আবার ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস (ই) দলের সর্বপ্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, এবং অষ্টম নির্বাচনে শ্রীরাজীব গান্ধী দ্বারা পরিচালিত কংগ্রেসবিরোধী দলগুলিকে একপ্রকার পর্যুদস্ত করে। ইহার পর কংগ্রেসে অন্তর্কলহ এবং শ্রীরাজীব গান্ধীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে বিরোধী দলগুলি মোটেই কাজে লাগাইতে পারে নাই। দেখা যায়, যে যে রাজ্যে বিরোধী দলগুলির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহারা বহুলাংশে সেই রাজ্যগুলিকেই আঁকড়াইয়া আছে—সর্ব-ভারতের দিকে প্রসারী দৃষ্টিভংগি তাহাদের নাই।

৯.৩. **বর্তমানে বিরোধী দলের প্রকৃতি :** সপ্তম নির্বাচনের ফলে ইন্দিরা কংগ্রেস আবার লোকসভায় সংখ্যাধিক্য লাভ করে। ফলে অন্যান্য দল আবার বিরোধী দলে পরিণত হয়। এবারেও সরকারে বিপুল সংখ্যাধিক্য থাকায় সংসদকে ঐ দলই (কংগ্রেস) নিয়ন্ত্রিত করে। তবে বিরোধী দলগুলির ভূমিকা একেবারে অগ্রাহ্য করা যায় না। প্রধান মন্ত্রী রাজীব গান্ধী ভারতের বর্তমান সংকটকালীন অবস্থায় বিরোধী দলগুলির নেতাদের সহিত পরামর্শ করিয়া সংকটের মোকাবিলা করিতে মোটামুটি সচেষ্ট হইয়াছেন। ইহাকে একদিক দিয়া ভারতীয় গণতন্ত্রের পক্ষে শুভ লক্ষণ বলিয়া গণ্য করা চলে। বিরোধী দলগুলি কিন্তু প্রয়োজনমত হাত বাড়াইতেছে না।

মোটামুটিভাবে বলা যায়, সংসদীয় শাসন-ব্যবস্থায় সরকার আইনসভার বিরোধী দল কর্তৃক যেভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় সেইভাবে ভারতীয় সংসদ কর্তৃক সরকার নিয়ন্ত্রিত হয় না। বরং **চতুর্থ ও পঞ্চম নির্বাচনের অন্তর্বর্তীকাল ছাড়া সরকারই সংসদকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া আসিতেছে** দেখা যায়। অতএব, সুসংগঠিত বিরোধী দল না গড়িয়া উঠার দরুন সংসদীয় শাসন-ব্যবস্থাও সঠিক রূপ গ্রহণ করিতেছে না। অনেকের অভিমত যে দলীয় ব্যবস্থায় দুর্বলতা সত্ত্বেও ভারতীয় সংসদে বিরোধী দলগুলি যে মোটামুটি দক্ষতার সহিত সরকারের ত্রুটিবিচ্যুতির সমালোচনা করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহা মানিয়া লইয়াই বলা যায়, বিরোধী দলগুলি মিলিত হইয়া সরকারের বিরোধিতা করিতে সমর্থ হইলে বিরোধিতার কার্যকারিতা বাড়িয়া যাইবে এবং সংসদীয় শাসন-ব্যবস্থাও তখন সার্থক হইবে। ইহা ব্যতীত বিরোধী দলগুলির পক্ষে কর্মসূচীকে ও নীতিকে সুনির্দিষ্ট করিতে

হইবে এবং জনগণের নিকট বিকল্প কর্মসূচীকে আকর্ষণীয় করিতে হইবে। আরও বলা হয়, বিরোধী দলগুলি দুর্বল হওয়ার দরুন সংসদের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইতে পারে না। এই কারণেই সংসদে কমিটিগুলির সংখ্যাবৃদ্ধি ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি করিতে হইবে।[১]

বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আরও বলা হয় যে বিরোধী দলগুলিকে আরও দায়িত্বশীল হইতে হইবে, শুধু শাসকদলের সমালোচনা করিলেই চলিবে না। নচেৎ, বিচ্ছিন্নতাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি আরও বৃদ্ধি পাইবে। এ-ব্যাপারে কংগ্রেসকেও হাত বাড়াইতে হইবে—শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠতার রথ চালাইলেই চলিবে না। এইরূপ সমঝোতা ভারতে সংসদীয় শাসন-ব্যবস্থার সার্থকতার পথ বেশ খানিকটা প্রস্তুত করিবে।

১০. রাজ্যসভার ক্ষমতা ও কার্য এবং লোকসভার সহিত সম্বন্ধ (The Council of States—Its Powers and Functions and its Relation with the House of the People) : সংসদের পরিষদদ্বয় সকল বিষয়ে সমান অধিকার ভোগ করে না।

অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে রাজ্যসভার ক্ষমতা অতি সামান্যই, এ-বিষয়ে লোকসভাই সর্বেসর্বা।

অর্থ বিল ভিন্ন অন্য বিল পাস করা সম্পর্কে অবশ্য দুই কক্ষ সমান ক্ষমতা ভোগ করিয়া থাকে। বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বুঝিবার জন্য বিস্তৃততর আলোচনার প্রয়োজন।

ক। **অর্থ বিল (Money Bills) :** অর্থসংক্রান্ত ব্যাপার সম্বন্ধে শাসনতন্ত্রে যে-সমস্ত বিধান আছে তাহা সংক্ষেপে হইল এইরূপ : কোন অর্থ বিল (Money Bills) বা অর্থবিষয়ক বিল (Financial Bills) অথবা ইহাদের সংশোধনকে রাজ্যসভায় উত্থাপন করা যায় না—লোকসভাতেই উত্থাপন করিতে হয়। কোন বিল অর্থ বিল কি না, এই প্রশ্ন উঠিলে লোকসভার স্পীকার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন তাহাই চরম সিদ্ধান্ত হইবে। রাজ্যসভা 'বাৎসরিক আর্থিক বিবৃতি' (Annual Financial Statement) বা বাজেটের আলোচনা করিতে পারে, কিন্তু ব্যয়ের দাবি মঞ্জুর করা, বিনিয়োগ বিল পাস করা, ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে লোকসভার সিদ্ধান্তই চরম। লোকসভায় পাস হইবার পর অর্থ বিলকে রাজ্যসভার নিকট সুপারিশের (recommendations) জন্য প্রেরণ করা হয়। বিল পাইবার ১৪ দিনের মধ্যে রাজ্যসভাকে তাহার সুপারিশ-সহ বিলটিকে লোকসভার নিকট ফেরত পাঠাইতে হয়। লোকসভা ঐ সুপারিশসমূহ গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করিতে পারে। আর যদি রাজ্যসভা ১৪ দিনের মধ্যে বিলকে ফেরত না

---

১. "The conduct of proceedings is a good test of parliamentary independence, but with a weak opposition more may be required if government policy and its administration are to obtain certain and searching examination. Here the structure and working of parliamentary committees is particularly important."—W. H. Morris-Jones

পাঠায় তাহা হইলেও ধরিয়া লওয়া হয় যে বিলটি উভয় পরিষদেই পাস হইয়াছে এবং রাষ্ট্রপতির সম্মতিপ্রাপ্তির পর উহা আইনে পরিণত হয়।

বলা যায়, এ-ব্যাপারে ভারতীয় সংবিধান অস্ট্রেলিয়া ও আয়ারল্যাণ্ডের সংবিধানকেই অনুসরণ করিয়াছে।

খ। অর্থ বিল ভিন্ন অন্যান্য বিল (Bills other than Money Bills): অর্থ বিল ছাড়া অন্যান্য বিল সম্পর্কে ভারতীয় সংবিধানের ব্যবস্থা হইল যে উহাদিগকে সংসদের যে-কোন কক্ষে বা পরিষদে উত্থাপন করা যাইতে পারে। আবার অর্থ বিল ছাড়া **অন্যান্য বিল পাস করা সম্পর্কে উভয় কক্ষের ক্ষমতা সমতুল্য।** উভয়ের অনুমোদন না থাকিলে কোন বিল পাস হইতে পারে না। এক পরিষদে কোন বিল পাস হইবার পর যখন অপর পরিষদে ঐ বিল প্রেরিত হয় তখন যদি—(১) বিলটিকে প্রত্যাখান করা হয় অথবা (২) বিলটির সংশোধন সম্পর্কে দুই পরিষদের মধ্যে মতবিরোধ ঘটে অথবা (৩) বিল প্রেরণের পর ছয় মাসের অধিককাল অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও অপর পরিষদ যদি বিলকে পাস না করে তাহা হইলে ফয়সালার জন্য রাষ্ট্রপতি পরিষদদ্বয়ের যুক্ত অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন। এই যুক্ত অধিবেশনে উপস্থিত ও ভোটপ্রদানকারী সদস্যসমূহের ভোটাধিক্যে বিলটি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এরূপ যুগ্ম অধিবেশনের ব্যবস্থা অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যবস্থার অনুরূপ।

মোটামুটিভাবে বলা যায়, অর্থসংক্রান্ত বিল ভিন্ন অন্যান্য সাধারণ আইনের ক্ষেত্রে ভারতীয় সংসদের উভয় পরিষদের ক্ষমতাই সমান, এমন কি সংবিধান-সংশোধনের ক্ষেত্রেও রাজ্যসভা লোকসভার সহিত সমক্ষমতা ভোগ করিয়া থাকে। রাষ্ট্রপতির নির্বাচন ও পদচ্যুতির ব্যাপারেও রাজ্যসভার ক্ষমতা লোকসভার ক্ষমতার সমতুল্য।

রাজ্যসভার একটি বিশেষ ক্ষমতা: এই সকল ক্ষমতা ছাড়া সংবিধানে রাজ্য-সভাকে এমন বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যাহা লোকসভা প্রয়োগ করিতে পারে না। যেমন, সংবিধানের ২৪৯ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাজ্যসভা যদি উপস্থিত ও ভোটপ্রদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে এরূপ প্রস্তাব পাস করে যে জাতীয় স্বার্থে রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে সংসদের পক্ষে আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন বা সমীচীন তাহা হইলে পার্লামেণ্ট এ-বিষয় সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করিতে পারে। এইভাবে দ্বিতীয় পরিষদের প্রস্তাবের ভিত্তিতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা বণ্টনব্যবস্থাকে পরিবর্তিত করিয়া লওয়া যায়।

গ। শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ (Control of the Executive): শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে রাজ্যসভার তুলনায় লোকসভা অধিকতর শক্তিশালী।

সংবিধান মন্ত্রি-পরিষদকে লোকসভার নিকট যৌথভাবে দায়িত্বশীল করিয়াছে।

ইহার অর্থ হইল যে লোকসভায় জয়পরাজয় দ্বারা সরকারের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হইবে—রাজ্যসভায় পরাজয় মন্ত্রি-পরিষদকে ততটা স্পর্শ করে না।

১০.১. **রাজ্যসভার ক্ষমতার যৌক্তিকতা**: প্রশ্ন প্রশ্ন করা যাইতে পারে, আইন পাস, ক্ষমতা বণ্টন-ব্যবস্থার পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে সংসদের দ্বিতীয় পরিষদ রাজ্যসভার হস্তে এত ক্ষমতা ন্যস্ত করা সমীচীন হইয়াছে কি না? অনেকে এই অভিমত পোষণ করেন যে রাজ্যসভা যেভাবে গঠিত তাহাতে ঐ পরিষদের হস্তে ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া ঠিক হয় নাই। দুই পরিষদের মধ্যে ক্ষমতা লইয়া বিরোধের ফলে সময় ও শক্তিরই অপচয় হইবে, কোন উপকার সাধিত হইবে না।

ইহা ব্যতীত গত কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে বলা যায় যে, দ্বিতীয় পরিষদ হিসাবে রাজ্যসভা বিশিষ্ট কোন ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে নাই; লোকসভায় যাহা একবার আলোচিত হইয়াছে তাহারই পুনরাবৃত্তি মোটামুটি দ্বিতীয় পরিষদে হইয়াছে।[১]

১০.২. **যুক্তরাষ্ট্রীয় দ্বিতীয় পরিষদের ভূমিকার প্রশ্ন**: অপরপক্ষে বলা হয় যে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে রাজ্যসভা অংগরাজ্যগুলির প্রতিনিধিত্ব ও স্বার্থ সংরক্ষিত করে; সুতরাং রাজ্যসভার ক্ষমতা সম্পর্কে আপত্তি করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু এ-যুক্তির বিশেষ কোন সারবত্তা নাই; যুক্তরাষ্ট্রীয় দ্বিতীয় পরিষদ হিসাবে কার্য করিতে হইলে প্রত্যেক অংগরাজ্য হইতে সমান সংখ্যক প্রতিনিধি লইয়া দ্বিতীয় পরিষদ সংগঠিত হওয়া প্রয়োজন। ভারতীয় সংবিধানে এ-ব্যবস্থা করা হয় নাই। ভারতীয় রাজ্যসভা জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রত্যেক অংগরাজ্য হইতে পরোক্ষভাবে বিধানসভা কর্তৃক নির্বাচিত সদস্য লইয়া গঠিত হয়। ইহা ব্যতীত সদস্যদের একাংশ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক কেন্দ্রীয় মন্ত্রি-পরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী মনোনীত হন। সুতরাং রাজ্যসভা পৃথকভাবে অংগরাজ্যের প্রতিনিধিত্ব বা স্বার্থসংরক্ষণ করে একথা বলা ভুল।

"In a country having Cabinet Government, Parliament almost never initiates or creates, but rather only reviews and usually accepts and registers, policy." Ogg

স্মর্তব্য

১ কেন্দ্রের দ্বি-পরিষদসম্পন্ন আইনসভায় উচ্চতর পরিষদকে যুক্তরাষ্ট্রীভিত্তিক করা হয় নাই।

২. লোকসভার স্পীকার ব্রিটিশ ঐতিহ্য অনুসরণ করেন না।

৩. লোকসভায় এখনও সুসংহত ও দায়িত্বশীল বিরোধিতার ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে নাই।

৪. সংসদের দুইটি কক্ষের মধ্যে লোকসভাই অধিক শক্তিশালী—ইহা সংসদীয় গণতন্ত্রের সহিত সংগতিপূর্ণ।

১. "Composed of men similar to those who sit in the House of the People, the Council has, not surprisingly failed to evolve a distinct role for itself." Morris-Jones

অনুশীলনী

1. Describe the composition of the Indian Parliament and discuss its functions. Would you call it a sovereign body? Give your reasons.

[ভারতীয় সংসদের গঠন বর্ণনা করিয়া উহার কার্যাবলী সম্বন্ধে আলোচনা কর। উহাকে কি একটি সার্বভৌম সংস্থা বলা যায়? কারণ প্রদর্শন করিয়া উত্তর দাও।]

[প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের উত্তরের ইংগিত: ভারতীয় পার্লামেন্ট বা সংসদকে সার্বভৌম আইনসভা বলিয়া বর্ণনা করা যায় না। সার্বভৌম আইনসভা হইল সেইরূপ সংস্থা যাহার ক্ষমতা কোনমতেই সীমানির্দিষ্ট নহে। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট হইল এইরূপ আইনসভা। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় বা আধা-যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় প্রত্যেক আইনসভার ক্ষমতাই সংবিধান দ্বারা নির্দিষ্ট। অনুরূপভাবে ভারতীয় সংসদের ক্ষমতাও নির্দিষ্ট—উহাকে সংবিধান-প্রদত্ত ক্ষমতার গণ্ডির মধ্যে চলিতে হয়। সুতরাং উহাকে সার্বভৌম আখ্যা দেওয়া যায় না।... এবং ... ২০১-০৪, ২১০-২৪ ও ২৬৪-৬৬ পৃষ্ঠা।]

2. Discuss the nature of the privileges and immunities of Parliament and its members under the Constitution of India.

[ভারতীয় সংবিধানে সংসদ ও উহার সদস্যদের বিশেষ অধিকার ও অব্যাহতির প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা কর।] (২১৬-২০ পৃষ্ঠা)

3. Give in brief the position and power of Speaker of the House of the People (*Lok Sabha*).

[লোকসভার স্পীকারের (অধ্যক্ষের) পদমর্যাদা ও ক্ষমতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।]

(২১০-১৪, ২১৫ পৃষ্ঠা)

4. Explain clearly the constitutional relationship between the Council of States (*Rajya Sabha*) and the House of People (*Lok Sabha*).

(B. U. 1985; N. B. U. (Hons. 1985)

[লোকসভা ও রাজ্যসভার মধ্যে শাসনতান্ত্রিক সম্পর্ক বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা কর।] (২৩১-৩৩ পৃষ্ঠা)

5. Describe the composition of the *Rajya Sabha* and its functions.

(N. B. U. 1985)

[রাজ্যসভার গঠন ও কার্যাবলীর বর্ণনা কর।] (২০২-০৩, ২৩১-৩৩ পৃষ্ঠা)

6. Democratic government demands not only a parliamentary majority but also a parliamentary minority." Discuss this statement with reference to the role and function of the Opposition in the Indian Parliament.

["গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল থাকিলেই চলে না, সংখ্যালঘিষ্ঠ দলও প্রয়োজন।" ভারতীয় সংসদে বিরোধী দলের ভূমিকা ও কার্যাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে উক্তিটির পর্যালোচনা কর।]

(২২৪-২৫, ২২৭-৩১ পৃষ্ঠা)

7. Critically examine the role of the Opposition in the Indian Parliament.

(C. U. 1975, '80)

[সমালোচকের দৃষ্টিকোণ হইতে ভারতীয় সংসদে বিরোধী দলের ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা কর।]

(২২৭-৩১ পৃষ্ঠা)

8. Explain the channels through which the legislature in India controls the executive.

[কি কি পদ্ধতি ভারতে আইনসভাসমূহ শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে তাহা ব্যাখ্যা কর।]

(২২২-২৪ পৃষ্ঠা)

9. What are the constituent elements of the Union Parliament? Briefly discuss the relations among these elements. (C. U. 1982)

[ইউনিয়ন সংসদ কি কি অংশ লইয়া গঠিত। ঐ অংশগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক সংক্ষেপে আলোচনা কর।] (২০২-০৫, ১৭২-৭৪ এবং ২৩১-৩৩ পৃষ্ঠা)

10. What is the extent of Rajya Sabha's power regarding money bills?

(B. U. 1985)

[অর্থবিল সম্পর্কে রাজ্যসভার ক্ষমতার পরিধি কি?] (২২২-২৩, ২৩০-৩২ পৃষ্ঠা)

১৫ সংসদে আইন প্রণয়ন ও অর্থবিষয়ক কার্যপদ্ধতি

(LEGISLATIVE AND FINANCIAL PROCEDURES IN PARLIAMENT)

"A numerous assembly is as little fitted for the direct business of legislation as for that of administration." J. S. Mill

"The (House of) Commons is not a true legislature but an extension of the executive." S. E. Finer

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে রাজ্যসভা ও লোকসভার ক্ষমতা আলোচনা প্রসংগে আইন প্রণয়ন-পদ্ধতির কিছুটা বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। এখন এ-সম্বন্ধে বিস্তৃততর আলোচনা করা হইতেছে।

১. সংসদে আইন প্রণয়ন-পদ্ধতি (Legislative Procedure in Parliament) : সংবিধান অনুসারে অর্থ বিল এবং অন্যান্য অর্থসম্বন্ধীয় বিল (Money Bills and other Financial Bills) ব্যতীত অন্যান্য বিল সংসদের দুই কক্ষের যে-কোন কক্ষে উত্থাপিত করা যায় (১০৭ অনুচ্ছেদ)। কোন বিল বিনা সংশোধনে বা সংশোধিত আকারে দুই কক্ষ কর্তৃক গৃহীত না হইলে উহা সংসদের কক্ষদ্বয় কর্তৃক পাস হইয়াছে বলিয়া ধরা হইবে না। এ-বিষয়ে দুই কক্ষের মধ্যে বিরোধের ব্যাপারে সংবিধানে **বিস্তৃত নিয়মাবলী** বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। এই নিয়মাবলী অনুসারে **অর্থ বিল** ও **অন্যান্য অর্থসম্বন্ধীয় বিল** ব্যতীত অন্যান্য বিল পাস করা সম্পর্কে সংসদের **উভয় কক্ষের ক্ষমতা সমান**।

১.২. দুই কক্ষের যুক্ত অধিবেশন : যখন কোন বিল এক কক্ষ কর্তৃক গৃহীত হয় তখন উহাকে অপর কক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়। বিল পাওয়ার পর অপর কক্ষ যদি ঐ বিলকে (১) প্রত্যাখ্যান করে অথবা (২) বিলটির সংশোধন সম্পর্কে দুই কক্ষের মধ্যে শেষ পর্যন্ত মতবিরোধ ঘটে অথবা (৩) বিল প্রেরণের পর ৬ মাসের অধিককাল অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও অপর কক্ষ যদি বিলকে পাস না করে, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি দুই কক্ষের যুক্ত অধিবেশন আহ্বান জানাইয়া বিজ্ঞপ্তি দিতে পারেন। তবে ইতিমধ্যে **লোকসভা ভাঙিয়া দেওয়ার ফলে** বিলটি বাতিল হইয়া থাকিলে (lapsed by the dissolution of the House of the People) এরূপ বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যায় না।

১.৩. অসিদ্ধ বিল সম্পর্কে সংবিধানের বিধান : বিল অসিদ্ধ (Lapsing of Bills) হওয়া সম্পর্কে সংবিধানের নির্দেশ হইল যে, (১) সংসদের কক্ষদ্বয়ের অধিবেশন বন্ধ (prorogation) হওয়ার দরুন বিবেচনাধীন কোন বিল অসিদ্ধ হইয়া যাইবে না। (২) লোকসভা কর্তৃক পাস হয় নাই এমন কোন বিল রাজ্যসভার বিবেচনাধীন থাকিলে তাহা লোকসভা ভাঙিয়া গেলে অসিদ্ধ হইয়া যায় না, কিন্তু যে বিল

লোকসভার বিবেচনাধীন রহিয়াছে অথবা লোকসভায় পাস হওয়ার পর রাজ্যসভার বিবেচনাধীন রহিয়াছে তাহা লোকসভা ভাঙিয়া যাওয়ার সংগে অসিদ্ধ হইয়া যায়। (৩) অবশ্য যে-সকল বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতির অপেক্ষায় তাঁহার বিবেচনাধীন রহিয়াছে সেই সকল বিল লোকসভা ভাঙিয়া গেলেও অসিদ্ধ হইয়া যায় না।

২. সংসদে বিল পাসের বিভিন্ন পর্যায় (Different Stages in the Passing of a Bill in Parliament) : বিল উত্থাপন ও পাস করা সম্পর্কে সংসদের দুই পরিষদের ক্ষমতার আলোচনার পর যে বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়া উভয় পরিষদের বিল পাস হয় তাহার আলোচনা করা প্রয়োজন।

বেসরকারী ও সরকারী বিল : এই প্রসংগে বেসরকারী বিল (Private Member's Bills) এবং সরকারী বিল (Government Bills) এই দুই ধরনের বিলের মধ্যে **পার্থক্য** মনে রাখিতে হইবে। কারণ, এই দুই প্রকার বিল পাসের পদ্ধতির মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রহিয়াছে। যে-সকল বিল সংসদের সাধারণ সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত হয় তাহাদিগকে বেসরকারী বিল বলা হয়, আর যে-সমস্ত বিল মন্ত্রীরা উত্থাপন করেন তাহাদিগকে সরকারী বিল বলা হয়। বর্তমানে অধিকাংশ আইনই সরকারী উদ্যোগ ও তত্ত্বাবধানে উত্থাপিত ও পাস হয়। সুতরাং প্রথমে সরকারী বিল পাসের পদ্ধতিই আলোচনা করা যাইতে পারে।

২.১. সরকারী বিল পাসের পদ্ধতি—আইনের প্রস্তাব ও খসড়া রচনা : কোন্ কোন্ বিষয় সম্পর্কে বিল পাস করা হইবে কি না-হইবে, সে-সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ক্যাবিনেট। প্রয়োজন মনে করিলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিদপ্তর নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে আইন পাসের প্রস্তাব করে, অবশ্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবগুলি দলীয় নির্বাচনী কর্মসূচীর ভিত্তিতেই করিতে হয়। যাই হোক, যখন কোন আইন পাসের প্রস্তাব করা হয় তখন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিদপ্তরকে প্রস্তাবিত বিলের আর্থিক রাজনৈতিক সাংবিধানিক এবং অন্যান্য ফলাফল কি হইবে না-হইবে, তাহা **বিচার** করিয়া দেখিতে হয়। অন্যান্য মন্ত্রিদপ্তর বা রাজ্য সরকারগুলিকে প্রস্তাবিত আইন কোনভাবে স্পর্শ করিলে, উহাদের সহিতও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিদপ্তরকে **পরামর্শ** করিতে হয়। ইহা ছাড়া সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিদপ্তরকে আইনসংক্রান্ত মন্ত্রিদপ্তরের (The Ministry of Law) সহিত **পরামর্শ** করিতে হয়। এই আইন ও বিচার সংক্রান্ত মন্ত্রিদপ্তর (Minstry of Law and Justice) বিলটির আইনগত বা সাংবিধানিক দিক সম্পর্কে পরামর্শ দিয়া থাকে। ইহার পর আইনের প্রস্তাবকে ক্যাবিনেটের নিকট উপস্থিত করা হয়। ক্যাবিনেট প্রস্তাবকে অনুমোদন করিলে আইনসংক্রান্ত মন্ত্রিদপ্তরকে প্রস্তাবিত আইনের খসড়া রচনা করার অনুরোধ করা হয়। খসড়া রচনাকার্য সমাপ্ত হইলে বিলটিকে ছাপানো হয় এবং পার্লামেণ্টে উত্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়।

ক। বিল উত্থাপন ও বিলের প্রথম পাঠ (Introduction and First Reading) : সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে বিল উত্থাপনের অনুমতির জন্য প্রস্তাব করিতে হয়।

প্রথা অনুযায়ী এই পর্যায়ে কোনপ্রকার সমালোচনা হয় না এবং স্পীকার কক্ষের নিকট প্রস্তাবটিকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য উপস্থিত করেন। অনুমতি পাওয়ার পর মন্ত্রী বিলটিকে উত্থাপন করেন। উত্থাপনের পর বিলটিকে অবিলম্বে জনসাধারণের অবগতির জন্য সরকারী **গেজেটে প্রকাশিত** করা হয়। অবশ্য নিয়ম আছে যে বিল উত্থাপনের অনুমতির প্রস্তাব না করিয়া বিলটিকে স্পীকারের অনুমতিক্রমে সরকারী গেজেটে প্রকাশ করা যায়। এ-অবস্থায় মন্ত্রীকে পরে আর বিল উত্থাপনের অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন হয় না।

খ। বিলের দ্বিতীয় পাঠ ও বিলের নীতির আলোচনা (Second Reading and Discussion of the Principles of a Bill): বিল উত্থাপনের পর ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী **প্রস্তাব** করিতে পারেন যে, (ক) পরিষদ বিলটির বিচার-বিবেচনা করুক ; অথবা (খ) বিলটিকে **সিলেক্ট কমিটির নিকট প্রেরণ** করা হউক, অথবা (গ) বিলটি সম্পর্কে **জনসাধারণের মতামত** জানিবার জন্য উহাকে প্রচার করা হউক, (ঘ) ইহা ব্যতীত কতকগুলি বিল সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী **দুই কক্ষের যুক্ত কমিটির** (a Joint Committee of the Two Houses) **নিকট প্রেরণের** প্রস্তাবও করিতে পারেন। ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী যখন এই সকল প্রস্তাব করেন তখন তিনি বিলের উদ্দেশ্য, বিল পাসের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। ইহার পর বিলটির নীতি ও সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি লইয়া বিতর্ক চলে কিন্তু বিলের বিভিন্ন ধারার বিশদ আলোচনা চলে না। বিলের কোন সংশোধন প্রস্তাবও করা যায় না, তবে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর উপরি-উক্ত চারি প্রকার প্রস্তাবের যে কোনটির সংশোধন উত্থাপন করা যাইতে পারে। যেক্ষেত্রে জনমত গ্রহণের জন্য বিল প্রচারের প্রস্তাব গৃহীত হয়, সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কক্ষের কার্যদপ্তর (the Secretariat) রাজ্য সরকারগুলিকে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় বিলকে প্রকাশ করিতে এবং বিলের সহিত সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির নিকট হইতে মতামত গ্রহণ করিতে নির্দেশ দেয়।

গ। কমিটি পর্যায় (Committee Stage): মতামত সংগৃহীত এবং উহা পরিষদের সদস্যদের মধ্যে প্রচারিত হওয়ার পর ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী সাধারণত বিলটিকে কোন সিলেক্ট কমিটি বা উভয় পরিষদের যুক্ত কমিটিতে প্রেরণের প্রস্তাব করেন। তবে এখানে মনে রাখিতে হইবে যে ভারতীয় পার্লামেণ্টে যে প্রথা অনুসৃত হইতেছে তাহাতে অল্প সংখ্যক বিলকেই কমিটির নিকট প্রেরণের প্রস্তাব করা হয়।[১]

সিলেক্ট কমিটি: যখন কোন বিলকে সিলেক্ট কমিটির নিকট প্রেরণের প্রস্তাব করা হয় তখনই ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী কমিটির সদস্য যাঁহারা হইবেন তাঁহাদের নামোল্লেখ করেন। যখন যুক্ত কমিটিতে বিল যায় তখন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী যে কক্ষে বিল উত্থাপিত হইয়াছে সেই কক্ষ হইতে যাঁহারা সদস্য থাকিবেন তাঁহাদের নামোল্লেখ করেন এবং অন্য কক্ষকে যুক্ত কমিটির সদস্যদের নাম করিতে অনুরোধ জানান।

---

১. "Few Bills are referred to Select and Joint Committees and it is only with Bills of exceptional importance that such a procedure is adopted." *The Indian Parliament* (Government of India Publication)

সিলেক্ট কমিটির চেয়ারম্যান স্পীকার কর্তৃক নিযুক্ত হন।

সিলেক্ট কমিটিতে বিলের বিচারবিবেচনা: কমিটিতে প্রথম বিলটির সাধারণ আলোচনা করা হয় এবং পরে বিলের প্রত্যেকটি ধারার পুংখানুপুংখভাবে বিচারবিবেচনা চলে। কমিটির সদস্যরা সংশোধনের সুপারিশও করিতে পারেন। সাক্ষিসাবুদ গ্রহণ, কাগজপত্র তলব, সংশ্লিষ্ট স্বার্থের বক্তব্য শ্রবণ ইত্যাদি করিতে কমিটি সমর্থ। কমিটি বিলের আসল উদ্দেশ্যের বা নীতির কোন পরিবর্তন করিতে পারে না। বিলের ভাষাগত দুর্বলতা থাকিলে অথবা বিলের উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়া না থাকিলে কমিটি সংশোধনের প্রস্তাব করিয়া থাকে। কমিটিকে ইহা দেখিতে হয় যে কোন প্রচলিত আইনের সহিত বিলটির কোন বিরোধিতা আছে কি না।

ঘ। রিপোর্ট পর্যায় (Report Stage): বিচারবিবেচনার পর কমিটি তাহার রিপোর্ট রচনা করে এবং কমিটির চেয়ারম্যান ঐ রিপোর্টকে সংশ্লিষ্ট কক্ষের নিকট উপস্থিত করেন। ইহার পর ঐ রিপোর্ট ছাপানো হয় এবং রিপোর্ট ও সংশোধিত বিল সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হয়। কমিটির রিপোর্ট প্রদানের পর ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী প্রস্তাব করিতে পারেন: (১) কমিটি কর্তৃক প্রেরিত বিলের বিচারবিবেচনা করা হউক; অথবা (২) বিলকে পুনর্বার সিলেক্ট কমিটির নিকট প্রেরণ করা হউক; অথবা (৩) বিলটি জনসাধারণের মতামত গ্রহণের জন্য প্রচার করা হউক।

ঙ। বিচারবিবেচনা পর্যায় এবং বিলের ধারার আলোচনা (Consideration Stage and Clause by Clause Discussion): সিলেক্ট কমিটি কর্তৃক প্রেরিত কোন বিল সম্পর্কে বিচারবিবেচনার প্রস্তাব ভোটে গৃহীত হওয়ার পর বিলের বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে আলোচনা চলে এবং ভোট গ্রহণ করা হয়। এই পর্যায়ে **সংশোধন প্রস্তাব** করা যায়। কোন্ কোন্ সংশোধন প্রস্তাব করা যাইবে তাহা নির্ধারণ করিবার ক্ষমতা স্পীকারের রহিয়াছে, তবে তিনি ঐ ক্ষমতা প্রয়োগ নাও করিতে পারেন। এই প্রসংগে একটি বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইংল্যাণ্ডে প্রত্যেক বিলই কমিটির নিকট প্রেরণ করা হয়; কিন্তু ভারতীয় সংসদে বিলকে কোন কমিটির নিকট প্রেরণ না করিয়া ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বিলের দ্বিতীয় পাঠের সময় এই প্রস্তাব করিতে পারেন যে বিলটির বিচারবিবেচনা করা হোক। এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে, কোন কমিটির নিকট বিল প্রেরিত হয় না এবং সংশ্লিষ্ট পরিষদ সরাসরি বিলের বিভিন্ন ধারার আলোচনায় নিযুক্ত হয়।

চ। বিলের তৃতীয় পাঠ (Third Reading): যখন বিলের সকল ধারা সম্পর্কে বিচারবিবেচনা এবং ভোটগ্রহণ সমাপ্ত হয় তখন বিলের তৃতীয় পাঠ হয়। প্রস্তাব করা হয় বিলটিকে (অথবা সংশোধিত বিলকে) পাস করা হোক। এই পর্যায়ে বিলকে সামগ্রিকভাবে গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যানের প্রশ্ন লইয়া বিতর্ক চলে। মৌখিক বা আনুষ্ঠানিক সংশোধনের প্রস্তাব ভিন্ন অন্য কোন সংশোধনের প্রস্তাব করা যায় না।

ছ। অন্য পরিষদ দ্বারা বিচারবিবেচনা (Consideration by the Other Houses): বিলটি এইভাবে এক পরিষদে পাস হওয়ার পর উহাকে অপর

পরিষদের নিকট প্রেরণ করা হয়। অপর পরিষদেও অনুরূপ পদ্ধতিতে বিলটি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। বিলটি অপর পরিষদ কর্তৃক পাস করা হইলে উহা রাষ্ট্রপতির নিকট সম্মতির জন্য উপস্থিত করা হয়। রাষ্ট্রপতি সম্মতি প্রদান করিলে বিলটি আইনে পরিণত হয়। কিন্তু অপর পরিষদ বিলকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে, অথবা কোন ব্যবস্থা অবলম্বন না করিয়া ফেলিয়া রাখিতে পারে।

যেক্ষেত্রে বিলকে প্রত্যাখ্যান করা হয় বা ছয় মাস ধরিয়া ফেলিয়া রাখা হয়, সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশন আহবান করিতে পারেন এবং এই যুক্ত অধিবেশনে সংখ্যাধিক্যের ভোটে বিলটির ভাগ্য নির্ধারিত হয়।

অপর পরিষদ আবার বিলকে প্রত্যাখ্যান না করিয়া বা ফেলিয়া না রাখিয়া বিলটিকে সংশোধিত আকারে গ্রহণ করিতে পারে। এক্ষেত্রে যে কক্ষে বিলটি প্রথমে উত্থাপিত ও পাস হইয়াছে সেই কক্ষের নিকট ফেরত আসে। ফেরত আসিবার পর উত্থাপনকারী পরিষদ সংশোধন স্বীকার করিয়া লইতে পারে আবার স্বীকার নাও করিতে পারে।

যেক্ষেত্রে সংশোধন স্বীকার করিয়া লওয়া হয় না এবং দুই পরিষদের মধ্যে বিরোধ থাকিয়াই যায় সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশন আহবান করিয়া বিল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যবস্থা করিতে পারেন।

বেসরকারী বিল (Private Members' Bills): বেসরকারী বিল পাসের পদ্ধতি মোটামুটিভাবে সরকারী বিল পাসের পদ্ধতির অনুরূপ হইলেও কতকগুলি বিষয়ে কিছুটা পার্থক্য রহিয়াছে। মন্ত্রীরা ছাড়া অন্য কেহ কোন বিল উত্থাপনের অনুমতির প্রস্তাব করিতে চাহিলে তাহাকে ঐ মর্মে এক মাসের নোটিস দিতে হয়। স্পীকারের অনুমতিক্রমে ১ মাসের কম নোটিসেও বিল উত্থাপনের অনুমতি চাহিয়া প্রস্তাব করা যায়। বেসরকারী বিল আলোচনার জন্য নির্দিষ্ট দিন ধার্য করা থাকে এবং ঐ দিনেই বেসরকারী বিলসংক্রান্ত আলোচনাদি করা হয়। লোকসভায় বেসরকারী বিল ও প্রস্তাব সংক্রান্ত একটি কমিটি (a Committee on Private Members' Bills and Resolutions) আছে। কোন বেসরকারী বিল সংবিধানের সংশোধন করিতে চাহিলে তাহা লোকসভার কার্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করিবার পূর্বে ঐ বিলকে কমিটি পরীক্ষা করিয়া দেখে।

আবার উত্থাপিত সকল প্রকার বেসরকারী বিল লোকসভা কর্তৃক বিবেচিত হওয়ার পূর্বে কমিটি পরীক্ষা করে এবং উহাদের গুরুত্ব ও প্রকৃতি অনুসারে ক ও খ শ্রেণীতে বিভক্ত করে। খ শ্রেণীর বিলের তুলনায় ক শ্রেণীর বিলগুলি প্রাধান্য লাভ করে। বিলের আলোচনার সময়ও কমিটি স্থির করিয়া দেয়। ইহা ব্যতীত যেক্ষেত্রে কোন বেসরকারী বিল সম্পর্কে আপত্তি তোলা হয় যে উহা লোকসভার আইন প্রণয়ন ক্ষমতার বহির্ভূত, সেক্ষেত্রে কমিটি বিলটিকে পরীক্ষা করিয়া দেখে। কমিটিকে তাহার রিপোর্ট লোকসভার নিকট পেশ করিতে হয়।

অন্যান্য ব্যাপারে বেসরকারী বিলসংক্রান্ত পদ্ধতি সরকারী বিল পাসের পদ্ধতিরই অনুরূপ।

জ। বিলে সম্মতিজ্ঞাপন (Assent to Bills): সংসদের কক্ষদ্বয় কর্তৃক বিল পাস হওয়ার পর উহাকে রাষ্ট্রপতির নিকট সম্মতির জন্য প্রেরণ করা হয় এবং **রাষ্ট্রপতির সম্মতি পাইলে তবেই উহা আইনে (Act) পরিণত হয়।** এ-সম্বন্ধে পরে আবার উল্লেখ করা হইতেছে।

৩. অর্থ বিল সম্পর্কে বিশেষ পদ্ধতি (Special Procedure in respect of Money Bills) : বিল পাসের উপরি-উক্ত 'অর্থ বিল' (Money Bills) এবং '**অন্যান্য অর্থসম্পর্কিত বিলে'র** (Other Financial Bills) ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য নহে—ইহাদের সম্পর্কে সংবিধানে বিশেষ ব্যবস্থা রহিয়াছে।

৩.১. অর্থ বিলের সংজ্ঞা (Definition of a Money Bills) : সংবিধানের ১১০ অনুচ্ছেদ অনুসারে যে বিলে **নিম্নলিখিত সকল বা যে-কোন বিষয়ের ব্যবস্থা** থাকে, 'মাত্র' সেই বিলকে অর্থ বিল (a Money Bill) বলিয়া গণ্য করা হইবে ; (ক) কোন কর ধার্য, বিলোপ, পরিহার, পরিবর্তন বা নিয়ন্ত্রণ . (খ) ভারত সরকার কর্তৃক ঋণ গ্রহণ বা কোন প্রত্যাভূতি (guarantee) প্রদানের নিয়ন্ত্রণ, অথবা ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত বা গ্রহণীয় কোন আর্থিক দায়িত্ব সম্পর্কিত আইনের সংশোধন , (গ) ভারতের সঞ্চিত তহবিল বা আকস্মিকতা তহবিলের (Contingency Fund) জিম্মা (custody), ঐরূপ তহবিলে অর্থ প্রদান বা উহা হইতে অর্থ উঠাইয়া লওয়া , (ঘ) ভারতের সঞ্চিত তহবিল হইতে অর্থ বিনিয়োগ ; (ঙ) কোন ব্যয় ভারতের সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য বলিয়া ঘোষণা, অথবা ঐরূপ কোন ব্যয়ের বৃদ্ধি ; (চ) ভারতের সঞ্চিত তহবিল বা ভারতের সরকারী গণিতক খাতে (public account) অর্থপ্রাপ্তি কিংবা ঐরূপ অর্থের জিম্মা বা নির্গম অথবা ইউনিয়ন বা কোন রাজ্যের হিসাব পরীক্ষা , অথবা (ছ) উপরি-উক্ত (ক) হইতে (চ) পর্যন্ত বর্ণিত যে-কোন বিষয়ের প্রাসংগিক (incidental) কোন বিষয়।[১]

৩.২. সংজ্ঞার তাৎপর্য : অর্থ বিলের উপরি-উক্ত সংজ্ঞায় 'মাত্র' শব্দটির তাৎপর্য মনে রাখা প্রয়োজন। ইহার দ্বারা বুঝানো হইয়াছে যে, কোন বিল 'অর্থ

১. "..a Bill shall be deemed to be a Money Bill if it contains *only* provisions dealing with all or any of the following matters, namely :— (*a*) the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax ; (*b*) the regulation of the borrowing of money or the giving of any guarantee by the Government of India, or the amendment of the law with respect to any financial obligations undertaken or to be undertaken by the Government of India ; (*c*) the custody of the Consolidated Fund or the Contingency Fund of India, the payment of moneys into or the withdrawal of moneys from any such Fund ; (*d*) the appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of India ; (*e*) the declaring of any expenditure to be expenditure charged on the Consolidated Fund of India or the increasing of the amount of any such expenditure ; (*f*) the receipt of money on account of the Consolidated Fund of India or the public account of India or the custody or issue of such money or the audit of the accounts of the Union or of a State ; or (*g*) any matter incidental to any of the matters specified in sub-clauses (*a*) to (*f*)." Article 110 of the *Indian Constitution*.

বিল' বলিয়া পরিগণিত হইতে হইলে উহাতে উপরি-বর্ণিত (ক) হইতে (ছ) পর্যন্ত বিষয়গুলি ছাড়া অন্য কোনি বিষয় থাকিবে না। এই বিষয়গুলির সহিত অন্যান্য বিষয় কোন বিলের অন্তর্ভুক্ত করা হইলে তাহাকে অর্থ বিল বলিয়া গণ্য করা হইবে না। বিলের বিষয়বস্তু যদি মাত্র নিম্নলিখিত বিষয়গুলির মধ্যে কোনটি হয় তাহা হইলেও উহাকে অর্থ বিল বলিয়া ধরা হইবে না: (১) জরিমানা বা অন্য কোন আর্থিক দণ্ড ধার্য ; অথবা (২) লাইসেন্সের জন্য বা কৃত সেবার জন্য (for serv:ces rendered) ফী দাবি বা প্রদান ; অথবা (৩) কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা কর্তৃক স্থানীয় উদ্দেশ্যে কোন কর ধার্য, বিলোপ, পরিহার, পরিবর্তন বা নিয়ন্ত্রণ।

৩৩. **অর্থ বিল পাসের পদ্ধতি (Procedure for Pa‹sing Money Bills): অর্থ বিলের উত্থাপন (Introduction of Money Bills):** অন্যান্য বিল পাসের পদ্ধতি হইতে অর্থ বিল (Money Bills) পাসের পদ্ধতি যে ভিন্ন তাহার উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে।

রাজ্যসভায় অর্থ বিল উত্থাপন করা যায় না, মাত্র লোকসভাতেই যায়।

এই ব্যবস্থা গণতন্ত্রসম্মত, কারণ গণতান্ত্রিক নীতি অনুসারে কর ধার্য, সরকারী ব্যয় ইত্যাদি সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব করিবার ক্ষমতা জনপ্রিয় কক্ষের হস্তেই ন্যস্ত থাকা সমীচীন। আবার ইংল্যাণ্ডের সংসদীয় নীতি অনুযায়ী ভারতীয় সংবিধানে নির্দেশ রহিয়াছে যে কোন অর্থ বিল (যাহার বিষয়বস্তু উপরি-উক্ত অর্থ বিলের সংজ্ঞার (ক) হইতে (চ) বিষয়গুলির যে-কোনটির সহিত সম্পর্কিত) রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ছাড়া উত্থাপন করা যাইবে না।

'সরকারই অর্থ বিল উত্থাপনের অধিকারী' ইহার তাৎপর্য হইল যে অর্থ বিলের উত্থোক্তা হইবে সরকার—অন্য কেহ নহে। ইহার সপক্ষে বলা হয়, এই ক্ষমতার দরুন সরকারের পক্ষে দায়িত্ব কার্যকর করার সুবিধা হয়। ইহা ব্যতীত বেসরকারী সদস্যগণকে অর্থ বিল উত্থাপনের ক্ষমতা দেওয়া হইলে বাজেটে বিশৃংখলা দেখা দেওয়ার স: বনা থাকে।

৩৪ **উত্থাপনের পরবর্তী বিভিন্ন পর্যায় (Other Stages after Introduction):** উত্থাপনেব পর বিল পাসের অন্যান্য পর্যায়ের মধ্য দিয়া অর্থ বিল লোকসভায় গৃহীত হয়। তবে মনে রাখা প্রয়োজন, উত্থাপনের পর দ্বিতীয় পাঠের সময় অর্থ বিলকে কোন যুক্ত কমিটিতে প্রেরণের প্রস্তাব করা যায় না।

লোকসভা কর্তৃক পাস হওয়ার পর অর্থ বিলকে সুপারিশের (recommendations) জন্য রাজ্যসভার নিকট প্রেরণ করিতে হয়।

রাজ্যসভা বিলকে প্রত্যাখ্যান বা সংশোধন করিতে পারে না, বিল সম্পর্কে মাত্র সুপারিশ পাঠাইতে পারে।

বিল পাওয়ার তারিখ হইতে ১৪ দিনের মধ্যে রাজ্যসভাকে তাহার সুপারিশসহ বিলকে লোকসভার নিকট ফেরত পাঠাইতে হইবে। লোকসভা ঐ সুপারিশ গ্রহণ

কিংবা প্রত্যাখ্যান করিতে পারে। **উভয় ক্ষেত্রেই** বিলটি দুই কক্ষ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবে। আবার এমনও হইতে পারে যে বিল প্রাপ্তির পর ১৪ দিনের মধ্যে রাজ্যসভা লোকসভার নিকট বিলকে ফেরত পাঠাইল না। এরূপ হইলে ধরিয়া লইতে হইবে যে **উভয় কক্ষই বিলকে পাস করিয়াছে**।

৩.৫. লোকসভার মোটামুটি একচেটিয়া ক্ষমতা : সংবিধানের এই সকল নিয়মের মোট অর্থ দাঁড়ায় যে **অর্থ বিল সম্পর্কে লোকসভাই প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী**—রাজ্যসভার কোন উদ্যোগ বা কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা নাই। ইহা মাত্র সুপারিশ করিতে সমর্থ এবং সুপারিশ গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করা লোকসভার উপর নির্ভর করে। আবার **কোন বিল অর্থ বিল কিনা,** সে-সম্পর্কে যদি মতবিরোধ দেখা দেয় তবে লোকসভার স্পীকারের সিদ্ধান্তই চরম বলিয়া গণ্য হইবে। অর্থাৎ, স্পীকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কেহ কোন প্রশ্ন তুলিতে পারিবে না—এমনকি আদালতে কিংবা সংসদের কোন কক্ষেও না। সংবিধানে [১১০ (৪) অনুচ্ছেদ] আরও নির্দেশ রহিয়াছে যে অর্থ বিল যখন রাজ্যসভার নিকট প্রেরিত হইবে তখন ঐ বিলটি যে অর্থ বিল সেই মর্মে স্পীকারের একটি সার্টিফিকেট (certificate) থাকিবে।[১]

সংসদের পদ্ধতিগত ও কার্য পরিচালনার (Rules of Procedure and Conduct of Business) নিয়মকানুনে বলা হইয়াছে লোকসভা কর্তৃক অর্থ বিল প্রেরিত হওয়ার পর যথাসম্ভব শীঘ্র বিলকে রাজ্যসভার নিকট উপস্থাপিত করিতে হইবে। ইহার পর রাজ্যসভার সভাপতি কক্ষের নেতার সহিত পরামর্শ করিয়া বিলটি বিচারবিবেচনা ও ফেরত পাঠানোর সমস্ত কার্য সমাপ্ত করিবার জন্য দিন ঠিক করিয়া দেন। বিল সম্পর্কে বিচারবিবেচনার প্রস্তাব গ্রহণ করার পর বিলটির বিভিন্ন ধারার আলোচনা হয় এবং সংশোধনের সুপারিশ করা যায়। এই পর্যায় শেষ হইলে বিলটি ফেরত পাঠাইবার প্রস্তাব করা হয়। অর্থ বিলটি যখন লোকসভার নিকট ফেরত আসে তখন লোকসভা এইরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে : 'অর্থ বিলটি সম্পর্কে রাজ্যসভা কোন সুপারিশ না করিলে লোক-সভার কর্মসচিব (Secretary) লোকসভাকে ঐ সংবাদ জানান এবং বিলটিকে রাষ্ট্রপতির নিকট সম্মতির জন্য উপস্থিত করা হয়। যেক্ষেত্রে রাজ্যসভা অর্থ বিলের সংশোধনের সুপারিশ করে সেক্ষেত্রে লোকসভাকে সংশোধনের বিচারবিবেচনা করিতে হয়। লোকসভা সংশোধনের সুপারিশ অগ্রাহ্য বা গ্রহণ করিতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই রাজ্যসভাকে ঐ সংবাদ জ্ঞাত করানো হয়।

৪. অর্থ বিল ও অন্যান্য অর্থ সংক্রান্ত বিলের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Money Bills and other Financial Bills) :

অর্থ সংক্রান্ত বিলসমূহ প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত (১) অর্থ বিল (Money Bills) এবং (২) অন্যান্য অর্থ সংক্রান্ত বিল (other Financial Bills)।

---

১. লোকসভার নিয়ম অনুসারে স্পীকারকে এইভাবে সার্টিফিকেট দিতে হয় : "I hereby certify that this is a Money Bill within the meaning of Article 110 of the Constitution of India."

৪.১. **অর্থ বিলের প্রকৃতি :** অর্থ বিল বলিতে কি বুঝায় তাহার আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে (২৪০-৪১ পৃষ্ঠা)। দেখা গিয়াছে, যখন কোন বিল মাত্র সংবিধানের ১১০ অনুচ্ছেদে বর্ণিত (ক) হইতে (ছ) বিষয়গুলির সকল বা কোন বিষয় লইয়া রচিত হয় মাত্র তখনই উহা অর্থ বিল বলিয়া পরিগণিত হয়। এ-সম্পর্কে কোন সন্দেহের উদ্রেক হইলে স্পীকারের সিদ্ধান্তই চরম বলিয়া গ্রহণ করিতে হয় এবং অর্থ বিল বলিয়া স্পীকার সার্টিফিকেট প্রদান করিলে ঐ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন তোলা যায় না। সংবিধানে এই অর্থ বিলের সহিত অন্যান্য অর্থ সংক্রান্ত বিলের পার্থক্য নির্দেশ করা হইয়াছে।

---

৪২. অর্থ বিলের সহিত অন্যান্য অর্থ সংক্রান্ত বিলের পার্থক্য : মোটামুটিভাবে এই পার্থক্য হইল যে অর্থ বিল কর অথবা ব্যয় সংক্রান্ত বিষয় ছাড়া অন্য কোন বিষয়ের সহিত সম্পর্কিত নয় ; অপর পক্ষে কর কিংবা ব্যয় ব্যতীতও অপরাপর বিষয় অন্যান্য অর্থ সংক্রান্ত বিলের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত হয়।

৪.৩. **দুই শ্রেণীর অর্থ সংক্রান্ত বিল :** এই 'অন্যান্য অর্থ সংক্রান্ত বিল' দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। (ক) প্রথম শ্রেণীর বিলের বৈশিষ্ট্য হইল যে উহাতে **অর্থ বিলের বিষয়বস্তু** ও **অন্যান্য বিষয়**—উভয়ই থাকে। অর্থ বিলের মত এইরূপ বিলকে রাজ্য-সভায় উত্থাপন করা যায় না এবং উত্থাপনের জন্য রাষ্ট্রপতির সুপারিশের প্রয়োজন হয়। কিন্তু অন্যান্য সাধারণ বিলের মত এই সকল অর্থ সংক্রান্ত বিলকে রাজ্যসভা সংশোধন বা প্রত্যাখ্যান করিতে পারে। আবার অন্যান্য সাধারণ বিলের মতই এরূপ বিল সম্পর্কে দুই কক্ষের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে কক্ষদ্বয়ের সংযুক্ত অধিবেশনে উপস্থিত ও ভোট-প্রদানকারী সদস্যদের সংখ্যাধিক্যের ভোটে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

(খ) দ্বিতীয় শ্রেণীর 'অন্যান্য অর্থ সংক্রান্ত বিল' বলিতে সেই সকল সাধারণ বিলকে বুঝায় যাহাতে অর্থ বিলের কোন বিষয়বস্তু থাকে না, কিন্তু ঐগুলিকে আইনে পরিণত করিয়া কার্যকর করা হইলে ভারতের সঞ্চিত তহবিল হইতে অর্থব্যয় করিবার প্রয়োজন দেখা দেয়। এরূপ বিল পাসের পদ্ধতি সাধারণ বিল পাসের পদ্ধতিরই মত। অর্থাৎ, যে-কোন কক্ষে এরূপ বিল উত্থাপন করা যায় এবং এরূপ বিলকে সংশোধন বা প্রত্যাখ্যান করিবার ক্ষমতা রাজ্যসভার আছে। তবে একটি বিষয়ে ইহা সাধারণ বিল হইতে পৃথক : যে-কোন কক্ষ এরূপ বিল উত্থাপন করিতে পারিলেও রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত উহার বিচারবিবেচনা (consideration) করিতে সমর্থ নহে।

৪.৪. **বিলে সম্মতিজ্ঞাপন (Assent to Bills) :** পূর্বেই বলা হইয়াছে যে সংসদের কক্ষদ্বয় কর্তৃক গৃহীত হওয়ার পর বিলকে রাষ্ট্রপতির নিকট সম্মতিজ্ঞাপনের জন্য উপস্থিত করা হয়।

৪.৫. **রাষ্ট্রপতির বিল নাকচ করিবার ক্ষমতা :** অর্থ বিল যখন রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হয় তখন ঐ বিলটি যে অর্থ বিল সেই মর্মে স্পীকারের একটি সার্টিফিকেট থাকে। রাষ্ট্রপতি ঐ বিলে সম্মতি দিতে পারেন অথবা নাও দিতে পারেন (১৫১ পৃষ্ঠা) আবার অর্থ বিল ভিন্ন অন্য বিলকে রাষ্ট্রপতি সংসদের কক্ষদ্বয়ের নিকট পুনর্বিবেচনার

জন্য ফেরত পাঠাইতে পারেন। অবশ্য যেক্ষেত্রে বিলকে ফেরত পাঠানো হয় সেক্ষেত্রে বিল দ্বিতীয়বার কক্ষদ্বয় কর্তৃক গৃহীত হইলে রাষ্ট্রপতি উহাতে সম্মতি দিতে বাধ্য থাকেন।

এই প্রসংগে মনে রাখিতে হইবে যে রাষ্ট্রপতি শাসনতান্ত্রিক প্রধান (constitutional head) এবং মন্ত্রি-পরিষদের পরামর্শ অনুসারে কার্য করিতে বাধ্য—ঐ পরামর্শ ব্যতীত **সংসদ কর্তৃক গৃহীত কোন বিলকে রাষ্ট্রপতির পক্ষে বাতিল করা সম্ভবপর নয়।**

৩. সংসদের অর্থ বিষয়ক কার্যপদ্ধতি (Financial Procedure in Parliament): সংসদের অর্থবিষয়ক কার্যপদ্ধতি ব্রিটিশ ব্যবস্থারই অনুরূপ—ইংল্যাণ্ডের মত ভারতেও অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে সংসদের ক্ষমতা সম্পর্কে সংবিধানে কতকগুলি মৌলিক নীতির উল্লেখ রহিয়াছে।

কতকগুলি সাধারণ নিয়ম: (১) ইংল্যাণ্ডে যেমন সরকার সংসদের আইন ব্যতীত কোন কর ধার্য বা সংগ্রহ করিতে পারে না, ভারতীয় সংবিধানে (২৬৫ অনুচ্ছেদ) তেমনি বলা হইয়াছে যে আইনের ভিত্তিতে ছাড়া কোন প্রকারের কর ধার্য বা সংগ্রহ করা যাইবে না।[১]

(২) ইংল্যাণ্ডের মত ভারতেও সরকার ব্যতীত অন্য কেহ করধার্য বা করবৃদ্ধির প্রস্তাব করিতে পারে না। অর্থাৎ, আইনসভার বেসরকারী সদস্যগণ (Private Members) নূতন কোন করধার্যের বা প্রচলিত কোন করের বৃদ্ধির প্রস্তাব করিতে পারেন না। ইহারা মাত্র কোন কর হ্রাস বা রহিত করিবার প্রস্তাব করিতে পারেন।

(৩) ইংল্যাণ্ডের মতই আবার ভারতীয় সংবিধানে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে **রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত কোন ব্যয়মঞ্জুরীর দাবি করা যাইবে না।** ইহার অর্থ হইল যে সরকার ব্যতীত অন্য কেহ ব্যয়ের প্রস্তাব করিতে সমর্থ নয়, লোকসভা ব্যয়মঞ্জুরীর দাবি হ্রাস বা প্রত্যাখ্যান করিতে পারে, কিন্তু ব্যয়বৃদ্ধির কোন প্রস্তাব করিতে পারে না।

(৪) ইংল্যাণ্ডের মত ভারতেও **অর্থবিষয়ক ব্যাপারে জনপ্রিয় কক্ষই (popular house) আসল নিয়ামক।** ভারতীয় সংবিধানের ১০৯ (১) অনুচ্ছেদে নির্দেশ রহিয়াছে যে রাজ্যসভায় কোন অর্থ বিল উত্থাপন করা যাইবে না। অর্থাৎ, সংসদের নিম্নতর কক্ষ লোকসভাতেই মাত্র অর্থ বিল উত্থাপিত হইবে। ইহা ছাড়া অর্থ বিল লোকসভা কর্তৃক গৃহীত হইলে রাজ্যসভা উহাকে ১৪ দিন পর্যন্ত বিলম্ব করাইয়া দিতে পারে কিন্তু উহাকে নাকচ করিতে পারে না। আবার ব্যয়মঞ্জুরীর দাবি লোকসভাতেই উপস্থিত করিতে হয় এবং ঐ দাবি মঞ্জুর করিবার ক্ষমতাও লোকসভার হস্তেই ন্যস্ত করা হইয়াছে।

এই নিয়মাবলী সম্পর্কে প্রশ্ন করা যাইতে পারে যে, ব্যয়মঞ্জুরীর দাবি প্রভৃতি বিষয়ে সংসদের উপর বাধানিষেধ আরোপ করিয়া সরকারের হস্তে ক্ষমতা ন্যস্ত করিবার তাৎপর্য কি? বলা হয়, ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করিবার ক্ষমতা বেসরকারী সদস্যদের দেওয়া হইলে সরকারী ব্যয়ের ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য সরকারকে

১. "No tax shall be *levied* or *collected* except by authority of law."

দাবী করা সম্ভব হয় না। সুতরাং সরকারি দায়িত্বকে কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যেই ব্যয়বৃদ্ধির দাবি করিবার অধিকার মাত্র সরকারের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া লোকসভার সকল সদস্যকে ব্যয়ের প্রস্তাব উত্থাপন করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইলে বাজেট আলোচনা ও পাসে বিশৃংখলা দেখা দিবার সম্ভাবনা থাকে, কারণ প্রত্যেক সদস্য তাঁহার নিজের অঞ্চলের স্বার্থের জন্য অর্থবরাদ্দের চেষ্টা করিতে থাকিবেন। ইহার ফলে সামগ্রিকভাবে দেশের বৃহত্তর স্বার্থ ক্ষুন্ন হইবার আশংকা থাকে।

সাধারণ নিয়মগুলির আলোচনার পর অর্থবিষয়ক কার্যপদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাইতে পারে। আলোচনা বাজেট পাস হইতে সুরু করা হইতেছে।

৬. বাজেট পাসের পদ্ধতি (Procedure of Passing the Budget): বাজেট পাস মোটামুটি **চারিটি পর্যায়ে বিভক্ত**। প্রথম পর্যায় হইল সংসদে বাজেট পেশ।

ক। সংসদে বাৎসরিক অর্থবিবরণী বা বাজেট পেশ (Presentation of Annual Financial Statement or Budget): এপ্রিল মাসের প্রথম তারিখ হইতে সরকারের নূতন আর্থিক বৎসর (financial or fiscal year) আরম্ভ হয়।[1] এই তারিখের পূর্ব হইতেই আগামী বৎসরের সরকারের আয়ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব প্রস্তুত করা আরম্ভ হয়। এইভাবে আনুমানিক হিসাব রচনা হওয়ার পর উহাকে সংসদের নিকট উপস্থিত করা হয়। সংবিধানে নির্দেশ রহিয়াছে যে রাষ্ট্রপতি প্রত্যেক আর্থিক বৎসর সম্পর্কে **আনুমানিক আয়ব্যয়ের হিসাব** বা **'বাৎসরিক অর্থ-বিবরণী'** ('annual financial statement') সংসদের কক্ষদ্বয়ের নিকট পেশ করাইবার ব্যবস্থা করিবেন।

এই 'বাৎসরিক অর্থ'বিবরণী'কেই বাজেট (Budget) বলিয়া অভিহিত করা হয়।

প্রকৃতপক্ষে লোকসভায় বাজেট পেশ করেন অর্থ মন্ত্রী (Finance Minister) স্বয়ং। বাজেট পেশ করিবার সময় অর্থ মন্ত্রী বাজেটের ব্যাখ্যা করিয়া বক্তৃতা প্রদান করেন।

ক. ১. ধার্য ব্যয় ও অনুমোদনসাপেক্ষ ব্যয়: সংবিধানের নির্দেশ অনুসারে 'অর্থবিবরণী'তে আনুমানিক ব্যয়ের হিসাবকে **দুই ভাগে বিভক্ত** করিয়া দেখানো হয়: (ক) ভারতের সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য ব্যয়সমূহ নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ (the sums required to meet expenditure *charged upon* the Consolidated Fund of India) এবং (খ) ভারতের সঞ্চিত তহবিল হইতে অন্যান্য প্রস্তাবিত ব্যয় মিটাইবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ। ব্যয়ের হিসাবকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করিবার তাৎপর্য হইল যে প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ব্যয়সমূহের ক্ষেত্রে বাৎসরিক অনুমোদনের প্রয়োজন হয় না (*non-votable* expenditure)। তবে উহাদের সম্পর্কে সংসদের দুই কক্ষেই আলোচনা চলিতে পারে। রাষ্ট্রপতির বেতন ভাতা ও তাঁহার পদ সম্পর্কিত অন্যান্য ব্যয়, রাজ্যসভা ও লোকসভার সভাপতি

---

১. বর্তমানে শুধু fiscalও বলা হয়—যেমন fiscal 1987-88.

ও সহ-সভাপতিদের বেতন ও ভাতা, প্রধান ধর্মাধিকরণের বিচারপতিদের বেতন ও ভাতার দরুন ব্যয়, সরকারী ঋণজনিত ব্যয় নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনাপরীক্ষকের বেতন ভাতা ও পেনসন্, কোন আদালতের রায়ের ফলে দেয় অর্থ ইত্যাদি হইল প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ব্যয়—অর্থাৎ এইগুলি ভারতের সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য ব্যয়। ইহা ব্যতীত সংসদ আইন দ্বারা কোন ব্যয়কে ভারতের সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য ব্যয় বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে।

প্রথম শ্রেণীর ব্যয়গুলি ছাড়া অন্যান্য সরকারী ব্যয় দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত—অর্থাৎ এই সকল ব্যয় প্রতি বৎসর লোকসভার **অনুমোদনসাপেক্ষ** এবং লোকসভার ভোটের দ্বারা নির্ধারিত হয়।

ক.২. কতকগুলি ব্যয়কে অনুমোদন না করিবার কারণ : এখন কতকগুলি ব্যয়কে প্রত্যেক বৎসরে সংসদের ভোটাধীন না করিবার যুক্তি হিসাবে বলা হয়, সরকারী ব্যয়ের মধ্যে কতকগুলির প্রকৃতি ও গুরুত্ব এরূপ যে ঐগুলিকে সংসদের বাৎসরিক অনুমোদনের উপর নির্ভরশীল করা হইলে রাষ্ট্রের কার্য ব্যাহতই হইবে। যেমন, প্রধান ধর্মাধিকরণের বিচারকদের বেতন ও ভাতা প্রত্যেক বৎসর সংসদের অনুমোদনসাপেক্ষ করা হইলে ইহাদের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ন হইবার সম্ভাবনা থাকিবে।

ব্রিটিশ দৃষ্টান্ত : ইংল্যাণ্ডেও কতকগুলি ব্যয়—যেমন রাজা বা রাণীর নিজস্ব ও পারিবারিক ব্যয়, জাতীয় ঋণ বাবদ ব্যয় ইত্যাদি—সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য ব্যয়; এগুলি প্রত্যেক বৎসর সংসদের ভোটের দ্বারা স্থিরীকৃত হয় না, সংসদের স্থায়ী আইন কর্তৃক নির্দিষ্ট থাকে। ইহা **সঞ্চিত তহবিলী ব্যয়** (the Consolidated Fund Services) নামে পরিচিত। স্থায়ী ব্যয় ছাড়া অন্যান্য সরকারী ব্যয়ের জন্য প্রতি বৎসর পার্লামেন্টের আইনের প্রয়োজন হয়। এই ব্যয়গুলি ইংল্যাণ্ডের বাৎসরিক **অনুমোদনসাপেক্ষ ব্যয়** (the Supply Services) বলিয়া অভিহিত হয়।

খ। বাজেটের সাধারণ আলোচনা (General Discussion of Budget) : সংসদে বাজেট পেশ করিবার কিছুদিন পরে সংসদের উভয় কক্ষে নির্দিষ্ট কয়েক দিন ধরিয়া বাজেটের আলোচনা চলে। এ-পর্যায়ে **সামগ্রিকভাবে** বাজেটের **সাধারণ আলোচনা** বা বাজেট-সম্পর্কিত সরকারী নীতি লইয়া আলোচনা চলে। বিভিন্ন সরকারী বিভাগের কার্যের বিচার ও সমালোচনা এবং জনসাধারণের অভিযোগ প্রকাশ এই আলোচনার সময় করা হয়। আলোচনার শেষে অর্থ মন্ত্রী উত্তরপ্রদান করিয়া থাকেন।

গ। লোকসভায় ব্যয়মঞ্জুরীর দাবি সম্পর্কে ভোটগ্রহণ (Voting of Demands for Grants in *Lok Sabha*) : বাজেটের সাধারণ আলোচনার পর সংসদের নিম্নতর কক্ষ লোকসভায় উপরি-উক্ত ভোটযোগ্য ব্যয়গুলি মঞ্জুরীর দাবি সরকার করে এবং ঐগুলি সম্পর্কে আলোচনা ও ভোটগ্রহণ করা হয়। আলোচনা ও ভোটগ্রহণ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করিতে হয়। আলোচনা ও ভোটগ্রহণের সময়

কতদিন হইবে না-হইবে ত' স্পীকার কক্ষের নেতার সহিত পরামর্শ করিয়া ধার্য করেন। এই সময়ের মধ্যে ব্যয়সংক্রান্ত আলোচনা সমাপ্ত না হইলে নির্দিষ্ট সময়ের শেষদিনে যে-সকল ব্যয়ের দাবির কার্য শেষ করা হয় না, সেই সকল ব্যয় সম্পর্কে স্পীকার **গিলোটিন পদ্ধতি** (Guillotine) প্রয়োগ করেন এবং আলোচনা ব্যতিরেকেই ভোটের সাহায্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যবস্থা করেন।[১] বস্তুত, অধিকাংশ ব্যয়ের প্রস্তাব এইভাবে বিনা আলোচনায় লোকসভায় পাস হইয়া যায়।

এই ভারতীয় পদ্ধতিও ব্রিটিশ পদ্ধতির অনুরূপ। ইংল্যাণ্ডের কমন্স সভায় সরকারী ব্যয় সম্পর্কে আলোচনা ও ভোটগ্রহণ ২৯ দিনের মধ্যে শেষ করিতে হয় এবং শেষ তারিখের পূর্বের দিনে ব্যয়ের একটা মোটা অংশ বিনা আলোচনায় পাস হইয়া যায়। এ-ব্যবস্থা সম্পর্কে হিল্টন ইয়ং যে সমালোচনা করিয়াছেন তাহা ভারতের বেলায় সমভাবে প্রযোজ্য। তিনি বলিয়াছেন, বিনা আলোচনায় এইভাবে ব্যয়মঞ্জুর করিবার ব্যবস্থার মত অকাম্য আর কোন কিছু হইতে পারে না। **ইহার ফলে সরকারী ব্যয়ের উপর সংসদীয় নিয়ন্ত্রণ একপ্রকার প্রহসনে পর্যবসিত হয়।**[২]

অনুমোদনসাপেক্ষ এই ব্যয়গুলি সম্পর্কে লোকসভার ক্ষমতা হইল যে উহা যে-কোন প্রস্তাবিত ব্যয়কে হ্রাস কিংবা প্রত্যাখ্যান করিতে পারে, কিন্তু কোন ব্যয়বৃদ্ধি বা নূতন কোন ব্যয়ের প্রস্তাব করিতে পারে না। সরকারী ব্যয়ের দাবি বিচার-বিবেচনার সময় লোকসভায় যে-সকল ব্যয়হ্রাসের প্রস্তাব আনয়ন করা হয় তাহা প্রধানত সরকারী নীতির সমালোচনার উদ্দেশ্যেই করা হয়।

গ ১. বিভিন্ন ধরনের ছাঁটাই প্রস্তাব: লোকসভার নিয়মাবলী অনুসারে ব্যয়হ্রাসের প্রস্তাব তিন প্রকারে করা যায়: (১) নীতি অনুমোদনসংক্রান্ত ছাঁটাই প্রস্তাব ('Disapproval of Policy Cut'), (২) ব্যয়সংক্ষেপসংক্রান্ত ছাঁটাই প্রস্তাব ('Economy Cut'), এবং (৩) অভিযোগের নিদর্শনস্বরূপ প্রতীক ছাঁটাই প্রস্তাব ('Token Cut')। (১) প্রথম শ্রেণীর প্রস্তাবে সরকারী কোন ব্যয়ের দাবিকে ছাঁটাই করিয়া নামমাত্র ১ টাকায় লইয়া আসিবার প্রস্তাব করা হয় ('That the demand be reduced to Rs. 1/-')। ইহার অর্থ হইল সরকারী দাবিকে অস্বীকার করা (a refusal of supplies) এবং প্রস্তাবের উদ্দেশ্য হইল সংশ্লিষ্ট দাবিসংক্রান্ত

১. "The Speaker in consultation with the leader of the House shall allot so many days as may be compatible with the public interest for the discussion and voting of demands for grants. On the last day of the allotted days, at 5 O' clock, the Speaker forthwith puts every question necessary to dispose of all outstanding matters in connection with demands for grants." *The Rules of the House of the People (Lok Sabha)*

২. "Between a third and half of the total expenditure for the year is often voted in an hour or so, without any sort or kind of debate or criticism. A more unsatisfactory state of affairs could hardly be imagined. It reduces the whole laborious process of the control of expenditure by the House to something of a farce." Hilton Young: *System of National Finance*

সরকারী নীতির আলোচনা করা। (২) দ্বিতীয় ধরনের প্রস্তাবে সরকারের কোন ব্যয়ের দাবিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ কমাইবার প্রস্তাব করা হয়। যেমন, প্রস্তাব করা যাইতে পারে যে ব্যয়ের দাবির পরিমাণ ৫০,০০০ টাকা হ্রাস করা হউক (That the amount of the demand be reduced by Rs. 50,000/-')। ইহার উদ্দেশ্য হইল যে লোকসভা সরকারের কোন ব্যয়ের দাবি প্রয়োজনাতিরিক্ত মনে করিলে উহাকে কমাইবার প্রস্তাব করিয়া ব্যয়সংক্ষেপের চেষ্টা করিতে পারে। (৩) তৃতীয় ধরনের প্রস্তাবে কোন নির্দিষ্ট অভিযোগের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য সরকারের কোন ব্যয়ের দাবি সামান্য ছাঁটাই—যেমন ১০০ টাকা ছাঁটাই—করিবার প্রস্তাব করা হয়। এই প্রস্তাব করা হইলে লোকসভায় নির্দিষ্ট অভিযোগ লইয়া আলোচনা-সমালোচনা চলে।

ঘ। বিনিয়োগ আইন (Appropriation Act): লোকসভায় ব্যয়-মঞ্জুরীর দাবি অনুমোদিত হওয়ার পর যথাসম্ভব শীঘ্র **'বিনিয়োগ বিল'** (Appropriation Bill) নামে একটি অর্থ বিল (Money Bill) পাস করাইয়া লইতে হয়।

এই আইনের তাৎপর্য: বিনিয়োগ আইন পাস করাইবার উদ্দেশ্য হইল 'অনুমোদিত ব্যয়' (grants voted) এবং 'ভারতের সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য ব্যয়, ('expenditure charged on the Consolidated Fund of India')—এই দুই শ্রেণীর ব্যয়নির্বাহের জন্য 'ভারতের সঞ্চিত তহবিল' হইতে **সরকারকে অর্থ তুলিবার ক্ষমতা দেওয়া**। কারণ, সংবিধানে সুস্পষ্ট নির্দেশ রহিয়াছে [২৬৬ (৩) এবং ১১৪ (৩) অনুচ্ছেদ] যে সঞ্চিত তহবিল হইতে কোন অর্থ আইনের ভিত্তিতে ছাড়া অন্যভাবে উঠানো যাইবে না। সুতরাং লোকসভায় ব্যয়মঞ্জুরীর দাবি অনুমোদিত হইলে সঞ্চিত তহবিল হইতে প্রয়োজনীয় অর্থ উঠাইবার জন্য বিনিয়োগ আইন নামে একটি আইন পাস করাইয়া লইতে হয়। এই আইন প্রণয়নের সময় মঞ্জুরীকৃত কোন ব্যয়ের পরিমাণ বা উদ্দেশ্য পরিবর্তন অথবা 'সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য ব্যয়ে'র পরিমাণ পরিবর্তন করিয়া কোন সংশোধন প্রস্তাব আনয়ন করা যায় না। বিনিয়োগ বিল আলোচনাকালে শাসন বিভাগীয় নীতি বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লইয়া **আলোচনার সুযোগ** থাকিলেও উহা **বিশেষ সীমাবদ্ধ**, কারণ ব্যয়মঞ্জুরীর দাবির বিচারবিবেচনার সময় পূর্বে যে-সকল বিষয় লইয়া একবার আলোচনা হইয়া গিয়াছে তাহা আবার আলোচনা করা চলে না।[১]

ঘ.১. গণনানুদান (Votes on Account): বাৎসরিক আর্থিক বিবৃতি বা বাজেট এবং বাৎসরিক বিনিয়োগ আইনের আলোচনা ও পাস করিতে করিতে নূতন আর্থিক বৎসর আরম্ভ হইয়া যায়। অথচ সংবিধান অনুসারে আইন ব্যতীত সরকার কোন অর্থ ব্যয় করিতে সমর্থ নয়। সুতরাং নূতন আর্থিক বৎসর সুরু হইবার তারিখ

১. "The debate on an Appropriation Bill shall be restricted to matters of public importance or administrative policy implied in the grants covered by the Bill which have not already been raised while the relevant demands for grants were under consideration." *The Rules of the House of the people (Lok Sabha)*

হইতে যে-পর্যন্ত না বাজেট আলোচনা সমাপ্ত ও বাৎসরিক বিনিয়োগ আইন পাস হয় সেই সময়ের জন্য নূতন **আর্থিক বৎসর আরম্ভ হইবার পূর্বেই** লোকসভা সরকারকে **অর্থব্যয়ের অনুমতি** প্রদান করে। ইহাকে গণনানুদান (Votes on Account) বলা হয়। ইহার সংগে সংগে বিনিয়োগ (গণনানুদান) আইনও (Appropriation Votes on Account] Act) পাস করা হয়।

ইংল্যাণ্ডের রীতিকে অনুসরণ করিয়াই ভারতীয় সংবিধান গণনানুদানের ব্যবস্থা করিয়াছে। পূর্বে মার্চ মাস শেষ হইতে না-হইতে তাড়াহুড়া করিয়া বাজেট আলোচনা সমাপ্ত এবং বিনিয়োগ আইন পাস করিতে হইত। সুতরাং বাজেটের সম্যক আলোচনা সম্ভব হইত না। বলা হয় যে বর্তমান সংবিধানে গণনানুদানের ব্যবস্থা থাকার ফলে বাৎসরিক বাজেট তাড়াতাড়ি করিয়া পাস করিতে হয় না এবং সরকারী ব্যয়ের সম্যক আলোচনার জন্য সময় পাওয়া যায়।

ঘ ২. অনুপূরক, অতিরিক্ত বা অধিক অনুদান (Supplementary, Additional or Excess Grants) : যখন চলতি বৎসরের জন্য কোন বিষয় সম্পর্কে যে ব্যয় মঞ্জুর করা হইয়াছে তাহা অপ্রচুর হইয়া পড়ে অথবা কোন নূতন বিষয় সম্পর্কে অনুপূরক বা অতিরিক্ত ব্যয় করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়ে তখন সরকারকে ঐ ব্যয়ের হিসাব পেশ করিয়া মঞ্জুর করাইয়া লইতে হয়। ইহাকেই **অনুপূরক বা অতিরিক্ত অনুদান** (supplementary or additional grants) বলিয়া অভিহিত করা হয়।

অনুপূরক ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব লোকসভা কর্তৃক চলতি আর্থিক বৎসরের মধ্যে অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন। আবার কোন আর্থিক বৎসরে কোন বিষয়ের উপর অনুমোদিত অর্থের অধিক ব্যয় করা হইয়া থাকিলে সরকারকে ঐ **অধিক ব্যয়ের** (excess grants) দাবি লোকসভার নিকট উপস্থিত করিয়া পাস করাইয়া লইতে হয়।

অনুপূরক ব্যয়ের দাবি (supplementary demands) এবং **অধিক ব্যয়ের দাবির** (excess demands) **মধ্যে পার্থক্য** মনে রাখা প্রয়োজন। অনুমোদিত ব্যয় অপেক্ষা অধিক ব্যয় করা হইলে এবং সংশ্লিষ্ট আর্থিক বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া যাইবার পর সরকার লোকসভার নিকট অনুমোদন চাহিয়া ঐ অধিক ব্যয়ের দাবি উপস্থিত করা হইলে এইরূপ দাবি লোকসভার নিকট উপস্থিত করিবার পূর্বে **সরকারী গণিতক কমিটি** (Public Accounts Committee) **কর্তৃক অনুমোদিত** হওয়া প্রয়োজন।

সমালোচনা : অনুপূরক অনুদান ও অধিক ব্যয়ের দাবির সমালোচনা করা হয়। বলা হয় যে বিশেষ অবস্থায় এইরূপ অনুদানের ব্যবস্থা অপরিহার্য হইয়া পড়ে, কিন্তু এই ধরনের অনুদানের পরিমাণ অধিক হইলে সরকারী ব্যয়ের উপর সংসদের নিয়ন্ত্রণ শিথিল হইতে বাধ্য।

ঘ.৩. প্রত্যয়ানুদান ও ব্যতিক্রমানুদান (Votes of Credit and Exceptional Grants) : (১) লোকসভা সরকারকে প্রত্যয়ানুদান (votes of credit) এবং ব্যতিক্রমানুদান (exceptional grants) প্রদান করিতে পারে।

অপ্রত্যাশিত বা অনিশ্চিত ব্যয়—যেমন জরুরী অবস্থার দরুন ব্যয়—মিটাইবার জন্য লোকসভা প্রত্যয়ানুদানের মাধ্যমে সরকারকে অর্থব্যয়ের ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারে। (২) ইহা ব্যতীত লোকসভা চলতি বৎসরের কার্যাদির ব্যয়ের মধ্যে পড়ে না এমন কোন বিশেষ উদ্দেশ্যের ব্যয়বহনের জন্য ব্যতিক্রমানুদানের সাহায্যে অর্থব্যয় করিবার ক্ষমতা সরকারকে প্রদান করিতে পারে।

৭. রাজস্ব আইন (Finance Act) : কর ধার্য বা সংগ্রহের জন্য আইনের প্রয়োজন হয় এবং যে আইনের দ্বারা সরকারের কর প্রস্তাবসমূহকে কার্যকর করা হয় তাহাকেই রাজস্ব আইন বলা হয়। সুতরাং সরকারকে রাজস্ব-সম্পর্কিত প্রস্তাবসমূহকে **রাজস্ব বিল** (Finance Bill) আকারে সংসদের নিকট পেশ করিতে হয়। যখন সংসদের নিকট বাজেট বা বাৎসরিক আর্থিক বিবরণী পেশ করা হয় সেই সময়ই ঐ বিল উপস্থিত করা হয়। কোন কর বৃদ্ধি বা নূতন কর ধার্য করিবার উদ্দেশ্যে এরূপ বিলের কোন সংশোধন রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত করা যায় না। অবশ্য কর হ্রাস বা বিলোপসাধনের সংশোধন আনয়ন করা যায়। এই প্রসংগে ইহা উল্লেখযোগ্য যে রাজস্ব বিল আলোচনায় সংসদের ব্যাপক স্বাধীনতা রহিয়াছে—সরকারের আর্থিক নীতির এবং সামগ্রিকভাবে সরকারের শাসনকার্য পরিচালনার সমালোচনা করা যায়। ইহা ব্যতীত যে-কোন অভিযোগ লইয়া আলোচনা চলিতে পারে। আর একটি বিষয়ও লক্ষ্য করিবার আছে। সাময়িক করসংগ্রহ আইন (Provisional Collection of Taxes Act) অনুসারে সংসদে বাজেট পেশ করিবার সংগে সংগে বাণিজ্যশুল্ক এবং অন্তঃশুল্ক প্রভৃতি স্থাপন ও বৃদ্ধি সম্পর্কিত সরকারী রাজস্ব প্রস্তাবসমূহ কার্যকর হয়। রাজস্ব আদায়ে যাহাতে সরকারের ক্ষতি না হয় সেই উদ্দেশ্যেই এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে, কারণ রাজস্ব আইন পাস করিয়া কর আদায়ের ব্যবস্থা করিতে বিলম্ব হয়।

৮. আয়ব্যয়ের উপর সংসদের নিয়ন্ত্রণ (Control of Parliament over Finance) : আয়ব্যয়ের নিয়ন্ত্রণ বলিতে রাজস্ব ও ব্যয়ের উপর নিয়ন্ত্রণকে বুঝায়।

৮. ক. রাজস্বের উপর নিয়ন্ত্রণ ; সংবিধানের নির্দেশ অনুসারে আইনের ভিত্তিতে ছাড়া কোন করধার্য বা করসংগ্রহ করা যাইবে না।[১] ইহার তাৎপর্য হইল, সংসদ আইন পাস করিয়া অনুমতি না দিলে শাসন বিভাগ কোনপ্রকার করধার্য বা করসংগ্রহ করিতে পারিবে না।

৮.খ. ব্যয়-নিয়ন্ত্রণ : ব্যয়-সম্পর্কিত ব্যাপারে সংসদ কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ 'ভারতের সঞ্চিত তহবিল'কে (the Consolidated Fund of India) ভিত্তি করিয়া চলে। ইংল্যাণ্ডের অনুকরণে ভারতেও কেন্দ্র এবং প্রত্যেক রাজ্যের জন্য একটি করিয়া **সাধারণ তহবিল** গঠন করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কেন্দ্রের ক্ষেত্রে এই তহবিলে রাজস্ব এবং

১. ২৪৪ পৃষ্ঠা দেখ।

কর বাবদ ভারত সরকারের যত অর্থ আদায় হয় তাহা জমা পড়ে। আবার এই তহবিল হইতেই সরকারের নিয়মিত সকল ব্যয় মিটানো হয়। কিন্তু সংবিধানের নির্দেশ রহিয়াছে যে আইন ব্যতীত ভারতের সঞ্চিত তহবিল হইতে কোন অর্থ তোলা যাইবে না।[১] এই আইনই হইল যাহাকে বলা হয় **'বিনিয়োগ আইন'** (Appropriation Act)। বিনিয়োগ আইন পাস করার পদ্ধতি পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে (২৪৮ পৃষ্ঠা)। সংবিধানের এই নির্দেশের উদ্দেশ্য হইল যে শাসন বিভাগ আইনসভার অনুমতি ব্যতীত সরকারী অর্থ ব্যয় করিতে পারে না।

৮. গ. অপচয় ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ: তবে সরকারী আয়ব্যয়ের উপর আইনসভার নিয়ন্ত্রণ কার্যকর করার পক্ষে উপরি-উক্ত ব্যবস্থাকে পর্যাপ্ত বলিয়া মনে করা হয় না। যাহাতে সরকারী ব্যয়ের অপচয় না ঘটে, যাহাতে অর্থের সদ্ব্যবহার ও ব্যয়সংক্ষেপ হয়, যাহাতে সরকার আইনসভা কর্তৃক নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে ব্যয় করে তাহার দিকেও দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। কিন্তু আইনসভার নিজের পক্ষে সরকারের ব্যয়ের দাবি ও সরকারী হিসাবের খুঁটিনাটি পরীক্ষা করিয়া দেখা সম্ভব হয় না। আইনসভার বিরাট সদস্যসংখ্যা, বাজেট এবং সরকারী হিসাবের জটিলতা এবং সময়ের অভাব হইল আইনসভা কর্তৃক এরূপ পরীক্ষা করিবার পথে প্রধান অন্তরায়। সুতরাং সরকারী আয়ব্যয়ের নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে সংসদকে সহায়তা করিবার জন্য তিন প্রকারের ব্যবস্থা রহিয়াছে: ( ) ভারতের নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনাপরীক্ষক (The Comptroller and Auditor-General of India), (২) সরকারী গণিতক কমিটি (The Public Accounts Committee), এবং (৩) আনুমানিক ব্যয়-হিসাব কমিটি (The Estimates Committee)।

গ. ১. ভারতের নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনাপরীক্ষক (The Comptroller and Auditor-General of India): ইংল্যাণ্ডের মত ভারতীয় সংবিধানেও সরকারী আয়ব্যয়-ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণাধীন রাখার জন্য ভারতের নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনাপরীক্ষকের পদের ব্যবস্থা রহিয়াছে।

পদের গুরুত্ব: এই পদটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আইনসভা যে উদ্দেশ্যে যতটা পরিমাণ অর্থব্যয় মঞ্জুর করে ঠিক সেই উদ্দেশ্যে সেই পরিমাণ অর্থ যথাযথভাবে ব্যয় হইতেছে কি না, তাহা দেখা নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা-পরীক্ষকের দায়িত্ব। সুতরাং যাহাতে নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনাপরীক্ষক নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে কর্তব্য পালন করিতে পারেন এবং নির্ভয়ে সরকারী হিসাবের ত্রুটিবিচ্যুতি সম্পর্কে আইনসভার নিকট রিপোর্ট দাখিল করিতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে তাঁহাকে সরকারী বা শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত রাখিতে হয়।

সংবিধানে পদাধিকারীর স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা: ভারতীয় সংবিধানে নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনাপরীক্ষকের এই স্বাতন্ত্র্য ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করিবার জন্য কতকগুলি ব্যবস্থা রহিয়াছে: (১) ভারতের নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনাপরীক্ষক রাষ্ট্রপতি কর্তৃক

১. "No moneys out of the Consolidated Fund of India shall be appropriated except in accordance with law." *Art. 266 (3)*

নিযুক্ত হন এবং যে পদ্ধতিতে প্রধান ধর্মাধিকরণের বিচারকদের পদচ্যুত করা যায় মাত্র সেই পদ্ধতিতেই তাঁহাকে অপসারণ করা যায়। অর্থাৎ, যখন সংসদের প্রত্যেক পরিষদ মোট সদস্যসংখ্যার অধিকাংশ এবং উপস্থিত ও ভোটপ্রদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ দ্বারা সমর্থিত প্রমাণিত অসামর্থ্য (incapacity) বা অসদাচারের (misbehaviour) জন্য অপসারণার্থ একটি আবেদন রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থিত করে তখনই মাত্র রাষ্ট্রপতি তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে পারেন। (২) তাঁহার মাহিনা ও চাকরির সর্ত আইন দ্বারা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে এবং নিয়োগের পর এই সকল সর্ত তাঁহার স্বার্থের প্রতিকূলে পরিবর্তিত করা যাইবে না। সংসদ ১৯৭১ সালে নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনাপরীক্ষক (কর্তব্য, ক্ষমতা ও চাকরির সর্তসংক্রান্ত) আইন [The Comptroller and Auditor-General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971] দ্বারা পদাধিকারীর দায়িত্ব ও কার্যের সর্তাদি নির্ধারিত করিয়া দিয়াছে। (৩) যাহাতে শাসন বিভাগের বা সরকারের পক্ষপাতিত্ব করার কোন অবকাশ না থাকে সেই উদ্দেশ্যে সংবিধানে বলা হইয়াছে যে অবসর গ্রহণের পর নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনাপরীক্ষক কোন সরকারী পদ গ্রহণ করিতে পারিবেন না। (৪) নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনাপরীক্ষকের বেতন ও তাঁহার দপ্তরের অন্যান্য ব্যয় প্রভৃতি কেন্দ্রীয় সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য ব্যয়, পার্লামেন্টের অনুমোদনসাপেক্ষ নহে।

নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনাপরীক্ষকের কার্য সম্পর্কে সংবিধানে বলা হইয়াছে: (১) ইউনিয়ন (কেন্দ্র) ও রাজ্য এবং অন্যান্য কর্তৃপক্ষের হিসাবপত্র সম্পর্কে নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনাপরীক্ষকের কি কি কার্য বা ক্ষমতা থাকিবে তাহা সংসদ আইন করিয়া স্থির করিয়া দিবে। (২) যতদিন-পর্যন্ত না এরূপ আইন প্রণীত হইতেছে সেই পর্যন্ত বর্তমান সংবিধান চালু হওয়ার পূর্বে ভারতের মহাগণনাপরীক্ষকের (The Auditor-General of India) যে কার্য ও ক্ষমতা ছিল তাহাই বর্তমান নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনাপরীক্ষকের থাকিবে।

কার্যাবলী: বর্তমানে নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনাপরীক্ষকের কার্য ও ক্ষমতা সংক্ষেপে হইল এইরূপ: ৪২তম সংশোধনের (১৯৭৬) পূর্বে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে তিনি স্থির করিতেন যে কিভাবে ইউনিয়ন ও রাজ্যের হিসাব রক্ষিত হইবে। সংশোধনটিতে বলা হইয়াছে যে কেন্দ্র ও রাজ্যসমূহের হিসাব কিভাবে রক্ষিত হইবে তাহা রাষ্ট্রপতি নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনাপরীক্ষকের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিয়া দিতে পারেন। পূর্বতন জনতা সরকার পূর্বাবস্থা পুনঃপ্রবর্তিত করার ব্যবস্থা করে। পূর্বে তিনি আবার কেন্দ্র ও রাজ্যসমূহের হিসাবপত্র রাখিতেন (প্রতিরক্ষা ও রেলপথ সংক্রান্ত হিসাব বাদ দিয়া)। ইহা ছাড়া বাৎসরিক সরকারী হিসাব তৈয়ারি করিয়া উহা সংশ্লিষ্ট সরকারের নিকট পেশ করার দায়িত্ব ছিল নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনাপরীক্ষকের। জনতা সরকারের আইন দ্বারা ইউনিয়নের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনাপরীক্ষককে এ-দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে।[১] রাজ্যগুলিও আইন পাস করিয়া অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে।

---

১. The Comptroller and Auditor-General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 as amended in 1976

হিসাবপরীক্ষক বা নিরীক্ষক (auditor) **হিসাবেই** (as an Auditor) **নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনাপরীক্ষকের কার্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ।** কারণ, সংসদ এই হিসাব পরীক্ষার মাধ্যমেই সরকারী ব্যয়-নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা করে। সংসদ নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট অর্থব্যয় মঞ্জুর করে। শাসন বিভাগ যাহাতে সংসদ কর্তৃক নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকিয়া ব্যয় করে তাহা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্যই নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনাপরীক্ষক সংসদের পক্ষ হইতে সরকারী ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে শাসন বিভাগ আইন অনুযায়ী ব্যয় করিয়াছে কি না। ইহা ছাড়া অপচয়মূলক ব্যয় হইয়া থাকিলে উহার প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকেন। নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনাপরীক্ষক সরকারী কোম্পানী, সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত সংস্থা প্রভৃতির হিসাব পরীক্ষা করিয়া দেখেন। সংবিধান অনুযায়ী নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনাপরীক্ষককে কেন্দ্রের হিসাব সম্পর্কে **রাষ্ট্রপতির নিকট** এবং রাজ্যের হিসাব সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের **রাজ্যপালের নিকট রিপোর্ট পেশ** করিতে হয়। কেন্দ্রের ক্ষেত্রে ঐ রিপোর্ট রাষ্ট্রপতি সংসদের নিকট এবং রাজ্যের ক্ষেত্রে রাজ্যপাল রাজ্য আইনসভার নিকট উপস্থিত করার ব্যবস্থা করেন। আইনসভার নিকট যে সরকারী হিসাব এবং নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনাপরীক্ষকের রিপোর্ট পেশ করা হয় তাঁহার উপর ভিত্তি করিয়াই সরকারী গণিতক কমিটি (the Public Accounts Committee) তাহার রিপোর্ট লোকসভায় দাখিল করে।

একটি অসংগতি দূরীকরণ : ভারতের নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনাপরীক্ষকের ভূমিকায় একটি অসংগতি ছিল। তাঁহাকে একদিকে যেমন সরকারী হিসাব প্রণয়ন করিতে হইত, অপরদিকে তেমনি আবার ঐ হিসাবকে পরীক্ষা করিয়া রিপোর্ট প্রদান করিতে হইত। হিসাব প্রণয়ন ও হিসাব পরীক্ষার কার্য একই হস্তে থাকা সমীচীন নয়। এইজন্য হিসাব প্রণয়নের কার্য ব্যবহনকারী শাসন বিভাগগুলির (Administrative Departments) নিকট হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত গৃহীত ও কার্যকর হয়।

সুতরাং বর্তমানে নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনাপরীক্ষকের কার্য হইল কেন্দ্র ও রাজ্যের হিসাব পরীক্ষা করিয়া দেখা—কেন্দ্রের ক্ষেত্রে হিসাব রক্ষার দায়িত্ব আর তাঁহার নাই।

অন্য একটি ত্রুটি : অন্য একটি বিষয়ে ভারতীয় ব্যবস্থার ত্রুটি এখনও রহিয়া গিয়াছে। নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনাপরীক্ষকের পদটির নাম হইতে বুঝা যায় যে **নিয়ন্ত্রক** (Comptroller) হিসাবেও তাঁহাকে কার্য করিতে হইবে। ইংল্যাণ্ডে নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনাপরীক্ষকের নিয়ন্ত্রক হিসাবে কার্য হইল ব্যাংক অফ্ ইংল্যাণ্ডে সরকারী তহবিলে সকল সরকারী আয় জমা হইতেছে কি না এবং উক্ত তহবিল হইতে আইনসম্মতভাবে টাকা উঠানো হইতেছে কি না তাহা নিয়ন্ত্রণ করা।

ভারতে প্রতিরক্ষা, রেলপথ প্রভৃতি অনেক ক্ষেত্রেই সঞ্চিত তহবিল হইতে যথেচ্ছভাবে টাকা উঠানো যায়, ইহার জন্য নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনাপরীক্ষকের অনুমতির প্রয়োজন হয় না। সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত বাজেটের সীমার মধ্যে থাকিয়া ইহা করা হইতেছে কি না, তাহা বিচার করিবার দায়িত্ব শাসন বিভাগের।

গ.২. সরকারী গণিতক কমিটি (Public Accounts Committee) : সংবিধান অনুসারে সংসদ (এবং রাজ্য আইনসভা) উহার কার্যপদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত করার জন্য নিয়মকানুন রচনা করিতে সমর্থ। এই নিয়মকানুন দ্বারাই সরকারী গণিতক কমিটির গঠন ও কার্যাদি স্থির করিয়া দেওয়া হয়। কেন্দ্রের এই কমিটি হইল লোকসভার কমিটি।

গঠন : প্রত্যেক বৎসর লোকসভা সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে কমিটিতে **১৫ জন সদস্য** নির্বাচিত করে ; ইহা ব্যতীত রাজ্যসভার ৭ জন সদস্য ইহার সহিত সংযুক্ত করা হয়। ইংল্যাণ্ডে কিন্তু সরকারী গণিতক কমিটির সদস্যরা মাত্র কমন্স সভার সদস্য লইয়াই গঠিত হয়, উচ্চতর কক্ষ লর্ড সভার সদস্য ইহাতে থাকেন না। কারণ, অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে কমন্স সভাই সর্বেসর্বা।

কার্য ও উদ্দেশ্য : ভারতে কেন্দ্রীয় সরকারী গণিতক কমিটির কার্য হইল বিনিয়োগ হিসাব (Appropriation Accounts) এবং অন্যান্য যে-সকল হিসাব সংসদের নিকট উপস্থিত করা হয় সেই সকল হিসাব এবং নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনাপরীক্ষকের কেন্দ্রীয় সরকারের হিসাব সম্পর্কে রিপোর্ট পরীক্ষা করা। কমিটির **উদ্দেশ্য** হইল **তিনটি :** (১) কমিটিকে দেখিতে হয় যে সংসদ যে উদ্দেশ্যে অর্থমঞ্জুর করে সরকার যেন সেই উদ্দেশ্যেই নির্দিষ্ট অর্থ ব্যয় করে। যেক্ষেত্রে সরকার সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত অর্থ অপেক্ষা কম কিংবা অধিক ব্যয় করে সেক্ষেত্রে কমিটি উহার কারণ ও যুক্তি বিচার করিয়া নিজের সুপারিশ প্রদান করে। নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনাপরীক্ষকের সরকারী হিসাব সম্পর্কিত রিপোর্ট কমিটিকে এই অনুসন্ধানকার্যে সাহায্য করে। (২ কমিটির আর একটি কর্তব্য হইল অপচয়, অমিতব্যয়িতা, ক্ষতি, অফলপ্রসূ ব্যয় ইত্যাদি সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ব্যয়সংক্ষেপের ব্যবস্থা করা। (৩) সরকারী আয়ব্যয়ের ক্ষেত্রে নৈতিক মানের উন্নয়ন করা এবং আর্থিক সমীচীনতার নিয়মকানুনের প্রবর্তন করা হইল কমিটির আর একটি উদ্দেশ্য। কমিটির এই সকল কার্য সম্পাদনে নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনাপরীক্ষক সাহায্য করিয়া থাকেন।

কমিটির কার্যকারিতা : কমিটির মন্তব্য ও সুপারিশ রিপোর্ট আকারে সংসদে পেশ করা হয়। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর—বিশেষত অর্থ মন্ত্রিদপ্তরের—দায়িত্ব থাকে সরকারী গণিতক কমিটির সুপারিশকে কার্যকর করার। এই কমিটির গুরুত্ব থাকিলেও ইহার সীমাবদ্ধতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলা হয় যে, সরকার অপচয়জনকভাবে ব্যয় করিয়া ফেলিবার পর কমিটি উহার বিচারবিবেচনা করে।[১]

ইহা ব্যতীত স্মর্তব্য যে, কমিটির রিপোর্ট বিশ্লেষণ করিয়া দেখার মত সময় বা ইচ্ছা কোনটাই সংসদের থাকে না। তাহা হইলেও কমিটির কিছুটা সার্থকতা রহিয়াছে। ইহা পরোক্ষভাবে সরকারের উপর প্রভাব বিস্তার করে, কারণ বিভিন্ন প্রশ্ন

১. "...there is a feeling that after all it (the Public Account Committee) carries out a post-mortem which can have only a deterrent effect, if at all." P. K. Wattal

সম্পর্কে কমিটির অনুসন্ধানকার্য ও আলোচনার প্রচারমূল্য রহিয়াছে। ইহা ছাড়া কমিটির সমালোচনা সরকারের কার্যকলাপের উপর নৈতিক চাপের সৃষ্টি করে।[১]

গ.৩. আনুমানিক ব্যয়-হিসাব কমিটি (Estimates Committee) : সরকারী ব্যয়ের উপর আইনসভার নিয়ন্ত্রণকে ব্যাপক না করিতে পারিলে ঐ নিয়ন্ত্রণ বিশেষ ফলপ্রসূ হয় না।

প্রয়োজনীয়তা : উল্লেখ করা হইয়াছে সরকারী গণিতক কমিটির (the Public Accounts Committee) কার্য হইল সরকার যে ব্যয় করিয়াছে তাহার হিসাব-নিকাশ পরীক্ষা করিয়া দেখা যে ঐ ব্যয় **আইনসভা কর্তৃক নির্দিষ্ট ও অনুমোদিত ব্যয়ের সহিত সংগতিপূর্ণ কিনা** এবং কোন অপচয়মূলক ব্যয় সরকার করিয়াছে কি না। অর্থাৎ, সরকার ব্যয়বহন করিবার পর এই কমিটি উহার হিসাব লইয়া পর্যালোচনা করে। কিন্তু সরকারী ব্যয়-নিয়ন্ত্রণেব পক্ষে ইহাই যথেষ্ট বলিয়া মনে করা হয় না। বলা হয় যে, সরকার যখন ব্যয়ের প্রস্তাব করে তখনই সরকারের আনুমানিক ব্যয়ের হিসাব (estimates) পর্যালোচনা করিয়া ব্যয়সংক্ষেপের সুপারিশ করিতে পারে এমন কোন সংস্থা থাকা প্রয়োজন। অর্থাৎ, প্রস্তাবের পর্যায়ে সরকারের প্রস্তাবিত ব্যয়ের বিচারবিবেচনা কবিয়া ব্যয়সংক্ষেপেব সুপারিশ করিবার জন্য কমিটি থাকা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য ভারতীয় সংসদে 'আনুমানিক ব্যয়-হিসাব কমিটি' গঠন করার ব্যবস্থা রহিয়াছে।

গঠন : সংসদের এই কমিটি ৩০ জন সদস্য লইয়া গঠিত। লোকসভা উহার নিজস্ব সদস্যদেব মধ্য হইতে সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে ইহাদের নির্বাচিত কবে। **কোন মন্ত্রী এই কমিটির সদস্য হইতে পারেন না।** কমিটির সদস্যদের মধ্য হইতে কমিটির চেয়ারম্যান বা সভাপতিকে নিয়োগ করেন স্পীকার। সদস্যদের কার্যকালের মেয়াদ হইল এক বৎসর, তবে কমিটির কার্যের গতি অব্যাহত রাখিবার উদ্দেশ্যে এই প্রথা করা হইয়াছে যে প্রতি বৎসর পূর্বতন সদস্যদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ অবসর গ্রহণ করিবেন।

কার্যাবলী : সংসদের আনুমানিক ব্যয়-হিসাব কমিটির প্রধান প্রধান কাজ হইল নিম্নরূপ : (১) যে নীতির উপর ভিত্তি করিয়া সরকার আনুমানিক ব্যয়ের হিসাব প্রস্তাব করে সেই নীতিকে মানিয়া লইয়া কিভাবে ব্যয়সংক্ষেপ করা যায়, কিভাবে সংগঠনগত উন্নয়ন, দক্ষতা বা শাসনকার্যের পরিচালনাগত সংস্কারসাধন সম্ভব করা যায় তাহার ইংগিত দিয়া কমিটি রিপোর্ট প্রদান করে। (২) শাসনকার্য পরিচালনার ব্যয়সংক্ষেপ ও দক্ষতা নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে কমিটি বিকল্প নীতির (alternative policies) ইংগিতও দিতে পারে। (৩) প্রস্তাবিত ব্যয়ের হিসাবে অর্থ বিভিন্ন ব্যয়েব মধ্যে সরকার সুষ্ঠুভাবে বণ্টন করিয়া দিয়াছে কি না তাহার বিচারবিবেচনা করে।

১. "The Committee's power is indirect and lies nominally in the potential results of the reports and in the publicity which it is able to give to the questions it investigates and in the moral effect of its criticism." A. K. Chanda : *Indian Administration*

(৪) আনুমানিক ব্যয়ের হিসাবকে কি আকারে আইনসভার নিকট পেশ করা হইবে, সে-সম্পর্কে কমিটি সুপারিশ করিতে পারে।

লোকসভায় আনুমানিক ব্যয়ের হিসাব উপস্থিত করার পর কমিটি উহার কার্য সুরু করিতে পারে। সমগ্র আর্থিক বৎসর (financial or fiscal year) ধরিয়াই কমিটি উহার কাজ চালাইয়া যাইতে পারে এবং যেমন যেমন কাজ হইতে থাকে লোকসভার নিকট কমিটি সেরূপ রিপোর্ট দাখিল করে। তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে কমিটি উহার রিপোর্ট দাখিল করিবার পূর্বেই লোকসভা সরকারের 'ব্যয়মঞ্জুরীর দাবিসমূহ' (demands for grants) পাস করিতে পারে। কোন বৎসরের আনুমানিক হিসাবের সমগ্রটাই যে কমিটিকে বিচারবিবেচনা করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। প্রকৃতপক্ষে যাহা করা হয় তাহা হইল এই যে, **কমিটি এক বা একাধিক সরকারী বিভাগের আনুমানিক হিসাবের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ হইতে কতিপয় বিষয় বাছিয়া লইয়া উহার বিচারবিবেচনা করে।** বিচারবিবেচনার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করে। বিচারবিবেচনার জন্য ধার্য তারিখে সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মসচিব উপস্থিত হইয়া ঐ বিভাগের প্রস্তাবিত ব্যয়ের সমর্থনে বক্তব্য পেশ করেন। লোকসভার নিকট পেশ করিবার পূর্বে তথ্যগত যাথার্থ্য নির্ণয়ের জন্য কমিটি উহার রিপোর্টকে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের নিকট প্রেরণ করে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের নিকট তথ্যাদি সংক্রান্ত সংবাদ পাওয়ার পর কমিটির চেয়ারম্যান রিপোর্টের প্রয়োজনীয় পরিবর্তনসাধন করিতে পারেন। রিপোর্ট এইরূপে চূড়ান্তভাবে প্রণীত হওয়ার পর উহাকে লোকসভায় দাখিল করা হয়। যদিও আনুমানিক ব্যয়-হিসাব কমিটির উপর আনুষ্ঠানিকভাবে কোন বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয় না তথাপি লোকসভায় সদস্যরা বাজেট আলোচনার সময় রিপোর্টের কথা উল্লেখ করিতে পারেন।

কমিটির কার্য যে **গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল** তাহা সহজেই অনুভব করা যায়। সুতরাং প্রয়োজন হয় বিবেচনাধীন বিষয়সমূহকে বিস্তৃত বিশ্লেষণ করিয়া দেখা। এই উদ্দেশ্যে এক বা একাধিক সাব-কমিটি (sub-committees) গঠন করা হয়। সাব-কমিটি বিভিন্ন বিষয়ের পুংখানুপুংখ পরীক্ষা করিয়া কমিটির কার্যে সহায়তা করে।

আনুমানিক হিসাব কমিটির উপযোগিতা সম্পর্কে লর্ড মরিসন কমন্স সভার কমিটি প্রসংগে যে উক্তি করিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিয়া বলা যায় যে বর্তমান সময়ে আইন-সভার পক্ষে সরকারী আনুমানিক হিসাবের খুঁটিনাটির বিস্তৃত বিচারবিশ্লেষণ করা সম্ভব নয় : এই কার্যের জন্য কমিটিই অধিকতর উপযোগী এবং অধিকতর কার্যকর।[১] দ্বিতীয়ত, ব্যয় পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে কমিটির সুপারিশ ও সমালোচনা সরকারকে প্রভূত সাহায্য করে। তৃতীয়ত, কমিটির মন্তব্য ও সমালোচনার ভয়ে সরকার ও বিভিন্ন বিভাগকে বুঝিয়াসুঝিয়া চলিতে এবং ব্যয়সংক্ষেপ করিতে সযত্ন হইতে হয়।

১. "...it would be difficult, if not impossible, for the House (of Commons) as a whole to examine...the accounts and estimates in detail : committees are more effective instruments for such a purpose." Lord Morrison

কমিটির ক্ষমতার সমীচীনতা: সরকারী নীতি বিবেচনা করিবার ক্ষমতা কমিটিকে দেওয়া সমীচীন কি না সে-সম্পর্কে শাসনতন্ত্রবিদগণের মধ্যে মতবিরোধ রহিয়াছে। অনেকে বলেন, সরকারী নীতি সম্পর্কে কমিটির উপর বাধানিষেধ থাকিলে কমিটির কার্য বিশেষ ফলপ্রসূ হইতে পারে না। সরকারী ব্যয় কত কি হইবে না-হইবে তাহা প্রধানত সরকারী নীতির দ্বারাই নির্ধারিত হয়। অপরপক্ষে সমালোচকগণ বলেন সরকারী নীতির বিবেচনার ক্ষমতা কমিটিকে প্রদত্ত হইলে কমিটি **তথ্য-তদন্তকারী সংস্থার** (a fact-finding mechanism) স্থলে **ত্রুটিবিচ্যুতি-তদন্তকারী সংস্থায়** (a fault-finding mechanism) পরিণত হয়। ইহা ব্যতীত কমিটির সম্মুখে সরকারী নীতির সমর্থন করিতে হয় বলিয়া স্থায়ী কর্মচারীরা বিব্রত বোধ করেন। বলা হয়, এই অবস্থা সংসদীয় শাসন-ব্যবস্থার সহিত কোনক্রমেই সংগতিপূর্ণ নয়। কারণ, ক্যাবিনেট শাসন-পদ্ধতিতে সরকারী নীতির জন্য দায়িত্ব বহন করেন মন্ত্রীরা এবং ইঁহাদের আইনসভার নিকট জবাবদিহি করিতে হয়। সুতরাং **আনুমানিক হিসাব কমিটি সরকারী নীতি বিচারের যথোপযুক্ত স্থান নয়** এবং সরকারী কর্মচারীদের উপর সরকারী নীতি সমর্থনের দায়িত্ব ন্যস্ত করারও কোন যুক্তি থাকিতে পারে না। সংসদ ও কমিটির কার্য এবং সরকারী কর্মচারী ও মন্ত্রীদের ভূমিকার মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে।[১]

৯. ভারতীয় সংসদের কমিটি-ব্যবস্থা (The Committee System in the Indian Parliament):

বর্তমান যুগে বিভিন্ন দেশের আইনসভাগুলিতে কমিটি-ব্যবস্থার দ্রুত প্রসার দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য বিভিন্ন দেশের আইনসভার কমিটিগুলির ক্ষমতা ও কার্যাবলীর মধ্যে তারতম্য রহিয়াছে।

৯.১. কমিটি-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা: কমিটি-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সহজেই উপলব্ধি করা যায়। রাষ্ট্রের কার্যাবলী একদিকে যেমন দিনের পর দিন বাড়িয়া চলিয়াছে অপরদিকে আবার তেমনি জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। ফলে বহু সদস্য-সম্বলিত আইনসভাগুলির পক্ষে বিভিন্ন বিষয়ের বিস্তৃত বিচারবিবেচনা সম্ভবপর হইতেছে না। সুতরাং সমস্যা দাঁড়াইয়াছে কিভাবে আইনসভাগুলি দক্ষতা বজায় রাখিয়া ক্ষিপ্রতার সহিত উহাদের **ক্রমবর্ধমান কার্যাদি** সম্পাদন করিতে পারে। এই সমস্যার চাপেই আইনসভাগুলি কমিটি-ব্যবস্থা প্রবর্তিত করিতে বাধ্য হইয়াছে। ইহাতে আইনসভাগুলির সময়সংক্ষেপ এবং বিভিন্ন বিষয়ের সম্যক বিবেচনা নিশ্চিত করা সম্ভবপর হয়।[২]

ইহা ব্যতীত কমিটি-ব্যবস্থার ফলে আইনসভার অভিজ্ঞ ও দক্ষ সদস্যগণ কমিটির কার্যে নিয়োজিত হওয়ার সুযোগ পান। দলীয় উত্তেজনা অপেক্ষাকৃত কম থাকায় কমিটিগুলি

---

১. "The Estimates Committee cannot be the forum for the discussion of policy, nor can officials be counsels for defence. Parliamentary functions (must be distinguished from committee functions and the role of officials distinguished from that of ministers." Asok Chanda

২. K. C. Wheare: *Government by Committee*

শান্ত পরিবেশে সুষ্ঠুভাবে বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আলোচনা করিতে সমর্থ হয়। আর এক দিক হইতেও কমিটি-ব্যবস্থার গুরুত্বের কথা উল্লেখ করা হয়। বলা হয়, কমিটি-ব্যবস্থার মাধ্যমে আইনসভা শাসন বিভাগের কার্যাদি নিয়ন্ত্রণ করিতে সমর্থ হয়। বস্তুত, **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত**—যেখানে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি প্রবর্তিত—দেশে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রিত রাখিবার অন্যতম প্রধান উপায় হইল কমিটি-ব্যবস্থা।

৯.২. ভারতীয় সংসদের স্থায়ী ও অস্থায়ী কমিটি: ভারতে সংসদীয় কমিটিগুলিকে মোটামুটিভাবে **দুই ভাগে ভাগ** করা যায়. (১) অস্থায়ী কমিটি (*ad hoc* committees), এবং (২) স্থায়ী কমিটি (standing committees)। অস্থায়ী কমিটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে গঠিত হয় এবং কার্য সমাপ্ত হইলে উহা ভাঙিয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, অস্থায়ী কমিটিগুলির মধ্যে বিল সম্পর্কিত সিলেক্ট কমিটি (Select Committees on Bills) এবং যুক্ত কমিটির (Joint Committees) কথা উল্লেখ করা যায়। অপরদিকে স্থায়ী কমিটিগুলি অপেক্ষাকৃত স্থায়ী ধরনের, অস্থায়ী কমিটিগুলির মত নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের সংগে সংগে ভাঙিয়া যায় না। স্থায়ী কমিটির উদাহরণ হিসাবে কার্য পরিচালনাসংক্রান্ত পরামর্শদান কমিটি, আবেদনসংক্রান্ত কমিটি, অধিকার-সংক্রান্ত কমিটি, নিয়মাবলীসংক্রান্ত কমিটি প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়।

৯.৩. লোকসভার কমিটি (Committees of the *Lok Sabha*):

সংসদের কার্যে সাহায্য করিবার জন্য বিভিন্ন কমিটি রহিয়াছে। এই কমিটিগুলিকে মোটামুটিভাবে তিন ভাগে বিভক্ত কব' যায়।

তিন শ্রেণীর কমিটি: প্রথমত আছে **সাধারণ প্রকৃতির** কতকগুলি **কমিটি**—যেমন, কার্য পরিচালনাসংক্রান্ত পরামর্শদান কমিটি, নিয়মাবলীসংক্রান্ত কমিটি, অধিকার-সংক্রান্ত কমিটি ইত্যাদি। ইহারা প্রধানত সংসদের গঠন ও ক্ষমতাসংক্রান্ত বিষয়াদি লইয়া বিচারবিবেচনা করে। দ্বিতীয়ত রহিয়াছে সংসদের আইন প্রণয়নসংক্রান্ত কমিটি—যেমন, প্রত্যেক কক্ষের বিল সম্পর্কিত সিলেক্ট কমিটি, উভয় কক্ষের যুক্ত কমিটি ইত্যাদি। তৃতীয়ত রহিয়াছে সংসদের অর্থবিষয়ক কার্য সম্পর্কিত কমিটি—যথা, সরকারী গণিতক কমিটি, আনুমানিক ব্যয়-হিসাব কমিটি এবং সরকারী উদ্যোগাধীন প্রতিষ্ঠানসংক্রান্ত কমিটি। নিম্নে গুরুত্বপূর্ণ কমিটিগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হইল.

১। কার্য পরিচালনাসংক্রান্ত পরামর্শদান কমিটি (Business Advisory Committee): লোকসভার অধিবেশন প্রারম্ভের সংগে এই কমিটি স্পীকার কর্তৃক গঠিত হয়। ইহার সদস্যসংখ্যা ১৫ জনের অধিক হয় না এবং স্পীকার নিজেই কমিটির সভাপতিত্ব করেন। নূতনভাবে গঠিত না-হওয়া পর্যন্ত কমিটি কাজ করিয়া চলে। এই কমিটির প্রধান কার্য হইল সরকারী বিল বা অন্যান্য সরকারী কার্যের পরিচালনার বিভিন্ন পর্যায়ের জন্য কতটা সময় ব্যয় করা হইবে সেই সম্পর্কে সুপারিশ প্রদান করা।

২। আবেদনসংক্রান্ত কমিটি (Committee on Petitions): এই কমিটিও ১৫ জন সদস্য লইয়া গঠিত হয়। স্পীকার সদস্যগণকে মনোনীত করেন।

নূতন কমিটি গঠিত না-হওয়া পর্যন্ত পূর্বেকার কমিটি কার্য করিতে থাকে। জনসাধারণ বিল বা অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে লোকসভার নিকট যে আবেদন করে তাহার বিচারবিবেচনা করা এবং লোকসভার নিকট ঐ সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদান করা এই কমিটির কার্য।

৩। **নিয়মাবলীসংক্রান্ত কমিটি (Committee on Rules)**: এই কমিটি স্পীকার কর্তৃক মনোনীত ১৫ জন সদস্য লইয়া গঠিত হয়। স্পীকার পদাধিকার-বলে কমিটির সভাপতি হন। এই কমিটি লোকসভার কার্যের পদ্ধতি ও পরিচালনা সম্পর্কে বিচারবিবেচনা করে এবং প্রয়োজন মনে করিলে লোকসভার নিয়মকানুনের পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের সুপারিশ প্রদান করে।

৪। **অধিকারসংক্রান্ত কমিটি (Committee of Privileges)**: স্পীকার কর্তৃক এই কমিটি মনোনীত হয় এবং ইহার সদস্যসংখ্যা ১৫ জন। লোকসভা এবং ইহার সদস্য বা কমিটির অধিকার-সম্পর্কিত প্রশ্নের বিচারবিবেচনা করে।. লোকসভা কিংবা স্পীকার যখন অধিকারভংগের প্রশ্ন ইহার নিকট পেশ করে তখন কমিটিকে তথ্যাদি বিচার করিয়া স্থির করিতে হয় যে অধিকার ভংগ করা হইয়াছে কি না এবং ঐ সম্পর্কে সুপারিশ প্রদান করিতে হয়।

৫। **সরকারী প্রতিশ্রুতিসংক্রান্ত কমিটি (Committee on Goverument Assurances)**. এই কমিটি স্পীকার কর্তৃক মনোনীত ১৫ জন সদস্য লইয়া গঠিত হয়। ইহার **কার্যকালের মেয়াদ** ১ বৎসর। মন্ত্রীরা লোকসভায় যে-সকল প্রতিশ্রুতি দেন তাহা এই কমিটি পরীক্ষা করিয়া দেখে, কতদূর এই সকল প্রতিশ্রুতি কার্যকর করা হইয়াছে এবং করা হইয়া থাকিলে সময়মত করা হইয়াছে কি না সেই সম্পর্কে কমিটি লোকসভার নিকট রিপোর্ট প্রদান করে। এখানে পুনরুল্লেখ করা যাইতে পারে যে অন্যান্য দেশের আইনসভায় এই ধরনের কমিটি নাই।

৬। **অধস্তন আইনসংক্রান্ত কমিটি (Committee on Subordinate Legislation)**: এই কমিটি স্পীকার কর্তৃক মনোনীত অনধিক ১৫ জন সদস্য লইয়া এক বৎসরের জন্য গঠিত হয়। **মন্ত্রীরা ইহার সদস্য হইতে পারেন না।** এই কমিটির কার্যাদির আলোচনা অন্যত্র করা হইয়াছে (২২৩-২৪ পৃষ্ঠা)। এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা যায়, যে আইনের দ্বারা শাসন বিভাগের হস্তে নিয়মকানুন প্রণয়ন ও প্রবর্তন করার ক্ষমতা ন্যস্ত করা হইয়াছে সেই আইন অনুযায়ী ক্ষমতা প্রযুক্ত হইয়াছে কি না সে-সম্পর্কে বিচারবিবেচনা করা এবং লোকসভার নিকট রিপোর্ট প্রদান করা এই কমিটির দায়িত্ব।

৭। **লোকসভার বৈঠকে সদস্যদের অনুপস্থিতি সম্পর্কিত কমিটি (Committee on Absence of Members from the Sittings of the House)**: এই কমিটির সদস্যসংখ্যা হইল ১৫ জন। ইহারা স্পীকার কর্তৃক এক বৎসরের জন্য মনোনীত হন। কমিটির কার্য হইল লোকসভার বৈঠকে অনুপস্থিত হওয়ার জন্য সদস্য যে আবেদনপত্র পেশ করেন তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা। যেক্ষেত্রে কোন সদস্য ৬০ দিন বা ততোধিক দিন অনুপস্থিত রহিয়াছেন তাঁহার অনুপস্থিতি মকুব করা

হইবে, না তাঁহার আসন শূন্য হইয়াছে ঘোষণা করা হইবে সে-সম্পর্কে কমিটি রিপোর্ট প্রদান করে।

৮। **সরকারী গণিতক কমিটি (Public Accounts Committee):** ইতিপূর্বেই এই কমিটির গঠন ও কার্য সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে (২৫৪-৫৫ পৃষ্ঠা)। এখানে সংক্ষেপে উহার পুনরুল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রত্যেক বৎসর লোকসভা সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে এই কমিটিতে ১৫ জন সদস্য নির্বাচিত করে। ইহা ব্যতীত রাজ্যসভার ৭ জন সদস্য ইহার সহিত সংযুক্ত করা হয়। **কোন মন্ত্রী কমিটির সদস্য হইতে পারেন না।** সরকারী গণিতক কমিটির কার্য হইল সরকারের বিনিয়োগ হিসাব এবং অন্যান্য যে-সকল হিসাব সংসদের নিকট উপস্থিত করা হয় সেই সকল হিসাব এবং নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনাপরীক্ষকের রিপোর্ট পরীক্ষা করিয়া দেখা। এরূপ পরীক্ষার উদ্দেশ্য সহজেই বুঝা যায়। কমিটিকে দেখিতে হয় যে সংসদ যে উদ্দেশ্যে অর্থমঞ্জুর করিয়াছে সেই উদ্দেশ্যেই সরকার নির্দিষ্ট অর্থ ব্যয় করিয়াছে কি না তাহা দেখা। অপচয়, অমিতব্যয়িতা, অফলপ্রসূ ব্যয় প্রভৃতি সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ব্যয়সংক্ষেপের ইংগিত কমিটি দিয়া থাকে।

৯। **আনুমানিক ব্যয়-হিসাব কমিটি (Estimates Committee):** এই কমিটির গঠন ও কার্যাবলী সম্পর্কেও পূর্বে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে (২৫৫-৫৭ পৃষ্ঠা)। সংক্ষেপে, কমিটিটি ৩০ জন সদস্য লইয়া গঠিত হয়; সদস্যগণ সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে এক বৎসরের জন্য লোকসভা কর্তৃক নির্বাচিত হন। কমিটির কার্যাবলীর মধ্যে প্রধান চারিটি হইল: (ক) সরকারের আনুমানিক ব্যয়ের হিসাবকে পরীক্ষা করিয়া দেখা এবং কিভাবে ব্যয়সংক্ষেপ, সংগঠনগত উন্নয়ন, দক্ষতা বা শাসনকার্যের পরিচালনাগত সংস্কারসাধন সম্ভব করা যায় তাহার ইংগিত দিয়া বিপোর্ট প্রদান করা; (খ) শাসনকার্য পরিচালনার দক্ষতাবৃদ্ধি এবং ব্যয়সংক্ষেপের উদ্দেশ্যে বিকল্প নীতির (alternative policies) ইংগিতও দেওয়া; (গ) প্রস্তাবিত ব্যয়ের হিসাবে সরকার বিভিন্ন খাতের মধ্যে অর্থ সুষ্ঠুভাবে বণ্টনের ব্যবস্থা করিয়াছে কি না তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা; এবং (ঘ) আনুমানিক ব্যয়ের হিসাবকে সংসদের নিকট কি আকারে পেশ করা হইবে না পেশ করা হইবে না, সে-সম্পর্কে সুপারিশ করা।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় সরকারী গণিতক কমিটি এবং আনুমানিক ব্যয়-হিসাব কমিটির স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ বহু পরিমাণে এই দুইটি কমিটির মাধ্যমেই আইনসভা সরকার এবং সরকারী ব্যয়কে নিয়ন্ত্রিত রাখিতে সমর্থ হয়।

১০। **বিল সম্পর্কিত সিলেক্ট কমিটি (Select Committees on Bills):** যখন কোন বিল সম্পর্কে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বা সদস্য প্রস্তাব করেন যে বিলটিকে সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণ করা হউক তখনই এইরূপ কমিটি গঠিত হয়। প্রস্তাবকারী ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বা সদস্যই কমিটির সদস্যদের নাম ঠিক করেন এবং সদস্যদের মধ্য হইতে স্পীকার কর্তৃক সভাপতি নিযুক্ত হইয়া থাকেন। কমিটিতে সংশ্লিষ্ট বিলটির আলোচনা

এবং বিভিন্ন ধারার বিচারবিবেচনা চলে। কমিটি সংশোধনের সুপারিশ করিতে পারিলেও উদ্দেশ্য বা নীতির পরিবর্তন করিতে পারে না। বিচারবিবেচনার উদ্দেশ্যে সাক্ষীসাবুদ গ্রহণ, কাগজপত্র তলব, সংশ্লিষ্ট স্বার্থের বক্তব্য শ্রবণ ইত্যাদি করিতে কমিটি সমর্থ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কমিটি রিপোর্ট তৈয়ারি করে এবং লোকসভার নিকট পেশ করে।

১১। বেসরকারী বিল ও প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি (Committee on Private Members' Bills and Resolutions): এই কমিটি অনধিক ১৫ জন সদস্য লইয়া গঠিত হয়। সদস্যগণ স্পীকার কর্তৃক এক বৎসরের জন্য মনোনীত হন। কমিটির বিভিন্ন কার্য রহিয়াছে। কোন বেসরকারী বিল সংবিধানের সংশোধন করিতে চাহিলে তাহা লোকসভার কার্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করিবার পূর্বে কমিটি ঐ বিলকে পরীক্ষা করিয়া দেখে। আবার কমিটি উত্থাপিত সকল প্রকার বেসরকারী বিলকেই লোকসভা কর্তৃক বিবেচিত হওয়ার পূর্বে পরীক্ষা করে এবং প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অনুসারে উহাদিগকে 'ক' ও 'খ' শ্রেণীতে বিভক্ত করে। বিলগুলির আলোচনার সময় কি হইবে না হইবে, সে-সম্পর্কেও কমিটি সুপারিশ করে। ইহা ব্যতীত কোন বিল সম্পর্কে যদি আপত্তি উঠে যে উহা লোকসভার এক্তিয়ারভুক্ত নয় তাহা হইলে কমিটি ঐ বিলকে পরীক্ষা করিয়া দেখে।

১২। সরকারী উদ্যোগাধীন প্রতিষ্ঠানসংক্রান্ত কমিটি (Committee on Public Undertakings): সরকারী উদ্যোগাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের কাজ-কর্মের অনুসন্ধান করার জন্য এই কমিটি ১৯৬৪ সাল হইতে প্রবর্তিত হইয়াছে। কমিটি লোকসভার ১০ জন সদস্য এবং রাজ্যসভার ৫ জন সদস্য লইয়া গঠিত। কমিটির কার্য হইল: (ক) নির্দিষ্ট সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির রিপোর্ট ও হিসাব পরীক্ষা করা; (খ) সরকারী প্রতিষ্ঠানসংক্রান্ত নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনাপরীক্ষকের কোন রিপোর্ট থাকিলে তাহার বিবেচনা করা; (গ) সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি সঠিক ব্যবস্থায় এবং সমুচিত বাণিজ্যিক নীতি অনুযায়ী পরিচালিত হইতেছে কি না তাহা পরীক্ষা করা (এরূপ পরীক্ষা ঐ প্রতিষ্ঠানগুলির স্বাতন্ত্র্য ও দক্ষতার পরিপ্রেক্ষিতে করিতে হয়); এবং (ঘ) সরকারী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত যে-সকল কার্য বর্তমানে আনুমানিক ব্যয়-হিসাব কমিটি ও সরকারী গণিতক কমিটির হস্তে ন্যস্ত তাহা স্পীকার নির্দেশ করিলে বিচারবিবেচনা করিয়া দেখা। কিন্তু কমিটি সরকারী নীতি এবং প্রতিষ্ঠানগুলির দৈনন্দিন কার্য পরিচালনাসংক্রান্ত বিষয়াদির বিচারবিবেচনা বা অনুসন্ধান করিতে সমর্থ নয়।

৯.৪. রাজ্যসভার কমিটি (Committees of the *Rajya Sabha*): লোকসভার মত রাজ্যসভারও বিভিন্ন কমিটি রহিয়াছে, তবে লোকসভার তুলনায় রাজ্যসভায় কমিটির সংখ্যা অল্প। যেমন, রাজ্যসভায় আনুমানিক ব্যয়-হিসাব কমিটি, সরকারী গণিতক কমিটি, সরকারী প্রতিষ্ঠানসংক্রান্ত কমিটি অথবা অধস্তন আইন-সংক্রান্ত কমিটি নাই। অপরপক্ষে, রাজ্যসভায় নিম্নলিখিত কমিটিগুলি রহিয়াছে: কার্য পরিচালনাসংক্রান্ত পরামর্শদান কমিটি (Business Advisory Committee), আবেদনসংক্রান্ত কমিটি (Committee on Petitions), অধিকারসংক্রান্ত কমিটি

(Committee of Privileges), নিয়মাবলীসংক্রান্ত কমিটি (Committee on Rules) এবং বিল সম্পর্কিত সিলেক্ট কমিটি (Select Committee on Bills)। এই সকল কমিটির গঠন ও কার্যাবলী লোকসভার অনুরূপ কমিটির গঠন ও কার্যাবলীর মত।

দুই কক্ষের যুক্ত কমিটি (Joint Committee of both Houses): গুরুত্বপূর্ণ বিলের বিচারবিবেচনার জন্য দুই কক্ষের যুক্ত সিলেক্ট কমিটি (Joint Select Committees) নিয়োগ করা হয়।

যুক্ত কমিটি: ইহা ব্যতীত তিনটি স্থায়ী যুক্ত কমিটি (Standing Joint Committees of the two Houses) রহিয়াছে: (ক) বেতনভুক্ পদসংক্রান্ত কমিটি (The Committee on Offices of Profit), (খ) সংসদ সদস্যদের বেতন ও ভাতা সম্পর্কিত কমিটি (The Committee on Salaries and Allowances of Members of Parliament) এবং তপশীলভুক্ত বর্ণ ও জনজাতির কল্যাণসংক্রান্ত কমিটি (The Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes)।

"A Good system of government is dependent on a sound financial system, and Parliamentary control over the finances of the State, wisely and effectively exercised, is the most secure foundation for a democratic form of administration." G S Rou

---

স্মর্তব্য

১. সংসদে আইন প্রণয়নের জন্য দুই কক্ষেই বিল পাস হওয়ার প্রয়োজন হয়।

২. অর্থবিষয়ক ব্যাপারে রাজ্যসভার ক্ষমতা নাই বলিলেও হয়।

৩ বিভিন্ন পদ্ধতিতে লোকসভা ব্যয়-নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা করিলেও প্রকৃতপক্ষে আয়ব্যয় নিয়ন্ত্রণের বিশেষ ক্ষমতা সভার নাই।

৪. অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতীয় সংসদেও কমিটি-ব্যবস্থা বেশ কিছুটা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

অনুশীলনী

1. **Write a note on the legislative procedure in the Indian Parliament.** (C. U. 1975)

[ভারতীয় সংসদে আইন-প্রণয়ন পদ্ধতির উপর একটি টীকা রচনা কর। (২৩৪—৩৯ পৃষ্ঠা)

2. **What are Money Bills in respect of the Indian Union under the Constitution? Describe fully the procedure laid down in the Constitution for the passing of Money Bills by the Union Parliament.** (C. U. 1966, '72)

ভারতীয় সংবিধানে ইউনিয়ন-সরকারের অর্থ বিল বলিতে কি বুঝায়? কেন্দ্রীয় সংসদ কর্তৃক অর্থ বিল পাসের প্রকৃতি সংবিধানে লিপিবদ্ধ আছে তাহার পূর্ণ বিবরণ দাও।] (২৪০—৪২, ২৪৩—৪৪ পৃষ্ঠা)

3. **Discuss the nature of financial control exercised by Parliament over the finances of the Union.** **(C. U. 1967, '69, '78)**

[ভারতীয় সংসদ ইউনিয়ন সরকারের আয়ব্যয় কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে তাহার পর্যালোচনা কর।] (২৫০-৫২, ২৫৪-৫৭ পৃষ্ঠা)

4. **Discuss the role and functions of the Comptroller and Auditor-General of India under the Constitution of India.**

[ভারতীয় সংবিধানে নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনাপরীক্ষকের ভূমিকা ও কার্যাবলী ব্যাখ্যা কর।]

(২৫১-৫৩ পৃষ্ঠা)

5. **How is the budget passed in the Indian Parliament? What laws are necessary to give effect to the budget proposals as they are passed by Parliament?**

(C. U. 1970)

[ভারতীয় সংসদে বাজেট কিভাবে পাস হয়? সংসদে গৃহীত বাজেটের প্রস্তাবগুলি কার্যকর করিবার জন্য কি কি আইন পাসের প্রয়োজন হয়?] (২৪৫-৫০ পৃষ্ঠা)

6. **What is a 'Money Bill'? Explain how a Money Bill is adopted by the Union Parliament.** **(C. U. 1983)**

[অর্থ বিল কাহাকে বলে? ভারতীয় সংসদে অর্থ বিল গ্রহণের পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর।]

(২৪০-৪২, ২৪৩-৪৪ পৃষ্ঠা)

7. **Discuss the Committee System of the Indian Parliament.**

[ভারতীয় সংসদে কমিটি-ব্যবস্থার পর্যালোচনা কর।] (২৫৭-৬২ পৃষ্ঠা)

8. **Write notes on: (*a*) Consolidated Fund, (*b*) Appropriation Bill, (*c*) Supplementary Grant, and (*d*) Finance Commission.** **(C. U. 1966, '67, '70, '74)**

[টীকা রচনা কর: (ক) সঞ্চিত তহবিল, (খ) বিনিয়োগ বিল, (গ) অনুপূরক ব্যয়মঞ্জুরী, এবং (ঘ) ফিনান্স কমিশন।] (২৪৫, ২৪৮, ২৪৯, ৭৪-৭৫ পৃষ্ঠা)

১৬ ভারতীয় সংসদের সাংবিধানিক মর্যাদা (THE CONSTITUTIONAL STATUS OF THE INDIAN PARLIAMENT)

"In the main our Constitution has preferred the supremacy of the Legislature to that of the Judiciary." Das J.

১ ব্রিটিশ ও মার্কিন আইনসভা (British and American Legislature): শাসন-ব্যবস্থায় স্থান ও মর্যাদার দিক দিয়া ভারতীয় সংসদ ব্রিটিশ সংসদীয় ব্যবস্থা ও মার্কিনী ব্যবস্থার মধ্যবর্তী স্থান অধিকার করে। **ব্রিটিশ সংবিধানের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল সংসদের প্রাধান্য বা সার্বভৌমিকতা** (the supremacy or sovereignty of Parliament)। ব্রিটিশ সংসদের এই প্রাধান্যের অর্থ হইল যে আইনত সংসদের উপর কোন বাধানিষেধ নাই। ইহা যে-কোন রকমের আইন প্রণয়ন, পরিবর্তন বা বাতিল করিতে পারে। আদালত আইনের ব্যাখ্যা করিতে পারে, কিন্তু কোনক্রমেই সংসদ কর্তৃক রচিত আইনের বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলিতে পারে না। সংসদের সমস্ত আইনই আদালতের নিকট বৈধ।[১] অপরপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধানের প্রাধান্য থাকায় সরকারের বিভিন্ন বিভাগকে সংবিধান-নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকিয়া কার্য করিতে হয়। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা কংগ্রেসকে সংবিধান-নির্দিষ্ট ক্ষমতা সম্পর্কেই আইন প্রণয়ন করিতে হয়, নতুবা সংবিধান ভংগের অভিযোগে ঐ আইন বাতিল হইয়া যায়। ইহা হইতে বুঝা যায়, ব্রিটেনে যেমন সংসদের প্রাধান্য রহিয়াছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেসের তাহা নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রাধান্য ভোগ করে সুপ্রীম কোর্ট। সংবিধানের অর্থ কি এবং আইনসভা ও শাসন বিভাগ সংবিধান-নির্দিষ্ট সীমা লংঘন করিতেছে কিনা, তাহা বিচারের ক্ষমতা নিজের হস্তে তুলিয়া লইয়া সুপ্রীম কোর্ট নিজের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছে। এই প্রাধান্যের ফলে সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের ব্যাখ্যাই হইয়া দাঁড়াইয়াছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান ('The Constitution is what the judges say it is')। এবং সুপ্রীম কোর্ট আইনসভা-প্রণীত কোন আইনকে মাত্র সংবিধানের সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে বলিয়াই বাতিল করিতে পারে না, যুক্তিযুক্ত নয় বা স্বাভাবিক [illegible] নীতিকে লংঘন করিয়াছে বলিয়াও যে-কোন আইনকে অবৈধ বলিয়া ঘোষণা [illegible] পারে। সুতরাং আইন প্রণয়ন ব্যাপারে আইনসভার সিদ্ধান্তই সব কিছু নয়। [illegible] শেষ পর্যন্ত সুপ্রীম কোর্টের মতামতই আইন হইয়া দাঁড়ায়।[২]

---

[১] "The principle of parliamentary sovereignty means neither more nor less [illegible]is, namely, that Parliament has, under the...Constitution, the right to [illegible] unmake any law whatever; and further, that no person or body is [illegible] by the law...as having the right to override or set aside the legislation of [illegible]ment." Dicey

[২] [illegible] is not what the legislature desires, but what the Courts regard as [illegible] permissible that in the end becomes law." Dean Roscoe Pound

১.১. সংসদের প্রাধান্য ও আদালতের প্রাধান্যের মধ্যবর্তী অবস্থা: ভারতীয় সংবিধান ব্রিটেনের ন্যায় সংসদের প্রাধান্য এবং মার্কিন দেশের আদালতের প্রাধান্য এই দুই ব্যবস্থার মধ্যবর্তী ব্যবস্থা নির্দেশ করিয়াছে। ইংল্যাণ্ডের মত ভারতে ক্যাবিনেট শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা সংসদের নিকট তাঁহাদের কার্যের জন্য দায়িত্বশীল থাকেন। কিন্তু এই সাদৃশ্য সত্ত্বেও এই দুই সংসদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে। ব্রিটেনের সংসদ আইনগত প্রাধান্য ভোগ করে এবং অনিয়ন্ত্রিতভাবে আইন প্রণয়ন করিতে সমর্থ। **ভারতীয় সংসদ এই ধরনের সার্বভৌম সংস্থা নয়** এবং অবাধভাবে আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা ভোগ করে না।[১] ভারতীয় সংসদের **ক্ষমতার উৎস হইল** লিপিবদ্ধ মৌলিক আইন ভারতীয় সংবিধান। এই সংবিধান কর্তৃক বিভিন্ন অনুচ্ছেদ এবং তপশীলে ভারতীয় সংসদের আইন প্রণয়নের এক্তিয়ার ও ক্ষমতা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যেমন, সংবিধানের ২৪৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংসদের আইন প্রণয়নক্ষমতা রাজ্য তালিকার দ্বারা সীমাবদ্ধ, কারণ রাজ্য তালিকা সম্পর্কে আইন প্রণয়নক্ষমতা ন্যস্ত হইয়াছে রাজ্যগুলির আইনসভার হস্তে, সংসদ সাধারণত ঐ তালিকার উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। আবার সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে যে-সকল মৌলিক অধিকারসংক্রান্ত ব্যবস্থা আছে তাহা লংঘন করিয়া সাধারণ আইনসভা হিসাবে সংসদ আইনকানুন প্রণয়ন করিতে পারে না। আরও উল্লেখ্য, নাগাভূমি ও মিজোরামের ক্ষেত্রে সংসদ কতিপয় ধরনের আইন পাস করিলে সেই আইন সংশ্লিষ্ট রাজ্যের আইনসভা কর্তৃক অনুমোদিত না হইলে কার্যকর হয় না।[২]

সংবিধান-নির্দিষ্ট এই সীমারেখার অর্থ হইল, আইনসভা সংবিধানের নির্দেশ অমান্য করিয়া যদি কোন আইন প্রণয়ন করে তাহা অবৈধ বলিয়াই পরিগণিত হয় এবং কোন আইন সংবিধান লংঘন করিয়াছে বলিয়া অবৈধ কি না তাহার বিচারের ভার ন্যস্ত হইয়াছে আদালতের হস্তে।[৩] এমনকি কতিপয় ক্ষেত্রে আইনসভা-প্রণীত আইনের যৌক্তিকতাও (reasonableness) বিচার করিতে আদালত সমর্থ—যেমন, সংবিধানের ১৯ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্র আইনের দ্বারা মতামত প্রকাশের অধিকার, সমবেত হইবার অধিকার প্রভৃতির উপর যে বাধানিষেধ আরোপ করে তাহা যুক্তিসংগত কি না তাহার বিচারের ভার হইল আদালতের। ভারতীয় সংসদের ক্ষমতার এই সীমাবদ্ধতার কথা মনে রাখিয়াই বলা হয় যে ভারতীয় সংসদ ব্রিটিশ সংসদ অপেক্ষা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের

১. "It (the Indian Parliament) is not a sovereign body, uncontrolled with unlimited powers." Chief Justice Kania, in re *Delhi Laws Act, 1912* (1951) ...

২. Arts. 371-A & G (13th and 53rd Amendment to the constitution).

৩. "The Constitution of India is a written constitution and though it has adopted many of the principles of the English Parliamentary system, it has not accepted the English doctrine of the absolute supremacy of the Parliament in matters of legislation. In India a statute law to be valid must in all cases be in conformity with the constitutional requirements, and it is for the judiciary to decide whether any enactment is constitutional or not." Mukherjea, J. in Gopalan v. *State of Madras* (1950)

কংগ্রেসের সহিত অধিক তুলনীয় এবং **মার্কিন কংগ্রেসের মতই ভারতীয় সংসদ অ-সার্বভৌম আইন প্রণয়ন** সংস্থা বা আইনসভা (*non-sovereign law-making body*)।

তবে একথা যেন **মনে করা না হয়** যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত ভারতেও **আদালতের চরম প্রাধান্য** (absolute supremacy) **সুপ্রতিষ্ঠিত** হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আদালতের ন্যায় ভারতীয় আদালত আইনসভা-প্রণীত আইনের সমীচীনতা বা নীতি সম্পর্কে বিচার করার ক্ষমতা ভোগ করে না। ভারতীয় আদালত শুধু বিচার করিতে পারে যে, সংসদ বা রাজ্যের আইনসভা সংবিধান কর্তৃক নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকিতেছে কি না। সুতরাং বলা যায়, সংবিধান কর্তৃক নির্দিষ্ট বাধানিষেধের বাহিরে ভারতীয় সংসদ নিজস্ব ক্ষেত্রে প্রাধান্য এবং পূর্ণ ক্ষমতা ভোগ করে।[১]

আবার আর একটি ক্ষেত্রে ভারতীয় সংসদ প্রকৃত সার্বভৌম ক্ষমতা ভোগ করে। সংবিধানের অধিকাংশ ব্যবস্থা সংসদ সাধারণ অথবা বিশেষ সংখ্যাগরিষ্টের ভোটাধিক্যে সংশোধন বা পরিবর্তন করিতে পারে। অবশ্য কতকগুলি বিষয় সম্পর্কে সংশোধন করিতে হইলে সংসদের অনুমোদন থাকিলেই চলে না, রাজ্যগুলির আইনসভার অর্ধেকের সম্মতি থাকা প্রয়োজন। সুপ্রীম কোর্ট ১৯৬৭ সালে **গোলকনাথের মামলায় রায়** প্রদান করে যে, সংসদ সংবিধানের সংশোধনের মাধ্যমে মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ বা হরণ করিতে পারে না। ১৯৭১ সালে সুপ্রীম কোর্টের রায় বাতিল করিয়া চতুর্বিংশতিতম সংবিধান পাস করাইয়া ইহাতে বলা হইয়াছে যে সংশোধনের মাধ্যমে সংসদ সংবিধানের মৌলিক অধিকার ও অন্যান্য বিষয়সংক্রান্ত যে-কোন অংশের সংশোধন করিতে পারিবে। ইহার পর এক মামলায় (Keshavananda *v.* State of Kerala) সুপ্রীম কোর্ট রায় প্রদান করে যে, সংসদ সংবিধানের মৌলিক বৈশিষ্ট্য (basic features) সংশোধনের সাহায্যে পরিবর্তিত করিতে পারিবে না। ১৯৭৬ সালে সংবিধানের ৪২তম সংশোধন পাস হয়। ইহাতে বলা হয় যে সংসদ কর্তৃক গৃহীত কোন সংশোধনের বৈধতা-বিচার আদালত করিতে পারিবে না। আরও ঘোষণা করা হয় যে সংসদ যে-কোন সংবিধানের যে-কোন অংশের পরিবর্তন করিতে পারিবে—এ সম্পর্কে সংসদের উপর কোন বাধা থাকিবে না।

এই প্রসংগে উল্লেখ্য যে ১৯৭৮ সালে জনতা সরকার ৪৫তম সংশোধনী বিলে (সংশোধন পাস হইলে উহার ক্রমিক সংখ্যা ৪৪-এ দাঁড়ায়) প্রস্তাব করে যে সংবিধানের মৌল বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করিতে হইলে সংসদে বিশেষ পদ্ধতি ছাড়াও গণভোটের প্রয়োজন হইবে এবং গণভোটে অন্যূন শতকরা ৫১ ভাগ নির্বাচককে ভোট দিতে হইবে। সংবিধানের **প্রস্তাবিত মৌল বৈশিষ্ট্যগুলি** ছিল : (ক) ধর্মনিরপেক্ষ বা গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য, (খ) মৌলিক অধিকার, (গ) প্রাপ্তবয়স্কের স্বাধীন ভোটাধিকার, এবং (ঘ) বিচারালয়ের

১. "Although our Constitution has imposed some limitations on the legislative authorities, yet subject to and outside such limitations our Constitution has left our Parliament and State legislatures supreme in their respective legislative fields." Das, J. in *Gopalan* v. *State of Madras* (1950)

স্বাধীনতা। জনতা সরকারের সংশোধনের এই প্রস্তাব রাজ্যসভা নাকচ করিয়া দেয়। সুতরাং ব্যবস্থাটি ছাড়াই সংবিধানের ৪৫তম সংশোধনী বিল (সংশোধন সংখ্যা ৪৪) পাস হয়।

উপসংহার: উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে সহজেই উপলব্ধি করা যায় ভারতীয় সংবিধানে সংসদের প্রাধান্য যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রচেষ্টাই করা হইয়াছে। তবে কতকগুলি বাধানিষেধ সংসদকে মানিয়া চলিতে হইবে।

"The British Parliament is absolute in its sovereignty and no act of Parliament can be challenged in a Court of Law. The Indian Constituting, following the model of the United States, has established a Supreme Court with the right and duty of upholding the Constitution." K.M.Panikkar

স্মর্তব্য

১. সাংবিধানিক মর্যাদার দিক দিয়া ভারতীয় সংসদ ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ও মার্কিন কংগ্রেসের মধ্যবর্তী স্থান অধিকার করে।

২. সংসদকে অন্যতম অ-সার্বভৌম আইনসভা বলিয়া বর্ণনা করা যায়।

অনুশীলনী

1. Write a note on the constitutional status of the Indian Parliament.

[ভারতীয় সংসদে সাংবিধানিক মর্যাদার উপর একটি টীকা রচনা কর।] (২৬৪-৬৭ পৃষ্ঠা)

2. Is the Indian Parliament a sovereign body ? (C. U. 1972)

[ভারতীয় সংসদ কি এক সার্বভৌম সংস্থা?] (২৫৪-৬৬ এবং ২৬৪ পৃষ্ঠার ১নং প্রশ্ন)